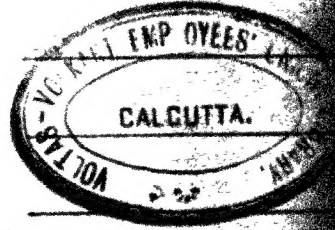


39214



লেখক-লেখিকার সূচী

লেখক-লেখিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আদিবাণী	১
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	গোল্ডেন-গুজ পামা	২
দত্তীন্দ্রমোহন বাগচি	পুনরাগমনার	৯
অমরুপা দেবী	সন্ত তুলসীদাস	৪৬
সুনির্মল বসু	যাস্না রে ভাই	৭৯
ফটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	কালুর গল্প	৪২৭
পরশুরাম	চন্দ্র সূর্য বন্দনা	৫২
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	অপরূপ কথা	৪৫৭
ভারদ্বাজ বন্দ্যোপাধ্যায়	নবীন চাঁনের তরুণ জীবন	১১
প্রবোধকুমার সাত্তাল	সেকালের চোটবেলা	৭৬
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	সিংহগড়ের সিংহবিক্রম	১৪৫
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	ছই ভাই	৩৬৩
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ	২৪
প্রমোদ মিত্র	শিশি	৫৩
বৃদ্ধবেশ বসু	একটি কুকুরচানা ও ছটি ছেলে	৩০
বনমল	নেপথ্যে	১২০
অরবীন্দ্রনাথ রায়	চিকিৎসাখানার খবর	৪৪
মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	হুগের ঢাকা	৪১৭
সজ্জনীকান্ত দাস	'ভরাশা' ও আশা	৭০
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	ভাংচাদার 'হাফাকার'	৩১৬
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	বাণ ও ছেলে	৮১
দৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	ছই ওস্তাদ	১১১
প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	অমৃতপু	৩১০
আশাপূর্ণা দেবী	রং বহল	১৬১
কালিদাস রায়	মৃত সুবিক	১৬৯
নরেন্দ্র দেব	লাবু	১৮৫
নীহাররঞ্জন গুপ্ত	বোকা	২০৮

শেষক-সেবিকা	বিষয়	পৃষ্ঠা
পবেজকুমার বিজ	“মুরকাটা বাবা”	২৬৩
কুমুদকুমার বসিক	বৃক্কের বিধান	২৯০
শরোজকুমার রায়চৌধুরী	মা	২৫৪
বিহারক ভট্টাচার্য	ভোট ফর্ অমরেশ মায়া !	৩২৫
শিবরাম চক্রবর্তী	বিজয়ার পর দিগ্বিজয়	৩২৬
মুকুন্দর দে সরকার	হীরাফুনি	৪০৯
স্বপ্নলতা রাও	পাবাগী	১৫৩
হেবেজকুমার রায়	“বীরাঙ্গনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা”	২৫৫
সাহারানী দেবী	পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত	২৭৪
বশনভূক্তো	যজ্ঞবাক্তির ব্যাপার	২১৯
বোসেনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	স্বাহোর কোয়ারা	৪৪০
বীরেন্দ্রলাল ধর	পুয়াগো বজ্জ	২২৭
মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	বুনো আতা	৮৮
বীরেন্দ্রকুমার ভট্ট	বেটে বাটুলের বুদ্ধি	৩৪৬
অনিমউদ্দিন	শুকঠাকুরের ভাগবত পাঠ	১৩০
দুর্জয়ীন	গুণ একটা শেরালের গল্প	১৬০
বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)	রায়ডাকে বাঘের ডাক	৪৬৮
বিজ্ঞ হুগোপাধ্যায়	বিখ্যাত জলদহা ক্যাপটেন কীড	১৭৪
বিমলচন্দ্র বোষ	রূপকথা নয়	৪০৪
পি. সি. সরকার	ইজ্জতলাল	৩০৪
কিতীজনারায়ণ ভট্টাচার্য	অশ্বখামার পা	২৯২
আশা দেবী	ঘড়িটার ঘুম নেই	৪১৬
প্রভুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	ভিনশেপ্ট্ ভ্যানগগ্ আর পল গগ্যা	১৯৬
স্বধীন্দ্রনাথ রায়	আধারে হুটল আলো	৪২৮
মধুসূদন বসুমদার	ককাল	২৭৯
বিমলচন্দ্র বোষ	সিম্পু বুড়োর জীপ	৩২৩
অম্বগোপাল সিংহ	সাহুসহ	২০৩
অপর্ণা রায়	ছড়াগার বুদ্ধি	৩৫৬
সখনা হাস	“আমি যদি জীপনী ঘেরে হ’তাম”	১০৯
ভগবতীরাণী	সাজা	৪৫৯



বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
অপ্রকাশিত কবিতা—		
পুনরাগমনার ...	যতীন্দ্রমোহন বাগচি ...	৯
হাসনা রে তাই ...	সুনির্মল বসু ...	৭৯
অপ্রকাশিত গল্প—		
✓ সন্ত তুলসীদাস ...	অম্বরুপা দেবী ...	৪৬
অপ্রকাশিত নাটক—		
গোল্ডেন-ওজ পালা ...	অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২
প্রবন্ধ—		
✓ সেকালের ছোটবেলা ...	প্রবোধকুমার সাক্তাল ...	৭৬
উপভাস—		
✓ দুই তাই ...	শৈলজানন্দ বৃথোপাধ্যায় ...	৩৬৩
জন্মগ-কাহিনী—		
নবীন চীনের তরুণ জীবন ...	তারানন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১১
জীবন কথা—		
✓ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ ...	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ...	২৪
ভিনসেন্ট, ভ্যানগগ্‌ আর পল গগ্যা ...	প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১২৬
গল্প—		
✓ দিশি ...	প্রোমেন্স মিত্র ...	৫৩
✓ একটি কুরহানা ও ছটি ছেলে ...	হৃদযেব বহু ...	৩০
✓ নেপথ্যে ...	বনমল ...	১২৭
✓ বাপ ও ছেলে ...	নৃপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় ...	৮১

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
গল্প—		
✓ অল্পতপ্ত	প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	৩১০
বুগের ঢাকা	মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	৪১৭
✓ ধ্বংস	আশাপূর্ণা দেবী	১৬১
✓ 'মুরকাটা' বাবা	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	২৬৩
✓ মা	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	২৫৪
চই ওস্তাদ	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	১১১
✓ খোকা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	২০৮
হীরা কুনি	সুকুমার দে সরকার	৪০৯
বুনো আতা	মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়	৯৮
✓ খন্ডিবাড়ির বাপা	স্বপনবুড়ে	২১৯
পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত	রাধারানী দেবী	২৭৪
✓ আবারে ফুটল আলো	সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৪২৮
✓ শুধু একটা শেরালের গল্প	দৃষ্টিহীন	১৪০
✓ চুড়াগার হুঁত	অপর্ণা রায়	৩২৬
✓ দাঙ্গা	তপতীরানী	৪২৫
ঐতিহাসিক গল্প—		
✓ সিংহগড়ের সিংহবিক্রম	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	১৪৫
✓ 'করাশা' ও আশা	সজনীকান্ত দাস	৭০
✓ 'বীরাদনা, পরাক্রমে ভীমা-সমা'	হেমেন্দ্রকুমার রায়	২৩৫
জল্পকথা—		
✓ গাছ	নরেন্দ্র দেব	১৮৫
✓ বেটে বাটুলের হুঁত	বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট	৩৪৬
✓ অপজল কথা	বক্ষিয়ারঞ্জন মিত্র মজুমদার	৪৫৭
হাসির গল্প—		
✓ ভাঙাঘর 'হাংকার'	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৩৩৬
✓ শিবরায় পর বিখ্যাত	শিবরায় চক্রবর্তী	৩২৬
✓ শুকটাকুরের ভাগবত পাঠ	অসিরউদ্দিন	১৩০
শিকার কাহিনী—		
✓ শিকারকাহিনী	হীমেন্দ্রনাথ রায় (বাগপোদ্দা)	৪৪৮

ବିଷୟ	ଲେଖକ ଲେଖିକା	ପୃଷ୍ଠା
ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଗଳ୍ପ—		
✓ କଳାଲ	... ସମ୍ବନ୍ଧନ ସଂକଳନ	... ୨୧୯
✓ ଅନ୍ଧଧାରୀ ପା	... କ୍ରିଷ୍ଣାନାରାୟଣ ଡ଼ା଼ା଼ା	... ୨୨୨
ଜାତୁବିଜ୍ଞା—		
ଇନ୍ଦ୍ରଜାଳ	... ପି. ସି. ସରକାର	... ୩୦୫
ରହସ୍ୟ ଗଳ୍ପ—		
✓ ବିଧାତ ଜଳନରା କାପଟେନ କୌଡ଼	... ବିକ୍ର ଯୁଗୋପାଧ୍ୟାୟ	... ୨୧୫
ନାଟକ—		
ପାମାଣୀ	... ସୁଖଲତା ରା଼	... ୧୫୭
ଡୋଟି ଫର ଅନ୍ଧରେଶ ଧାମା !	... ବିଧାୟକ ଡ଼ା଼ା଼ା	... ୭୨୧
ତୌତିକ ଗଳ୍ପ—		
✓ ପୁରାଣେ ବନ୍ଧୁ	... ଧୀରେନ୍ଦ୍ରଲାଲ ଧର	... ୨୨୧
ଆତ୍ମ୍ୟ—		
ଆତ୍ମୋତ୍ତର ଫୋଟାରୀ	... ସୋମେଶଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ	... ୫୫୦
ଛତ୍ରା—		
✓ ସିନ୍ଧୁ ଖୁ଼େର ଜୀପ	... ବିସ୍ମଳଚନ୍ଦ୍ର ସୋଧ	... ୭୨୭
କବିତା—		
ଆନିର୍ବାଣୀ	... ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର	... ୨
କାଳୁର ଗଳ୍ପ	... କଟକଚନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ	... ୫୨୧
ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନା	... ପରଶୁରାମ	... ୧୨
✓ ଚିଢ଼ିଆଖାନାର ଧବର	... ଅରଦାଶଙ୍କର ରାୟ	... ୫୫
ସୂତ ସୂଚିକ	... କାଳିଦାସ ରାୟ	... ୨୭୨
ବୃକ୍ଷର ବିଧାନ	... କୁହରଜନ ସନ୍ନିକ	... ୨୨୦
ରୂପକଥା ନର	... ବିସ୍ମଳଚନ୍ଦ୍ର ସୋଧ	... ୫୦୫
ସଢ଼ିଟାର ଗୁମ୍ ନେଇ	... ଆନା ଦେବୀ	... ୫୨୭
“ଆମି ବାରି ଜୀପ୍ସି ସେରେ ହ’ତାସ”	... ଶାନ୍ତନା ଦାସ	... ୨୦୨
ନାହୁଲ	... ନବଗୋପାଳ ସିଂହ	... ୨୦୭

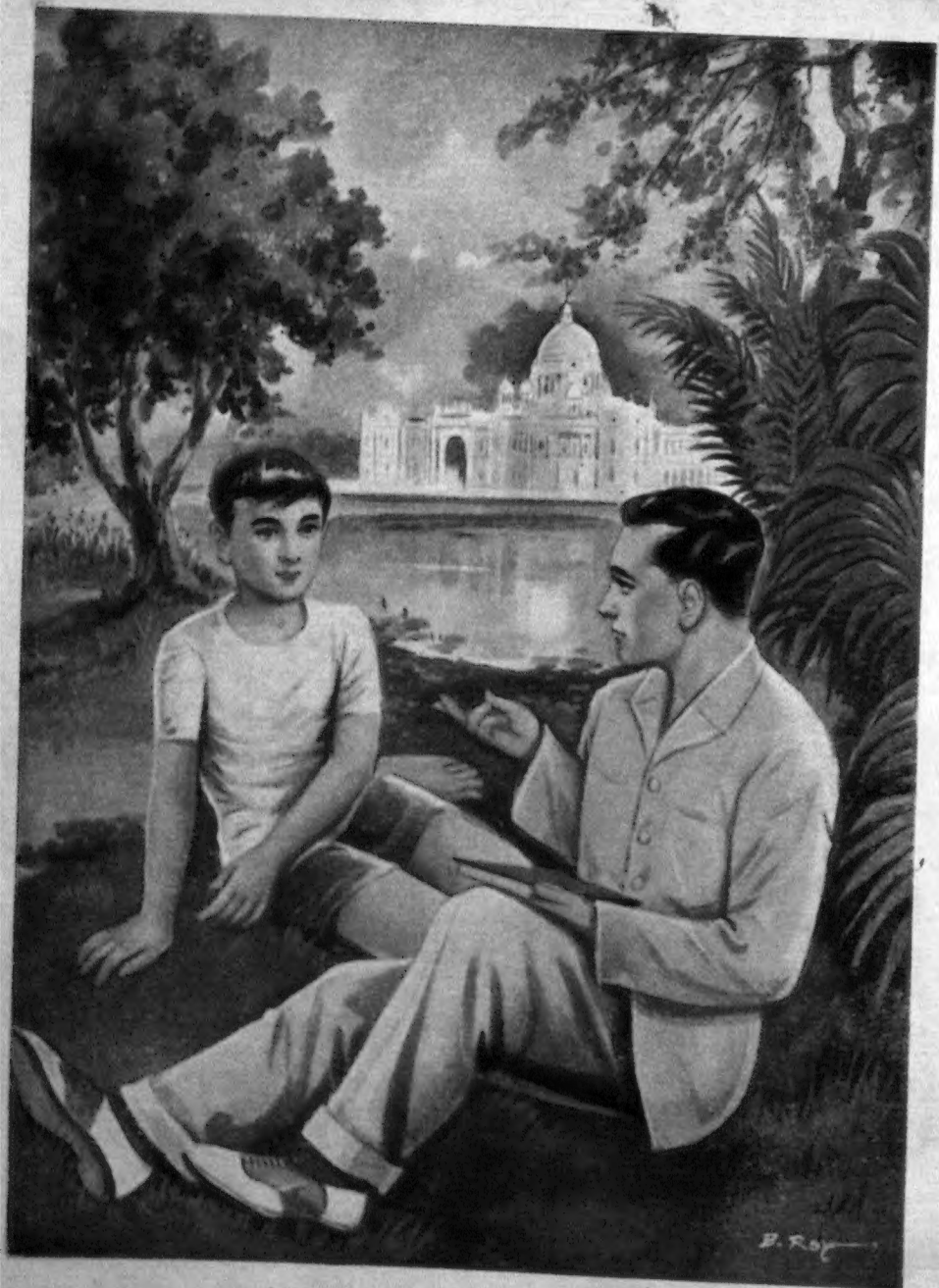
পাদপূরণের সূচী

সোনালী কথা বিদেশী সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখ্য মনি-মাণিক্য

মনি-মাণিক্য	মণিকার	পৃষ্ঠা
ওবলোমভ্	আইভান গনচারভ্	৮
দি স্টোরি অফ্ স্তান বিচেল	এ্যাক্সেল্ হুন্নি	৬৯
পিনক্কিয়ে	চার্লস্ কলোদি	১৪৪
ডক্টর জিভাগো	বোরিস্ পাস্টার্নাক	১৫২
মোগলী (জাংগ্ টেলন্)	মার্ডার্ড্ কিপলিঙ্	২০২
অন্ আরার	সার্লট্ ব্রোনটা	২৩৪
এ ডল্ফ্ হাউস্	ইব্‌সেন	২৫৩
লীড্ অফ্ গ্র্যাস্	ওয়াল্ট্ হুইটম্যান	২৮৯
ওয়াল্ডেন্	হেনরী ডেভিড্ থোরো	৩৫৫
এলিস্ ইন্ ওয়ান্ডারলাণ্ড	লিথ্‌ইন্ কারল	৩৬২
বি কাপটেন্ ডটার	পুর্সন	৪০৩

মণি ও মুক্তা

অবতৃতি	১০	শৈব-সাহিত্য	২২৬
মহাভারত	৪১	মহাভারত	৩০৯
অম্বেষ	৮০	গীতা	৩২২
গীতা	১১৯	প্রাচীন হিন্দী গৌহা	৩৫৫
মহাভারত	১৬০	মহাভারত	৩৯৫
লজ্জবান	১৮৪	ভৈষ্ণবীমোপনিষৎ	৪১৫
অম্বেষ	২০৭	কঠোপনিষৎ	৪২৬
		শ্রীচৈতন্যদেব	৪৫৬

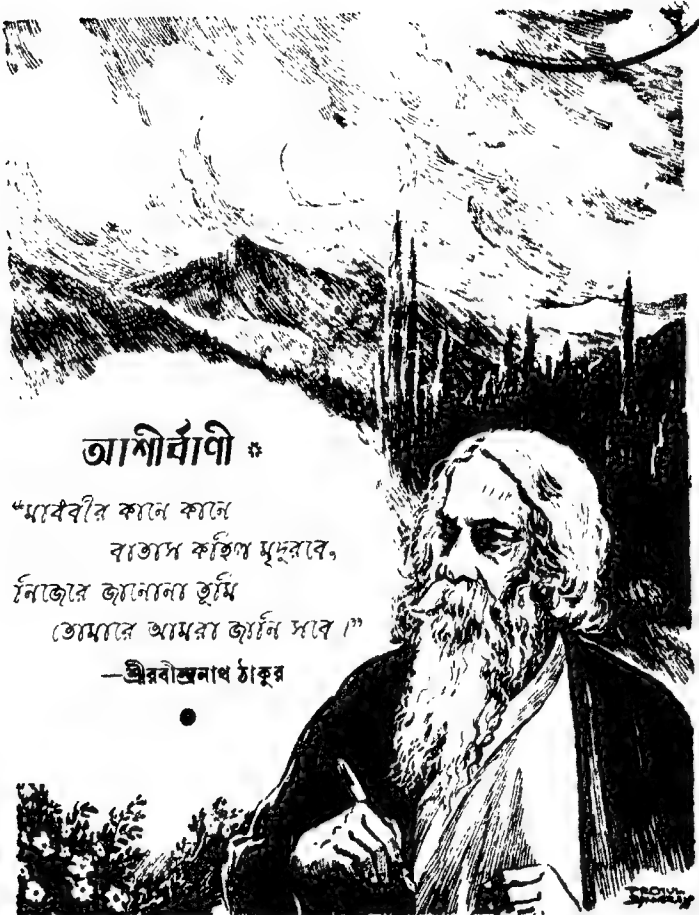


পটলকে নিয়ে একটা পার্কে এসে বসলাম।



	পৃষ্ঠা
● মা—	
পটলকে নিয়ে পাকৈ এসে বসলাম।	১
● মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ত্রিপুরামকুফ—	
দেবেন্দ্রনাথ গায়ের জামা তুলে ধরলেন।	২৫
● সম্ভ্রতুলসীদাস—	
তুলসীর চোখে জল করছে অকোষধারে।	৫৮
● লিপি—	
বালির চড়ার উপর ইগুয়ানার। গিজগিজ করছে।	৬৫
● সেকালের ছোটবেলা—	
আধুনিক যুগে বিজ্ঞানের বৈচিত্র্য।	৮০
● বাপ ও ছেলে—	
হরবিলাস হাত তুলে বামীজীকে নমস্কার করলেন।	৯৭
● বুঝো আভা—	
শাগরেদ ভুটে। নোট এগিয়ে ধরল।	১০৫
● 'আমি যদি জীপসী মেয়ে হ'তাম'—	
হাত লাকাইয়ের বেধিয়ে থেলা	১০৮
● মেপখ্যে—	
তিহু ফুলের মালাটি তাঁকে পরিয়ে দিলে।	১২১
● গুরুত্বাকুরের ভাগবতপাঠ—	
"পাইয়াছি যে পাইয়াছি"	১৩৭

● শুধু একটা শেরালের গল্প—	পৃষ্ঠা
খরগোশ হুখে করে একটা শেরাল এগিয়ে আসছে। ...	১৫৪
● সিংহগড়ের সিংহবিজয়—	
মাতা কীভাবেই প্রত্যেক আশীর্বাদ করছেন। ...	১৬১
● লাবু—	
ছোট রাজকুমার লাবণ্য শ্রভার হুখের কাছে আমটা এগিয়ে দিল। ...	১৯৩
● বোকা—	
বোকা দিদির হাত থেকে আটাটা কেসটা ছিনিয়ে নিল। ...	২১৭
● পুরাণো বন্ধু—	
বরালরাম বললে—আমার টাকাগুলো ফেরত চাই। ...	২৩৩
● কঙ্কাল—	
হরিহরবাবু বললেন—“এ সব কথা তুই কি করে জানলি?” ...	২৮১
● ইন্ড্রজাল—	
“ওয়ারটার অব ইণ্ডিয়া” ...	৩০৫
প্যারিসের রত্নমকে পি. সি. সরকার ...	৩০৫
বৈজ্ঞানিক কল্পনাতে বিশ্বস্ত রেহ ...	৩৫৩
ইন্ড্রজাল ...	৩৫৩
● নিম্পু খুড়োর জীপ—	
গাড়ির ঢাকা ছিটকে পালার... ...	৩২২
● বিজয়ীর পর বিজয়—	
টার্নার ওয়ালা, জুগু আর আমি মামাকে টেনে তুললাম। ...	৪০১
● হোরাহুনি—	
বর্ষ উগল হো। যেয়েছিল কিছু তাক তুল হয়ে গেল। ...	৪১৬
● হুখের ঢাকা—	
গান গাইতে গাইতে বাবা কীভাবে থাকেন। ...	৪২৫
● কীভাবে খুঁটল আলো—	
কালোমানিক গাড়োরানের উপর খাঁপিয়ে পড়ল। ...	৪৩৩



ভাণীবাণী *

“মাদেবীর কান কান
বাতাস কহিল মূদ্রাব,
নিজের জানানা তুমি
তোমার আমরা জানি মনে।”

—ঐরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



গোল্ডেন-গুজ পালা

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

[অধিকারী, পাঠক, তুড়ি-তুড়ি, দোত-
দোতারের প্রবেশ]

(গীত)

আরে চোপ খেলো গোল গোল
খেড়াল-আঁখি, চেরা পটোল
কাজল-খেয়া ডবোল ডবোল ॥ ~
বলে বাও হাতে নিয়ে হংসনাহার প্রোগ্রাম
হরো না হাত টান
গুনে নাও পেতে কান
তরে প্রাণ—দান ক'খানা
করতে হয় কর বাছেতাই দহালোচনা ।

বাজে বকেনা আবেল তাবোল,
সভার কাজে বাধিও না গোল,
বলে ছিরি খোল থিরি থিরি বোল
হাটে করে গোল বিচ্ছিরি ঢোল ॥

পাঠক। বলি ও অধিকারী মশায়,
বলি দর্শন পাবো তো? অধিকন্তু অধি-
রাজা, ছার মহারাজা ভুঁই-নাস্তি ভুঁয়োরাজা
বহুত দেখেছি—গোল্ডেন গুজ তো কখনো
দৃষ্টি সোচর হননি!

অধিকারি। তিনি নিত্য ঐ পুস্তক

দেব দেউল

৩

হৃদের জলে—একটি করে স্নর্গভিষ প্রসব করেই নিজেকে তামস পর্দারত করে অন্তরালে রান্নিবাস করেন, তাই বড় একটা কেউ তাঁকে দেখতে পায় না।

পাঠক। তা, তিনি কি আজ গোচরীভূত হবেন অভাগাদের চক্ষুচক্ষে? দেখা পাই তো তাকে বলে কয়ে আমার এই হংসনামাধানা সোনার জলের মলাটে যাতে করে ছাপিয়ে নিতে পারি—

অধিকারি। খেলা ধরে অপেক্ষা কর; পুসর হৃদের তীরে এসে তার দর্শন দুর্লভ হবে এমন তো বোধ হয় না।

পাঠক। পুসর তপস্তার ফলে হংসনামা লিখেছি দাদা, শেষরক্ষে যেন হয় দেখো!

অধিকারি। হংসনামা শৌনবার যখন তাঁর ইচ্ছে তখন নিশ্চয় এদিকে আগমন করবেন। প্রস্তুত হয়ে থাকো; আসা মাত্র তোমরা হংসনামার নান্দি শুরু করে দিও। 'নজর পড়লে আর ভালনা নেই—কৃপা হবেই!

পাঠক। তাই, বামনাই কপাল,—কি জানি কি হয়। বিলম্ব হচ্ছে, সন্ধ্যা প্রায় উৎরে গেল, ক্রমে যে অন্ধকার হয়ে এলো—গোল্ডেন গুজের আসবার তো কোনো লক্ষণ দেখিনে! গেল বুঝি দর্শন কসূকে!

অধিকারি। অত্ বাস্ত হও কেন?

রোসে' দেখি—ঠা ঐ যে হৃদের পশ্চিম পারে হোগলা-ঝাড়ের কাছে স্নর্গ-অঙ্ক একটি ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে—সময় হল, প্রস্তুত থাকো।

পাঠক। দেখি দেখি, সোনার ডিম কি বল! এ যে বিরাট একটা তরমুজ দেশীয় তরমুজ ও তরমুজ বিশেষ স্নর্গের অভায় দিগদিগন্ত উজ্জ্বল করে জলে ডুবেতে চলে। একখানা জাল হলে হুলে নেওয়া যেতো দাদা।

(গীত)

সকলে। হাউ জাল বুনে যাই

জাল বুনে যাই

মনে মনে স্থপনেরই জাল

তোমায় ধরব বলে মরুগলে

নয়ন জলে ফেলে যাই জাল।

ধরা দিবে কি পাঁচাকলে

ওরে আমার কাঁচা সোনার ডিমেরভারি পাণি

তুমি হবে কি আমার

কপাল ক্রমে বন্দি

না'কি আজ-কাল করে

বসেই রব চিরকাল।

অধিকারি। স্থিরো ভব, স্থিরো ভব! ভাগ্যলক্ষী অদৃষ্টে যদি শূণ্য অন্ধ না লিখে থাকেন তো ঐ-টি টুপ করে জলে ডোবা মাত্র দশরীরে কলিকালের সুপর্ণগড়ুর তোমাদের সম্মুখে হাজির হয়ে কৃপা বিতরণ করে যাবেন। কোনো জালের কর্ম নয়।

● গোল্ডেন গুজ পাল
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেব দেউল

(গীত)

ও সে সোনার কক ধরনা অটীত
ও কী কারো আলো পড়ে কদাচিত
রহিলি অবোধ কি লাগি দক্ষিণ
বাতিসের কাঁদ আকাশে কলিঙ্গ
ভরিয়া চলেচ তবাক কবজ ।

তুড়ি । প্রায়টি চ যদা লক্ষী
নারিকেল ফলাশ্রুত ।
জুড়ি । প্রায়টি চ যদা লক্ষী
গজভুক্ত কপিপুত্ন ॥

(গীত)

দোস্ত-দোস্তার । আইসেন লক্ষী এড়ারে দটি
পটসেন নাকৈলে জলটুকু মিটি
যাইচেন লক্ষী অলক্ষ্যে সবিয়
গজভুক্ত কপিপু যাইলেন ধরিত
মিটি ঐক্য লক্ষীর চটি
এই অনাচি টি এই সন্যাস টি ॥

পাঠক । পায়ের মূলো দাঁও দাদা
ভাগ্যে যেন দর্শন পাই—ও গজরাজভুক্ত
কংবালের সোনার ধোলাটা পেলেও কাজ
চলে যাবে । ওহে শীখ ঘণ্টা দাঁও, বিলম্ব
করেনা, আসচেন বোধ হচ্ছে—নজর
রাখ !

(দশ ঘণ্টা সহিত কারওবের বৈকালিক
তাগুৎ নৃত্য ও গীত)

ও দেখ, ভুবলো বেলা দুপুরে দিয়ে
রঙের মেলা
বেলা ভুবিল রে
অলের পারে আলো ভুবিল রে

● পোকেন শুভ পাদা
অমরীজনাথ ঠাকুর

উদিল সাকের তাবা
মেঘের পারে বাতের তাবা
দিনের পাখি বাসা নিল
গুমে গুমালে রে ।

পাঠক । ওহে আনাকে এগিয়ে
যেতে দাঁও, তোমরা যে ভীড় করলে,
পথ ছাড়, পথ ছাড়,—আড়াল ছাড়
না হে—কেমন মানুষ তোমরা—ও
অধিকার—

এ বদশন মল্য ভার তোমাদের ভেড়ে
লক্ষী যেন চক্ৰমার পক্ষি যেন নীড়ে ॥

ভীড় কর কেন ? ভীড় কর কেন ? এ
নিরাশ ততে হয় বুঝি—ও আসা-
বরদার, ও চোপদার ভীড় ঠেকাও না
এসে ।

(আসা-বরদার প্রবেশ)

(গীত)

আসা যাওয়ার গোল নয়
ও ধারে কে ও কথা কয় ?
ঠাসাঠাসি বসা হোক
হাতা-হাতি থাক-ধাক্কি ভালো নয়,
ভালো নয় ।
রাস টানা-টানি কানা-কানি মহাশয় !!

পাঠক । আমি পাঠক—হংসনামা—
এই দেখ কথা শোনে না—আঃ ঠেলাঠেলি
কর কেন ?



(রামদা হাতে চোপদাবেব প্রবেশ)

(গীত)

বস্‌ চোপ্‌ মারবো কোপ্‌

চোপ্‌ চোপ্‌ চোপ্‌

ভীড় ভাড়—পিড়কীর পথ সাফা হোক্‌ ।

(কারপরদাজের প্রবেশ ও গীত)

কার চোপদার জর্দা সোনার

হংসরাজার পর্দাপাট ঘরের কোনার ।

রাজহংসিনী হংসনাধিনী লখি লজ্জি

অন্তরঙ্গিণী

সুবচনী কলহংসিনী লরে হরেছেন বার

চোখ বন্ধ হোক বাজে লোকজন্যর ॥

(সুবচনী ধোঁড়া তাঁদের প্রবেশ)

সুবচনী । পর্দানশীনগণ জর্দা-জরীন্
গোল্ডেন গুজের নিমন্ত্রণে আর, এস,
ভি, পি লিখতে চলেছেন পদ্মপত্রে !
শোভাযাত্রা করে আসছেন তাঁরা এই
বাগে । হাবিলদার, চোপদার এবং
রাজসরকারের তাঁবেদার কোটাল ও

● গোল্ডেন গুজ পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেব দেউল

কিলেদার ছাড়া সকলে চোখ বন্ধ করে
মুখ-বন্দি মিষ্টারের জগে অপেক্ষা করেন।

(স্বচরিত্র পর্দার অন্তরালে প্রস্থান)

পাঠক। ওহে ও অধিকারি, মুখবন্ধ
চোখ বন্ধ করতে বলে যে, হংসনামা পাঠ
করি কি প্রকারে ?

অধিকারি। উত্ত (চোখ বন্ধ মুখ বন্ধ
করুন)।

তুড়ি জুড়ি। চোখে কেমন চক। চো
লগে গেল।

(ফ্রেন্সন গীত)

নিশার পলন সম ঠিকিতেছে সব
যেন আলি পশিলাম কোন মরুভূলে
উজ্জলিত স্বর্ণবীণে আছিল সুরার এ স্থান
মুখর কলহংস রবে সাজিত কুল ফলে
নবীন পল্লবে। এখে দেখি শুধায়েরেছে সব !
নিভেছে খেইট। নীরব উল্লাসহীন
সবস্থান, নিঃশব্দ উজাড় চারিদিক।
পরিত্যক্ত ভূতগ্রস্ত আলয় যথা—

হত বিনষ্ট ভগ্নশ্রী ॥

পাঠক। বামনাই কপাল—হায় হায়
দেখতে দেখতে যে পর্দার মধ্যে অন্তর্দান
হয়ে গেল।

(গীত)

আরি আরি ও চোপদার ও অধিকারি
পর্দার তেতোরে কি ঘাইবার পারি ?
আছে কি টিকিট কমিসিওনার—
প্রাইভেট এন্ট্রির একটা ?
আমি যে ডেলি-কাসকের স্বত্বাধিকারী।

● গোয়েন্দা ভল পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হবে যে কাণ্ড—

এক কলমে তার প্রকাণ্ড

সমালোচনা লিখে দিতে পারি
যেতে দাঁত : হ অধিকারি !!

অধিকারি।

ওটা ভিতর নয়, ততোরে

ওখানে তোমার খাটবেনা জোর

দেখছ আসছেন কে শীরে তাজ হল
কারি। গুজরী বিবিকে দেখেই অজ্ঞান
হলে যে। গোয়েন্দা গুজ আসছেন, ঠিক
হয়ে থাক হংসনামার পুঁথি ধরে।

পাঠক। আঁ গোয়েন্দা গুজ এসে
পৌছান নি?—আসছেন? আর নয়
পেখাশোনা! এই হংসনামার পুঁথির
পাতায় চোখ রাখলেম, দেখি কি করেন
বিধাতার বাহন। এবারে কস্কাতে দেব
না। ওকে তুড়ি জুড়ি তোমরা নজর রেখো
—আমাকে একটু চান্স করে দিও।

(স্বর্ণশ্রী বহে গোয়েন্দা গুজকে টেনে

বন্দীগণের প্রবেশ ও গীত)

মহাশূর্য্য যৈরমর্য্য ত্রীদৌন্দর্য্য গান্ধীর্ষ্য আকর
নিশ্চেষ্ট নিশ্চরণ অখচ সকল গুণের সাগর ॥
হার তেজ তপন তাপে তপ্ত কৈল মরী
আকাশে গড়ুড় কানে পাতালে কানে অহি।
সর্ব্ব ধর্ম্ম কর্ম্ম নর্ম্ম শর্ম্মেতে প্রবর
অবর্ম্মর গর্ব্ব ধর্ম্ম স্বর্ণ বর্ম্ম ধর ॥

অধিকারি। নাও পাঠক এইবার
নান্দিপাঠ হংসনামার—

দেব দেউল

৭

পাঠক। কষ্টাষু সর্বস্বামপি—এঃ ভুলে
যাচ্ছি—

কষ্টাষু সর্বস্বামপি দর্শনেন হংসস্ত
শব্দেন সর্ব সিদ্ধি

নামানি হংসস্ত শৃণোতি যন্ত
প্রয়াস্তি তুরিতানি তস্ত ॥

নাও হে অস্তার্থ করনা তুড়ি জুড়ি।

(গীত)

তুড়ি জুড়ি। দেখলে পবে রাতঃস
পরাকাষ্ঠা লভে বংশ
শুনলে পবে হংস শব্দ
সর্ব সিদ্ধি হয় লক্ষ।
যাত্রাকালে হংস নাম
উন্নিত হরণ করে যান ॥

গুজ। বাঃ বেশ গেয়েছ। অধিকারিকে
বোলো আমি বড় খুসি হয়েছি। বোলো,
ভুলো না—মন দিয়ে সকলে হংসনামা দেখ
—না পাঠক ওঠা হচ্ছে না, বোসো।
তুড়ি জুড়ি দোস্ত দোহার ছোকরা তোমরা
বেশ গেয়েছ। নাও একটা একটা পালক
টুপিতে গুঞ্জে কেল।

পাঠক। আজে আমি—আমার হংস-
নামাখানা—

গুজ। (হংসনামা লয়ে) আমার
শয়নের সময় হল। অধিকারি তুমি
রইলে—

তুড়ি জুড়ি। আনাদের একটা করে
গোল্ড মেডেল—

পাঠক। হজুর আমার হংসনামাটা—

(চোপনার গীত)

চুপ গোল কোরোনা কেউ,
শরেন চলেন গোল্ডেন গুজ
চকুর গুজর গুজ।
গোলমাল করোনা কেউ গুজ গুজ
বসে কেন উঠে সিঁড়াও
আসব চড়েনা কেউ।

(সকলে বাজ-গীত)

হজুর হজুর গোল্ড গুজব
গুজব গুজব হজুর হজুর কি কর?
লগনটা তুলে দর
দেখে নাও মুটিয়া হজুর
এল গোল্ড নয় হোল্ড হজুর!
(গুঞ্জে প্রস্থান)

পাঠক। হজুর আমার হংসনামা—

অধিকারি। আরে হংসনামা করে
থপলে যে, পাঠ শুরু কর—

পাঠক। আরে পুঁথিখানা যে নিয়ে
গেলেন কর্তা, পাঠ করি কি দেশে?

অধিকারি। অ্যা! তবে তো মুসিলে
ফেলে। তোমার মত ত মুখ্য দেখিনি।
পুঁথি ছেড়ে দিলে কি বলে?

পাঠক। কি জানি কি হতে কি হয়ে
গেল। আমার দ্বারা পাঠ অসম্ভব। তুর
তোর হংসনামা—চলেন আমি ধরে—

অধিকারি। যাত্রার কি হবে?

পাঠক। যা হয় তুমি কর। তুড়ি
জুড়ি সবাই আছে, পাঠও যথাস্থ করেচে
সবাই—আমার আহ্বারের সময় হল।

অধিকারি। বলি ও পরমটা, তুমি

● গোল্ডেন গুজ পালা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেব দেউল

ভাই তোমার চোঁতা খুলে পড়ে চল— পারে যাবেন, সেই সময় ধোরো—ফল
যেমন যেমন লেখা আছে ঠিক ঠাক। আমি হবে।
তামাক খেয়ে নিই। এসেহে পাঠক পাঠক। তবে ভাই আমি একটু ঘুম
তামাক খেয়ে নাও, হতাশ হয়ো না। রাত দিয়ে নিই। ভোরের দিকটায় হাজির হব
কাটলেই গোল্ডেন গুজ আর একটি স্বর্ণ— প্রমট্টার তত্ত্বকণ কাজ চালিয়ে নিন।
ভিষ্ম প্রসব করতে এই পথ দিয়েই সমুদ্র (প্রস্তান উভয়ের)



জোনালী কথা

ওব্লোমভ্ (আইভান গনচারভ্)

কথ-কথালিহিতো ওব্লোমভ্ একখানি রাসিক নভেল। এই
কাহিনীর নায়কের নাম থেকে এই উপজ্ঞাসের নামকরণ হয়েছে,
ওব্লোমভ্। এই উপজ্ঞাসের প্রধান বিশেষত্ব হলো, তার নায়কের
চরিত্র। উপজ্ঞাসের সাহিত্যো যে-সব টাইপ-চরিত্র অমর হয়ে আছে,
ওব্লোমভ্ তাদের মধ্যে এমন একটা টাইপ চরিত্র যা আর কোন সাহিত্যিকট সৃষ্টি করেন নি।
ওব্লোমভ্ হলো আদর্শ অলস এম। এই কর্ম-বাস্তু উপজ্ঞাসে সীতমন্ত উদ ও যুগ্ম করে।
যদি কোন কাজ নিরুপায় ভাবে থাকে এসে পড়ে সে তার নিজস্ব কোললে তাকে সরিয়ে
রাখে, মনকে সাধুনা দেয়, কাল করবে। কিন্তু সে কাল আর আসে না। আমাধের
সকলের মধ্যে অল্প-বিস্তর এই ওব্লোমভ্ লুকিয়ে আছে কিন্তু বিখ্যাত কথ-সাহিত্যিক গনচারভ্
এই চরিত্রটিকে দীর্ঘ উপজ্ঞাসের ভেতর যে-পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছেন, তা সভ্যই বিচিত্র। বিগত-
পঞ্চাশীর তারের রাশিয়ার এক শ্রেণীর ধনী ছিলেন, পিতৃ-পুরুষের সন্তক অর্থে কথবা প্রজাদের
অর্থে ডারা নিরুপস্থ কর্মহীন বিলাসিতার জীবন যাপন করতেন। ওব্লোমভ্ হলো সেই
শ্রেণীর একজন কিন্তু বিলাসের জীবন যাপন করছে হলেও যেটুকু হাত-পা বাড়তে হয়,
ওব্লোমভ্ তাকেও নারাজ। নায়কের সঙ্গে সঙ্গে গনচারভ্ নায়কের সঙ্গী ও সহায়রূপে একটি
ভৃত্যের চরিত্র (জাহার)ও এঁকেছেন, কর্মবিমুখ অলস প্রভুর যে উপযুক্ত জাতি। যদি কোন
শোকাবাক্ত ব্যাধি বার, এই ভক্ত সে পরমোদর পরিচর্য করে না! ষট-এর শেষে ওব্লোমভ্
তার শোচনীয় অস্তিত্ব মুহূর্তে দেখে, যাত্রা দিয়ে তার শির ভূষাও জীর্ণশিথি পথ-ভিত্তিকরণে
রাতার হুঁকে সরছে। আজ সোভিয়েট রাশিয়ার ওব্লোমভ্ আর তার মতন ব্যক্তি, তাদের সৃষ্টি
পথও বিপুল হয়ে গিয়েছে।



[অপ্রকাশিত]

—যতীন্দ্রমোহন বাগচি

(১৫ই আগষ্ট—'৪৭, স্বাধীন ভারতের শুভ-সন্দেশ)

একে-একে ছয়ে-ছয়ে কা'রা ওই নিঃশব্দ চরণে
শূন্য পথে ভেসে এসে' দেখা দেয় বিস্মিত নয়নে ?
একবার মনে হয়, ঢেনা-ঢেনা বুঝি এরা সব,
আরবার ভাবি কিরে, বক্ষে বুঝি করি অনুভব
ইহাদেরই ধ্যান-মূর্তি অন্তরের নিভৃত মন্দিরে,
যেপে কিসা জাগরণে তাই দেখা পাই ফিরে ফিরে' ।
উভয়ের মাঝখানে বুঝি না কোন্টা সত্য ঠিক,
রহস্যের কুয়াসায় অন্ধ হয়ে আসে চারিদিক ।

—কিও ও কিসের চিহ্ন কর্ণদেশে হেরি সবাকার ?
মৃত্যু কি পরায়ে গেছে প্রণয়ের শেষ অলঙ্কার

দেব দেউল

অবিচ্ছিন্ন আলিসনে,—অক্ষুণ্ণ স্মৃতির নিদর্শন,—
 নীলকণ্ঠ করি' তারে মৃত্যুজয় শিবের মতন ?
 এই আসে, আরও আসে অস্বপ্ন স্বপ্নের পথ দিয়া
 অর্ধ শতাব্দির দ্রষ্ট প্রাণ-পুষ্পে নৃতন করিয়া
 গাঁথি' লয়ে কণ্ঠমালা অমৃত অন্নান শতদলে,
 পরাইতে নবপ্রাতে মৃত্যুহীন জীবনের গলে ।

একে-একে ছয়ে-ছয়ে তরু তারা আসে, ওই আসে
 নিঃশব্দ চরণপাতে নিঃসীম বক্ষের মহাকাশে !
 —ত্যাগের অগ্রজ এরা অ-মরার বক্ষে তাই স্থান—
 সত্ত্বকোটি বাসালীর বীরশ্রেষ্ঠ বরিষ্ঠ সন্তান ।
 বিশ্বজিৎ দান-যজ্ঞে আজীবন সর্ব্বত্র সাঁপিয়া
 দেশের সে অগ্নি-যুগে যে দাবাগ্নি উঠিল জুলিয়া,
 সাগ্নিক তপস্যা তেজে, এরাই যজ্ঞের হোতা তার ;
 দধীচির বংশধর, তোমাদের করি নমস্কার ।
 আজিকার এই উৎসব যতই খণ্ডিত ক্ষুদ্র মানি,—
 তোমাদেরই সাধনার সিদ্ধিমূলে সত্য বলে জানি ।

নমস্কার সন্ধ্যা বুঝাঃ নমস্কার সন্ধ্যা বুঝাঃ
 শুক কাঠক হুঁকার নমস্কার কহাচেন ।

—অবহুতি

মনি ও মুক্তা



ফলধান গাছ ফলের তারে হুয়ে পড়ে,
 সজ্জন তাঁর শুণের ভারে নত হন । শুক কাঠ
 আর হুঁ কিস্কুতেই নত হতে জানে না ।

বন্দী চীনের তরুণ জীবন

—ভারতীয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ছ বছর আগে ১৯৫৭ সালে আমি চীন দেশ গিয়েছিলাম। আগে বলতাম—মহাচীন। বর্তমানে বলি ‘জনগণের রাষ্ট্র চীন’, ইংরেজীতে বলা হয় People's Republic of China. নিমন্ত্রণ করেছিলেন ওখানকার ‘লেখক সংঘ’। তার আগের বৎসরে চীনের লেখক সংঘ ভারত সরকারের কাছে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছিলেন—তাদের বর্তমান চীন সাহিত্যের জনক ‘লু-শুন’এর বিংশতিতম ত্রিরাশি দিবস উপলক্ষ্যে বিশ্বসাহিত্য সম্মেলনে তখন ভারতীয় লেখক প্রতিনিধি পাঠাবার অজ্ঞ। ভারত সরকার যে তখন প্রতিনিধি নির্বাচন করেছিলেন, তার মধ্যে আমি ছিলাম একজন এবং অপর জন ছিলেন হিন্দী-সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক শ্রীজৈনেশ্বরকুমার। তিনি গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, কবিতাও লেখেন ‘সুতরা’ কবিও বটে। এ ব্যতীত আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ যেহেতু পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে হয় কারণ যেহেতু পৌঁছে অত্যন্ত অশুভ হয়ে পড়ি। পরের বৎসর ‘চীনের লেখক সংঘ’ আবার আমাকে নিমন্ত্রণ পাঠালেন,—‘আমাদের বেশে আসুন—আমরা নতুন দেশ গড়ছি—নতুন আমাদের আদর্শ; কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের বহু প্রাচীন কালের বন্ধু; তাদের সঙ্গে দেওরা-নেওরা বেটা সেটা শাসন-শোষণের মধ্য দিয়ে কোনদিন হয়নি, হয়েছে মিত্রতার মধ্য; তাও শুধু বস্ত্র বিনিময়ের অর্থাৎ বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে নয়, হয়েছে ধর্ম সাংস্কৃতি জ্ঞান বিনিময়ের মধ্য দিয়ে। সেটা আজও বজায় রয়েছে, সুতরাং আপনি আসুন—আমাদের দেশ দেখুন—আপনাদের সাহিত্যের খবর বলুন—আমাদের খবর শুুন। সামনেই আমাদের অষ্টোদশ দিবস—সে দিনের উৎসবে যোগদান করুন।

তোমরা নিশ্চয় সকলেই জান যে আমরা যে সময় অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে ইংরেজদের শাসনপাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হই তার বছর পরই—১৯৪৮ সালে মহাচীনে—জাপানী যুদ্ধের পর—গৃহযুদ্ধ বা বিপ্লব শেষ হয় এবং চিগাং কাউন্সিলের দল মহাচীনের মূল ভূখণ্ড ছেড়ে ফরমোজা দ্বীপে আশ্রয় নেন, জরী হন বীর মাও-সে-তুংয়ের নেতৃত্বে চীনের কৃষক মজুর এবং সাধারণ মানুষ নিয়ে গঠিত কম্যুনিষ্ট দল। আন্তকের পৃথিবীতে কম্যুনিষ্ট দল এবং কম্যুনিজমের আদর্শ ও স্বরূপ নিয়ে যে মতভেদ—মতান্তর এবং স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যে আলোচনা তার তুলনা একমাত্র হিমালয়। হিমালয় পূর্ব-পশ্চিমে বিন্দুত—উত্তর-দক্ষিণে—তার যেমন চুই দিক, কম্যুনিজমের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে মতের পরিমাণও তেমন তার চুই দিক। কিন্তু আসল সত্য যে কি—তা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু একটা কথা ঠিক যে তাঁরা দেশে নতুন গড়নের কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে করে যাচ্ছেন। যারা কঠোর সমালোচক তাঁরাও একথা স্বীকার করে বলেন—এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? কাবণ মানুষেরা সেখানে প্রায় শৃঙ্খলাবদ্ধ, ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই স্তত্রাং চকুমমত তাদের খাটিয়ে কাজ আদার করে নেওয়া হয় জিজিয়া কবের মত। বাই সত্য চোক—তাঁই দেপবার আগ্রহ নিয়ে চীনে গিয়েছিলাম। পৌচেছিলাম ২৮শে সেপ্টেম্বর, ফিরেছিলাম ২৯শে অক্টোবর—একমাস ছিলাম। ঠিক একমাস। এই একমাসে দেখেছি কম নয়, অনেক ঘুরেছি এবং দেখেছি, কলকাতা থেকে হংকং—সেখান থেকে ক্যান্টন—ক্যান্টন থেকে লিংকিং, লিংকিংয়ের চারিপাশে যোগ্যথামাব পল্লী-অঞ্চল—সেখান থেকে চুংকিং, এ সবই এসেগেলেনে। চুংকিং থেকে স্টামারে ইয়াংসিকিয়াং নদীপথে প্রায় হাজার মাইল—এবং এই হাজার মাইলেএর প্রায় ৫০০-৬০০ মাইল পাহাড়-কাটা প্বদের মধ্য দিয়ে ঘুরেছি। ফাফাও শহরে এসে ইয়াংসিকিয়াং নদীর উপর প্রথম ব্রিজের উদ্ঘাটন সমারোহের মধ্যে উপস্থিত থেকেছি—সেখান থেকে শা হাই—শা হাই থেকে হাচু; সেখান থেকে আবার ক্যান্টন হংকং হয়ে কলকাতা। মাইলের মাপেতো কম পথ নয়; বিশ হাজারেরও বেশী। তার মধ্যে বড় ছোট ঘটনা ঘটেছে অনেক। সমস্ত লিখলে একখানা বই নিশ্চয়ই হয়। কিন্তু সে বই আমি লিখি নি। কারণ এই নবীন রাষ্ট্র চীনের বয়স মাত্র দশ বৎসর (১৯৪৭ সালে)। তার সম্পর্কে বই লিখে একটা মহামত প্রকাশ করবার মত সময় এখনও আসে নি। যেটুকু হয়েছে সেটুকু লাম হিসেব কববার সময় চীনের ইতিহাস মনে রাখলে বলতেই হবে তার মূল্য অসাধারণ। তবে সে যখন সম্পূর্ণ হবে তখনই তার আসল বিচার হবে। যেমন আমাদের দেশে। ময়ূরাকী—বামোদর ভালাী—পথঘাট—জিজ—স্বাভ্যাকেন্দ্র এ তো কম হয়নি। কিন্তু তার মূল্য কত সে প্রমাণ হবে তার কলে।

● নবীন চীনের তরুণ জীবন

তারাশঙ্কর বক্ষ্যোপাধ্যায়

সে যাক। তোমাদের কাছে চীনের তরুণ-তরুণীদের কথা বলি। এখানে আমাদের দেশের সঙ্গে চীনের প্রভেদ আকাশ-পাতাল। সেখানে তাদের দেশের নব-সংগঠন সম্পর্কে যে উৎসাহ দেখে এসেছি তার শতাংশের একাংশও যদি এখানে থাকত তবে এ দেশের বারো বছরের মধ্যে সোনার দেশ হতে পারত। আমাদের দেশে ২৬শে অক্টোবর এবং ১২ই অগাস্ট দুটি জাতীয় উৎসব হয়। একটি রিপাবলিক ডে অর্থাৎ ইন্ডিপেনডেন্স ডে। এই দিনে তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের যে মিছিল চোখে পড়ে তাদের হাতে বিভিন্ন দলের ব্যান্ড ও ডে—কেউ হাঁকে—ইয়ে আজাদী কুটা যায়। কেউ হাঁকে—ইয়ে সবকার মুর্দাবাদ। কেউ হাঁকে স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ। কিন্তু এখানে গিয়ে



ছাত্রীদল এগিয়ে আসছে। অস্ত্রোত্তের হাতে কাগজের ফুলের ঝড়। এগুলো তারা বাণীর উপর ধরে ছিল।

১লা অক্টোবর যে জাতীয় উৎসব দেখলাম—তাতে বালক-বালিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শ্রমিক বৃন্দ, ব্যাচম-জীবী, তরুণ-তরুণী, নর্তক-নর্তকী একবাক্যে হাঁকে গেল—নয়া চীন জিন্দাবাদ। সে কি উৎসাহ! যেন সমুদ্রের ঢেউ। কলোন্ড তুলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্ণধারদের বসবার উচ্চ মঞ্চের পাথপাথে আঁচড় খেয়ে পড়ে নতি এবং আহুগতা আনিয়ে গেল। দলের পর দল। এক একটি দল যেন ঠিক এক একটি চলন্ত ফুলের বাগিচা। দেখলাম—একটি হলুদ ফুলে কলমর একখানি ফুল বাগিচা চলে আসছে। হঠাৎ ফুলগুলি নেমে গেল—তখন দেখা গেল কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠানের ডেলে-

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

যেদেরা বাপার উপর কুলের গুচ্ছগুলি ধরে তার তলার আয়োগোপন করে চলে আসছিল। ওদের পর এল ব্যারামজীবী খেলোয়াড়েরা, লরীর উপর ব্যারাম দেখাতে দেখাতে যাচ্ছে, সাইকেলে চেপে ব্যারাম করতে করতে চলেছে, একচাকার বানের উপরেও একজনের ঘাড়ে আর একজন তার ঘাড়ে একজন চেপে চলেছে। চীনের সদময় কর্তৃত্বের নেতা শ্রদ্ধের মাত-সে-তুঙের সামনে এসে সবাই ধনি দিয়ে যাচ্ছে—নয়া চীন জিকাবাদ, চীনা জনগণ জিকাবাদ, মাত-সে-তুঙ জিকাবাদ!



।তপরে এক চাকার সাইকেল চালিয়ে কসরত দেখাচ্ছে একট ফোট হেলে।

ইদ চীনের তুলন জীবন
মানবকর বন্দোপাখ্যায়

এর আগেও ঠিক এই দেখেছি।
পিকি: দোঁচেভিলাম ২৮শে সেপ্টেম্বর।
ভিলাম চিনমিন হোটেলে তিনতলার
একখানা রাস্তার দারের ঘরে। পশ্চিমে
দক্ষিণে ডাঁদিকে রাস্তা। আমি ভিলাম
একা। অর্থাৎ আমার কোন দল ছিল
না। সাধারণতঃ বিদেশের নিমন্ত্রণে—
বিশেষ করে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির
নিমন্ত্রণে দলবদ্ধ হয়ে ডেলিগেশন
হিসেবেই যাওয়া আসা চলে। আসাটা
কম, যাওয়াটাই বেশী। আমাদের
দেশ থেকে সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
ডেলিগেশনই বেশী। ওদের দেশের
শিক্ষক সংঘ—লেখক সংঘ—শিল্পী সংঘ
—নানান সংঘ সরাসরি এদেশে নিমন্ত্রণ
পাঠান—আমাদের দেশ থেকে ৫ জন
৭ জন ১০ জন মিলে ডেলিগেশন
হিসেবে যান। তবে বুৎ উৎসব—
শান্তি উৎসব—এ সব উৎসব যখন হয়
তখন দল ভারী হয়ে ৫০।১০০ কি
তারও বেশী হয়ে পাড়ায়। আমার
ক্ষেত্রে কিন্তু আমি ভিলাম একক।
এই একাকীত্ব বিষয়ে কিন্তু ভারী

অহুবিধের কারণ হয়ে ওঠে। নিজের ভাবার কথা বলবার লোক মেলে না, একলা একলা থাকতে হয়, বরের মধ্যে যে সময়টুকু সেটুকু আর কাটতে চায় না। যত তৃষ্ণিত এসে জোটে। কথাটা বলছি এই জন্তে যে পিকিংয়ে ছোট্টোলে সবরকম গুণগ্রাহন্য সংবৎ ভাল ঘুম হত না। একটু রাগ্নি থাকতেই ঘুম ভেঙে যেত। আমি রাস্তার দিকে ১০ ফুট ৬ ফুট কাচের জানালার ধারে চেয়ার টেনে বসে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তখন থেকেই রাস্তায় গাড়ি আসত; মিউলে টানা গাড়ি, একটা মিউলে টানা—জটো মিউলে টানা, এসব গাড়ি বাইরে থেকে থাবার নিয়ে এসে ঢুকত পিকিংয়ে। ক্রমে ভোর হতে হতে লম্বা আসত; তার মধ্যে নিত্যই দেখতাম কিছু লম্বীতে যেত চাঁদ থেকে ১৪।১৫।১৬ বছরের ছেলেমেয়ের দল। চলে যেত আবার ঘণ্টাভিনেক পর ফিরত। তাদেরও সেই এক ধ্বনি। আমার ঈন্টার-প্রিটার ছিলেন একটা চীনা তরুণ। নাম মিস লু। সে সত্তা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঈংরেজী ভাবার প্রাক্ষুয়েট হয়ে বেরিয়ে লেখক সংঘে ঈন্টারপ্রিটারের চাকরি নিয়েছে। তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়?

লু বলেছিল—এই অস্তোবর ডে আসছে—তার জজ প্যাবেডে মংডু দিতে যার।

প্রশ্ন করেছিলাম—কি বলে চীনা ভাবার?

—কেন? জনগণের চীনা রাষ্ট্র জিন্দাবাদ। মাও-সে-তুঙ জিন্দাবাদ। মাও-সে-তুঙ শতাব্দী হোন।

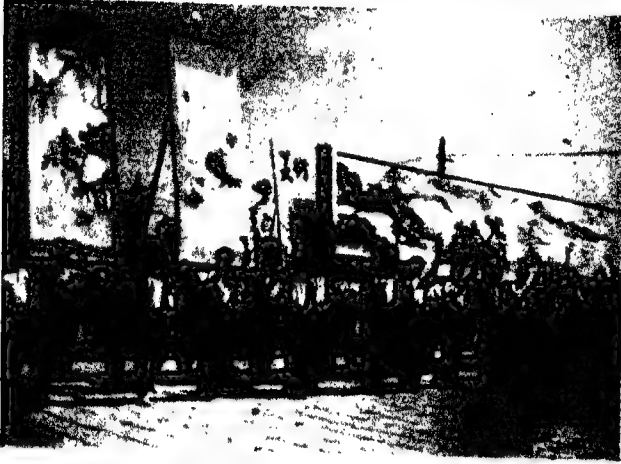
প্রশ্ন করে ছিলাম—মাও-সে-তুঙকে তোমরা পূজা তর্কি কর; না?

—নিশ্চয়। তর্কি করব না? জনগণের মুক্তিগাতা! একটু থেমে বলেছিল—জান আমি বর্তমান পিকিং এ



চায় ও চায়ীন্দ—হাতে জাতীয় পতাকা।

● নবীন চীনের তরুণ কীবন
তারাপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



চিত্র শিরীষের বিহীন প্রদর্শনী। নিঃশেষের আঁধার সব কাঁধে করে নিচে চলেছে।

তাকে দেখতে পাব। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম—দেশের মুক্তিযুদ্ধের নেতা—নববিধানের সর্বদর নারকের প্রতি এই যুগভীর অমরাগ দেখে।

মনে মনে প্রশ্ন করেছিলাম—আমাদের দেশে এই অমরাগ আছে কি ?

নিঃসংশয়ে নিঃসেই উত্তর দিয়েছিলাম—অমরাগ অবশ্যই আছে কিন্তু এই অমরাগ নেই।

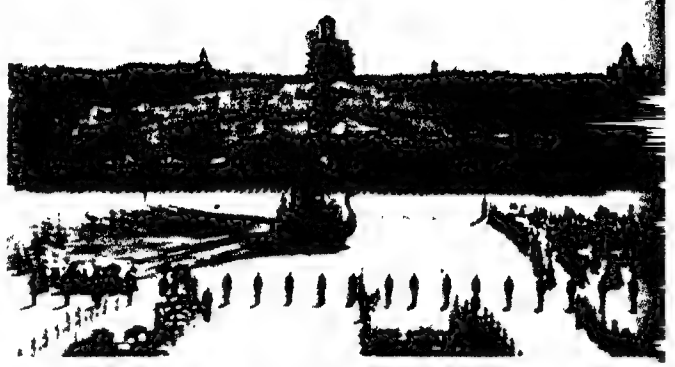
এসে উত্তরও আছে। চীন দেশ একটি রাজনৈতিক দলের দেশ। সেখানে কম্যুনিষ্ট পার্টির একচ্ছত্র প্রাতিষ্ঠিত। শোনা যায় আরও চ'একটি রাজনৈতিক দল আছে বটে কিন্তু সে নামেই। এই একচ্ছত্রের অঙ্গ তরুণ-তরুণীর দল যারা দেশের সেবা করতে চান তাঁরা ওই দলে গিয়েই যোগ দেন। এবং কম্যুনিষ্ট পার্টি ডিক্টেটরের অধীন বলেই ডিক্টেটার এমন চরম প্রত্যাভিক্রম পাত্র হয়ে ওঠেন। অবশ্য মাননীয় মাও-সে-তুঙ পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সব যুগপ্রবর্তক বিরাটপুঙ্খ অগ্রগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে একজন। কিন্তু অত্যাচারী ডিক্টেটারও আমাদের বর্তমান যুগে বেবেছি। এবং তিনি বতর্দিন ডিক্টেটার থেকেছেন—ততদিন সে দেশের মানুষদের কাছে বিশেষ ক'রে দলের কর্মীদের কাছে এমনি সহস্র প্রজন্ম অমরাগ ও আত্মগতা পেরেছেন। আর আমাদের দেশ গণতন্ত্রের দেশ—এ দেশে ব্যক্তিবাদীনতা অবাধ, এবং আমাদের রাষ্ট্রনায়কেরাও দেশের সর্বাধিনায়ক অশেফা অনেক গুলত। সেই কারণে এই আত্মগতা দেখা যায় না এবং তা আমাদের কাম্যও নয়।

নবীন চীনের তরুণ জীবন

ভারতবর্ষ বন্যোপাখ্যার

এসেজিততদিন প্রত্যেক
বার ইউনিভারসিটির
দলের সঙ্গে প্যারেড
করেছি। কন জ্ঞান ?
মাও-সে-তুঙকে একবার
দেখতে পাব। এই
এইবার প্রথম যোগ
দেখি না। তোমার
ইন্টারপ্রিটারের কাজ
কবডি এবার অতিথি-
দের আসনে তোমার
সঙ্গে পাড়াতে পাব,
এবং অনেক কাঁচ
থেকে অনেককণে দূরে

এই সঙ্গে আরও
একটি কথা বলতে
হবে। নঃ-হলে মিথ্যা
বলা হবে, চীনের
নববিধানের প্রতি
অন্তায় করা হবে।
সেটাও এই অল্পব্যাগ
ভক্তির অঙ্গতম কার্য।
সেটি হল চীন কম্যুনিষ্ট
রাষ্ট্রতন্ত্রের এই বালক-
বালিকা তরুণ-তরুণীর
জীবন সবাঙ্গশুদ্ধির
করে গড়ে তোলবার
প্রতি যত্ন এবং বিপুল



অষ্টোবর উৎসবে—মুদ্রণশিল্পে নতুন-নতুন কীর্তি।

আয়োজন। সে এক আশ্চর্য ব্যবস্থা। শহরে গ্রামে শিক্ষায়তন। প্রতিটি ছেলে সেখানে
পড়ছে। শহরে শ্রমিকদের এলাকার নার্সারী উদ্বল। নেপাত বাচ্চারা সেখানে দলের বাগানে
বাগানে আঙিনার খেলে বেড়াচ্ছে। চীনের মত বিরাট দেশ—যে দেশের লোকসংখ্যা পৃথিবীর
সব দেশ থেকে বেশী—সেই দেশ—দশ বছরের মধ্যে অশিক্ষার অন্ধকার তাঁরা দূর করেছেন।
শুধু শিক্ষা নয়—স্বাস্থ্য গড়ে তুলবার জন্ত, বালক-বালিকা তরুণ-তরুণীদের আন্দোলন জন্ত—শহরে শহরে
ছেলেদের পার্ক (গ্রামে এটা পাই নি—এখনও গড়ে নি—তবে গড়বে) স্টেডিয়াম। সকাল থেকে
রাত্রি পর্যন্ত, দলের পর দল আসছে খেলছে আবার কাজে চলে যাচ্ছে। যে সব শহরে শীত বেশী সে
সব শহরে ঢাকা স্টেডিয়ামের বন্দোবস্ত। বিরাট দলের মধ্যখানে তলিবেলের কোর্ট, টেনিস খেলার কোর্ট,
ব্যাডমিন্টন কোর্ট। রাত্রেও খেলা চলে আলো জ্বলে। খেলা স্টেডিয়ামে মাঝখানে ফুটবল খেলা
হচ্ছে, চারি পাশে রেস চলছে—বোড় বোড় রেস নর, তরুণ-তরুণীরা ছুটছেন; সাইকেল রেস হচ্ছে।
সব থেকে আশ্চর্য হলাম প্যারাচুট ট্রেনিং খেলা দেখে। একটা আলাদা জরিগার দশ থেকে পনের
বোল বছরের ছেলেরা প্যারাচুট ট্রেনিং নিচ্ছে খেলার আমোদের মধ্যে। প্রায় পঞ্চাশ বাঁট কুট
উঁচু পোল, সেই পোলে হুক দিয়ে প্যারাচুট লাগানো আছে; সেই প্যারাচুটের সঙ্গে এক একজনকে
বেধে দিয়ে কপিকলের সাহায্যে টেনে উপরে তুলে দিলে প্যারাচুটস্ট একটা দড়ি টানলে হুকটা

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারানতর বন্দোবস্তাধার

পুলে যার এবং সে তখন খোলা প্যারাচুটের সাহায্যে আন্তে আন্তে নিচে নামে। একটা পোল আছে সেটা অনেক উঁচু, অন্তত ১০০ ফুট। এই প্যারাচুট স্টেডিরামে ছেলেমেয়েদের অসম্ভব তিড়। সাংহাইয়ের পেলার মাঠে দেখেছি—পাশাপাশি ৮টা গ্রাউণ্ডে ১৬টি টিমের খেলা চলছে। হাইজাম্প চলছে একপাশে—লংজাম্প চলছে। খেলাধুলার অন্ত নেই। ছোট শিশুদের জুত কোন কোন শহরে পার্কের মধ্যেই স্বতন্ত্র থানিকটা আরগা আছে। সেখানকার বন্দোবস্ত দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল—মন ভরে উঠল! সে কি ব্যবস্থা। নানান ধরনের রকিং চেয়ার, কোনটা বোড়া কোনটা ভালুক কোনটা বাঘ কোনটা পাখি কোনটা গণ্ডার; কোনটা সিংহাসন কোনটা নৌকা কোনটা কিছু—হরেক রকমের রকিং চেয়ার; বোলনা; স্লাইড নাগরদোলা চারিদিকে জড়ানো সরেছে। থানিকটা আরগা টিনের ছাউনি কমা; বর্ষাবাদলে তার মধ্যে ছেলেরা বোরাকেরা করবে, ছুটবে; দোল খাবে। চারিপাশে বেক, লেখানে মারেরা বসে থাকেন ছেলেদের ছেড়ে দিয়ে। ভবিষ্যৎ আতি তৈরি হচ্ছে—এই সব পার্কে স্টেডিরামে ও ইকুলে। চুংকিং শহরে নজরে পড়ল—সকাল বেলা জনতিনেক তরুণী নারী কর্মী পাচ বছর থেকে আট-বশ বছরের ছেলে-মেয়েদের মাচ করিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বয়েজ স্কাউটদের হাটাই শোশাক, গলার লাল রঙের রুমাল বাঁধা। এই লাল রুমাল সহজে মেলে না, কৃতিত্ব দেখিয়ে অর্জন করতে হয়। সে কৃতিত্ব কি তা ঠিক বলতে পারব না। তবে এ তাদের এবং তাদের অভিভাবকদের পক্ষে খুব গর্বের কথা। আমার ইন্টারপ্রেন্টার মিস লু আমাকে এ বিষয়ে একটা কথা বলেছিল সেটা বললেই সকলে হুসতে পারবেন। লু সাংহাই অঞ্চলের মেয়ে—গুর বাপ ছিলেন ওদেশের ডাক্তার। স্কুলের পড়া শেষ করে ও পিকিংএ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়েছিল ছয় বছর আগে। সেই অবধি সাংহাই আসে নি; আসবার সুযোগ হয় নি। ছ' বছর পরে আমার সঙ্গে আসার সুযোগ ত্বরিত ছই-ই হল। এসেই আমার বলে সে তাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। আমি তাকে বললাম, তুমি সারাদিনটাই সেখানে থাকবে লু। আমি ঠিক চাণিয়ে নেব। পরের দিন সে ফিরে প্রথম কথাই বললে—আমার জাইপো—বাকি আমি ছ' বছর আগে মারের কোলে বেঁচে গিয়েছিলাম ব্যানার্জী—সে এবার লাল হার্ক অর্জন করে ছেলেদের যথো লীডার হয়ে গেছে।

আমি বিজ্ঞাসা করেছিলাম—লাল হার্ক হুঁর সম্মানের ব্যাপার!

—ওরে বাপরে! ওকি সকলে পায়? ও তো বড় লোক হবে! আমরা অভিভাবকরা কি গর্ব অনুভব করি জান না।

সাংহাই শহরে যে হোটেল ছিলো, সে হোটেলের সামনেই পার্ক। এবং আমি সাংহাই

● নবীন চাঁদের তরুণ জীবন

তারাপড়র বন্যোপাখ্যার

পৌচেছিলাম শনিবার ছপুরবেলা। বেলা তিনটে থেকেই পাকে এই ছেলের মরে বালক-বালিকাদের কুচকাওয়াজ স্পোর্টস এবং বক্তৃতা আরম্ভ হল। প্রকাত এবং শক্তিশালী আলো জালিয়ে চলল বারোটা একটা পর্যন্ত। পরদিন রবিবার সকাল বেলা সাড়ে সাতটা আটটা থেকে আবার শুরু হল—বিরাহমহীন ভাবে চলল রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত।

পিকিংয়ে ছিলাম আট দিন। এই আট দিনের মধ্যে কয়েক দিনই আমি বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চল দিয়ে গিয়েছি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরেও গিয়েছিলাম এবং ওখানে যারা ভারতীয় সরকারী ভাষা হিন্দী শেখেন তাঁদের ক্লাসে বক্তৃতাও করে এসেছি। সে কথা পরে বলব। তার আগে এই বিশ্ববিদ্যালয় অঞ্চলে বাইরে যা দেখেছি তাই বলি। এখানকার রাস্তাঘাট অপেক্ষাকৃত নিরুজন। পুরনো রাস্তা ভেঙেচুরে বড় করা হচ্ছে। এই রাস্তায় যুবক ছাত্রদের দৌড় অভ্যাস করতে দেখেছি। হাফ প্যান্ট—কেডস জুতো—গায়ে গেঞ্জি প'রে দলবন্দী ছেলেরা দৌড়ছে। পাঁচ সাত দশ মাইল যে যেমন পারে দৌড় অভ্যাস করে। পিকিংয়ে অস্ত্রোত্তর বেশ শীত। নভেম্বরের প্রথম থেকেই বরফ পড়ে শুনেছি। সেই শীতে তারা যেমন যেন নেয়ে উঠেছে।

এই ভাবে যে আতির বালক-বালিকা যুবক-যুবতী গড়ে উঠছে তারাতো অল্প কিছু দিনের মধ্যেই শক্তিতে সংহতিতে বিশ্বজয়ী হয়ে উঠবে। তাদের পণ ঘোষ করবে কে? এবং এই যে দলাদলিশূন্য চীন রাষ্ট্রে এর গঠনকর্ম একদিনে দশদিনের কর্ম সম্পন্ন করবে তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

তবে শুল্কলা বড় কঠিন। হয় তো বা লেক্সেই নিরমকামুন নিষ্ঠুর। আমি চীন যাবার কিছুদিন আগে সরকার থেকেই সরকারী দোষ-ত্রুটির সমালোচনা নিষেধ করা হয়েছিল। ফলে একদল বিরোধী পক্ষ বেশ কথা বলবার সুযোগ পান এবং সত্য অর্ধসত্য নানান ত্রুটিবিদ্রূতি নিয়ে কিছুটা ১০-১৫ হয়; এবং আমাদের দেশের ছাত্রেরা যেমন বিক্ষোভ দেখান—মিছিল করেন, তেমনি (এতগামি নয়) খানিকটা বিক্ষোভ দেখাতে চেরেছিলেন একটি শহরের একদল তরুণ। সরকার লেক্সেই কঠোর হতে সে বিক্ষোভ দমন করেছিলেন। থবরটি আমাকে দি়েছিলেন আমাদের ভারতীয় দূতাবাসের একজন বাঙালী কর্মী। বাকি ফলে এ ধরনের আন্দোলন বা বিক্ষোভ চীনের মত রাষ্ট্রে অসম্ভব। এ ভালো না মন্দ কি করে বলব? কারণ ব্যক্তিব্যবহিতা বড় না আতীর বার্ষ বড় এ বিচার সহজ নয়। আমাদের দেশে এই ব্যক্তিব্যবহিতার কল ছেলেদের রাজ্যে কি চেহারা নিচ্ছে তার একটি থবর এই সেহিন থবরের কাগজে বেরিয়েছে। বেলবরিসা অঞ্চলের এক চাকুরে তত্ত্বলোক তাঁর বালক পুত্রকে কোন আচরণের অজ্ঞ প্রহার বা তিরস্কার করেছিলেন বা হুইই করেছিলেন। শাসন করে তত্ত্বলোক আপিলে গেলেন। ছেলেকে প্রহারের অজ্ঞ মন একটু খারাপও ছিল, আবার ছেলেকে

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
তারাপকর বন্দোপাধ্যায়

দেয় দেউল

মন পথে বাওয়ার অজ্ঞা খানন করেছেন বলে কর্তব্যপালনের তৃপ্তিও অনুভব করছিলেন। আপিস থেকে ফেরবার সময় হয় তো ছেলের অজ্ঞা একটা কিছু কিনেও নিয়েছিলেন। ভাবছিলেন ছেলেকে দেবেন, বুঝাবেন; ছেলেও খুশি হবে—বুঝবে এবং অল্পতাপ প্রকাশ ক'রে বলবে—‘এমন সব কাজ আর করব না বাবা। এবার থেকে ভাল হব তুমি দেখো।’ কিন্তু বেলদরিয়ায় নেমে খানিকটা বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেই ছেলের সঙ্গীর দল তাঁকে ধরে ফেলে চিংকার ক'রে উঠল—‘যেয়ে ধ'রে বাপগিরি ফলানো—

—চলবে না। চলবে না। চলবে না।

বিস্মৃত হয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ওদিকে ফলি তখন চলছে—ইটের বদলে—

—পাটকেল।

—মারের বদলে—

—মার!

এবং মার মার লকে প্রকম্পিত হয়ে উঠল সারা অঞ্চলটি। ভদ্রলোক মারও খেলেন। এগন ব্যক্তিবাধীনতার পরিণতি যদি এই হয় তবে আমি বলব ওতে দরকার নেই। কড়াকড়ি ভাল। আমাদের গ্রামে একটা ছেলে ছিল, সে কিছুতেই পড়ত না। বাপ ছিলেন উদারপন্থী এবং আধুনিক। শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে বিদ্রোহীরা প্রথমভাগ বর্ণপরিচয় বাদ দিয়ে সে-কালের ‘হাসি-খুসী’ ছড়া

ও ছবির বই কিনে আনলেন। ছেলেকে দেখালেন—দেখ তো বাবা কেমন ছবি!

ছেলে বললে—
ভাল। দেখি বাবা।

ছেলে ছবি দেখতে বলল। বাপ পাশে বসে অ-এ অলগরের ছবিটা দেখিয়ে বললেন—বল—
অ-এ অলগর আসছে তেড়ে।

ছেলে লাক দিয়ে



ব্যক্তিবর বল—টীকের বিখ্যাত ড্রামন মিছিল।

● নবীন টীনের তরুণ জীবন

ভার্মাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উঠে দাঁড়াল এবং—
ওরে বাপরে, সাপরে!
বলে ছুটে পালাল।
অতঃপর বাপ আর
পাকতে পারলেন না,
ছুটে গিয়ে ছেলের
কানে ধ'রে এনে
গালে চড় কষিয়ে
বললেন—পড়!

কাজ হল।

এ তো একটা
ডটো কি চারটে ছেলের
বাপার। আর রাষ্ট্রের
ক্ষেত্রে গোটা জাত



বাংলায়কারিগীর হল এগিরে চলছে খেলা দেখাতে দেখাতে।

নিয়ে কথা। গোটা জাতের চরিত্র গঠনের দাঁড়ি বধন রাষ্ট্রের তখন রাষ্ট্রের আড়রে ছেলের ননীগোপাল
বাপ সাফলে চলবে কেন? চীনের কঠোরতা সম্পর্কে তাই নিশ্চয়ই বা করি কি ক'রে? দিবাচক্ষে
দেখতে পাচ্ছি আগামী দশ বছরে চীন জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ও সবুজিলালী ছ' তিনটি জাতির মধ্যে
একটি। হয় তো বা ডটির মধ্যে একটি।

এর একটি আশ্চর্য ভাল দিকের কথা বলি। সেদিন প্রথম চীনে প্রবেশ করছি। সীমাস্ত
থেকে ক্যান্টন পর্যন্ত প্রায় সাতের মাইল পথ ট্রেনে যেতে হয়। হংকং সীমান্তে নানান দেশের
অভিধি-পর্যটক-সরকারী ডেলিগেশন আসছেন। সীমাস্ত থেকেই প্রত্যেক দেশের জন্ত স্বতন্ত্র ইন্টার-
প্রেন্টার এসেছেন। ইন্টারপ্রেন্টাররা শুধু ইন্টারপ্রেন্টার নন এরাই গাইড, এরাই স্থপ-ত্ববিধে দেখেন,
এবং এক কথায় চীন সরকারের বা নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। এঁদের ক্রটি হল সেটা দেশের
ক্রটি বলেই ধরা হবে। এখন আমার সঙ্গে এক কামরার পাকিস্তানের এক সরকারী ডেলিগেশন
চলছিলেন। হংকং সীমান্তেই এঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এবং আমি আলাপ করতে গিয়ে
বেশ একটু খাচা খেয়েই সাবখানে সরে বলেছিলাম। তার একটু বিবরণ বিলেই এঁদের স্বরপটা স্পষ্ট
হবে। পাকিস্তান থেকে ডেলিগেশন—সুতরাং কেউ-না-কেউ ঢাকার বাঙালী থাকবেন। বাংলা তাহা
বলতে পারব। এবং একই ভারতবর্ষের দুই অংশ—এক ভাষা এক গান এক হৃদ এক মন, এক আর

● নবীন চীনের তরুণ জীবন
ভারতীয় বন্যোপাখ্যায়

দেব দেউল

এক বল এক বাতাস—হলেই বা ধর্ম ভিন্ন, এ মাহুব কি পর হতে পারে? এই ভেবে নিজেই এগিয়ে গেলাম। গোটা দলের (৭৮ জনের দল) নিখুঁত সাহেবী পোশাক। কিন্তু সেটা গ্রাহ্য করি নি, কারণ সাহেবী পোশাক ভারতবর্ষে বাংলা দেশেও আছে। প্রশ্ন করলাম—আপনারা পাকিস্তান থেকে আসছেন?

ইংরেজীতে জবাব হল—কি বলছেন অস্ট্রেলিয়ান?

তখন ইংরেজীতেই বললাম। তিনি জবাব দিলেন—ই-রা-স। কামিং ফ্রম কেরাচি!

জিজ্ঞাসা করলাম—আপনাদের দলে ঢাকার কেউ নেই? আমি কলকাতার লোক।

—ও। তার পরই হাঁকলেন—হে সেলিম, দিস অস্ট্রেলিয়ান ওয়াণ্টস যু।

সেলিম এগিয়ে এলেন; চমৎকার চেহারা, টাইট অনাবশ্যক ভাবে টেনে সোজা বা ঝাঁক করে নিয়ে বললেন—ওয়েল হোয়াট ক্যান আই ডু ফর যু?

আমি বললাম—আলাপ করতে চাই। আপনি বাঙালী। আমিও বাঙালী, কলকাতা থেকে আসছি। খাঁটি বাংলার বললাম। এবং ঢাকার ভাষা-আন্দোলন শ্রবণ করেই একটু অহংকার করে বললাম—আমি একজন সাহিত্যিক। আমার নাম তারানন্দর বন্যোপাধ্যায়।

তিনি ইংরেজীতে বললেন—আমি কখনও শুনি নি। এবং আমি বাংলা বইটাই পড়িনি। ওয়েল শুভবাহী। বলে চলে গেলেন। সীমান্ত পার হয়ে গাড়িতে উঠে দেখলাম—ভীরাও সেই কামরার এবং মাঝের রাস্তার ওপাশেই দল বেঁধে জমিরে বসেছেন। আমি লত্ক হয়েই ব'লে রইলাম। কারণ ওই দলটির আচার-আচরণে একটা অভ্যস্ততার প্রকাশ ছিল অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। কিছুক্ষণ পরই দেখলাম সেই ইন্টারপ্রিটার তরুণটিকে ঘিরে লস্করদার মত অস্তিমহা বধের পালা অভিনয় করছেন। তার আগে চীন আমেরিকার সম্পর্ক এবং আমেরিকা পাকিস্তান সম্পর্কের কথাটা শ্রবণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমেরিকানদের হ' পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ আছে, ভীরা চীন সম্পর্কে প্রকাজ্ঞা ভাবেই বিরূপ, তবে তাঁদের অস্ত্র ভাষা প্রয়োগ করতে দেখি নি। তবে মত্ততা করতে গিয়ে কিছুটা লত্ক হয়ে ওঠেন। কিছু এই পাকিস্তানী দল এই ছেলেটিকে ঘিরে তাকে প্রশংসাপে জর্জরিত করে তাকে ঘিরেই বীকার করতে চাইলে যে—চীনে অভ্যাসের অন্যায়ের সীমা নেই, দারিদ্র্য অশিক্ষা কৃষিকার অন্ত নেই। আর ছেলেটি অত্যন্ত তরুণভাবে অমৃতত বর্ষাদার সঙ্গে তার জবাব ঘিরে বাচ্ছিল।

বেশম,—হ' একটা কথা আমার মনে আছে।

—তোমাদের হাডো তো বিচার বন্ধকের নলের মুখে। লাম্বা লম্বা হলেই তো হয়ে গেল।

● নবীন চীনের তরুণ বীণ
তারানন্দর বন্যোপাধ্যায়

—না। তা কেন হবে। আইন আছে। বিচারালয় আছে। সব দেশেই যেমন বিচার হয়, তেমনিভাবেই বিচার হয়।

—সে বিচার তো বিচারের ভান মাত্র। সব আসামীই তো দোষ স্বীকার করে নেয়।

—তা অনেক নেয়। কিন্তু স্বীকারোক্তি সব দেশেই কিছু কিছু লোক করে।

—তোমরা ব্রেন ওয়াশ করাও। সে পদ্ধতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর।

—আপনারা অন্য দেশের মিথ্যা প্রচারে বিশ্বাস করেছেন।

—তোমরাও মিথ্যা প্রচার কর।

—প্রচার করি। কিন্তু মিথ্যা কেন করব?

এই ধরনের প্রশ্ন। যে প্রশ্ন একমাত্র আদালতে বা প্রকাশ্য সভায়—জেরার ক্ষেত্রে বা বাদান্ত্বাদের ক্ষেত্রে চলে, গৃহস্থের ঘরে এসে কোন অতিথি এমন প্রশ্ন গৃহস্থকে করেন না। আমার কানে অত্যন্ত রুঢ় ঠেকছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, এই তরুণ ইন্টারপ্রিটারটি ব্যারেকের জন্ত বা যুদ্ধের জন্ত ধৈর্য হারায় নি। অত্যন্ত সংযত বিনয়ের সঙ্গে অপ্রকৃত মর্যাদার নিষেকে স্থির রেখে সে উত্তর দিয়ে গেল, ক্যান্টন স্টেশন পর্যন্ত।

এই নতুন চীনের তরুণ সম্প্রদায়ের কথা। অবশ্য চীনের সকলেই কম্যুনিষ্ট নয়। অকম্যুনিষ্টই বেশী। তাদের সঙ্গে মেলামেশার সুরোগ হয় নি। তবে আমার বিশ্বাস তারা এট নববিধানের জীবনে কম্যুনিষ্টরা বা পেয়েছে তা না পেলেও কম পার নি। মুক্তি পেয়েছে অধিবাস ধনী সম্প্রদায়ের দাসত্ব থেকে। এ দাসত্ব গ্রায় ক্রীতদাসদেরই হত। এ প্রথা আমাদের দেশে কোন কোন দেশীয় রাজ্যের রাজাদের অন্তরে থাকলেও সাধারণভাবে তারতবর্ষের সমাজে ছিল না। আর পেয়েছে অন্ন। ওদেশে অন্ন যথেষ্ট। বস্ত্র কম—কিন্তু বস্ত্রও তারা পেয়েছে। শিক্ষা পাচ্ছে। এই দশ বৎসরের মধ্যে এটা কিছুতেই সম্ভবপর হত না যদি না কম্যুনিষ্টবল একচ্ছত্র অধিকারে কাজ করবার ও করবার সুযোগ না পেতেন। এবং যদি না সাধারণ মানুষ, সে ভয়েই হোক আর ভক্তিতেই হোক শৃঙ্খলাপরায়ণ ও অস্থগত না হত। আমি নিজে অহিংসার বিশ্বাসী। বিশ্বাস করি অহিংসাই মানুষের সমাজে একমাত্র শান্তি সুরের পথ, অবশ্যস্বাধীন ধ্বংস থেকে পরিচ্রাণের পথ। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বিশ্বাস করি—অহিংসা চর্চলের ধর্ম নয়, অহিংসা প্রেষ্ঠ শক্তিমানের পক্ষেই পালন করা সম্ভব। অহিংসা তাঁরই ধর্ম যিনি কোন অস্ত্রকে কমা করেন না। যিনি সত্যে অধিষ্ঠিত তাঁরই ধর্ম অহিংসা। চর্চলের অহিংসা পরাজয়েরই নামান্তর। অস্ত্রকে কমা প্রকারান্তরে দুর্নীতিক প্রেরণ। ব্যক্তিগতবীনতা সেখানে উচ্ছৃঙ্খলতার পরিপত হবেই। চর্চল নেতৃত্ব কখন সবার শক্তিমান জাতি গঠন করতে পারে না। অসম্ভব।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ

—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

‘শুনছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বরচিন্তা করে।’ মধুরবাবুকে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ,
‘তাকে ভারি দেখতে সাধ হয়। তার বাড়িতে নিয়ে যাবে একদিন?’

‘নিয়ে যাব।’ এক কথায় রাজি হল মধুর।

‘তোমার সঙ্গে তার আলাপ আছে?’

‘হা, আমরা যে একসঙ্গে পড়েছি হিন্দুকলেজে। একসঙ্গে মানে এক ক্লাসে।’
মধুরবাবু উৎসুক চোখে বললে, ‘তার সঙ্গে আমার খুব জানানোনা।’

‘তবে একদিন নিয়ে চलो সঙ্গে করে।’ শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে বরে পড়ল
ব্যাকুলতা।

‘চাল নেই তরোয়াল নেই নিধিরাম সর্দার—তুমি সেখানে যাবে কি! কত বড়
রাজপ্রাসাদের মতো তার বাড়ি। তার বাবা ঝারকানাথ ঠাকুরের রাজতুল্য বিত্ত।
বলতেই বলে প্রিন্স ঝারকানাথ। কত তাদের ঙ্কাজমক কত তাদের বোলবোলা।
তোমাকে সেখানে কে পুঁছবে?’



বারকানাথ নেই কিন্তু তার বড় ছেলে দেবেন্দ্রনাথ তারই মত ঠাঁকভেকে লোক। জানো, বাবসা করে অনেক টাকা লোকসান দেখে বারকানাথ, পাছাড়প্রমাণ ঋণ রেখে যায় ছেলের ঘাড়ে। দেবেন্দ্রনাথ শেষ ক্রান্তি পর্যন্ত সেই ঋণ শোধ করে দিয়েছে।

কলেজে-পড়া কৃতবিদ্য ব্যক্তি। কত বড় কর্মী, কত মহৎ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি স্বদেশের উন্নতির পথে অগ্রসর—এই আন্দোলন চালাচ্ছে ইংরেজ শিক্ষক আর পাদ্রীর, আর তারই অঙ্গস্রোতে গা ভাসিয়েছে উগ্রপন্থী ছাত্রের দল। তারই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে অগ্রণী এই দেবেন্দ্রনাথ। নিজের ধর্মে অনাস্থা, নিজের সংস্কৃতির প্রতি অশ্রদ্ধা ও পশ্চিমকে অনুকরণ করবার লালসার বিরুদ্ধে তার অভিযান। তারই জগ্গে রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করলেন আর তার প্রধান ব্যাখ্যাতা দেবেন্দ্রনাথ। ব্রাহ্মধর্ম তো হিন্দুধর্মের বিরোধী বা বিসম্বাদী নয়, আসলে তা হিন্দুধর্মেরই সার, নিবাসরস।

এ নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের কত লেখা কত বক্তৃতা।

‘আমি অতশত জানতে চাই না।’ বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ‘সে ঈশ্বরভক্ত তো?’

‘সে ঈশ্বরে শরণাগত। ঈশ্বর বই সে আর কিছু জানেনা। ঈশ্বরের কাছে সে যে দীক্ষা নিয়েছে তা আরামের দীক্ষা নয়, তা আগুনের দীক্ষা। যে ঘরে পূজা হয় সেই ঘরে গৃহস্থ যেমন জাগ-প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখে, নিবতে দেখনা, তেমনি জীবনে সে একটি অনির্বাক্য ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছে। সমস্ত জীবনই তার পূজার ঘর। আর সে প্রদীপে শুধু আলোই নয় দাহও আছে। দুঃখ-দুর্দিনের দাহ কিন্তু সত্যের আলো।

যে এই দীপ জ্বালায় সে আর ঘুমুতে পারে না। সেই দীপই তাকে জাগিয়ে রাখে। জাগিয়ে রাখে সত্যের প্রহরায়। দুর্বোলের বোড়ো ছাওয়ায় তা না নিলে যায় অকস্মাৎ, আলস্যে-ঔদাসীণ্যে না স্তিমিত হয়। আর কোনো ভার ভার নয় যেমন এই দীপরক্ষার ভার। তাতে যোগাও নিষ্ঠার তেল, উদ্বে দাহও উৎসাহের কাঠি দিয়ে, আর তাকে ঘিরে রাখে তোমার বিশ্বাসের দেয়াল দিয়ে। তাই খোর কন্টের দিনে যদিও দেবেন্দ্রনাথের আত্মীয় গেল, সমাজ গেল, বিত্ত গেল, প্রভুত্ব গেল, নিন্দার ছেয়ে গেল দলদিক, ধনী-মানী বন্ধু-স্বজন, সহায়-সহল, সব তাকে ত্যাগ করল, তবু দীপের অকম্প শিখা নিবতে দিল না কিছুতেই। সেই শিখাকে বৃকে করে লোকালয় ছেড়ে ঘুরতে লাগল অরণ্য-পর্বতে। সেই আলোকে দেখতে লাগল রুদ্রের প্রসন্ন মুখ। যিনি ভয়ের ভয় ভীষণের ভীষণ, তাঁর বজ্রমুষ্টির অন্তরালে খুঁজে নিয়েছে বরাভয়ের অমৃত।’

দেব দেউল

‘রাজার ছেলে স্বধি—এমন মহাপুরুষকে দেখব না সচক্ষে?’

‘কিন্তু তোমাকে পাঠা দিলে তো! তার উপর দেখ না কত বড় পণ্ডিত, কেমন সব জ্ঞানের কথা বলেছেন।

—সংসারাসক্ত বিষয়-মত্ত লোক বিষয় পেয়েও কেন মনে যথার্থ স্তব্ধ পায় না? যে জিনিসের উপর আমাদের সবচেয়ে বেশি মমতা, বেশি আকর্ষণ, যার বিনাশ বা বিচ্ছেদের কল্পনাতেও আমাদের দুঃসহ কষ্ট তা থেকেই কেন আমরা সর্বাত্মেই বঞ্চিত হই? কেনই বা পাণ্ডিবে স্তব্ধ অনর্থক ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়? কেন মনে হয় একটা উৎকৃষ্টতর স্তব্ধ কোথাও আছে, নইলে, কেন, কেন তবু আমাদের ভোগস্পৃহা? এই সব সিদ্ধান্ত করতে গেলে মনে হয় ঈশ্বর এমন বিধান করেছেন যে শুধু তাঁতেই আমাদের আসল স্তব্ধ। শুধু তিনিই সমস্ত তৃপ্তির হেতু। যতক্ষণ আমরা তাঁকে চোখের সামনে রাখি, তাঁর ইচ্ছার অনুগত হয়ে কাজ করি ততক্ষণই আমাদের যথার্থ আনন্দ।

আরো কী বলছেন শোনো।

—আমরা ক্ষুদ্র জীব হয়ে যে ঈশ্বরকে জানবার অধিকারী হয়েছি এই আমাদের সর্বোত্তম সৌভাগ্য। কিন্তু এই মহত্তম অধিকারের উপযুক্ত হতে হলে আমাদের সর্বভাবে পবিত্র হতে হবে। যেমন ভদ্র সমাজের উপযুক্ত হবার জগ্গে ভদ্র হতে হয়, সাধুর সঙ্গে বসবাসের জগ্গে সাধু হতে হয় তেমনি সেই পবিত্র-স্বরূপের সান্নিধ্য পেতে হলে পবিত্র হওয়া চাই। বাহ্যিক সাধুভাব প্রকাশ করতে পারলে সাধু সঙ্গে কখনো কখনো বিনয় রক্ষা করা যায় বটে কিন্তু পরমেশ্বরের সকাশে সেরূপ হবার নয়। সর্বাস্তর্যামী পরমেশ্বরের কাছে বিনয় রক্ষা করতে গেলে মন, বাক্য ও কার্য যুগপৎ পবিত্র রাখা দরকার।’

‘তবে? এমন স্তম্ভের যার কথা, এমন গভীর যার ঈশ্বর সম্বন্ধে অনুভব, চলো তাকে বেঁধে আসি দু’চোখ ভরে। তাকে বেঁধে আসাও পুণ্য।’

‘যদি তোমাকে চুকতে না দেয় বাড়িতে? তুমি কোথাকার কে এক হেঁজিপেঁজি লোক—’ মধুর নিরন্তর করতে চাইল।

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ‘যদি চুকতে না দেয় কিরে আসব। অন্তত দেবে আসব তো তার বাড়িটা। তার বাড়িটাই তো ভীষণ।’ তারপর বললেন আশ্বাসের সুরে, ‘তা হয়না। পারবেনা আমাকে কিরিয়ে দিতে। যদি শোনে আশিও ঈশ্বর ঈশ্বর করি—কাছে ভেকে নেবে হাত বাড়িয়ে, আনন্দের কথা শোনাবে।’

মিরে গেল মধুর। একেবারে সটান বেবেশ্রনাথের কামরায়।

‘চিনতে পারো?’

‘আরে মথুর না? চেছারাটা একটু বদলেছে দেখছি। ডুঁড়ি হয়েছে।’ হাসির রেখাটুকু মিলিয়ে যেতেই উৎসুক চোখে জিজ্ঞেস করল দেবেন্দ্রনাথ: ‘ইনি কে?’

‘ইনি ঈশ্বর-ঈশ্বর করে পাগল।’ বললে মথুর, ‘তোমাকে দেখতে এসেছেন।’

কে কাকে দেখে!

তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল দেবেন্দ্রনাথ।

‘দেখি তোমার গা দেখি।’ মৃদুভাবে প্রসন্ন বন্ধুতা, সহজ স্তরে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। আশ্চর্য, পারলেন বলতে। এতটুকু কুণ্ঠা হল না।

আরো আশ্চর্য দেবেন্দ্রনাথের ব্যবহার। অনায়াসে সে গায়ের জামা তুলে খরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখলেন দেবেন্দ্রনাথের গায়ের রঙ গৌর, তার উপর এক রাশ সিঁদুর ছড়ানো।

তার মানেই দেবেন্দ্রনাথের দিবা ভাব উপস্থিত। তিনি এসেছেন ঈশ্বর-সান্নিধ্যে। আগুনের সামনে এসেছেন বলেই তাঁর গায়ে এই সতেজ রক্তিম।

‘ঠিক লোকের কাছেই এসেছি।’ পাশে বসে পড়লেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, ‘আমাকে কিছু বলো।’

‘আমি কী বলব!

‘না, বলো। তুমি কত বড় পণ্ডিত। সমস্ত বেদ-উপনিষদ তোমার নখদর্পণে। এ পাণ্ডিত্যও তোমার প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহ। বলো কিছু শুনি। ঈশ্বরীয় কথার কি কিছু শেষ আছে? গত বলবে তত নতুন।’

বলতে লাগল দেবেন্দ্রনাথ। ‘এই জগৎ যেন একটা বিরাট কাড় লণ্ঠন, আর জীব হচ্ছে এক-একটি কাড়ের দীপ। এ জগৎ কে জানত? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জগতে। কাড়ের দীপ না থাকলে সব অন্ধকার, কাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।’

‘আরো একটু বলো।’

‘ঈশ্বরের মহিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। প্রভাতে আমাদের নিম্নলিখিত নয়ন মুক্ত হওয়া মাত্রই তাঁর চক্ষু আমাদের উপরে স্থাপিত দেখি। আমরা যদি তাঁর জগে ব্যাকুল হই, যদি সরল হৃদয়ে তাঁকে প্রার্থনা করি, যদি ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই আমাদের ক্ষুধা-তৃষ্ণার নিবারণ না হয়, তবে অন্তরে-বাহিরে দূরে-নিকটে সকল স্থানেই তাঁর প্রকাশ ঘেঁষতে পাই। যখন নিজেকে পবিত্র করি, ঈশ্বরের কাছে মুক্ত করি জন্ম ধার, সত্যক

দেব দেউল

হয়ে অপেষণ করি তাঁকে, তখন গরিগুহা, উজান-কানন, নির্জন-সজন সকল কিছুই তাঁতে ভরে ওঠে।

এবার আপনি কিছু বলুন।’ অশ্রুরোধ করল দেবেন্দ্রনাথ।

‘তুমি কলির জনক, তোমাকে দেখে আমার পূব আনন্দ।’ ভাবময় উজ্জ্বল মুখে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ‘জনক এদিক-ওদিক দু’দিক রেখে খেয়েছিল হৃদয়ের বাটি। তুমি সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রেখেছ, তুমিই তো বাহ্যতর, তুমিই তো বীরপুরুষ! তাই তো তোমাকে আমার দেখতে আসা।

জনক একদিকে নিজের হাতে লাঙল নিয়ে চাষ করছে, আরেক দিকে দেশদেশান্তর থেকে আসা জ্ঞানপিপাসুদের লক্ষ্যস্থান শিক্ষা দিচ্ছে।’

‘আরো একটু বলুন।’

‘এক হাতে কাজ করো আরেক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো। কাজ শেষ হলে দু’ হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।

যুদ্ধ যখন করতেই হবে, সংসারীদের বলি, কেল্লার মধ্যে মানে সংসারের মধ্যে থেকেই যুদ্ধ করা সহজ। মাঠে ঝাড়িয়ে, মানে সংসার ছেড়ে এসে যুদ্ধ করার অনেক বিপদ। যদি খেতে না পাও ঈশ্বর-টিশ্বর সব ঘুরে যাবে।

যা চাও তাই কাছে রয়েছে। অথচ লোকে নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিসও দেখতে পায়না। একজন গামছা গুঁজে গুঁজে তার-পর ঘেঁষে কাঁধেই রয়েছে। আরেকজন, শোনিমি বুঝি, তামাক খাবে বলে অনেক রাত্রে এক প্রতিবেশীর বাড়ি টিকে ধরাতে গেছে। কিন্তু তারা তখন সব ঘুমিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে দরজা ঠেলাঠেলি করায় একজন বেরিয়ে এসে জিগগেস করলে,—কি গো, এত রাত্রে কি মনে করে? তখন সেই লোক বললে,—আরে তাই, জানো তো আমাদের দেশা আছে, তাই এই টিকেখানা ধরাব বলে এসেছি। দেশলাই আছে? তখন প্রতিবেশী বললে,—বাঃ, তুমি তো বেশ লোক। এত রাত্রে দোর ঠেলাঠেলি করে আমাদের ঘুম ভাঙালে। তোমার হাতেই তো লঠন।’

দেবেন্দ্রনাথ ত্রাকোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করল। ‘আপনাকে আসতে হবে আমাদের উৎসবে।’

‘সে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তবে দেখছ তো আমার অবস্থা।’ সংক্ষিপ্ত বেশবাসের দিকে ইঙ্গিত করলেন : ‘কখন কী ভাবে তিনি রাখেন কিছু ঠিক নেই।’

‘বেশ তো, হুতি আর উড়ুনি পরে এস। জামা-টামা নাই পরলে।’ হস্ততায় স্নিগ্ধ বেবেন্দ্রনাথ : ‘তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বললে আমার কষ্ট হবে।’

- যদ্বি বেবেন্দ্রনাথ ও শ্রীরামকৃষ্ণ
অচিন্ত্যকৃষ্ণার সেনগুপ্ত

দেব দেউল

২৯

‘তা পারবনা। আমি পারবনা বাবু হতে।’

মথুর আর দেবেন্দ্রনাথ হাসতে লাগল।

দেবেন্দ্রনাথ তখন আছেন গঙ্গার উপর নৌকায়, উত্তেজিত বড়ের মত তাঁর নিভৃতকক্ষে ঢুকে পড়ল নরেন। জিজ্ঞেস করল, ‘আপনি দেখেছেন ঈশ্বরকে?’

‘আমি?’ অভিজুতের মত তাকালেন দেবেন্দ্রনাথ।

‘দেখলে আপনিই তে’ দেখবেন।

‘আপনি বর্তমান বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু।’
প্রগাঢ়ত্বের বললে নরেন, ‘আপনি মহর্ষি।’

‘কিন্তু আমি দেখলে তোমার লাভ কি?’ বললেন মহর্ষি। ‘তোমাকে নিজে দেখতে হবে।’

‘আমি কোথেকে দেখব?’ বিশাল চোখে তাকিয়ে রইল নরেন।

‘দেখবে, দেখবে—তোমার এমন যোগীচক্ষু, তুমি দেখবে না?’ অভয় আশ্বাসে প্রসারিত হলেন মহর্ষি।

যোগীচক্ষু দিয়ে আমি কী করব?
আমি চর্চক্ষে দেখতে চাই ঈশ্বরকে। আর, একুনি—একুনি। দেরি করবার আমার সময় নেই। তোমরা কেউ যদি ঈশ্বরকে দেখে থাকো, আমাকে দেখিয়ে দাও। একজন পারলে কেন আরেকজন পারবে না?

পারো, কেউ পারো দেখাতে?

আমি পারি।

তুমি পারো, কে তুমি?

আমি কেউ না, কিছু না। আমি

দুখখু গৈয়ো পুজুরী বাহ্ন। আমি দক্ষিণেথরে থাকি। তুই আয় আমার কাছে।
আমি কত দিন ধরে তোর জন্তে পথ চেয়ে বসে আছি। তাকে আমি দেখাব ঈশ্বর।



‘দেখবে, দেখবে—তোমার এমন যোগীচক্ষু, তুমি দেখবে না?’ বললেন মহর্ষি।



একটি কুকুর হানা ও দুটি ছেলে

—বুদ্ধদেব বসু

কী ভালো লাগে সেই সব দিনের কথা ভাবতে, যখন জীবন ছিল সহজ ও সবুল, ছিলো হালকা, পাখির মতো, পাখির পালকের মতো হালকা, ছিলো আন্তে-আন্তে বাতাসে-তেলে-চলা শাধা-শাধা বেগের মতো স্বাধীন। কী ভালো লাগে আজ, সেই ছেলেবেলার কথা ভাবতে।

গন্ধে ভরপুর ছিলো অগাধতা, গুলোর গন্ধ, ফুলের গন্ধ, পানি-পড়া পুকুরের গন্ধ, পেনসিলকাটা ঝড়ের গন্ধ, ঘোঁষে-রাখা লেপ ভোশক বালিশের গন্ধ, আর মায়ের গায়ের গন্ধ এক মন্দিরের মতো। স্পর্শে ভরপুর ছিলো অগাধতা;—খেলার বল, ছুরির ধাঁট, চারের প্যাকেটের সীলের পাত, বিদ্যুটের টিনের কৌকড়া কাগজ—কিছু ছিলো না, যা ভায় আপন ও গোপন স্পর্শ দিয়ে আমাদের খুশি করে না-ভুলতো। এমনকি শালিকপত্রের রঙিন ছবিরও আলাদা একটি স্পর্শ ছিলো—আবার ভুগোলের বইয়ের রঙিন ব্যাপের স্পর্শটি একটু স্বস্তি রকম।

সেই ছেলেবেলার আমি একজনকে ভালোবেসেছিলাম।

—একজনকে নয়, অনেককেই ভালোবেসেছিলাম। ছেলেবেলার বাঘের খেঁবেছি তাদের

একটি কুকুরহানা ও দুটি ছেলে
বুদ্ধদেব বসু

দেয় দেউল

৩৫

বনে আছে সৈন তর্ক করেছিলাম তার সঙ্গে।—‘সব সময় ও-রকম “বড়োলোক-
বড়োলোক” বোলো না তো!’

‘কেন বলবে না?’

‘ঐ কপাটা বিলি লাগে আমার, জঘন্ট লাগে।’

‘কপাটা জঘন্ট, কিন্তু বাপারটা বেশ ভালো—না?’

‘প্রথম কথা, তুমি যাকে “বড়োলোক” বোলো আমি তা নই। দ্বিতীয় কথা, যদি তা হতামও,
তাঁ ছাড়া আমার আর কি পরিচয় নেই?’

‘কিন্তু তুমি কেন, জিলা পুলের সব ছেলেই বড়োলোক। কারো বাবা পুলেক, কারো বাবা
ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট, আর কারো বা মেলোমশাই নামজাদা উকিল। সব ছেলেরই পকেটে পরস-
পকে, তার ইচ্ছেমতো ভোলাভালো লজপুথ থায়, সপাড়ে একদিন সিনেমার দোতে হ’লেও তাদের
ভংগে হয় না।’

‘কিন্তু তুমিও তো ঐ পুলেরই ছেলে!’

‘আমি?’ মাথা ঝেঁক হেসে উঠলো বীরেন, হাসিটা কর্কশ শোনালো। ‘আমার কথা
অলংকার। আমার সঙ্গে অনেক তফাৎ তোমাদের।’

‘আমি তো কিছু তফাৎ দেখি না।’

‘সে তুমি ইচ্ছে করে চোখ বুজে আছো ব’লে। এই তোমার কপাই ধরো না, বিনয়—
তোমার অবজ্ঞা বাবা নেই, কিন্তু বাবার টাকা আছে, আডে নিজেদের এই বাড়ি, তোমার মায়ের
এক ছেলে তুমি—কত স্নেহে তুমি আছো তুমি তা নিজেও জানো না। আর আমরা থাকি ভাড়া-
বাড়িতে, দু-কামরার টিনের ঘরে বারো জন মানুষ—কিন্তু তফাৎ আছে বইকি।’

সে-সুহৃদে আমার ইচ্ছে হ’লো হঠাৎ আমাদের বাড়িতে বাজ পড়ুক একদিন, মায়ের হাতে
বা টাকা আছে (যদি কিছু থাকে), কোনো অলৌকিক উপারে সব নষ্ট হ’য়ে যাক—আমাদের যেন
একবেলা খেয়ে কুঁড়েঘরে ঘুমোতে হয়, বছরে দু-ধানার বেশি কাপড় না জোটে—তুণু যেন ও-রকম
স্নেহে কথা না বলে বীরেন, ও-রকম ক’রে আমার বিকে আর না তাকার।

‘কিন্তু কার কত টাকা আছে বা নেই সে-কথাটাই কি সবচেয়ে জরুরি? তার মুক্তি কিছু
নয়? শুণ কিছু নয়? তাকে তোমার ভালো লাগে কি লাগে না সেটা কিছু নয়?’

‘তুমি অন্য দিকটা বন্ধো ক’রে দেখছো কেননা তোমার পক্ষে সেটাই সুবিধের।’

‘সুবিধের বানে?’

‘মানে—অন্তরের চাইতে স্নেহে আছো ব’লে বনে-বনে তোমার একটু অবজ্ঞা আছে তো,

● একটু কুকুরহানা ও দ্রুত হেনে
বুঝানব বন্ধু

সেই অবস্থিকে চাপা বেবার উৎকৃষ্ট উপার হ'লো নিজেকে এই কথা বোঝানো যে মানুষের টাকটা কিছু নয়—বুদ্ধি সব, গুণপনাই সব। কিন্তু আললে মানুষের মধ্যে দুটো জাত আছে : গরিব আর বড়োলোক, অলংঘ্য বাপ আছে অবশ্য তার, কিন্তু এই দুটো মাত্র দল অনবরত লড়াই করছে পরস্পরের সঙ্গে—চুরি, ডাকাতি, জোজোরিতে দিনে-দিনে আরো বেশি ওস্তাদ হ'য়ে উঠছে বড়ো লোকেরা, এদিকে গরিবরাও পণ করেছে নিজের ঘাঘা পাওনা ফিরে পাবেই। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—' আমি উৎসাহের বোঁকে ব'লে উঠলাম—'সকলেই তার ভাষা পাওনা ফিরে পাক, সকলেই সুখী হোক—কিন্তু কেউ যেন আর অন্তের সঙ্গে লড়াই না করে!'

অন্ধকারে বীরেন একবার তাকালো আমার দিকে, তারপর গভীর গলায় বললো, 'আমি ষাড়ি বাই।' আমি বথারীতি তাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম, যেতে-যেতে আরো অনেক নতুন কথা হ'লো তার সঙ্গে।

এর পরে কয়েকটা সপ্তাহ—দু' মাস কিংবা আড়াই মাস সময়—সত্যি আমি অন্তরঙ্গ হলাম তার সঙ্গে। বটার পর বটা কথা চলে তার সঙ্গে আমার; ছোটো অক্ষরে ছাপানো চিঠি-চিঠি বই সে পড়তে বেশ আমাকে—আশায়ের চা-বাগানে, আফ্রিকার হীরের খনিতে, যথবীপের রবারের ক্ষেতে—নানা দিকে মানুষের উপর অপমান আর অত্যাচারের কথা পড়তে-পড়তে আমার মাথার শির দপদপ করে, রাতে ঘুম হয় না। সত্যি—বীরেন কত বেশি জানে আমার চাইতে, কত বেশি ভেবেছে—আর এতদিন আমি কী ছেলেমানুষই ছিলাম। চ-জনে ব'সে-ব'সে (কি নদীর ধারে ইটতে-ইটতে) পৃথিবীর এক বর্ণভূগের কল্পনা করি, যখন কেউ কাউকে অপমান করবে না আর, কেউ কারো উপর অত্যাচার করবে না, হুজু শেষে যাবে, ভর, হিংসা, ঘৃণা প্রভৃতি শব্দগুলো অভিমানে থেকে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। কিন্তু তার আগে—বীরেন আমাকে কিম্বদিশ ক'রে বনে—তার আগে চাই বজা, চাই আগুন, চাই রক্তমান, ধ্বংস ক'রে দিতে হবে বা-কিছু পুরোনো আর পচা,—বা-কিছু কৃষির মতো ক্লিষ্টক্লিষ্ট করছে স্বকণ্ঠকে পোশাকের আড়ালে, আর সেই 'ধ্বংসযজ্ঞ'র অভ (টিক 'ধ্বংসযজ্ঞ' কথাটাই সে ব্যবহার করেছিলো)—চাই সাহস, শক্তি, ঘৃণা আর গুপ্ত চক্রান্ত।

এ-সব কথা শুনে আমার বে একটু ভয় না করে তা নয়, কিন্তু সেই ভয় থেকেই আরো বেশি রোমাঞ্চ আসে আমার মনে, বীরেনকে একজন বীর ব'লে মনে হ'তে থাকে আমার, তার কোনো কাজে লাগতে পারলেই আমি যেন লার্ঘ্যক হলাম। ঐ কয়েকটা দিন—কয়েকটা সপ্তাহ—আমি পত্নীরতন অর্থে মুগ্ধ ছিলাম, বাকে ভালোবাসি তার মধ্যেই নয়, সব ক্ষণ যেন খেয়ে পেয়ে দেখানে, সব ভর্তুকের অবদান হয়েছে। যেমন অগ্নের ঘোরে কোনো-কোনো মানুষ ছাঁয়ের কানিনের উপর বিয়ে হেঁটে চলে যায়, তেমনি আমিও কোথায় চলেছি তা জানি না।

● একটু হুজুরখানা ও হুট ঘরো
হুজুরে বস

আর তারপরেই সেই ছোট্ট ঝটনাটি ঘটলো।

শ্রীত প'ড়ে আসছে তখন, আশাঘের আত্মএল পরীক্ষার আর খুব বেশি বেশি নেই।
একদিন বন্ধের একটু আগে নবীর ধার থেকে বাড়ির দিকে ফিরছি হু-বনে। ডাকবাংলো ছাড়িয়ে
যে রাস্তাটি শহরের দিকে ঘুরে গেছে তাতে
চোক-চলোচল কম, মন্ত-মন্ত বাগানওলা
খানকয়েক বাড়ি আছে শুধু, তাতে পাটের
কলের সাহেবরা থাকে ;—অত্র একটা রাস্তা
‘লে আরো কাছে হয়, কিন্তু নির্ভনতার
জন্য আমরা প্রায়ই এটাই বেছে নিতাম।
শাহেবদের বাড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েচে
তার খানিকটা পরে বাবুবাচারের মেড়ি ;
তার কাছাকাছি এসে হঠাৎ আমি পমকে
পাড়লাম।

‘কী হ’লো ? হোঁচট খেলে নাকি ?’

‘না। কী-একটা এখানে প’ড়ে
আছে দেখছি।’

‘কী ?’

‘একটা বাক্স কুকুর। দেখছো না ?’

‘বাক্স কুকুর এই প্রথম দেখলে
নাকি তুমি ?’

‘না—আমি তাবছি—ভাণো, কী
হলয় !’

আমি নিচু হ’য়ে হুঁকে পড়লাম
রাস্তার উপর। একেবারে ছোঁচি একটা
কুকুর, সবোজর অগ্নেছে বনে হয়, দিন
শান্তকের বেশি বয়স হবে না, এখনো চার পায়ে দাঁড়াতে পারে না ভালো ক’রে, ভূশো-ভূশো পারের
হা, হুণটা দুটোতো, ল্যাংলি বেহের পকে একটু বেশি লম্বা। হঠাৎ দেখলে মন্ত একটা ইঁদুর ব’লে
তুল হয়। রাস্তার ধারের বাসের উপর বিয়ে ছোট্ট বেটে পা কেলেকেলে একটু-একটু হাঁটছে বেচারি।



আমি নিচু হ’য়ে হুঁকে পড়লাম রাস্তার উপর।

● একটা কুকুরহানা ও ছোট্ট হোসে
বুড়বেব বহ

লগা লগাটা অসহায়ভাবে প্রায় ষাট ছুঁয়ে আছে—একটু গিয়ে গেমে যাচ্ছে, উল্টে প'ড়ে যাচ্ছে, আবার একটুখানি গিয়ে হয় জিরিয়ে নিচ্ছে নয়তো আর চলতে পারছে না। আমাকে থামতে দেখে চকচকে করণ চোখ তুলে আমার দিকে তাকালো, নিশেনের মতো ল্যাঞ্জটি নাড়তে-নাড়তে কুইকুই আওয়াজ বের করলো গলা দিয়ে।

আমি ব'লে উঠলাম, 'কী হুম্মর !'

'হুম্মর-হুম্মর বলছো কেন বার বার ? আমি তো হুম্মর কিছু দেখছি না।'

'না, যানে—' একটু লজ্জিত হলাম আমি—'বেচার! বোধহয় পথ হারিয়েছে। বোধহয় গাভি করছে গুর। কোনো বাড়ি থেকে পালায়নি তো ? কারো পোখা ব'লে মনে হচ্ছে না তোমার ?'

'পোখা না হাতি ! স্ট্রিট-ডগ—চোক্ষ পুরুষের স্ট্রিট-ডগ। পথে-ঘাটে কত পাওয়া যায় ও-রকম ! চলো !' ব'লে বীরেন আমার কনুই দ'রে কাঁকানি দিলে।

কুকুর ছানাটি আবার আওয়াজ করলো, 'কু—কু—কু।'

আমি বললাম, 'ওর বোধহয় বিদে পেয়েছে।'

'ওর খাবার ঠিক ছুটে যাবে—শহরে আন্তাকুড়ের অভাব নেই।'

আমি একটু ভিত্ত গলায় বললাম, 'ওকে—ওকে ফেলে যাবে এখানে ?'

'ফেলে যাবে না তো কী ?' বীরেন হা-হা ক'রে হেসে উঠলো। 'আর ফেলে যাওয়া না বাওয়ার কথাই বা ওঠে কিলে ? তুমি তো ঐ কুস্তার ছাকে আনোনি এখানে, ওর অজ্ঞে কোনো-রকম দায়িত্বও নেই তোমার। কী, দাঁড়িয়ে আছো যে ? যাবে না ?'

ঐ ছোট, অসহায়, নির্বোধ জীবটির দিকে আবার তাকলাম আমি। আবছা আলোতেও তার কাণো আর করণ চোখ আমার চোখে পড়লো। যেন বেহের সবটুকু শক্তি প্রয়োগ ক'রে ব্যাকুলভাবে ল্যাঞ্ নাড়তে লাগলো সে, তারপর হঠাৎ সামনের পা ছুটি উঁচু ক'রে আমার পারের কাছে আক্রে-আক্রে আঁচড়াতে শুরু ক'রে বিলে। আমি তক্ষুনি নিচু হ'য়ে তাকে কোলে তুলে নিলাম।

বীরেন চৌচিরে উঠলো, 'করছো কী তুমি ?'

'ওকে নিয়ে বাই বাড়িতে।'

'বাড়ি নিয়ে যাবে ? ঐ নেড়ির বাচ্চাটাকে !' আবার হা-হা ক'রে হেসে উঠলো বীরেন।

'কী করবে নিয়ে গিয়ে ?'

'পুষবো।'

'পুষবে ? তা বেশ—তোমার বাড়ি, তোমার টাকা—আর আমি কী বলবো। কিন্তু পুষতে

● একটি কুকুরছানা ও ছটি ছেলে
বুড়বেশ বহু

হ'লে অন্তত একটা ভালো জাতের কুকুর-চান্না তো বেছে নিতে পারো। এই পাটের সাহেবরাই বেচে মাঝে-মাঝে, খোঁজে থাকলেই পাওয়া যায়।'

আমি কোনো জবাব দিলাম না কথার, নিঃশব্দে তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। আমার চারের তলার গরম একটা বলের মতো কঁকড়ে আছে কুকুর-চান্নাটি, তার নিখাসের ওঠা-পড়া অনুভব করছি আমি, ছোট্ট কপিলগুটি দপদপ করছে আমার বুকের কাছে। তারি ভালো লাগছিলো, কিন্তু বীরেনের কথা ভেবে খারাপও হ'য়ে যাচ্ছিলো মনটা : আমি তার সব কথাই মেনে নিই'তাম, আর স' কি আমার কিছুই মেনে নেবে না ?

পানিক পরে আমি বললাম, 'বীরেন, তুমি কি রাগ করছে' আমার উপর ?'

'না, রাগ করবে কেন ?'

'বাক্য' তো—' আমি জবাবদিহির স্বরে বলতে লাগলাম—'এখানে প'ড়ে থাকলে হয়তো 'প'ড় চাপ' প'ড়ে ম'রে যেতো বেচার।' কিংবা অন্ধকারে কেউ মাড়িয়ে দিগেই ওকে ঘেঁষে ফেলতো। একেবারেই বাচ্চা, এখনো ভালো ক'রে হাঁটতেও শেখেনি।'

'ওরা অত সহজে চাপা পড়ে না, বিনয়।' রাস্তার জম্মার, রাস্তাতেই বেঁচে থাকে—এমনি হাজার-হাজার রোজ জম্মাছে আর মরছে। তুমি বৈবাং এ-পথে এসেছিলে ব'লেই এটা প্রমাণ হয় না যে তোমাকে দিয়ে ওর দরকার ছিলো।'

'কিন্তু বৈবাং যখন এসেই পড়েছি, তখন পাশ কাটিয়ে চ'লে গাই কী ক'রে ?'

বীরেন একটু অসহিষ্ণুভাবে জবাব দিলো, 'ও একটা বাবুগিরি তোমার—তা ছাড়া' আর-কিছুই না। যে-দেশে মানুষের এত কষ্ট সে-দেশে কুকুর নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কি ভালো ? বললে ভালো শোনায় না—কিন্তু ঐ কুকুর-চান্না ম'রে গেলেই বা ক্ষতি ছিলো কী ? মানুষের অনেক কাজ আছে এই সংসারে—যারা সত্যি কোনো কাজ করে এসব ছোটোখাটো ব্যাপার নিয়ে নষ্ট করার মতো তাদের সময় থাকে না।'

বেশনি আগে অনেকবার হয়েছে, তেমননি এবারও বীরেনের কাছে তর্কে আমি চেয়ে শোলাম। আমার বুলাম যে বীরেনের তুলনার এখনো আমি অনেক কাঁচা, অনেক ছেলেমানুষ। কিন্তু আমার বুকের কাছে ঐ নিখাসিত পিণ্ডটি আমার লারা শরীরে শবের তাপ ছড়িয়ে দিলে।

বাড়িতে পা দিয়েই ডাক দিলাম—'মা, ঘাথো কী নিয়ে এসেছি।'

রাত ন-টা পর্যন্ত অথও উদ্ভেলনার কাটলো ঐ কুকুর নিয়ে। চখের মধ্যে গরম তাত চটকে-চটকে বা ওকে খাইয়ে দিলেন ; খাওয়ারাত্র এত সুতি হ'লো যে তুরতুর ক'রে হাঁটতে লাগলো লারা শরীরে, বেয়ালে ছায়া বেধে বুকে ঝাড়িয়ে কেঁউ-কেঁউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো, সুতির চোটে নিজেই

● একটি কুকুরচান্না ও ছটি ছেলে
বুকেবে বহ

চিৎপাত হ'য়ে উঠে যেতে লাগলো বার-বার, আর তিন ঘণ্টার মধ্যে অন্তত বার চারেক ঘর নোংরা ক'রে দিয়ে আন্নাঘের দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগলো যেন খুব তারিক করার মতো কিছু করেছে। আমি তখনই তার নাম বিলাম কুতুনী : কুতুনী, কুডোনি, কুতুন—এই ব'লে বার-বার ডেকে ডেকে তার দিল্লার প্রথম পর্ব শুরু ক'রে দিলাম—আর এমন হৃদ্বি ওর যে এক ঘণ্টা পরেই কুতুনী ব'লে ডাক দিলে ঠিক ছুটে চ'লে আসে। রাতে মা নিজেই বিছানার লেপের তলার শৌওয়ালেন ওকে, আর আমি ঘুমিয়ে পড়ার আগের হুহুর্ত পর্বত কুতুনীর কথাই ভাবলাম শুধু : আর-কিছুই মনে পড়লো না, বীরেনের কথাও না।

পরের দিন ঠিক নিয়মমতোই সব চললো। হুলে গেলাম, বিকেলে বীরেনের সঙ্গে বেড়ালাম, তাকে অনেক দূর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে বাড়ি ফিরে এলাম। কুতুনীর কথা বীরেনও কিছু লিগেস করলে না, আমিও কিছু বললাম না। কিন্তু বাড়ি ফিরেই যেতে উঠলাম কুতুনিকে নিয়ে।

তার পরের দিন সকালবেলাতেই বীরেনের গলা ধোনা গেলো—“বিনয়, বিনয়!”

সকালবেলায় সাধারণত সে আসে না; আমি ব্যস্ত হ'য়ে বেরিয়ে আসতে বারান্দাতেই তার সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

‘বিনয়, একটা থবর আছে, জরুরি থবর!’ খুব উত্তেজিত মনে হ'লো তাকে, তার গলার আগুয়ালে একটা অস্ত্র রকম উৎসাহ শুনলাম।

‘কী, কী ব্যাপার?’

‘ভাখো—এই ভাখো!’ ব'লে পকেট থেকে একটা হাণ্ডবিল বের করলে বীরেন।

‘কী-ওটা?’

‘আঃ—প'ড়েই ভাখো না!’

দেখলাম, একটা কুকুর-ছানা হারাবার বিজ্ঞাপন। একটা খাঁটি কক্স-টেরিয়ারের বাচ্চা হারিয়ে গেছে, তার গায়ের রং ধূসর, নাক চোখা, ল্যাঙ্গ একটু বেশি লম্বা। কেউ যদি কুড়িয়ে পেয়ে থাকেন দয়া ক'রে তিন নম্বর জুট মিলস এক্টেটে এ. টি. জোন্স-এর কুঠিতে ফিরিয়ে দেবেন। পকাশ টাকা পুরস্কার দেয়া হবে।

আমি কাগজটা প'ড়ে নিঃশব্দে বীরেনের হাতে ফিরিয়ে দিলাম।

‘তোমার কি মনে হয় যে পরণ্ড আন্না ঘে-বাচ্চাটিকে কুড়িয়ে পেলাম, এই নেই?’

আমার মনে হ'লো আমি যেন আঙে-আঙে ভূবে বাচ্চি। কীপথরে বললাম, ‘সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই!’

‘তাহ'লে—তুমি এখন কী করবে?’ এঁটু ক'থা বলতেই বীরেনের গলা কঁপে গেলো।

● একটা কুকুরছানা ও হুটী ছেলে

হৃদয়েশ বসু

‘কী আবার করবো। কিরিয়ে দেবো।’

‘কিরিয়ে দেবে? তবে তাকে—খাঁটি কক-টেরিয়ার, আমি কুহুর।’

আমি বললাম, ‘নিশ্চয়ই কিরিয়ে দেবো। এই একদিনেই আমাদের বেরকম যার প’ড়ে গেছে ওর উপর—’ বীরেনের মতো আমিও গোরবে বহুবচন ব্যবহার করলাম—‘জোন্স-সাহেবের সারা বাড়িতে কী বেন হলুতুল হচ্ছে এতক্ষণ ধ’রে!’

‘হ্যা, তা-ই—ঠিক বলেছো! এই হাণ্ডবিলে সারা শহর ভেরে দিচ্ছে। আমার বৈধাৎ চোখে পড়লো একটা ল্যাম্পোস্টের গারে—তুনি হিঁড়ে নিয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি।—তা’হ’লে কিরিয়েই দেবে?’

‘যার জিনিশ তাকে কিরিয়ে দেবো না? তুমি কী বলো?’

‘হ্যা, নিশ্চয়ই—নিশ্চয়ই—সে-বিবরে আর কথা কী। তা—ঐ—ঐ পু-পুরস্বারের টাকা?’

‘ছি! টাকা কেন নেবো?’

‘নিয়ে কোনো সংকর্ষে দান করতে পারো।’

‘আমার দাতা হবার কোনো ইচ্ছে নেই।’

হঠাৎ আমার হাত চেপে ধরলো বীরেন।—‘বিনয়, আমার একটা কথা রাখবে? আমাকে দিবে হাও কুহুর-ছানা, আমি জোন্স-সাহেবকে কিরিয়ে দিবে আসি। বলো, দেবে?’ তার চোখ দুটো ছুরির মতো চকচক ক’রে উঠলো, আমার হাতের মধ্যে কঁপে উঠলো তার হাত। কিন্তু আমি তার চোখের দিকে তাকাতেই সে চোখ নামিয়ে নিলে।

একটু চুপ ক’রে থেকে আমি বললাম, ‘বেশ, তা-ই হবে। এ-বেলাটা পাক, ফুলের পরে বিকেলে এসে নিয়ে যেরো।’

‘ঠিক? ঠিক যেবে? কথা দিচ্ছো?’

‘বললাম তো।’

সেদিন ফুলে বীরেনকে দেখলাম না, বিকেলেও অনেকক্ষণ তার পাতা নেই। আসছে না কেন—হঠাৎ অসুখ করলো নাকি—তার বাড়িতে একটা বোঁজ নিলে কেমন হয়—এই সব ভাবতে-ভাবতেই তাকে দেখতে পেলাম। তখন সন্ধ্য হ’তে আর বেশি নেই; নিশেখ হারার মতো আন্তে গোট দিয়ে ঢুকলো সে। অকস্মিক তার গায়ে থাকে পলওতার, আঁখ একটা হাইরতের আলোরানি জড়িয়েছে, হাতে ফুলছে যেতের একটা বড়ো ফুঁড়ি। আমার মন ভালো ছিলো না, বারান্দার সিঁকিতে চুপচাপ ব’লে ছিলাম, একটু দূরে বা একটা মোড়ার ব’লে—আর এই হু-অনের মধ্যে দুটে-দুটে খেলা করছে কুহুরি, নাকে-নাকে আমার পিঠে ঝাঁচড় দিচ্ছে—কিন্তু আমি তার দিকে বেশি তাকাছি না।

● একটা কুহুরানা ও দুটি ফুলে
ফুড়বে বহ

বীরেনকে দেখে আমি উঠে পাড়লাম। ‘আজ কুলে বাওনি, বীরেন?’

‘না, বেতে পারিনি। একটা অক্লান্ত কালে অস্ত আরগার বেতে হয়েছিলো। সেই অস্তেই আসতে দেরি হ’লো।’ হঠাৎ যেন একটু হাসির আভাস দেখতে পেলাম ওর ঠোঁটে। পরহুতেই আবার বললে, ‘তোমার পুত্র খামাপ লাগছে নিশ্চয়ই?’



‘কুন্নি নিয়ে যাবে?’

‘আর দেরি ক’রে লাভ কী। রাতও হ’রে এলো। তুমি কী বলো?’

‘না, দেরি ক’রে লাভ নেই। এখনই নিয়ে যাও।’

‘এই জাখো—নতুন একটা কুড়িও কিনেছি, ওর কোনো কষ্ট হবে না—আলোয়ানে জড়িয়ে দিখি কুলিয়ে নিয়ে যাবে। আ-তু-তু—উগি, পাপি, বাঃ, স্তম্ভ কুকুর! খাটি সস্ত-টেরিয়ান—এর ব্যাপারই আলাদা। এখনই কী রকম গলা হয়েছে—অ্যা?’ কুডুনিকে ছ-হাতে তুলে গারে হাত কুলিয়ে-কুলিয়ে আবার কমলো বীরেন, তারপর কুড়িটা এগিয়ে ধরলো ওর দিকে, নতুন কোনো খেলা ভেবে কুডুনি খাঁপিয়ে পড়লো তার মধ্যে। —‘তাহ’লে চলি।’ তখন কুড়িটা তুলে নিয়ে দ্রুত পায়ে বেগিয়ে গেলো বীরেন। বা-র আর আবার একটা বিষমতম সন্ধ্যা কাটলো সেদিন।

পরের দিন কুলে টিকিনের সময় বীরেন আমাকে সবিস্তারে সব জানালে। কুডুনিকে ঝোল-সাহেবের কুঠিতে কিরিয়ে বেরনি সে, রাহ-পুরের অমিয়ার-বাড়িতে বেচে দিয়েছে। অমিয়ার-

নতুন কোনো খেলা ভেবে কুডুনি খাঁপিয়ে পড়লো কুড়ির মধ্যে।

বাহু খুব কুকের লখ, তিনি ছ-শো টাকা দার দিয়েছেন—বা দিয়েছিলেন—হাতে-হাতে নগদ ছ-শো টাকা। অল্প কাছটি লহলে হয়নি, সকালবেলা ছ-বন্টা বাড়িয়ে থেকে থেকে আট-বশবন ধরোয়ান, চাকর, নারেশ, গোমতা, মোসাহেব প্রভৃতি পার হ’য়ে-হ’য়ে, তবে দেখা পেয়েছে রাহা-

● একটি কুকুরহানা ও ছোট ছেলে
বুড়োব বহ

বাবু, এবং সেই ঘোলাকাঠের পরেও নারেন-মশাইকে অনেকক্ষণ তৈলমর্দন করতে হয়েছে। তারপর নারেন-মশাই তাঁর নজর বাবদ পঁচিশ টাকা কেটে রাখলেন, চাকর দরোয়ানকে বকশিশ দিতে-দিতে আরো পাঁচ টাকা বেরিয়ে গেলো। নেট একশো সত্তর তার হাতে আছে—তার বাবার প্রায় চু-মাসের মাইনে—কিন্তু এই টাকাটা বাবাকে দেবে না সে, একটা আঁতুলিও দেবে না, স-শ'র চালাতে বাবার যত কষ্টই হোক সেটা বাবার ভাবনা, বাবার দায়িত্ব, তার কিছু না। টাকাটা বেমানম লুকিয়ে রাখবে সে—লুকিয়ে-লুকিয়ে বাবসা করবে এ দিয়ে—কী বাবসা, তাও সে ভেবে ফেলছে। কিন্তু এই টাকার আমারও কিছু আশ আছে বলে মনে করে সে—‘চাকার হোক আমার। চাকারই কুকুর-ছানাটি কুড়িয়ে পেরেছিলাম, তাই তুমি যদি চাও, বিনয়, অধিক টাকা একুনি তোমাকে দিয়ে দেবো—কোনো আপত্তি করবে না—আমি তো ইচ্ছে করলে পুরো বাপায়াটা লুকোতে পারতাম তোমার কাছে—কিন্তু দেখছে তো, লুকোলাম না—অত্নকে যারা একপ্রকার করে তাদের যেমন গণ্য করি আমি, তেমনি আমিও কড়িকে একপ্রকার করবে না কোনোদিন—এই আমার প্রতিজ্ঞা। তা, বিনয়—তুমি কিছু বলছো না?’

বলে বীরেন আমার মুখের দিকে তাকালো, কিন্তু আমি গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের করতে পারলাম না, তার মুখের দিকে তাকাতোও পারলাম না—আন্তে-আন্তে চলে এলাম সেগুন থেকে। কয়েক দিন পরেই অ্যান্ডেল পরীক্ষা হয়ে গেলো, পরীক্ষার পরে আমি অল্প মূলে ট্রান্সফার নিলাম, পরের বছর ম্যাট্রিক পাশ করে কলকাতার চলে এলাম কলেজে পড়তে। তার পরে বীরেনকে আর চোখে দেখিনি। ভাগ্যি পুণিবাঁটা বেশ বড়ো।

রাজানি গ্রন্থঃ বিদেং ততো ভাৰ্গা ততো ধনং ।
রাজতন্তি লোকত্বং ততো ভাৰ্গা ততো ধনং ।
রাজাতারত—হৃদিহিরে প্রতি ভীঃ



মণি ও মুক্তা

পরশবার রাজনীতি লব্ধে উপদেশ দিতে গিয়ে ভীম বলছেন, আগে রাজার আশ্রয়কে বেছে নিতে হয়, তারপর ভাৰ্গা আর ধন। রাজরক্ষণ না থাকলে ভাৰ্গা বা ধন কিছুই নিরাপত্তা থাকতে পারে না।



—অন্নদাশঙ্কর রায়

পায়রা ছিল চড়ুই ছিল জুটল এবার শালিক
আমরা কেবল ভাড়া যোগাই ওরাই বাড়ির মালিক ।

হরি, হরি, ওরাই বাড়ির মালিক ।

ওরা থাকে ঘুলঘুলিতে বেঁধে ওদের বাসা
ওপর থেকে ময়লা পড়ে এমন সর্বনাশা ।

হরি, এমন সর্বনাশা ।

কেউ বা করে বকম বকম কেউ বা কিচিমিচি
হৈ চৈ করছে কারা করছে মিহিমিহি ।

দিনের বেলায় টেচামেচি রাতে কিছু কম
রাত হুগুরে শুনে পাই ব-ক-ম ব-ক-ম ।

কখন ওদের ফোটে ডিম কখন গজায় ডানা
ঘরের মেজেয় হঠাৎ দেখি নতুন পাখির ছানা ।

দেব দেউল

৪৫

উড়তে সবে শিখছে কিনা, ফড়ফড়ানি সার
কেমন করে ফিরে যাবে মূলমূলিতে আর।
ওদিকে যে বেড়াল আছে চার চার শিকারী
আমার খাট আমার গদি ওরাই অধিকারী।
কেমন করে বাঁচাই হানা এ বড় সমস্তা
দোর জানালা বন্ধ করে ঢালাই তপস্তা।
টেবিলের পর চেয়ার পাতি চেয়ারের পর মোড়া
মোড়ার ওপর খাড়া হতে কাঁপে চরণ জোড়া।
মূলমূলিতে বাড়াই হাত পাখির কাছাকাছি
দেখি ওদের মায়ে ছায়ে কেমন নাচানাচি।



টলমলে সেই পিরামিডের চূড়ায় খাড়া আমি
পা হড়কে পড়ার ভয় সাধ্য নেই যে নামি।
আমি তো যাই বাঁচাতে, আমায় কে বাঁচায়?
বন্ধ ছয়ার, তাই তো আমার বন্ধু মেলা দায়।
টাল সামলে কোনো মতে বসি মোড়ার পরে
বাকীটুকুন শক্ত নয়, নামি চেয়ার ধরে।
ওদিকেতে হলো বেড়াল দিচ্ছে খালি হানা
চিড়িয়া তো গেল এখন কোথায় পাবে খানা।



সন্ত তুলসীদাস

(অপ্রকাশিত)

—অমুরুপা দেবী

—তুলসী ! ও তুলসী ! বাড়ি
আছে ? সদর-বাড়ি থেকে হাঁক
দেন পাড়ার পাঁচজন মাতব্বর।
তুলসীর সাড়া নেই ! তুলসীর স্ত্রী
রামাঘরে। রামাঘর থেকে তিনি
শুনলেন তাঁদের ডাক !...

স্বামী সে-ডাকে সাড়া দেন
না... ব্যাপার কি ? কোথাও
গেলেন নাকি ? না, ঘরেই
আছেন কোনো চিন্তায় বেহঁশ
হয়ে ?...

দেখতে হবে... দেখে স্বামীকে
হঁশ করিয়ে দেওয়া দরকার।

উমুনগোড়া থেকে তিনি উঠে ফিরে ঈড়ালেন... দরজার দিকে দু-পা এগুলেন।

—ওকি, কোথায় যাও ?

পিছনে রামাঘরের কোণ থেকে স্বামীকে হঠাৎ একথা বলতে শুনে স্ত্রী থমকে
ঈড়ালেন ; হেসে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি রামাঘরে এসে সৈঁধুলে কখন ? আমি
মোটাই টের পাইনি।

সে কথার জবাব না দিয়ে তুলসী শুধু বড় বড় চোখ মেলে স্ত্রীর পানে চেয়ে
রইলেন, তাঁর দু'চোখের দৃষ্টিতে যেমন তৃপ্তি, তেমনি কানুতি !

স্বামী কত ভালোবাসেন, ... স্ত্রী তার কত পরিচয় পান নিত। স্ত্রীর কোনো সাধ স্বামী অপরূপ রাখেন না। স্ত্রী আবদার তোলেন, রাগ করেন... কোনো কিছুতে স্বামীর বিরাগ নেই, বিরক্তি নেই!

আরো পাঁচটা বাড়িতে ছোটবড় নানা ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর কত বিবাদ-বিরোধ হয়—কত কলহ-খিটিমিটি—এ সংসারে তার কিছুমাত্র না। কখনো না! স্বামী অভিমান করতে জানেন না, রাগ করতে জানেন না। পাড়ার পাঁচজনে বলে, সোনার সংসার।

স্ত্রী বললেন—সদরে ওঁরা এসে ডাকছেন, যাও। শুনে এসো।

তুলসী বললেন—আমার ভালো লাগে না। কারো সঙ্গে আমি কেমন মিশতে পারি না।

স্ত্রী বললেন—না, ছি, যাও, পাঁচজনের সমাজে বাস করছো, তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চাই। রাখা উচিত।

তুলসী বললেন—কি হবে সম্পর্ক রেখে? পাঁচজনের পাঁচরকম মত, তাঁদের মনের সঙ্গে আমি যে মন মেলাতে পারি না।

দু'চোখের দুঃস্থিতে ভৎসনা করে স্ত্রী বললেন—না, আমি কোনো কথা শুনবো না। তোমাকে যেতেই হবে। শুনে এসো, ওঁরা কেন এসেছেন। লোকে নিন্দা করবে—বলবে, দিনরাত শুধু ঘরে বসে থাকে। এতে আমার কতখানি লজ্জা হয়, বলো দিকিনি... আমি যে পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে পারি না! না যাও, সাড়া দাও, শুনে এসো, ওঁরা কি বলেন, কেন ডাকছেন।

একান্ত অনিচ্ছাতেও উঠে যেতে হলো তুলসীকে। ফিরে এলেন একটু পরেই—অত্যন্ত বিরক্তভাবে। কাল একটা সালিসি আছে গাঁয়ে। কোনো দলাদলির ভিতর থাকেন না বলে তুলসীকেই দুই পক্ষ সালিস মেনেছে।

মোড়লরা এসে সেই খবর দিয়ে গেলেন। তার কোনো আপত্তিই কানে তোলেননি। দশজনে যা চাইছে, তুলসীকে তা করতেই হবে।

স্ত্রী বললেন—ঠিক কথাই বলেছেন ওঁরা।

পরের দিন সালিসি করতে যেতেই হলো তুলসীকে।

গ্রহের কের। তুলসীও বেরিয়েছেন, তাঁর খুশুরবাড়ি থেকে লোক এলো শুকুনি। খবর ধারাপ। সেখানে স্ত্রীর ভাইয়ের খুব শক্ত অহুধ। ভাইকে যদি দেখতে চায়, তাহলে তুলসীর স্ত্রীকে এখনই যেতে হয়।

ভাইকে যদি দেখতে চায়! একবার পর কি আর একদণ্ড অপেক্ষা করা চলে? তিনি শুধুমাত্রই বেরিয়ে পড়লেন—স্বামী বাড়ি নেই—তাকে জানিয়ে, অনুমতি আনিয়ে যদি যেতে হয়, তাহলে দেরি হয়ে যাবে অনেকটা। ভাইয়ের বেরকম অবস্থা, তাতে দেরি করাও চলে না কিন্তু। অনেক ভেবে তুলসীর স্ত্রী ভাই বেরিয়ে পড়লেন। চাকর-দাসীদের বলে গেলেন—স্বামী ঘরে এলে তাঁকে যেন সব বুঝিয়ে বলে তারা।

আর একটা চিন্তাও ছিল ত্রাঙ্কণীর মনে—স্বামীকে জানিয়ে যেতে হলে বাওয়াই হবে না হয়তো! বিবাহের পর কয়েকটা বৎসর কেটে গিয়েছে। একটি দিনের জন্ত স্বামী তাঁকে একা কোথাও যেতে দেন না। বাপের বাড়ি হোক, গঙ্গাস্নানে হোক, নিজে সব সময়ে সঙ্গে গিয়েছেন, এক-পলকের জন্তও ত্রীকে স্বামী চোখের আড় করতে চান না।

কিন্তু আজ? স্বামী গিয়েছেন গায়ে পাঁচজনের কাজে—ফিরতে কত দেরি হবে, কে জানে! এমনও হতে পারে যে সালিসির কাজ আজ শেষ হলো না, কাল পর্যন্ত তার জের চলবে! এ অবস্থায় স্বামী তাঁর সঙ্গে যাবেন কেমন করে? একথা শুনলে সঙ্গেই তিনি যাবেন, সালিসির কাজ ফেলে রেখে। তাহলে সে কি দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে, এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই তুলসীর স্ত্রী একা চলে গেলেন তুলসীকে না বলেই।

ভাইয়ের খুব শক্ত অনুধ! যেতে যেতে তিনি ভগবানকে ডাকছেন—‘হে ঠাকুর! গিয়ে যেন ভাইকে ভালো দেখতে পাই!’

এরিকে তুলসী—

তুলসীর মনটা একদম বিগড়ে রয়েছে। সকালে ছুটি অন্ন কোনোমতে গলা দিয়ে নাখিয়ে তাঁকে এসে বসতে হয়েছে এই সালিসিতে। এতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। এসব কামেলায় তিনি যেতে চান না। ভবু গায়ের লোক কেন যে তাঁকে টেনে নিয়ে আসে এর ভিতর, তিনি বুঝতে পারেন না। থেকে থেকে বাড়ির কথা মনে হয়। একটানা এতজন ত্রাঙ্কণীকে ছেড়ে এর আগে তিনি কখনো থাকেননি। আজ এই সালিসির পান্নায় পড়ে থাকতে হচ্ছে। ‘দূর ছাই সালিসি’—হঠাৎ তিনি করাশ ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন,—‘বেলা বেলা, আজ এই পর্যন্ত থাক। আমার স্ত্রীকে মাথা ধরেছে।’

কারও কাকুতি-মিনতি কানে তুললেন না তুলসী, ছুটে চলে এলেন ঘরে। দোর গোড়া থেকেই আঁকুল ঘরে ডাকলেন,—‘ত্রাঙ্কণী!’

জবাব নেই।

শ্রদ্ধা তুলসীমাণ
অবস্থায় যেন



তুলসী শুধু বললেন—“তুনি—তুনি—চলে এলে!”

[পৃষ্ঠা—৫০]

এ কেমন ধারা? সারাদিন বাইরে কাটিয়ে তুলসী ঘরে এলেন, ডাকলেন, ব্রাহ্মণীরা সাড়া নেই? বুকটা দুকদুক কেঁপে উঠলো। অস্থির করেনি তো তাঁর?

ছুটে শোবার ঘরে গেলেন তুলসী, তারপর রান্নাঘরে, তাঁড়ারে, সর্বত্র—কোথাও শ্রীকে পেলেন না।

“রমাইয়ের মা! ও রমাইয়ের মা”—বুড়ী দাসীকে ডাকতে লাগলেন তুলসী। গলা দিয়ে স্বর যেন বেরুতে চায় না! দারুণ আতঙ্ক তাঁর মনে। কী জানি, রমাইয়ের মা এখনই এসে হয়ত কী ভয়ানক অমঙ্গলের কথাই বা তাঁকে শুনিয়ে দেয়! ব্রাহ্মণী বেঁচে আছেন তো? সাপে কামড়ে মেরে ফেললো না তো হঠাৎ?

কিংবা রাঁধতে গিয়ে কাপড়ে আগুন লেগে—? না হলে তিনি সাড়া পান না কেন?

রমাইয়ের মা জলের খটি গামছা নিয়ে এলো আন্তে আন্তে। জলচৌকির সামনে রাখতে রাখতে সে বললে—“মায়ের যেতে মোটেই ইচ্ছে ছিল না বাবা, কিন্তু ভাইয়ের অমন অস্থিরের কথা শুনলে কোন্ মেয়ে না গিয়ে পারে, বলো?”

যেতে ইচ্ছে ছিল না! কোথায় যেতে? রমাইয়ের মা কী বে ব'লে চলেছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তার কোনো অর্থই চুকলো না তুলসীর মাথায়!

তারপর যখন তা চুকলো—তিনি জানলেন সব—পড়ে রইলো খটিভরা জল আর পাট-করা গামছা; যেমন ছিলেন, তেমনই ছুটে বেরিয়ে গেলেন তুলসী। আগে কখনো পাল্কি ছাড়া তুলসী খন্তরবাড়ি বাননি। আজ পাল্কির কথা মনেও হলো না। সারা দিনের ঘামে ভেজা জামাটা তখনো গায়েই ছিল, নাগরাটা দোর-গোড়ায় খুলে রেখেছিলেন—দোড়ে বেরুবার সময় সেটাকে ভিঙ্গিয়ে বেরিয়ে গেলেন, সে জোড়া পায়ে গলিমে নেবার কথা মনেও হলো না তুলসীর!

রাত তখন পড়ীর।

যোগী একটু ভালো আছে সেধে বাড়ির বেশীর ভাগ লোক আজ একবার বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছে। দু'একজন ভেগে আছে যোগীর পাশে। তুলসীর শ্রীও আছেন।

নিশ্চয় শুকুতা চারিদিকে। কেউ যেন লাক্ষিরে নামলো পাঁচিল থেকে। হঠাৎ কী-একটা ভারি জিনিস পড়লো যেন উঠানে। ডাকাত না হয়ে বায় না!

তুলসীর শ্রীই চোঁচিয়ে ডাকলেন যুগন্ত লোকদের। “ডাকাত! ডাকাত! ওঠো সবাই!”

দেব দেউল

উঠে সবাই দেখে—উঠানে একটা মানুষ লম্বা হয়ে পড়ে আছে। লাক দিয়ে নামতে গিয়ে চোট ধরেছে বোধ হয়! উঠতে পারছে না তাই!

এই তো হুযোগ! এলোপাখাড়ি লাঠি পড়তে লাগলো তুলসীর পিঠে।



লোকেরা তিন হাত পিছিয়ে গেল।

ভালোবাসতে পারতে, তাহলে কত আনন্দ, কত তৃপ্তি তুমি পেতে! তোমার জীবন ধন্য হ'তো, সার্থক হ'তো।

তুলসীর বেন চমক ভাঙলো। জ্ঞানহীনা জীলোকের মুখে এ কি ইঙ্গিত! এ কি নির্দেশ! ভগবান! আনন্দ! তৃপ্তি! জীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে।

● নত তুলসীবাস
অহরপা দেবী

অর্জুনাদ ক'রে তুলসী পাশ ফিরলেন—তখন তাঁর মুখ দেখতে পেয়ে বাড়ির লোকেরা চমকে লাফিয়ে পিছিয়ে গেল তিন হাত! আর তুলসীর স্ত্রী?

সে-বেচারী হাহাকার ক'রে কঁদে গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন তুলসীর পায়ের উপরে!

জল! জল! পাখা!—চারিদিকে ভিড়!

তুলসীর স্ত্রী কেবল বলেন—“তোমরা সরে যাও! আমি ওঁকে হুঁহ ক'রে তুলছি!”

তুলসীর মুখে যখন কথা ফুটলো, ব্রাহ্মণীর দিকে তাকিয়ে তিনি শুধু বললেন—“তুমি—তুমি—চলে এলে!”

স্ত্রীর চোখে জল বরছে অঝোরধারে। কঁদতে কঁদতে স্ত্রী বললেন—আমি তোমার স্ত্রী—সামান্য মানুষ—এই তুচ্ছ মানুষকে এত ভালোবাসো! ভগবানকে যদি তুমি এমন

সারা বাড়ি আবার নিশুম নিশুম হয়ে এলো। জামাইয়ের যোগ্য বিধানায় শুয়ে আছেন তুলসী—সেবা করতে করতে স্ত্রী তাঁর পায়ের তলাতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তুলসী এইবার উঠলেন।

তোমার জীবন ধন্য হবে, সার্থক হবে!—
 স্ত্রীর এই কথা কটি তাঁর কানে বাজে সারাক্ষণ!
 ঘর-সংসার, বিষয়-বিভব—স্ত্রী……তুলসীর মনে
 হয়, সব তুচ্ছ! নিঃশব্দে
 তিনি দরজা খুলে বাড়ি থেকে
 বেরিয়ে পড়েন।

বেরিয়ে তিনি যান
 নি জের গায়ে র
 দিকে নয়—পৃথিবীর
 বিশাল বুকে...
 লক্ষ্যহীন গতি...
 নিরুদ্ধেশের পথে!

ভালোবাসতে
 তিনি জানেন—
 এই ভালোবাসার
 মোড় ঘুরিয়ে দিতে
 হবে... কিন্তু কে
 সে যে ঘুরিয়ে?
 ভগবানই দেবেন!
 স্ত্রীর মূখ দিয়ে
 ভগবানই এই ইঙ্গিত
 দিয়েছেন!



তুলসীদাস—বার রামায়ণ ভক্তিতরে পাঠ করে
 কোটি-কোটি নরনারী।

কত তীর্থ! কত গুরু! কত বৎসরের নিভৃত সাধনা! ভালোবাসা মোড় ঘুরে
 দুবার শ্রোতে ভগবানের প্রেমসমুদ্রে বিশলো গিয়ে। ভারতের গগনে উদয় হলেন সন্ত
 তুলসীদাস—বার বৌহার হুন্দে হুন্দে অমৃত বরে পড়ে—বার রামায়ণ আজও ভক্তি-
 ভরে পাঠ করে ভারতের কোটি-কোটি নরনারী।

ଫଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ମତା

—ପରବ୍ରାତ୍

ଠାନ୍ଦର ଭୟ ହେବ,
ମାରାଜକାରୀ ଉଦ୍ଗୋଳ,
ଆସୁ ଶୈଳୀ କାଳି ମବ ଅବହୁତ
ସଦାମାୟୀ ଗର୍ଜନର କାଢ଼ି କରେ ରାତ ॥
ମୂର୍ଧ୍ନାକ ନୟନୀ,
ଏହି ଦେବତାଟି ମହା ଧୈର୍ଯ୍ୟଦାର,
ଚୌପର ରାତ ଦେଖା ନେଇ ଯୋଡ଼ି,
ଦିନର ବେଳା ଶୁଣ ଦେଖାତ ଓଡ଼ି,
ସଦନ ତାର କିଛି ନରକାର ନେଇ—
ଆରେ, ଆମେ ତୋ ଓରଦିନ ଥାକେ ॥
ତବ ଲୋକ ମୂର୍ଧ୍ନାକ କେନ ଚାନ୍ତି ?
କବିରା ବାଣେ ବାଢ଼ି—କୋମଳା
ହୁଏ କୋଡ଼ି, ମଣ୍ଡଳ ବସ, ହେନ ହସ ତେନ ହସ,
କିନ୍ତୁ କାହିଁ ହେଲେ କୌଣସି କି ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଉଦୟ ?
ଆମେକ, ଘୁଞ୍ଚି ଆମ କୌଣସି ଚନ୍ଦ୍ର,
ଏମେ ଉଦୟାନ୍ତା କି ଠାନ୍ଦର କହ ?
ଆଜେ ନା । ଆମାର ଜ୍ଞାନ ଆଜେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ,
ଏବେ ଜ୍ଞାନ ଚାହିଁ କାନ୍ଦୁକା ଗୋପୁର ।
ମୂର୍ଧ୍ନାକ ମୂର୍ଧ୍ନାକ କାରଣେ ମହାୟୁ ଏହି;
ବିଦାତାର ରାଜା ଅନର୍ଥକ କିଛି ନେଇ ॥
ଏବେ ମାତ୍ର ଠାନ୍ଦର ଭୟ, ମୂର୍ଧ୍ନାକ ଭୟ,
ମୂର୍ଧ୍ନାକ ପ୍ରକଟାତ ବ୍ୟବସାର ନୟ ॥



শ্রেয়শ্চক্রে মিত্র

আপনাকে চুরি!—প্রায় হেলেডারিই করে কেলেঙ্কিয়ায় বেটাপ কণাটার সঙ্গে কাপি
চাপতে গিয়ে বিধম ধেরে। ভাড়াভাড়া লামলে বললাম,—এত বড় সাহস!

ঘনাশা ঠাণ্ডা হয়ে রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সাহস নয় দার!

ব্যাপারটা যে বাহাতর নয় বনমালী নয়র লেনের তা বলাই বাহুল্য, কিন্তু গোড়া থেকে
তরু করাই নিশ্চয় উচিত।

কমিটা বাখার এসেছিল গৌরের। আমরা লবাই সেটার বোগান দিয়েছি মাত্র।

কিন্তু পেনে নিজেদের কীয়ে নিজেই পড়ে লক্ষ হ'ব কে জানিত!

সব দিক বেধে-ছেদেই ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু কোথায় যে রিতটুকু ছিল আগে ধরতে
পারিনি।

দেব দেউল

শিবু দ্বাৰী কাৰ্ডটা ছাপিয়ে এনেছে, তার আগে ঘনাধার বিবানিত্রার সুযোগে আমরা ক'জনে মিলে চিঠিটার ভাষার খসড়া করেছি অনেক মাথা ঘামিয়ে।

সুবিধে ছিল এই যে সে সময়ে বিজ্ঞান কংগ্রেস হচ্ছে কলকাতাতেই। দেশ-বিদেশের বড় বড় সব বিজ্ঞানের রণী মগরদোরা এসেছেন এই শহরে। যেন তাঁদেরই একজনের নাম দিয়ে কাৰ্ডটা ছাপান। ভূগোলবিদ্যার নামকরা মানচিত্রকার মসিয়ে সুস্তেল যেন পৃথিবীর অজ্ঞাত দুৰ্গমতম স্থানের অধিতীয় আবিষ্কারক ও পূর্ণটক ঘনশ্রাম দাস এই কলকাতা শহরেই সশরীরে উপস্থিত এই আশাতীত খবর পেয়ে আশ্চর্যে গদগদ হয়ে তাঁকে বিজ্ঞান কংগ্রেসের এক বিশেষ ভূগোল-বৈঠকে উপস্থিত দেশ-বিদেশের স্ত্রীমণ্ডলীকে তাঁর ভাষণ শুনিতে কৃতার্থ করার জন্তে বিনীত অহুরোধ আনিয়েছেন। কবে ও কখন তিনি স্বয়ং গাড়ি নিয়ে ঘনশ্রাম দাসকে নিতে আসবেন তাও এ অহুরোধের চিঠিতে জানানো আছে।

আগে পাকতে মংলা দিয়ে যেমন যেমন ঠিক করে রাখা গিয়েছিল ঠিক সেইমতই প্রথম অভিনয় সবাই করেছে। বসবার ঘরের মার্কাযারা আরাম-কোণার ঘনাদা এসে গা এলিয়ে বসবামাত্র শিশির বখারীতি তার সিগারেটের টিন সামনে খুলে ধরেছে। আমি লাইটার ছেলে সিগারেট ধরিয়ে দিয়েছি সঙ্গরমে। ঘনাদা প্রথম টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে শিশিরের ঝিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করেছেন,—কত চ'ল?

বেশী নয়, এই চার হাজার দু'শ' একুশ মাত্র!—শিশির আনিয়েছে সংকুচিতভাবে।

একুশ কেন হবে, উনিশ না?—ঘনাধার ক্রা কুক্ষিত হতে না হতে শিশির তাড়াতাড়ি পকেট থেকে নোটবই বার করে খুলে দেখে লজ্জার জ্বিত কেটেছে।—হ্যাঁ হ্যাঁ উনিশ-ই তো!

ঘনাদা লম্বট হয়ে আর একটি টান দিয়ে চোখ দু'টি প্রায় নিমীলিত করার পরই আমি আনন্দে বেন কণাটা চাপতে না পেরে বলেছি,—আমরা কিন্তু সবাই গুনতে যাচ্ছি সেদিন ঘনাদা!

সবাই গুনতে যাচ্ছি!—ঘনাদা চোখ খুলে তাকিয়েছেন!—কি গুনতে?

বা: আগনার বকুতা!—আমি বেন ঘনাধার বিশ্বতিতে অবাক হয়েছি।

ঘনাদা হতভুট করার আগেই শিশির সোৎসাহে বলে উঠেছে,—একবারে ভোরবেলা থেকে 'কিউ' হিতে হবে কিন্তু। নইলে আরগা মিলবে না।

ভোরবেলা থেকে কি!—শিবু শিশিরকে ধমকেছে,—আগের রাত্তির থেকে বল! মোহন-বাগান ইস্টবেবলের দীড়, কাইন্ডাল হার মেনে বাবে দেখিস্। সায়েল কংগ্রেসে একই! হাঝাহাঝা না হয়ে বায় না!

ঘন ঘন সিগারেট টান! আর চোখ-মুখের ভাব দেখেই ঘনাধার অবস্থাটা বুঝতে

● শিশি

প্রবেশ বিজ্ঞ

পায়া গেছে তখন। নেহাত মানের ব্যয়েই লোভানুজি রহস্তটা সবকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারছেন না।

শেষ পর্যন্ত ঐযে ধরতে আর পারেননি। বখানস্বয় গম্ভীর হয়ে নিজের চাল বজায় রেখে একটু ঘুরিয়ে বলেছেন,—সারেন্স কংগেসে আমি বক্তৃতা বিচ্ছিন্ন, তোমরা আনলে কোথা থেকে ?

কোথা থেকে আনলাম!—আমরা সমন্বয়ে নিজাদের বিশ্বয় প্রকাশ করেছি।

শিশু বিশদ ব্যাখ্যার ভার নিয়েছে,—শহরে কে না জানে! তবে মঁসিয়ে স্তম্ভেল নিজে সব অংগোজন করেছেন আর নিজেই যে তিনি আসছেন আপনাকে নিয়ে যেতে এটা অবগত সবাই জানে না।

ঘনাদার সুখে আশাত্মকপ আশঙ্কার ছায়া দেখে আমরা উৎসাহিত হয়ে উঠছি।

ঘনাদা অবশিষ্টা বিরক্তির ছলে প্রকাশ করেছেন,—ওঁ: মঁসিয়ে স্তম্ভেল বলে তো আমার গুরুত্বকর নয়! তিনি এসে পরলেই আমার যেতে হবে! সারেন্স কংগেসে বক্তৃতা দেবার জেগে আমি হেঁদিয়ে মরছি না কি ?

কি যে হলেন ঘনাদা!—শিশুর সমস্ত সারেন্স কংগেসের হয়ে যেন ঘনাদার রাগ ভাঙাবার তেজে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে,—আপনি হেঁদিয়ে মরবেন কি, হেঁদিয়ে মরছে তো তারা! এ যে কত বড় সৌভাগ্য তা কি তারা জানে না। নইলে মঁসিয়ে স্তম্ভেল নিজে বাড়ি হয়ে এসে আপনাকে নিম্নগণের চিঠি দিয়ে যান!

নিম্নগণের চিঠি! কি চিঠি?—ঘনাদা সত্যিই আকাশ থেকে পড়েছেন।

আমরাও একেবারে যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি,—সে কি! নিম্নগণের চিঠি আপনি দেখেননি? আপনি তখন বিকেলে লোক-এ বেড়াতে গেছেন। মঁসিয়ে স্তম্ভেল কত খোজ করে এসে কতক্ষণ বসে রইলেন, তারপর আমাদের কাছে চিঠিটা দিয়ে দেখা না হওয়ার জেগে কত চুপু করে গেলেন। বার বার করে বলে গেলেন যে আপনাকে নিতে তিনি নিজেই পরন্ত মানে শনিবার বিকেল চারটেতে আসছেন! সে চিঠি—সে চিঠি, হ্যাঁ গোরই তো চিঠিটা রাখলে আপনাকে দেখার জেগে!

আমরা যেন রেগে আশ্রয় হয়ে বারান্দার বেয়িমে এসে গোরের নাম ধরে ডাকাডাকি শুরু করেছি তারপর। গোরও শব্দব্যত্ন হয়ে ঘর থেকে বেয়িমে এসে বিরক্তির ভান করেছে,—কি ব্যাপার কি! হঠাৎ এত টোকায়েচি কিসের!

টোকায়েচি কিসের!—আমরা গোরকে গালাগাল দিতে আর বাকি রাখিনি—আত্মশক, অকর্ম্মার থাকি কোথাকার! কলকাতা শহরের সুখে চুন কালি দিয়ে সারেন্স কংগেসকে তুমি ডোবাতে বসেছ! মঁসিয়ে স্তম্ভেলের সে চিঠি তুমি ঘনাদাকে দাওনি!

গৌর লজ্জার ঘন মাটিতে মিশিয়ে গিয়ে হাতে হাতে ঘরা পড়া চোরের মত মুখ কাঁচু-কাঁচু করে ঘর থেকে কার্ডটি এনে ভরে ভরে ঘনাদার হাতে দিয়ে বলেছে—মাপ করবেন ঘনাদা! একেবারে মনে ছিল না।

তাচ্ছিল্যভাবে কার্ডটা ধরলেও ঘনাদার চোখ বেঁধে বোকা গেছে কি মনোযোগ দিয়ে কার্ডটা তিনি পড়েছেন।

কার্ডে কোন বুঁত যে নেই তা আশ্বাসের জন্য, ঘনাদাও নিশ্চয় ধরতে পারেননি।

ভেতরে বাই হোক বাইরে ঠাট বজার রেখে একটু অবজ্ঞার হুঁরে বলেছেন—হুস্তেল! পাঁড়াও পাঁড়াও, কোন্ হুস্তেল ঠিক মনে পড়ছে না!

বাঃ—মিসির হুস্তেলকে মনে পড়ছে না!—শিশির ঘনাদার দ্ব্যতিশক্তিকে একটু উল্টে দেবার চেষ্টা করেছে—সেই বিখ্যাত কার্টোগ্রাফার, মানে মানচিত্রের ব্যাপারে ছনিয়ার ঝাঁর জুড়ি নেই বললেই হয়।

হাঁঃ—সংক্ষিপ্ত একটা ধ্বনিতে যা বোকাবার হুকিরে ঘনাদা ঘর থেকে উঠে গেছেন।

তারপর শনিবার দিন সকাল থেকেই আমরা সজাগ। আধা নর, সে শনিবার কিসের ঘন একটা পুরো ছুটি ছিল। তপুয়ের খাওয়া বাওয়া পর্যন্ত কিছু যে হবে না তা জানতাম। কারণ ছুটির দিন বলে সকালে বাজারটা একটু ভালোবাস্তব করা হয়েছে। মাছের থলের বড় বড় গলদা চিংড়িগুলো ঘনাদাকে কান্দা করে বেঁধিয়ে রাখতে ভুলিনি।

বেলা একটা নাগাদ ভূরিভোজ শেষ হবার পরই আশ্বাসের সজাগ থাকার সময়।

এবারের সজাগ থাকা একটু অবশ্র জ্বালা ধরনের। ঘনাদা পাছে পালিয়ে যান সেই ভয়ে পাহারা দেওয়া নয়, তিনি কোন্ কীকে কিভাবে যেস থেকে সরে পড়েন, নিজেরা গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ভাই বেঁধে মজা করা।

তপুয়ের খাওয়ার সময়ই আমি তৈরি করে রাখা হয়েছে। তরপেট খেয়ে আশ্বাসের সবলেরই বেশ বুর চোখের পাতা জুড়ে আসছে। ছুটির দিন বলে সেদিন আর ভাই খেলাছুকো আজ্ঞা নয়, যে বাস বিহানার পড়ে বুঝ—এই কথাটাই জানিয়ে রেখেছি।

কিন্তু বিহানার কতকগুলি ঘটনা ঘেরে গুরে থাকা বাস! একটার পর ছোটো দাঁজল। ছোটোর পর তিনটে। ঘনাদা এখানে করছেন কি! ঘরের দরজা জানলা বন্ধ। কান খাড়া করে আছি ঘনাদার পায়ের শব্দে শুভে। পালা করে জানলার খড়খড়ির কীক দিয়ে তেতাদা থেকে দাঁড়বার শিঁড়িটার ওপর চোখ রাখছি, কিন্তু ঘনাদার কোন সাড়াশব্দই নেই।

● শিশি

প্রবেশ বিহ

তিনটের পর চারটে বাজল। ঘনাধা কি সত্যিই ছাফ ডিভিরে গালালেন! কিন্তু সেদিকেও তো আধাঘের রামতুলকে পাহারার রেখেছি, ঘনাধার সে রকম কোন চেষ্টা দেখলেই নিচে থেকে 'রাধা হো' বলে গান ধরবে। তাহলে? ঘনাধা কি সত্যিই অন্তর্ধানময় গোছের কিছু আনেন না কি!

ঘনাধার ঘরের দিকেই একবার খোঁজ করে আসিব কিনা তাবছি এমন সময়ে লগ্নকে তাঁর ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর তেতলার সিঁড়ির ওপর থেকে তাঁর পাড়া-কাঁপানো ডাক—কই হে! লব গেলে কোথায়! দিনের বেলা আর কত সুমোবে!

এ ওর মুখের দিকে তাকালাম ফাল ফাল করে। শেষে ঘনাধাই আধাঘের খুঁজছেন নিজে থেকে!

ঘনাধার ডাক না শুনে উঠার কি! গুটি গুটি একে একে ভিজে বেড়ালের মত তাঁর তেতলার ঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

শিবু ওরই মধ্যে একটু নিজেদের মুখরক্ষার চেষ্টা করে বললে,—আপনি এখনো তৈরী হননি ঘনাধা! চারটের সময়ে না আপনাকে নিয়ে যাবার কথা!

নিজের আধময়লা ফুটরা আর হুঁটিটার দিকে একবার চেয়ে বিছানার মাঝখানিতে উঠে বসে ঘনাধা অস্থূল মুখভঙ্গি করে বললেন,—আর কি তৈরী হব! কেন এই সাজে যাওয়া বাবে না?

বাধ্য হয়ে এ বিদ্রূপও হজম করতে হল। শিবু আর একবার ছাফ! সেজে যান ঝাঁড়াবার চেষ্টা করলে,—সিঁপের স্ত্রুতল-এর না আসিটি কিছু আশ্চর্য!

ঘনাধা একটু হাসলেন এবার। অবজ্ঞাতরে বললেন,—স্ত্রুতল যে আসবে না আমি জানতাম!

আপনি জানতেন,—বেশ সরস হয়েই আমরা ঘনাধার দিকে তাকালাম। কিন্তু যা তর করছিলাম ঘনাধা সেদিক দিগে গেলেন না। শিশিরের দিকে তখনী ও মধ্য আঙুল ঝাঁক করে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে অহুকস্পার স্তরে বললেন,—হ্যাঁ জানতাম। আমি ছিলাম না। কেনেই সেদিন এসেছিল, নইলে আমার সামনে এসে ঝাঁড়াবার ওর সাহস নেই।

পরম স্বস্তির নিশাস কেলে সাগ্রহে এবার উছানি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—কেন বলুন তে? এমন পৃথিবীজোড়া নাম, অন্তবদ্ধ কাটোগ্রাফার।

হঁঃ, কাটোগ্রাফার! ঘনাধা নাসিকাঞ্জন করলেন।

শিশির তৈরী হয়েই এসেছিল। ততকণে ঘনাধার আঙুলের ঝাঁক বখারীতি সিঁপারেট পশিরে দিয়ে বেশলাইয়ের কাঠি জেলে কেলেছে।

ঘনাদা প্রথম টানটি দিয়ে খানিক চূপ করে থেকে ধোঁরা ছাড়লেন। আমরা চাতকের মত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। ঘনাদার শ্রীহৃৎ থেকে কি শুধু ধোঁরাই বেরুবে ?

দৈর্ঘ্য ধরতে না পেরে শিবু একটু কাঁকুনি দেবার চেষ্টা করলে,—সত্যি কাটোগ্রাফার নয় বুঝি ? আল ?

আল হবে কেন !—ঘনাদা মুহূৰ্ত্ত ধমক দিলেন,—আসল কাটোগ্রাফারই বটে। কিন্তু তাতে হয়েছে কি ? নাম-ই গালভরা, আসলে অরিপথারের জেঠা ছাড়া তো কিছু নয়। বনজঙ্গল পাহাড়-পর্বতেরই পথের সাথে। জানে কি 'গোচর অ্যাবিস্তাল প্লে-ন' কোথায় আর কতখানি, মেপেছে কখনো 'মুইর' কি 'নেটো লি-মাইন্ট' কত উঁচু ?

অভিকৃতির মত বললাম,—মজলগ্রাহের ভূগোলে আছে বুঝি ? নামও তো কখনো শুনিনি !

ঘনাদা অম্লকম্পার হাসি হাসলেন,—তোমাদের ওই স্তন্তেলই কি জানত ! ডোবার পুঁটি হয়ে গেছল সবুজের তিমির সঙ্গে ফটকমি করতে ! ওই একটি শিশিতেই বাচ্চাধন কুপোকাত।

অন্তঃপোশের ওপর থেকেই হাত বাড়িয়ে পেছনের শেলুক থেকে যে শিশিটা তুলে ঘনাদা আমাদের এবার দেখালেন 'তাতে আমরা-ও গ'।

ওই শিশি ! ওটা হোমিওপ্যাথিক ওষুধের না ?

শিবুর অসাবধান মুখ এক মুহূৰ্ত্তের অন্তে কসকে গিয়ে প্রায় ঘাটে এসে ভরাডুবি হয়েছিল আর কি !

হোমিওপ্যাথিক !—ঘনাদা প্রায় ফেটে পড়ছিলেন, শিবুই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে বললে,—মানে প্রায় সেইরকম দেখতে কিনা। বোকা লোকেরা তফাত ধরতেই পারবে না।

ঘনাদা বগা নামালেন, একটু অবজ্ঞাভরে হেসে বললেন,—তোমাদের ওই স্তন্তেলও পারেনি। সাত সাগর খুঁজে নারবরো বীপে আবার চুরি করতে আসবার সময় এ অন্ততঃ জানত না, যে এই বিশির মধ্যে তাদের পরমার্ লুকোন থাকবে !

আপনাকে চুরি !—হাসি চাপতে গিয়ে বিবম বেয়ে প্রায় যাই আর কি ! অভিকষ্টে সেটা সামলে ও কলেঙ্কারি বাঁচিয়ে বললাম,—এত বড় সাহস !

সাহস নয় বাহ !—ঘনাদার মুখে রহস্তময় হাসি দেখা গেল। আমাদের মুখগুলোর ওপর একবার চোখ হুলিয়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন,—নারবরো বীপের নাম নিশ্চয় শোননি, গ্যালাপ্যাগোসের নামই হয়ত জানো না। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পশ্চিমে ইকোরেডের থেকে প্রায় ছ'শো পঞ্চাশ মাইল দূরের এই ক'টি ছোট-বড় আয়েরবীপের অটলার একশ' চকির বছর আগে দেবালের একটি পালতোলা জাহাজ টহল না বিতে গেলে বিজ্ঞানের এ হুগের সবচেয়ে একটা দাবী

● শিবি

জ্যেষ্ঠের দ্বিগ

মতবাদের জন্মই হ'ত কিনা সন্দেহ। সে পালতোলা জাহাজের নাম এচ. এস. এম. বীগল, সে জাহাজের বৈজ্ঞানিকের নাম চার্লস ডারউইন, আর সে মতবাদ হ'ল বিবর্তনবাদ।

গালাপ্যাগোস দ্বীপগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় হ'ল আলোবেমার্ন বা ইসাবেলা। যেখানে পান্টাটা ইংরিজী জে হরফের মত। সেই ইসাবেলার মাথার বা দিকে একটি বড় ফুটকি হ'ল নারবো দ্বীপ, ফার্নান্ডিনা-ও বলে কেউ কেউ। পৃথিবীর একমাত্র সামুদ্রিক গিরগটির জাত সেই গুয়ানার ভালো কবে পরিচয় নিতে সেই দ্বীপে তখন কিছুদিনের জেজো ডেরা পৌঁছে। পেকর 'লম' থেকে একটি ছাতি স্টিমার আমাকে আর আমার এক অহুচর নিমারাকে সেখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে। মাসপানেক বাদে আগার সেই স্টিমারই আমাদের নিয়ে যাবে।

আমার অহুচরটি ইকোয়েডরের আদিবাসীর জাত। এমনতে কাজকর্মে চৌকশ কিন্তু একবারে ভীতুব শেষ। একে এই জনমানবহীন পাণ্ডুর দ্বীপ তার ওপর চারদিনের বাঁলির চড়ায় বধবুটে চেতরার ইস্তরানার গজগজ করছে সারাক্ষণ। ছ'দিন যেতেই নিমারাব ভরে প্রায় নাড়ি-চাড়ার অবস্থা। সে ধর্মী গ্রীষ্টান। তার ধারণা কোনো অজানা পাপের শাস্তিতে বেঁচে থাকতেই স নরকে পৌঁছে গেছে।

আমি যত তাকে বোঝাই যে দেখতে ভয়ংকর হলে কি হয় এ দ্বীপের ওই সব প্রাণী একেবারে নীরব, মানুষকে পর্যন্ত তারা ভয় করতে শেখেনি, আর লড়াইয়ের পায়তাড়ি কখনোও নিজেদের মধ্যেও রক্তাক্ত মারামারি কখনো করে না, কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। রাত্রে সে ভালো করে ঘুমের না পর্যন্ত। তার বিবাস চোখের ছ'পাতা এক করলেই নাকাত পরতানের ওসব দূত চুপিচুপি হান দিয়ে তাঁবু স্রু আমাদের চিবিয়ে শেষ করে দেবে।

নিমারার অবস্থা দেখে বেশ একটু ভাবনাতেই পড়ে গেলাম। খাওয়া নেই ঘুম নেই, লোকটা শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে যাবে নাকি! সঙ্গে যে ক্ষুদ্রে ওয়ায়লেন্স ট্যান্স্‌মিটারটি ভিল তাই দিয়ে লিমাতে যে দিন স্টিমারটা তাড়াতাড়ি পাঠাবার জন্তে খবর দিয়েছি সেই রাত্রেই নিমারা একেবারে কেপে গেছে মনে হ'ল।

সারাদিনের ঘোরাকেরার পর রাত্রি শরীরে লবে তখন খাওয়াওনা সেয়ে একটু ঘুমিয়েছি হঠাৎ নিমারা হুড়বুড় করে তাঁবুর দড়িঝড়া প্রায় ছিঁড়ে কীপতে কীপতে আমার একেবারে গায়ের ওপর কাঁপিয়ে পড়ল।

বাচান, হজুর বাচান!

ঘড়মড়িয়ে জেগে উঠে প্রথমটা তো তাকে একটি চড় কবাতাই বাজিলাম। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে জিজ্ঞাসা করলাম যোগে—কি হয়েছে কি!

দেয় দেউল

এবার শরতান নিজেই এসেছে হুজুর। আর রক্ষে নেই।

রক্ষে যদি নেই আনিস তো আমার ঘুম ভাঙালি কেন হতভাগা!—বিহানা থেকে উঠে পড়ে বললাম,—কই কোথায় তোর শরতান দেখাবি চল।

নিমারা সহজে কি যেতে চায়। শরতানকে একবার সে দেখে এসেছে, আর একবার সামনে গেলেই তার দফা রফা এ বিষয়ে তার কোন সন্দেহ নেই।

কোনরকমে টানা-হেঁচড়া করে তাকে বাইরে নিয়ে গিয়ে তার ভীত ইশারায় বা দেখলাম তাতে আমারও চক্ষুহীন।

নারবরো দীপের মাঝখানে মরা আগ্নেয়গিরির প্রায় চূড়ার কাছে আমাদের তাঁবু খাটান হয়েছে।

রক্তপক্ষের রাত। চারদিকের সমুদ্রে যেন গাঢ় নীল কালি গোলা। সেই

গাঢ় নীলরক্ত সমুদ্রের জলে নারবরো আর ইসাবেলা দীপের মাঝখানের সংকীর্ণ প্রণালীতে বিরাট কি একটা অলঙ্ঘ্য ভাসছে দেখতে পেলাম। সেটাকে সবচেয়ে বড় আভের নীল তিমি বা লিবান্ড'ন্স ররকোরাল ভাবতে পারতাম, কিন্তু নীল তিমিও তো ছেখটি লাভবানি হাতের বেশী লখায় কখনো হয় না। তা ছাড়া নীল তিমির গা থেকে থেকে-থেকে এরকম আলো ঝিকরে বেরোর বলে তো কখনো শুনিনি।

গ্যা লা প্যা সো সে র সবই

অসুত। অতল সমুদ্রের কোনো অঝানা বিরাট বিত্তীবিটাই আমার দেখবার দৌভাগ্য হল নাকি ?

● শিবি
গ্রেমের দিক



...এবার শরতান নিজেই
এসেছে হুজুর।

বেধতে বেধতে বিরাট জলজরুটা লহুতে ডুবে গেল। নিমারা তখন আর ধাঁড়াতে না গেরে বসে পড়ে ছ'হাতে মুখ ঢেকেছে।

তাকে ধমক দিয়ে বললাম,—অত ভয়ের কি আছে। তোমার শরতান তো লহুত থেকে ডাঙার ওঠেনি। ভাছাড়া নিজেই সে ভরে ডুব মেরেছে চেয়ে দেখো।

চোখ না খুলেই নিমারা বললে,—না হুজুর, ও শুধু শরতানের চল। এখন ডুব দিয়েছে কিন্তু দেখবেন ঠিক আবার অস্ত্র মূর্তিতে এসে হাজির হবে।

নিমারার কথাই এক দিক দিয়ে অকরে অকরে তার পরদিন ফলন বলা যায়।

রাত্রে-দেখা সেই অজানা বিশাল জলচরের কথা মাথায় থাকলেও, রোজকার মত সকালে পেরিয়ে কামেরার কাটি অদ্বুত প্রাণী ও দৃশ্যের ছবি তখন তুলেছি। নারবরো বীপে হিংস্র প্রাণী একেবারে নেই বলা ঠিক নয়। একধরনের সাপই এই অহিংসার রাজ্যের কলঙ্ক। একটা ফণিমনসা ভাতের অদ্বুত গাছের খোপে সেই সাপের একটি বড় গিরগিটি ধরে খাওয়ার ছবি তখন হয়ে তুলেছি, এমন সময় পিঠে একটা খোঁচা খেয়ে চমকে উঠলাম।

নিমারার অবস্থা কাহিল। তাকে তাঁবুতেই রেখে এগেছি শুইয়ে। হুতরাং হঠাৎ একেবারে কেপে গেলেও সে এমন চুপি চুপি এসে আমার পিঠে নিশ্চয় খোঁচা দেবে না। তাহলে এই অনমানবহীন বীপে কে এসে আমার পিছনে ধাঁড়িয়ে খোঁচা দিয়েছে!

বলতে এতক্ষণ লাগলেও পলকের মধ্যে এসব ভাবনা বিচ্ছ্যতের মত মাথার মধ্যে ঝেলে গেল। তারপর পেছন নিরতে হাচ্ছি পিঠে আরো জোরে একটা খোঁচার লক্ষে ভারি গম্ভীর গলায় শাসানি শুনতে পেলাম—কেরবার চোঁঠা কোরো না, যেমন আছ সেইভাবে এগিয়ে চলো। তোমার পিঠে বোনলা বন্ধু ঠেকানো তা বোধ হয় বুকেছ।

শুধু ওইটুকুই নয় আরো অনেক কিছুই তখন বুকে ফেলেছি। কথাগুলো করালীতে বলা হলেও তাতে একটু বাঁকা টান। আলজিরিয়া কি মরক্কো-তে বারাক্ত করব পুত্র কাটিয়েছে সেই করালীরা যেভাবে কথা বলে সেই রকম কতকটা। আশ্চর্যের বিষয়, এই গলার আওরাজ আর এই কথার টান কেমন বেন আমার চেনা বলেই মনে হ'ল। কিন্তু তাই বা কি করে সম্ভব?

করেক পা হুকুমত এগিয়ে গিয়েই হঠাৎ হেসে উঠে কিরে ধাক্কালাম। পবরবার হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে একটি বন্ধু আর একটি রিভলভার আমার দিকে উঁচিয়ে উঠল।

রিভলভার বার হাতে, ভালগাছের মত লম্বা রোগা পাকানো বুড়োটে চেহারার সে লোকটিকে

● পিণি
শ্রেণের মিত্র

কখনো দেখিনি, কিংগ দোনলা বন্দুক আমার পিঠে ঠেকিয়ে যে হুকুম করেছিল শুধু গলা শুনেই তার পরিচয় ঠিকই অনুমান করেছিলাম, বেথলাম—সে তো আমাদের এই স্ত্রেনল।

গোর হঠাৎ একটা হেঁচকি-ই গেন তুলল মনে হ'ল।

ঘনাবা। কথা গািমিয়ে সন্নিধ্যভাবে তার দিকে চাইতেই আমরা বলে

উঠলাম—জল গেরে নে না একটু।

জল খাব কি!—গোরই খেঁকিরে উঠল আমাদের—ঘনাবার দিকে

চ'তটো বন্দুক ঝানো না? তা বন্দুক

আর রিভলভার তারা ছুড়ল তো?

না।—ঘনাবার মুখে রহস্যময় হাসি।

গুলি ছিল না বুঝি? না, খেলার

বন্দুক?—শিশিরের বোকার মত প্রশ্ন।

খেলার বন্দুক নয়, গুলিও ছিল।—

ঘনাবার মুখ আবার গম্ভীর হ'ল।

তবে?—আমরা সবাই বেকুব।

ঘনাবা আবার হাসলেন,—গুলি

ছুড়বে কি করে? সেই কথাই হাসতে

হাসতে তাদের বললাম। বললাম,

—কই ছোড়ো গুলি! দেখি। একটু

চুপ করে থেকে তাদের হতভম্ব মুখগুলো

একটু উপভোগ করে আবার বললাম,

—ভড়কিতে আর লাভ কি! তারা

হুনিয়া চুঁকে এই অথকে ধীপে আমার

গুলি করে খারবার জন্তে হানা যে

হাওনি তা বুঝেছি। এখন মতলবটা

কি খোলাখুলি-ই বলো।

...একটি বন্দুক ও একটি রিভলভার আমার দিকে ঝাঁকিয়ে উঠলো। [পৃষ্ঠা ৬৩]

খোলাখুলি-ই বলছি।—বুড়োটে লম্বা লোকটিই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে এবার

কথা বললেন,—আমাদের লসকে আপনাকে বেতে হবে।

কোথার? কেন?

● পিনি

প্রোব্রেন্স বিব্র



জানতে পাবেন না।—বুড়োর বুথ নয় বেন লোহার বুথোশ।

তাহলে কি করে যাই বলুন। ভাড়া ইংরিজির বদলে যদি নিজের ভাষায় কথা বলতেন তবু আপনার জাতিটা দেশটা কি বুঝতে পারতাম। স্ত্রত্বলের তো ওসব বালাই নেই। টিউনিশিয়ার জন্ম, জার্মানিতে শিক্ষা। বুকের পর কুশেরা কিছুদিন অটিকে রেখেছিল বলত। তারপর ইলগের হয়ে অজানা ভাষায় মানচিত্র আঁকার চুতোর আফ্রিকায় আব বশিভিয়ার ইকোরেডরে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে চঠাৎ একদিন নিকরেশ বলে সবাই জানে। আপনাদের মত চই অজানা অ'বাতার মাহুয়ের সঙ্গে কিছু না জেনে যেতে কি মন চায়।

এত কথা যে স্ত্রব্যোগের জন্তে বলছিলাম তা এবার মিলে গেল। স্ত্রত্বল আমার টিটকিরিতে এতদূর রাগে দুলছিল। আমার কথা শেষ হতেই ত কার দিয়ে উঠল,—তবু তোকে যেতেই হবে টুকে বাদর। ভালোর ভালোর না যাস তোর মত পুঁচকে ফড়িংকে চ' আড়লে টিপে নিয়ে যাবে!

তা' দেওয়ার দিক দিয়ে স্ত্রত্বল সে তর্প করতে পারে। স্ত্রত্বলকে তো দেখেছ? মাংসের কেটা পাহাড়, কিং কং তার কাছে কোন চার!

কিন্তু আমার যে রোগা চিমসে দেখলাম!—এমন একটা স্ত্রবিদে ছাড়তে না পেরে শিশু দম করে বলে ফেললে

সে তাহলে ভুগে ভুগে হয়েছে। তিন মাইল সবুজের তলায় তিন চকুনে ছ'হপ্তা ডুবে থাক। তো চারটিখানি কথা নয়। সেই থেকেই ওর অস্থখ!—অন্নান বদনে শিশুর খোঁচা এবার অগ্রাহ্য করে আমাদের সন্ত্যাকার হাঁ করে দিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—তখন সে একটা দৈত্য-বংশধ। কিন্তু গর্ভনের সঙ্গে আচমকা আমার একটা হাইকিক-এ হাতের বন্ধুটা ছিটকে পড়তেই পঞ্চমটা একটু ভাবাচাকা খেয়ে গেল। তারপর মনে হ'ল বুনো ক্যাপা একটা হাতীই ছুটে আসছে আমার দিকে। ডিগবাছি খেয়ে হাত পাঁচেক দূরে ছিটকে পড়তে তার হোথ কি যায়! গা কেড়ে বুড়ে উঠে, আঙনের তাঁটার মত চ'চোখ দিয়ে আমার বেন ভয় করতে এবার লম্বপনে চ' হাত বাড়িয়ে এসতে লাগল। খোঁচি-পাটে তাকে রাম-পটুকান ঘেঁষার জন্তে তৈরী হচ্ছি এমন সমত বাড়ি পিণ্ডের কামড়ের মত কি একটা। জালা পেরে ফিরে দেখি সেই পাকানো লম্বা বড়ো শরতানের মত আমার পিছনে হাতে কি একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে।

তারপরে আর জ্ঞান নেই।

জান বখন হ'ল তখন প্রথমটা স্বপ্ন দেখছি কিনা বুঝতে পারলাম না। এ কোথায় এলাম! চোট্ট একটা আনন্দা-বরজাহীন কোটির বললেই হয়। ছাড়া এত নিচু যে বিজানার ওপর উঠে

● দিলি
প্রেমের দিও

বললেই বেন সাধার ঠেকে বাবে। নারায়ণী বীপ বিহুবরেখার ওপরে বলে দেখানো ছিল বেশ গরম আর এখানে বিধি ঠাণ্ডা। তাছাড়া বাতালেও কেমন একটা ওহু ওহু পড়। স্থির হয়ে ব্যাপারটা ভেবে নিচ্ছি এমন সময় খুঁট করে একটা আওয়াজ হয়ে সাধনের বেওয়ারেই খানিকটা বেন সরে গেল। এক গাল হাসি নিয়ে পাখাড়ের মত শরীরটা কোনরকমে সেই পাখাড়ের কাঁক বিয়ে গলিয়ে স্ত্রুতল আমার বিচনারই এক ধারে এলে বলে পড়ে বলল,—বাক্ ঘুম তাহলে ভাঙল এত দিনে!



এতদিনে! মনে বা হ'ল বুঝে তা প্রকাশ করলাম না। বরং তাকিলোর সুরে একটু হেসে বললাম,—ভাঙল নয়, তোমরা ভাঙালে বলো! তা, কতদিন ওহুপত্র দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখলে?

তা মন্দ কি! প্যাসিফিক-এ তুরেচ আর অ্যাটলান্টিকে আগলে। এখন আইসল্যান্ড ছাড়িয়ে চলেছি।

হঁ—একটু চুপ করে থেকে বললাম,—কিন্তু এ নিউক্লিয়ার সাবমেরিনট কোথায় গেলে? 'অ্যাটমিক শব্দ' তো শুধু মার্কিন বুলবুলেরই আছে জানতাম।

'অ্যাটমিক শব্দ!'—স্ত্রুতল সত্যিই চমকে উঠল,—কে বললে তোমার!

সুখের মধ্যে স্নেহে কেনেছি বোধহয়, যেমন লাত লুক্কর খুলে আমার কি অস্ত্রে চুরি করে এনেছ ভাও জানতে পেরেছি।

স্ত্রুতল প্রথম অবাক হওয়ার বাতাসটা খানিকটা সামলে বললে,—কি অস্ত্রে এনেছি বলো দেখি?

—বে অস্ত্রে এনেছ অ্যাটলান্টিকের তলা দিয়ে লুক্কিয়ে বাবার পে একটা বাড়ি রাতার খোঁজ বিজ্ঞাস করলে তো আমি এমনই বলে দিতে পারতাম। তার অস্ত্রে ছুঁচ হুঁটিয়ে অজ্ঞান করে চুরি করে জানবার ব্যবসার ছিল না।

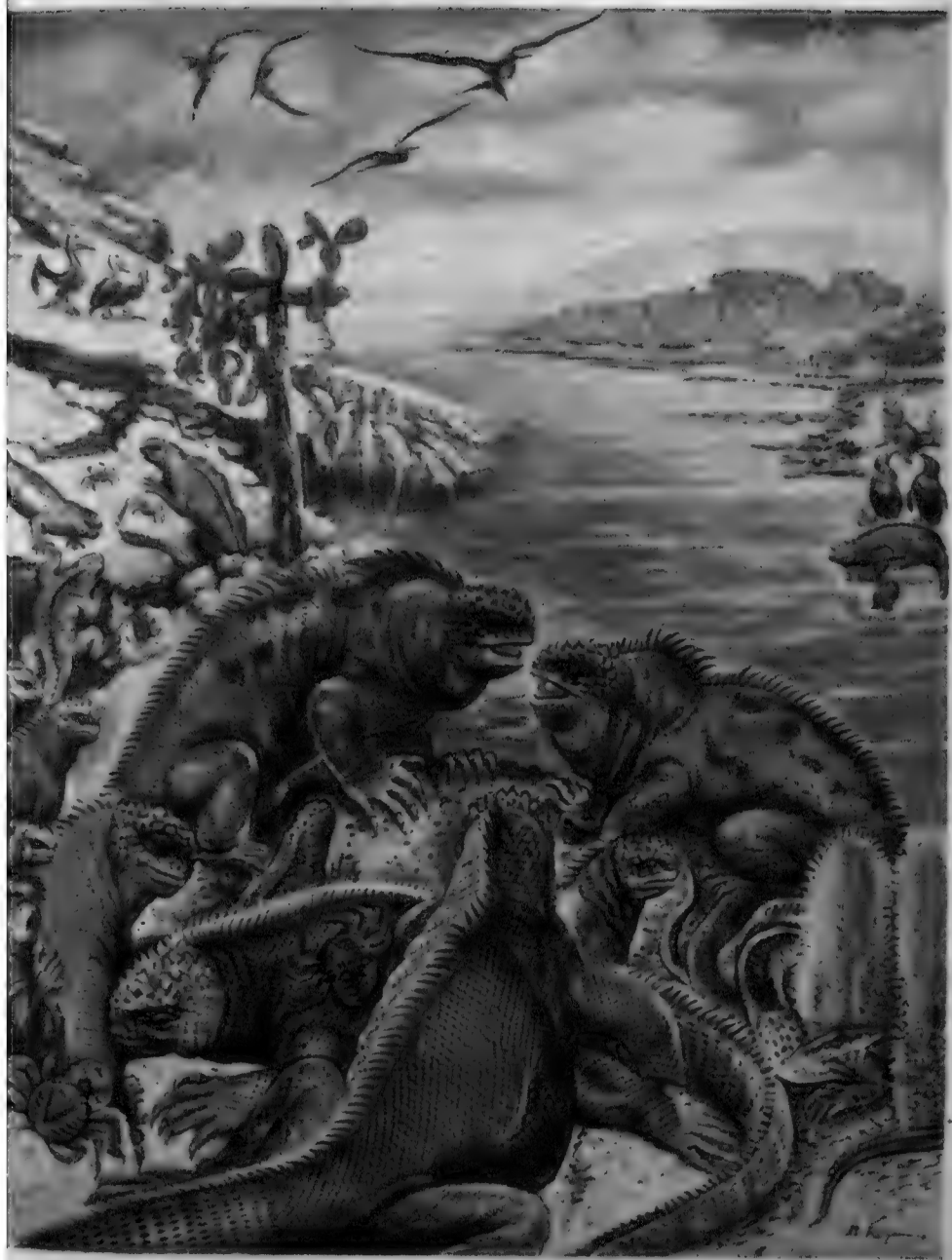
—ব্যবসার ছিল।—বলে স্ত্রুতল একটু হাসল।—আমার ছুঁচ অনেকটা করেছ, সবটা পারনি। অ্যাটলান্টিকের তলার রিক্ট জ্যাকির খাবের খবর তোমার চেয়ে ভালো কেউ জানে না এটা ঠিক, কিন্তু এ খাব হচ্ছে বেওয়ার চেয়ে বড় কাল তোমার দিয়ে করতে হবে।

বনাবা খাবলেন। শিহুর কাপটা মাঝে মাঝে এমন বেরাড়া হয়ে ওঠে!

কাঁক পেয়ে আর বনাবার বেকার পাছে বিগড়ে যার এই ভয়ে বিজ্ঞাস করলাম—রিবুট ভ্যাকিটা কি ব্যাপার বনাবা?

● বিদ্যি

প্রবেশে ছিল



বালি চকর বিষয়টি ডেহানার উপত্যকায় গিলগিলি দ্বীপে সংগৃহীত।

দেব দেউল

৬৫

ঘনাদা শুনী হয়ে বললেন,—পৃথিবীর ওপরকার নয় আটলান্টিক সমুদ্রের তলার এ একটা অকাঁচকা। চুই পাছাড়ের মাঝখানকার লম্বা গিরিখাত, আইসল্যান্ডের তলা থেকে শুরু হয়ে বর্ণিল আমেরিকার মাথা ছাড়িয়ে চলে গেছে। এক ধাবে মিড্‌আটল্যান্টিক রিজ্‌ আর এক ধারে রিফ্ট পাছাড়। এ রাস্তায় কোন সাবমেরিন চুপিসারে গেলে আমেরিকা কি ইউরোপ হৃদিসও পাবে না। স্তম্ভেলের কথার জানলাম শুধু এই ডোবা গিরিখাত চেনানো নয়, আটলান্টিকের ক'টি ডোবা পাছাড়ের হৃদিসও আমায় দিবে তারা পেতে চায়। ডাঙার পাছাড় পর্বতের তুলনায় এ সব ডোবা পাছাড় যে পেট্টোল থেকে শুরু করে দাবী সব ধাতুর কুবরের ভাণ্ডার এ খবর তারা জানে।

সমস্ত কথা শুনে একটু হেসে বললাম,—আমায় যদি এতই দরকার তাহলে এ সাবমেরিনটা কালের আমায় বলা উচিত নয় কি ?

অবস্থিতরে এদিক ওদিক চেয়ে স্তম্ভেল যেন একটু ভয়ে ভয়েই বললে,—বলতে মানা আছে।

মানা আছে!—তার দিকে একদৃষ্টে চরে তীএরবে বললাম,—তাহলে জনিয়ার ওয়াকিব মতলে য কানামুখ চলেছে তা মিথ্যা নয়! আমেরিকা ও রাশিয়া ছাড় আর একটি গোপন তৃতীয় শক্তি কে বা কার সত্যিই গড়ে তুলছে! আমেরিকা কি রাশিয়া যার যে তুল বা দোখট পাক তারা মানুষের সত্যি কল্যাণ চায়, কিন্তু এই তৃতীয় শক্তির সে সব কোন তুলতা নেই। আর যা ই হোক, তোমার গায়ের রাসী রক্ত তো কিছু আছে, কি বলে শুধু পরসার লোভে তুমি এদের কাছে নিজেদের বেচে দিয়েছ? নিজের দেশ বলে কিছু না মানো, মানুষ জাতের ওপরও কি তোমার মমতা নেই?

স্তম্ভেল কিরকম যেন বিহ্বল হয়ে পড়ল। ড'বার টোক গিলে বললে,—দেখো দাস, আমার চেহারাটা প্রকাণ্ড হলেও ভেতরে ভেতরে সত্যি আমি চরল। মনের ভোর এত কম যে অজ্ঞার বুকেও হঠাৎ প্রলোভনের কাছে হার মেনে বসি। বিশ্বাস করো যা আমি করেছি তার জন্তে আমার আকসোসের সীমা নেই। আমি পুরবারের লোভে তোমার খবর দিবে ওভাবে ধরবার বাবদা না করলে ওরা তোমার খোঁজও পেত না। কিন্তু এখন উপায় কি?

স্তম্ভেলের কথাগুলো যে আন্তরিক তা তার মুখ দেখেই বুঝলাম। তাকে এ কথার উত্তরে যা বলতে বাচ্ছিলাম তা কিন্তু আর বলা হ'ল না। সেই পরতানের মত বুড়া তখন দরবার এসে দাঁড়িয়েছে। কামরার ভেতর ঢুকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার একবার লক্ষ্য করে সে ভাড়া ঈরিজীতে স্তম্ভেলকে-ই বললে,—যা বোকাবার বুঝিয়ে দিয়েছ তো?

হ্যাঁ, এই দিচ্ছি!—বুড়া হঠাৎ এসে পড়ার স্তম্ভেল একটু যেন ভড়কে গেছে।

আচ্ছা, বুঝিয়ে কমিটিকমে এসে। এখানে বেরাড়াপনার শাস্তি যে কি তাও জানাতে ভুলো না।—বলে আমার একটু সন্ধ্যাপ পর্বন্ত না জানিয়ে বুড়া চলে গেল।

● দিদি
প্রবেশে মিত্র

দেব দেউল

বুড়ো যেতেই আগ্রহভরে বললাম,—উপার কি তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে ?

সুস্থেল লভয়ে ঠোটে আঁড়ল দিয়ে চাপা গলায় বললে,—সাবধান ! বকীস আর কিছু বোলো না।

এ ঘরে লুকোনো মাইক আছে। তোমার ঘুমের সময় বন্ধ ছিল এগুলি চালু হবে।

তার কথা শেখ চতে না হতে প্রায় অস্পষ্ট খুঁট করে একটা আঙুরায়ে বুঝলাম মাইক সজাগ।

কি এখন করা যায় ! সুস্থেলকে গোটাকতক কথা এগুলি না বললে নয়।

তাকে চোপের ইশারা করে দীয়ে দীয়ে বললাম—তিন, একশ বাইশ, সাতাত্তর।

সে খানিক হতভম্ব হয়ে থেকে চঠাৎ উৎসাহভরে বললে,—চয়।

বললাম,—তেইশ, চারশ পাঁচ, এগারো।

সুস্থেল তৎক্ষণাৎ উঠে ওই কামরারই একটি টেবিলের ওপর থেকে কাগজ পেন্সিল নিয়ে এল।

ব্যাপারটা কি হ'ল ?—আমরা হাঁ করে ঘনাদার দিকে তাকালাম।

কি আর, সাংকেতিক কথা !—ঘনাদা একটু হাসলেন।

সাংকেতিক কথা তো বুঝলাম !—গৌর বললে,—কিন্তু ও তো শব্দ নয় সংখ্যা। আর আপনি বলতেই সুস্থেল বুঝল কি করে ?

লোগোগ্রাফি জানলেই বুঝবে !—ঘনাদা অল্পকম্পান্তরে আমাদের দিকে চেয়ে বললেন,—লোগোগ্রাফিকিতে ছ' হাজার পর্যন্ত সংখ্যা দিয়ে মোটামুটি সব কিছুই বলা যায়। সকলের অবশ্য অত বুঝব থাকে না। সঙ্গে লোগোগ্রাফির আলাদা অভিধান রাখতে হয়।

এর পরে আর ট্যাঁ কী করবার কিছু নেই, তৎক্ষণাৎ কপালে তুলে বললাম,—আপনার বুঝি সব বুঝব ?

ঘনাদার মুখে স্বর্গীয় হাসি দেখা দিতেই শিবু জিজ্ঞাসা করলে,—ওই সব হিজিবিজি অঙ্ক যে বলাবলি করলেন তার মানে কি ?

মানে ?—ঘনাদা বুঝিয়ে দিলেন,—মানে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলাম,—তুমি লোগোগ্রাফি জানো ? সুস্থেল তাতে জানালে, হাঁ। তখন তাকে খাতা পেন্সিল আনতে বললাম।

একটু খেয়ে আমাষের মুখের চোঁরাগুলো দেখে নিয়ে ঘনাদা আবার শুরু করলেন,—খাতা পেন্সিল আনবার পর কাগজে লিখে সব কথাবার্তা সেরে ফেললাম। চুক্তি হয়ে গেল যে চশমনদের চোখে বুড়ো দেবার ক্ষমিতে সুস্থেল আমার সহায় হবে গোপনে। কিন্তু সুস্থেলের সব সাধু সংকল্প শেষ পর্যন্ত তার মনের দুর্বলতায় ততুল হয়ে গেল। তার এবং সাবমেরিনের সকলের প্রাণ বাঁচানোর কতকজাতিক পর্বত সে দেখাল না। লোগোগ্রাফিতে তার কাছে যেমন নিরেছিলাম যে নারদবরো বীণ থেকে আমার অজান করে আনবার সময় নিষাধকে সঙ্গে না নিলেও আমার কণ্ঠ

● নিবি

শ্রেয়সে মিত্র

দেব দেউল

৬৭

ধরকারী বাস বাগ সাবমেরিনে তুলে নিয়েছিল। আইসল্যান্ড ছাড়িয়ে রিক্ট তালির খাড়ে সাবমেরিন ঢোকবার পর সেই বাগ আর বাস না থাকলে এ গল্প আর এখানে বসে করতে হত না। সেইখানেই সাবমেরিনটির কবর হয়ে যেত।

কেন? অ্যাটমিক সাবমেরিন না?—যুথ থেকে বেহিয়ে গেল আপনা থেকে।

হ্যাঁ, অ্যাটমিক সাবমেরিনও বেগড়ায়। একসঙ্গে তখন ওপরে ভাসিয়ে তোলার আর হাওয়া শোষণের কল গেছে ধারাপ হয়ে। সে সব যন্ত্র মেরামত করতে যতক্ষণ লাগবে তার আগেই কাঁধে ডাঙাফাউন্ডের গ্যাসে আমাদের কারুর আর জ্ঞান থাকবে না! তন্তুলের যুগ তো! চাইএর মত নাটক। সেই শরতান বুড়ো পর্যন্ত কেমন একটু দিশাহারা।

আমার বাগ থেকে ওঠে শিশি তখন বার করলাম।

ওই শিশি—এক সঙ্গে সবাই বলে উঠলাম! ওই শিশিতে সাবমেরিন ভাসল?

সাবমেরিন ভাসবে কেন?—ঘনাদ! অধৈর্যের সঙ্গে বললেন, হাওয়ার সমস্তা মিটল।

ওই শিশিতে?—আমরা আবার হাঁ।

—হ্যাঁ ওই শিশিতে। ও শিশিতে কি ছিল আনো? ক্লোরেল। নামে একরকম আত্মবীক্ষণিক কাঁচামা—যাকে ছত্রাক বা ছাতা বলে। শিকি আউন্স জলে প্রায় চার কোটি ক্লোরেল থাকে। কার্বন ডায়াক্সাইড থেকে তাড়াতাড়ি অক্সিজেন ছেঁকে বার করতে তার ক্ষুদ্রি নেই। শিশি থেকে নানান পাত্র সেই ক্লোরেলার কৌটা জলে ফেলে সমস্ত সাবমেরিনের নানা আয়ুগার রাখবার ব্যবস্থা করলাম।

সময়মত যন্ত্রপাতি মেরামত হ'ল। তারপর প্রায় একমাস ধরে সমুদ্রের তলার সমস্ত রিক্ট পেরিপাথ আর মরক্কোর পশ্চিমের মারিরা অ্যাভিস্তাল প্লেন থেকে প্লেনো আর অ্যাটলান্টিস সি-মডিউট হয়ে সার্গাসো সমুদ্রের উত্তরে লোহম্ অ্যাভিস্তাল প্লেন পেরিয়ে বামুর্দা পেডেস্টাল পর্যন্ত অতলাস্তিকের বিশাল অন্তল রাজ্যের সন্ধান নিয়ে একদিন নিউফাউণ্ডল্যান্ডের এক নির্জন তীরে গিয়ে উঠলাম।

সেই শরতান বুড়োর মতলব এবার স্পষ্ট বোঝা গেল। একটি নির্জন খাঁড়িতে ঢুকে সাবমেরিন পানবার পর বুড়ো এসে চঠাৎ বাইরে তার সঙ্গে একটু ঘুরে আসার অনুরোধ জানালে।

হেসে বললাম,—বা কুরাশায় দেশ, এখানে টহল দেবার শখ আমার নেই।

তবু একবার বেড়িয়েই আসি চলে না। এখানকার লীল বাছ একটা শিকারও করা যেতে পারে।

প্রতিবাদি নিফল জেনে ওভারকোট পরে নিয়ে বেরুলাম। বেখলাম শুধু বুড়ো নয় সন্তুলও সঙ্গে সঙ্গে। শিকারের লোভ বেখালেও বন্ধু শুধু বুড়োই হাতে।

● দিদি
শ্রেয়স মিত্র

তীর ছাড়িয়ে কিছুদূর যেতেই বৃড়ে। সোজা হুজি আসল কথা পাড়লে—লুকোনো ম্যাপটা এবার দাও দাস।

উঁচিরে ধরা বন্দুকটা অগ্রাহ করেই অবাক হয়ে বললাম,—আটল্যান্টিকের তলার ম্যাপ! সে তো সাবমেরিনেই আছে।

না,—বৃড়োর গলার স্বরে যেন বাজ ডাকল—সে ম্যাপ ফাঁকি। সুস্থেল সব আমার কাছে স্বীকার করেছে। আসল ম্যাপ তুমি নিজের কাছে লুকিয়ে রেখেছ! দাও।

সুস্থেলের দিকে অলস দৃষ্টিতে তাকালাম। সে একেবারে অমানুষ নয়। অত্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে থতমত হয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বৃড়োর দিকে ফিরে বললাম,—যদি না দিই।

তাৎলেও ও ম্যাপ আমি পাব, শুধু এই নির্জন তীরে তোমায় শেষ নিশ্বাস নিতে হবে। কেউ জানতেও পারবে না কিছু।

বৃড়ো বন্দকের সেক্টিংকাচটা সরালো।

সুস্থেল হঠাৎ এগিয়ে এসে বললে,—দাঁড়ান, ওই ছুঁচোর জন্তে গুলি থরচ করবার দরকার নেই। একবার আমার বেকারদার কাবু করেছে, তার শোধ আমি নিজে হাতে নিতে চাই।

শোধ সে সত্যিই নিলে। চ'বায় আমার পাঁচো মাটি নিয়ে তিনবারের বার আমার পিঠের ওপর ঘটোৎকচের মত চেপে বলল ঘাড়টা। লোহার মত হাতে আমার পেছনে টেনে ধরে। প্রায় মটকে যায় আর কি!

বৃড়ো এবার এগিয়ে এসে সব বুঁজে শেষ পর্যন্ত কুতোর হুকতলার নিচে থেকে ভাঁজ করা ম্যাপটা বার করে নিয়ে বললে,—ছেড়ে দাও কালা ভূতটাকে।

ছেড়ে-ই তারা রেখে গেল। তারপর একা সেই জনমানবহীন ঝাঁড়ির পাড়ে।

দিন তিনেক উইলো গ্রাউসের বাসা বুঁজে বুঁজে শুধু ডিম থেয়ে কাটাবার পর, এক সীল-শিকারী ঘলের ঘোটর ঘোট সেখানে না এলে আর ফিরতে হ'ত না।

ঘনাধা ধামলেন। শিশিরের মুখে-ই আমাদের লকলের প্রশ্ন সবিস্ময়ে বার হ'ল।

—বলেন কি ঘনাধা! আপনি সুস্থেলের কাছে হারলেন, আবার যে ম্যাপের জন্তে এত তাও ওরা কেড়ে নিলে!

ঘনাধা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন,—সুস্থেলের কাছে না হারলে ওই জাল ম্যাপ ওরা বিশ্বাস করে কেড়ে নিয়ে বার! সুস্থেলকে ওইটুকুর জন্তেই কমা করেছে।

● নিদি

শ্রেয়ন্ত বিজ

অভিভূত হয়ে ঘনাকাকি শেষ একটা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে বাবার সময় শিশির যথেষ্ট থেকে কি
হেন একটা কুড়িয়ে নিল মনে হ'ল।

নিচে নেমে জিজ্ঞাসা করলাম,—কি একটা কুড়িয়ে নিলি তখন?

শিশির ছেঁড়া পাকানো কাগজটা আমাদের সামনে গুলে ধরে বললে—আমাদের সব কক্ষি বাতে
চাঁদ সেই আসল জিনিস।

দু'খ ক'জনে মিলে স্তম্ভেলের নামে যে চিঠি বানিয়েছিলাম তারই হাতে লেখা খসড়াটা।
ঘনাকাকি কখন কোথায় যে কুড়িয়ে নিয়েছেন জানতেও পারিনি।



জোনালী কথা

দি স্টোরি অফ স্তান মিচেল (এ্যাক্সেল মুন্খি)

এ্যাক্সেল মুন্খি যুরোপের একজন খ্যাতনামা ডাক্তার ও মনস্তত্ত্ববিদ।
আজ দশবছর হলো তিনি মারা গিয়েছেন। কীভাবে ঘরে তিনি
ফ্রান্সে ও ইতালীতে ডাক্তারী করেন। শেষ জীবনে স্টইডেনের রাজ্য
থাক স্টইডেনে ডেকে আনেন, স্টইডেন হলো ডাক্তার মুন্খির জন্মভূমি,
এবং সেখানে রাজ-পরিবারের ডাক্তার হিসেবেই অবশিষ্ট জীবন বাপন করেন। জীবনের
মধ্যাংশে তিনি নিজে তত্ত্বাবহা হয়ে বিখ্যাত ক্যাপ্রি দ্বীপের স্তান মিচেল নগরে বসবাস
করেন। সেখানে থাকবার সময় তিনি তাঁর ডাক্তারী জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সত্য
কাহিনীকে এক অগূর্ণ উপস্থাপনে রূপ দেন, সেই উপস্থাপনটিকেই দি স্টোরি অফ স্তান মিচেল
নামে খ্যাত। ডাক্তার হিসেবে তিনি জীবনের সংশোধন অন্তঃপুত্রের যে বিচিত্র রূপ
দেখতেলেন, এই উপস্থাপনে তা এক বিস্ময়কর মানব-জীবনের নথী হিসেবে রয়ে গিয়েছে।
তখন তিনি প্যারিসে ডাক্তারী করতেন, হঠাৎ রাষ্ট্রের এক নামজাদা নাস' থাকে কোন
করলো। তিনি টিকানার এসে দেখলেন বিধানার অজ্ঞান অবস্থার এক তুন্দরী তুন্দরী পুত্রে,
মুন্খি। পরীক্ষা করে দেখলেন, যেহেতু সন্তানসম্ভবা। পেটের ভেলেটিও মুন্খি। ডাক্তার বহু
চেষ্টা করে তুন্দরী আর ভবিষ্যৎ ছেলেকে বাঁচালেন। তুন্দরীর কাছে একটা লামা হীরের
রোচ ছিল, তার কাপড়-চোপড়ের মধ্যে। ডাক্তার রোচটিকে নাসের ভিন্দার রেখে দিলেন।
তারপর আর সেই তুন্দরীর কোন বহর তিনি পান নি। তিন বছর পরে হঠাৎ দেখলেন পথের
কাপড়ে একটা বহর বেরিয়েছে, সেই নাস'টিকে পুলিশ কারাকত্ব করেছে, শিশু-হত্যার অপরাধে।
কৌতুহলী হয়ে ডাক্তার নাসের সঙ্গে দেখা করলেন। নাস'সেই হীরের রোচটা ডাক্তারকে দিয়ে
দিলো এবং ডাক্তারের জেরায় সেই তুন্দরীর শিশুপুত্রের টিকানাও মিল। ডাক্তার সেই টিকানায়
গিয়ে দেখলো, এক সুদী সেই রূর ছেলটিকে দস্তক হিসেবে নিয়েছে, কিন্তু ছেলেটা রিন রিন
শুকিয়ে থাকে, কোন কথা বলে না, হাসে না, ছেলেটাকে আর সে রাখতে চায় না। বহরপরবশ
হয়ে ডাক্তার সেই শিশুকে নিয়ে এলো এবং আসল উপস্থাপন-পড়ে তোমরা দেখবে কি কল্প
পরিহিতিতে একদিন সেই শিশু তার আসল বার সন্ধান পায়। কিন্তু না আর তার শিশুকে
শেখো না, কারন এবার সত্যি সত্যি সে বাবা বেল।



দুরাশা ও আশা

—শ্রীমহাকাব্য রাম

রবীন্দ্রনাথের “দুরাশা”র নায়িকা ব্রজাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী, সিপাহী-বিক্রোহের নেতা বীর কেশরলালের শৌর্থে ও ধর্মবিশ্বাসে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দুধর্মের আচরণ ও অনুষ্ঠানের দ্বারা শেষ পর্যন্ত অনুভব করেছিলেন—

“মূর্তিপ্রতিমূর্তি, লক্ষ্যবল্যপানি, স্বর্ণচূড়ামণিচিত দেবালয়, ধূপ-ধূনার ধূম, অগুরুচন্দন-মিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগীসন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ হস্তবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র-লীলা, সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন, অতি বিস্তীর্ণ, অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সজ্জন করিত, আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর স্তায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাঙ্গণের ককে ককে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু সংসার আমার বালিকালভয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।”

১৮৫৭ সন। ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে নিদারুণ সংঘর্ষে সাংঘাতিক আহত হয়ে “রূপকেশের অনতিদূরে যমুনার তীরে আশ্রয়কাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ” পড়ে ছিল। নবাবপুরীর শুভ্রায়ায় জীবন ফিরে পেয়ে কেশরলাল পরে কি করেছিলেন সে কাহিনী “দুরাশা”য় নবাবপুরীই বিবৃত করেছেন। বীর দেওকিনন্দনের কথা “দুরাশা”য় বলা হয়নি।

দেওকিনন্দনও যমুনার শীকরসিদ্ধ সমীরণ বীজনে ধীরে ধীরে সজীবিত হয়ে উঠেছিলেন এবং ভারতবাসীর মনে ইংরেজের পরাধীনতাশাস ছিন্ন করে স্বাধীন হবার প্রবৃত্তি পুনর্ভাগরণের জন্তে সম্রাসীর বেশে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ টহল দিয়ে ফিরেছিলেন। তাঁর নিশ্চয়কর কীতিকলাপ কোনও ইতিহাসে লেখা নেই, কিন্তু আমরা জানি বিদ্রোহের বহ্নিকে তিনিই তুফানলের মত জাগিয়ে রেখেছিলেন মারাত্মক চিংপাবন ব্রাহ্মণদের মধ্যে, পাঞ্জাবের শিখদের অন্তরে এবং বাঙালীর স্বদেশী মেলায়। অনন্ত দুরাশার মধ্যে তিনিই সঞ্চার করেছিলেন তীব্র আশা। এই আশার কব', দেওকিনন্দনের শেষ জীবনের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে প্রকাশ পেলে আমাদের স্বাধীনতা দীর্ঘবিলাসিত হত না।

দেওকিনন্দন শেষ পর্যন্ত ফরাসী চন্দননগরে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানেই ১৮৮৫ সনের শেষ দিনে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর ইহজীবনের সমস্ত সম্পত্তি একটি ছোট টিনের তোরঙ্গে সযত্নে রক্ষিত ছিল। তার মধ্যে ছিল একটি ডাইরি বা দিনলিপি— ১৮৫৭ সনের ডিসেম্বর মাসের ১লা তারিখ থেকে ১৮৮৫ সনের ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁর চিন্তাধারা এই ডাইরিতে লিপিবদ্ধ ছিল। নিদারুণ নৈরাশ্যের মধ্যে তিনি কার কাছ থেকে আশার ক্ষীণালোক পেয়েছিলেন ১৮৬৮ সনে ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখের দিনলিপিতে তা স্বীকার করেছেন। সেদিনের দিনলিপিটি প্রকাশ করে যে মহান্ বিদেশী ঐতিহাসিকের রচিত “ভারতের বাণী” পড়ে দেওকিনন্দন নতুনভাবে উৎস্ক হয়েছিলেন তাঁকেই আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

দেওকিনন্দনের দিনলিপি, ১৮৬৮, ২৫শে ফেব্রুয়ারি, চন্দননগর

আজ ভোরে উঠে গঙ্গার ধারে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ সৌম্যদর্শন ফরাসী আচার্য মহাত্মা জেকলিয়টের সামনে পড়ে গেলাম। তিনিও পায়চারি করছিলেন। আমি একটু অন্তমনস্ক ছিলাম বলে আগে তাঁকে দেখতে পাইনি। বৃদ্ধ সন্মুখে আমার কাঁধের ওপর হাত রেখে বললেন, দেওকিনন্দন, তোমার মূখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার

আশাভঙ্গ হয়েছে, তুমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়েছ। বিশ্বাস হারানোকে আমি অধর্ম বলে মনে করি। আমি আজ এইমাত্র আমার



বৃদ্ধ আমার কাছে হাত রেখে বললেন—দেওকিনন্দন, মনে হয় তোমার আশাভঙ্গ হয়েছে।

বিশ্বাস হারানোকে আমি 'ভারতে বাইবেল' গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ করলাম। আজ ভোরে উঠে লিখেছি বইয়ের ভূমিকাটি, শিরোনামা দিয়েছি "ভারতের বাণী"। তুমি এসো আমার সঙ্গে, সেটি তোমাকে শোনাব।

তারই অমুসর ৭ ক'রে গেলান তাঁর ধ্যান-মন্দিরে। কত বই, কত মানচিত্র। দেওয়ালের তাকে তাকে পুণ্ডীভূত জ্ঞান! মনে হ'ল কোনও প্রাচীন পৌঙ্গণ্ড স্ফায় প্রবেশ করেছি। বৃদ্ধ তাঁর "ভারতের বাণী" পড়ে শোনালেন। শুনতে শুনতে আমার সমস্ত জড়তা কেটে গেল, আমার জ্ঞান-চক্ষু যেন সজ্জা হয়ে গেল। প্রজ্ঞায় আমার মন ভরে উঠল। আমি তাঁকে আত্মী প্রণাম করলাম।

"ভারতের বাণী"র একটি নকল নিয়ে এসেছি। এই সঙ্গে সেটি গৌণে রাখলাম। আমার এই হিনলিপি কখনও কারো চক্ষুগোচর হবে কিনা জানি না, যদি হয়, এই "ভারতের বাণী" সবাই শুনতে পাবে, আমার মত সবাই উৎসাহ হবে এবং আমার হিনলিপি সার্থকতা লাভ ক'রে আমার লুপ্ত আত্মার শান্তি বিধান করবে।

● 'হুয়াশা' ও আশা
ঐনুল্লাহ কানুনগো

ভারতের বাণী

ওগো প্রাচীন ভারতের মৃত্তিকা, মানব-সভাতার সূতিকাগার তুমি, তোমাকে প্রণাম। প্রণাম মানবতার খাত্তী মহিমাম্বিতা তোমাকে, সক্ষমা তোমাকে— তোমার সমস্ত লালনে বহু শতাব্দীবাণী নৃশংস বৈদেশিকদের অবিরাম আক্রমণেও তোমার সম্মান-গরিমা ধূলাবলুপ্তিত হয়ে বিলুপ্ত হয়নি। ধর্মবিশ্বাস, মানবপ্রেম, কাব্য ও বিজ্ঞানের তুমি জন্মদাতা—তোমাকে প্রণাম। প্রতীচীর ভবিষ্যৎ তোমার অতীতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক।

তোমার রহস্যময় অরণ্যের গভীরে আমি প্রবেশ করেছি। তোমার বির্যট প্রকৃতি-সম্ভার ভাষা আমি আয়ত্ত করেছি সেই গহনে। সেখানকার বট-অশ্বত্থ- তিস্তিড়ার শাখাপ্রশাখায় পত্রপল্লবে সাদ্ধা সমীরণের মৃদু মর্মরধ্বনি আমার অন্তরাঙ্গার কানে কানে তিনটি ঐশ্বর্যজালিক শব্দের গুঞ্জন তুলেছে—সত্য, শিব, স্তন্দর।

প্রাচীন মন্দির ও দেবায়তনের অলিন্দে ঠাঁড়িয়ে ত্রাঙ্কণ-পুরোহিতদের আমি প্রশ্ন করেছি। তাঁরা বলেছেন—

“বাঁচা মানেই চিন্তা করা, চিন্তা করা মানেই ঈশ্বরকে জানা—যে ঈশ্বর একমেব- দ্বিতীয়ম্ হয়েও সকলের মধ্যে বিরাজ করছেন।”

ঋষি ও মহাত্মাদের বাণী আমি শুনেছি। তাঁরা বলেছেন—“বেঁচে থাকা মানে শেখা, শেখা মানেই বিচার করা এবং ঐশী শক্তির অসংখ্য প্রকাশের মধ্যে সেই অরূপের অপ্রভৃতিগ্রাস্ত রূপকে আবিষ্কার করা।”

দার্শনিকদের শরণাপন্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করেছি—

“ছ’হাজার বছরের অচল জ্ঞান নিয়ে তোমরা এখনো বেঁচে আছ কেন? ওই প্রপ্রথানিই বা কী যা সামনে রেখে নাড়াচাড়া করছ?”

তাঁরা মৃদুহাস্তে জবাব দিয়েছেন—

“বেঁচে থাকা মানেই পরার্থে বেঁচে থাকা, স্থায়পথে চলে বেঁচে থাকা। এই প্রপ্রথানিতে তারই নির্দেশ আছে। এর নাম বেদ। এতে আছে জ্ঞানের শাখাত্ত বাণী এবং সে পরম বাণী আমাদের পূর্বপুরুষদের ধ্যানে ধরা পড়েছিল।”

কবিদের গান আমি শুনেছি। প্রেম, সৌন্দর্য ও পুষ্প-স্মরণের গান গেয়ে তাঁরা ঈশ্বর-মহিমাই কীর্ত্তন করেছেন।

কাঁটার শয্যায় শুয়ে যোগীদের হাসিমুখে দৈহিক যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করতে দেখেছি; দেখেছি জ্বলন্ত আগুনের আসনে বসে দুঃখজয়ের দ্বারা ঈশ্বর-লাভের সাধনা করতে।

গঙ্গার উৎস-মূল গঙ্গোত্রীতে আরোহণ করেছি আমি, দেখেছি হাজার হাজার ভক্ত নতজানু হয়ে পুণ্যতোয়া নদীর ধারে প্রত্যাশের উদীয়মান সূর্যকে বন্দনা করছে। সে বন্দনার ভাষা ভেসে এসেছে আমার কানে—“ক্ষেত্র শৃঞ্জে শ্রামল, বৃক্ষ কলভারে আনত, হে দেব, এ তোমারই দান। তোমাকে প্রণাম।”

কিন্তু এই অগাধ বিশ্বাস, এই সন্তীবনী-জ্ঞান, ত্রাফণ-পুরোহিত-ঋষি-দার্শনিক-লিলী-কবির এই দিবা শিক্ষা সত্ত্বেও, হে হতভাগিনী জননী-ভারত, আমি দেখলাম তোমার সন্তানেরা ধীরে ধীরে নির্দীর্ঘ, জীর্ণ ও আদর্শভ্রষ্ট হয়ে গেল। পাশ্চাত্য পশু-শক্তির কাছে, বৃত্তিময় অভিলোভী, অত্যাচারী বণিকের হাতে দেখলাম তোমার রক্তক্ষয়; তোমার বিষ্ঠ অপকৃত হল, লাঞ্চিতা হল তোমার কন্যা। তোমার স্বাধীনতা হল পদদলিত। তোমার দুর্ভাগ্য সন্তানেরা এই শোষণ, অগহরণ, লাঞ্জনাকে মেনে নিল অদৃষ্ট বলে, দেবতার কাছে পরম্পর নালিশ জানালে না।

তারপর শুনে আসছি দিনাস্তুর স্মিধ নাতাসের সঙ্গে ভেসে-আসা ভয়কণ্ঠের করুণ আর্তনাদ। কার এ ক্রন্দন, কোথা থেকে আসছে? মরু-জলাভূমি থেকে, দুর্গম পথের প্রান্ত থেকে, নদীতীরের শ্মশান থেকে, না অরণ্যের অন্ধকার থেকে? মনে হয়েছে—বুঝি বা ক্ষত গোরব আর বিলুপ্ত ঐশ্ব্যের জগ্রে বর্তমানের বুকে ভর ক’রে অতীতই হাহাকার করছে!

অথবা এক বিশ্লোহ বিক্ষুব্ধ হবার পর সিপাহীদের ত্রীপুত্রকণ্ঠার আর্তনাদ! লালকোর্তা ব্রিটিশ সৈন্যেরা অবাধে গুলি চালিয়ে হতভাগ্যদের নিঃশেষ করতে করতে নিজেদের দুঃখপ্ল, নিজেদের আতঙ্ক ভুলতে চাইছে হয়তো!

দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু মাতার শীতল বুকে জীবনরস না পেয়ে অসহায় শিশুরা কান্নায় ভেঙে পড়ছে না তো?

এ সব ভয়াবহ দুঃখযন্ত্রণার মর্মভেদী প্রকাশ আমাকে দেখতে হয়েছে।

যাদের লৌহ-হস্তের নিষ্পেষণে হে ভারত, তোমার সন্তানেরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে, তাদেরই শাসন মেনে নিয়ে তারা নিরুৎসাহের হাসি হাসছে। দেখতে পাচ্ছি তারা স্বহস্তে, হয়তো সোমাসে অতীত গরিমা ও স্বাধীনতার স্মৃতির কবর খুঁড়ে চলছে।

আমি নিজের মনকে প্রশ্ন করেছি, কোন্ পিশাচের চৌর্য লগে ভারতের পূত দেহে পচন গুস্ত হয়েছে? এ কী শুধু কালধর্ম? মানুষ যেমন বৃদ্ধ অক্ষয় জরাভীর্ণ হয়ে মরে, একটা জাতও কি তেমনি মরে? এও কী সম্ভব—

● ‘হুশা’ ও আশা

জিনকনীকাজ দাস

ভারতের প্রাচীন ঋষিবাক্য, অপৌরুষেয় বেদের বাণী কি এভাবে ব্যর্থ ও বিনষ্ট হতে পারে !

হে ভারত, তোমার অতীত সম্পদ বিনষ্ট হতে পারে না। কাল তোমার গৌরবকে কুক্ষিগত করতে পারেনি—যেমন পেরেছে সহস্রভোরণ খিবিসকে, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বাবিলনকে, পিরামিড-শোভিত মিশরকে, দ্বিখিজ্রী গ্রীসকে, প্রবল-প্রতাপাধিত রোমকে। সিনাই পর্বতশিখর থেকে বর্ষিত হয়েছিল হিত্রুজাতির যে বিধান-প্রস্তর-ফলক, তার ভাষা কবে হারিয়ে গেছে কিন্তু আমি আজও শুনতে পাচ্ছি—প্রাচীন ব্রাহ্মণ, ঋষি, দার্শনিক-কবির। তোমারই অরণ্য-পর্বতে অমর আত্মার যে জয়োচ্চারণ করেছিলেন, স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে সানাজিক সদাচারের যে মাহাত্ম্য কীর্তন করেছিলেন এবং সেই পরম দেবতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের মনে যে জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন, তা মরেনি, তা হারায়নি, তা নষ্ট হয়নি। এখনও মন্দির-শ্রাঙ্গণে, পর্বত-গুহায়, অরণ্যের গভীরে গীত হচ্ছে সেই গান, জাগ্রত আছে সেই জিজ্ঞাসা এবং সমাজকে এখনও ধারণ করে আছে সেই সদাচার। মাইভঃ, মাইভঃ ভারতবর্ষ, তুমি আবার জয়দ্রুত হবে। ভারতবাসী আজও যখন বৈদিক মন্ত্রেই নতি নিবেদন করেছে সেই দেবতাকে, যিনি দিয়েছেন নির্দেশ আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যালোক, যিনি মেঘবর্ষণে বারংবার স্নকলা করেছেন মাটিকে, তখন সে আলোক নির্বাপিত হবে না, সে মাটি হবে না উষর।

আমি আবার স্মরণ করলাম সেই রহস্যময় অতীতকে। আবার কালের কালো যবনিকা ঠেলে কী বিপুল ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হ'ল আমার দৃষ্টিতে; সহস্র মন্দিরগাত্র থেকে গৌরবময় ঐতিহ্য কথা কয়ে উঠল, মুখর হ'ল প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভ ও নগর-প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ; বল্মল ক'রে উঠল বেদ-উপনিষৎ-স্মৃতি পুরাণের পাতা।

ভয় নাই ভারত, তুমি অমর, তুমি চিরজয়ী। কুরাশা আচ্ছন্ন করেছে উত্তুঙ্গ হিমালয়কে, মেঘ ঢেকেছে সূর্যকে—এ সাময়িক, এ ক্ষণিক। এ কুরাশা দূর হবে, এ মেঘ কেটে যাবে।

*

*

*

*

দেওকিনন্দনের দিনলিপিতে এরপর এইটুকু মাত্র লেখা আছে—“নাশুর গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে পথ খুঁজে পেলো তার যেমন আনন্দ হয় আমি তেমন আনন্দ পেলাম এই ‘ভারতের বাণী’ শুনে। আশায় আমার বুক ভরে গেল। কল্পনানৈবেদ্যে দেহভেদ পেলাম, পূর্বদিকস্থ লাল হয়ে উঠেছে, স্বাধীনতা-সূর্যোদয় হ'ল বলে।”



—প্রবোধকুমার সাহা

ছোটবেলাকার কথা মন দিয়ে খখন ভাবতে বসি তখন, কি জানি কেন, একটু দুঃখই পাই। এখনকার জগতে বাস ক'রে তখনকার কালটি ভাবতে গেলে বুঝতে পারি, কেমন যেন একটা আধমরা যুগে আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হত। তখন ভাল ক'রে বাঁচবার সুযোগ যে ছিল না তা নয়, কিন্তু এখনকার মতো এমন বিচিত্র মালমসলা তখন কোথায় ছিল? সকাল বিকেল ছিল পড়াশুনোর চিন্তা, মাঝখানে খালি হাতে কিছুটা খেলাধুলো,—চারদিকের সমাজটা ছিল বড় রূপণ। রূপকথার গল্প শোনা যেতো,—বড় জোর রামায়ণ আর মহাভারত। কিন্তু এখন যেমন প্রতি পদক্ষেপে গল্প আর কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে, তখন এসব কোথায় ছিল? এখন প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনে যেন বিভিন্ন উপকরণ এসে প্রতিক্ষণে ভিড় করছে, তখনকার দিনে এ ভিড় ছিল না। মানুষের এত আবিষ্কার, বিজ্ঞানের এমন জয়যাত্রা, দুঃসাহসীদের এমন অভিযান, জ্ঞান ও বিজ্ঞার এমন বিপুল সমারোহ,—এসব আমাদের ছোটবেলায় স্বপ্নবৎ ছিল।

ইউরোপ এবং আমেরিকার দিকে আমরা চেয়ে থাকতুম নতুন কথা শোনবার জন্য। তখন খবরের কাগজ ছিল কম, সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা ছিল নগণ্য, ইংল

কলেজের পড়াশুনো ছিল পাঠ্য বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ,—এমনিধারা অবশ্য টুকটাকি বাইরের কোনও আকর্ষণের সন্ধান পেলে আমরা তাই নিয়েই হৈ চৈ বাধিয়ে তুলতুম। তাছাড়া তখনকার দিনে ইংরেজ গভর্নমেন্টও এটা চাইত না যে, এত বেশী বাইরের খবর এসে আমাদের কানে ঢোকে।

সিনেমার ছবি আরম্ভ হয়েছিল আমাদের ছোটবেলায়। কিন্তু অভিনয়কর্মীদের শাসন আর বিধিনিষেধ অমাত্য করে সিনেমায় যাওয়া ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তখনকার দিনে চার আনা পয়সা একসঙ্গে যোগাড় করা একপ্রকার অসম্ভব ছিল। এক মণ চাউলের দাম তখন ছিল তিন টাকা, কিন্তু গৃহস্থের পয়সা ছিল বড় কম। খাটি খি যখন সেকালে পাওয়া যেত, তখন কেনবার ক্ষমতা ক'জনেরই বা ছিল? এক দিল্লী কাগজের দাম যখন ছিল চার পয়সা, তখন সেটাকেই মনে হত অনেক বেশী। এরকম অবস্থায় চার আনা দিয়ে সিনেমার ছবি দেখা,—কার এমন বুকের পাটা?

আমরা আস্তে আস্তে কলকাতায় এক আশ্রয়স্থান ক'রে মোটরগাড়ি দেখা দিতে লাগল। তখন ওর নাম ছিল হাওয়াগাড়ি। সেই গাড়ি রাস্তা দিয়ে আওয়াজ ক'রে গেলে তাকে দেখবার জন্য বাড়ির দরজা জানলায় ভিড় জমে যেত। ট্যান্ডি এল অনেক দেরিতে। এক মাইল ট্যান্ডিতে চড়ে যেতে গেলে খরচ পড়ত চার আনা। সাধারণ লোকের সাথো কুলোত না। বড়লোকদের ছিল পালকি গাড়ি, তাদের বাড়িতে থাকত ষোড়া, নম্রত আস্তাবলে,—তাই চ'ড়ে তারা আনাগোনা করত। কারো ছিল ফাঁটন, কারো বা ল্যাণ্ডো। সাধারণ লোকের দরকার হলে ছাকরা গাড়ি ভাড়া ক'রে আনতে হত। তখনকার দিনে গৃহস্থের মেরেরা কেউ পথে বেরোত না। যদি দরকার হত, পালকি এসে দাঁড়াত দরজায়। কেউ কারো বাড়ির মেয়েছেলেকে সহজে দেখতেই পেত না। শুধু মহাষ্টমী আর পালপার্বণে গঙ্গার ঘাটে মেয়েদেরকে দেখা যেত।

আকাশে উড়োজাহাজ যেদিন দেখা গেল,—বেশ মনে আছে, অনেকের বাড়িতে সেদিন উত্তেজনার জ্বল রাস্তা চড়েনি। পাড়ায়-পাড়ায় জনতা, বাড়িতে-বাড়িতে কলরব, ঘরে-ঘরে তর্কের ঝড়। জার্মানীর জেপলিনের গল্প শুনেছিলুম, বোধ হয় যেন কাগজেও তার ছবি ছাপা হয়েছিল, কিন্তু সে সব তো ইউরোপের রূপকথা! চোখের সামনে দিয়ে উড়োজাহাজ আকাশপথে উড়ে গেল, এবং তার মধ্যে মানুষ বসে রয়েছে, এমন বিচিত্র দৃশ্য আর কে কবে দেখেছে? আমরা তখন বড়াই ক'রে বলতে আরম্ভ করে দিলুম, আমাদের রামায়ণ আর মহাভারতে পুণ্ড্রকরবীর কথা লেখা আছে! সকলের আগে নাকি এই ভারতবর্ষেই এককালে উড়োজাহাজ তৈরি হয়েছিল।

দেব দেউল

ছোটবেলায় কলের গান আমরা জানতুম। কিন্তু রেডিও আবার কি! এ আবার এক আশ্চর্য ব্যাপার এসে ঝাঁড়াল। টেলিফোন নয়, তারের সংযোগও নেই,— অথচ চাবি ঘুরিয়ে ঠিক জায়গায় কীটাটি ঠোঁয়াতে পারলে দিবিয়া গানবাজনা! পৃথিবীর সব জায়গা থেকে মানুষের আসল গলার আওয়াজ বয়ে নিয়ে আসছে এই রেডিও,—এর চেয়ে বিষয় আর কি হতে পারে? এ যুগ যেন আমাদের মনে একটার পর একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে চলেছে!

টকির যুগ এল, এল টেলিভিশন, এখন আবার আসছে সিনেমা। সূর্যলোকে রকেট উড়ে চলল, রাতার ঝাঁড়িয়ে রইল দিগন্তের ধর নিয়ে, স্পুটনিক চলে গেল মহাশূন্যেরও বাইরে, চাঁদে যাবার পথ পাওয়া যাচ্ছে, মরা মানুষ মাঝে মাঝে বেঁচে উঠছে,—এর পরে বিজ্ঞানীরা আরও নাকি এগিয়ে চলবে। এটম বোমা, অয়জান বোমা, ব্যালিস্টিক মিসল—এরা দেখতে দেখতেই পুরনো হয়ে এল।

আমাদের ছোটবেলায় মানুষের কৌতূহল ছিল সীমাবদ্ধ, অজ্ঞেই তারা খুলী থাকত, সামান্য কিছু পেলেই সেলাম কৃকে তারা মাথায় তুলে নিত। আজ সে সব আর নেই। ক্ষুধা তৃষ্ণা এখন বেড়েছে, জ্ঞানের সীমা আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, বিজ্ঞার পথ কতদূর অবধি আরও এগিয়ে চলবে কেউ জানে না। বিজ্ঞানের আবিষ্কার, মানুষের বুদ্ধি আর প্রতিভা, যন্ত্রপাতির উন্নতি,—এদের শেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তাই বলছিলাম, একটু হিংসে হচ্ছে। যারা আজ ছোট তাদের সামনে কী আশ্চর্য সুন্দর ভবিষ্যৎ।

বাদের বয়স হয়েছে, চলে পাক ধরেছে, যারা জীবনের সব খেলাগুলো প্রায় শেষ করে এল, তারা আজ বড়ই দুর্ভাগ্য। অনেক নতুন আসছে, আসছে অনেক অনাবিহৃত জীবন, আসছে চারিদিক থেকে বিচিত্রের কৌতুক সস্তার,—কিন্তু আমাদের কালের অনেকই আর থাকবে না। নতুনের হাতে আমরা সর্ব্ব দিয়ে একদিন হাসিমুখে বিদায় নেব।



হাওয়াগাড়ি বেখবায় অস্ত্র বাড়ির বয়সী আনন্দের ভিড় জমে যেত।



যাস্না রে ভাই-

—সুনির্মল বসু

(অপ্রকাশিত)

যাস্না রে ভাই 'হাস্নাবাদে',
মেজাজ যদি খারাপ থাকে,
হাস্তে হবে দিন-রাতির,
পড়তে হবে ঘোর-বিপাকে ;

হাসির নিয়ম ভাঙবে সেখায় শক্তি এমন নাইক কারো,
কাদতে গিয়ে গোমরা মুখে তোমরা হেসে উঠবে আরো ।
অশ্রুটুকু 'অশ্রু'বেয়ে পড়বে ঝরে অভিমানে,
এমন ব্যাপার তাদের দেশে নাইক লেখা অভিধানে ।
গর্বে হাসি হাসতে হবে, হয় যদি ভাই সর্বনাশও,
আছাড় খেয়ে হাসতে হবে, আচার খেয়ে যেমন হাসো ।
কিলটি খেয়ে খিলখিলিয়ে হাসবে হাসি মিঠে-মিঠে,
পিঠের উপর পড়লে লাখি, ভাবতে হবে খাচ্ছ 'পিঠে' ।
নিন্দা শুনে চিন্তা যদি 'মনের' কোণে আসতে থাকে,
ছেলে বুড়ো সবাই মিলে হল্লা করে হাসতে থাকে ।
মরলে পরে আত্মীয় কেউ সাধ্য্যও নাই কাদবে কেহ,
ভীষণ হেসে অশানঘাটে বইতে হবে মৃতের দেহ ।
সরস সবার ধরন-ধারণ, মরণকালে সবাই হাসে,
অবিশ্বাসের কথা তো নয়, হাসি বেরোয় নাভিশ্বাসে ।

দেব দেউল

দাসী-ফ্যাসাদ, হাস্যামা আর অত্যাচারে, হত্যাকালে,
 অট্টহাসি হাসবে সবাই হট্টগোলে, সম্মান তালে ।
 ‘হাস্যনাবাদে’ হাসির আবাদ, হাসির শহর আজগুবি সে,
 সবাই সেখায় ‘হাস্য-রসিক’, জ্যাঠা-ঝুড়ো-মোশো-পিশে ।
 শহর জুড়ে হাসির বহর, হাসির লহর কেবল ওঠে,
 হাস্যমাসিয়ে উঠছে সবাই দম-ফাটানো হাসির চোটে ।
 গুরুমশাই কুঁচকে ভুরু মুচকে হাসে ফোঁকলা-দাঁতে,
 বেত্র খেয়ে ছাত্র-দলে উঠছে হেসে পার্শ্বাশ্রিত ।
 হাঁসুলি গলায় হাসছে মেয়ে হাসনা-হানা গাছের তলে,
 হাঁসেল জুড়ে বামুন উড়ে বিকট হেসে পড়ছে ঢলে ।
 ইতিহাসের উল্টে পাতা হাসছে পোড়া ইঁসুলে সে,
 হাঁসো হাতে চামার দলে ফসল কাটে সরল হেসে ।
 পাতিহাঁসের হাসি দেখে নাতি হাসে ঠাকুরদাদর,
 মানুষগুলোর হাস্য দেখে পাছে হাসি কুকুর গাধার ।
 জেলখানাতে চোর-কয়েদী জোর হেসে সব টান্ছে ঘানি,
 পিঁজরাপোলে অট্টরোলে অকেজো সব হাসছে প্রাণী ।
 হাসছে রুগী হাসপাতালে, হাসছে যুগী আশ্রমেতে,
 ‘হাস্যনাবাদে’ হাসনা রে ভাই,—হাসির লেশায় উঠবি মেতে ।

স্বাধীন আত্মতাঃ স্বাধীন হৃদয়ঃ ।
 স্বাধীনতা বোঝে বনে বন্যঃ স্বাধীনতা ।

—অস্ট্রেবদ

মনিও মুক্তা



ভোম্বাঘের সংকল্প স্বাধীন হোক, স্বাধীন হোক
 ভোম্বাঘের সকলের স্বপ্নঃ । একমন হয়ে সকলে
 মিলে লাভ কর চরম ঐক্য ।



বাপ ও ছেলে



—শ্রীমৎস্যকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

[১]

তিন পুরুষ ধরে এই কাঠের ব্যাঘসা।

হরবিলাস রায়ের তখন মাত্র পনেরো বছর বয়স, লবে লেকেও ক্লাসে উঠেছে, বাপ পশুপতি-নাথ রায় দুল ছাড়িয়ে ছেলেকে কাঠের গোলায় তক্তাপোশের ওপর এনে বসালেন।

বিষস্ত পুরানো কর্মচারী মণ্ডলমশাইকে ডেকে বলেন, ঘোড়ল মশাই, বড়খোকাকে কাঠ চেনান্!

সে আজ প্রায় তিন হুগ আগেকার কথা।

সেদিন লোকে বলতো রায়েরের কাঠের গোলা, আজ হরবিলাস রায়ের, তর্কাবধানে সেই কাঠের গোলায় নাম হয়েছে রায় এণ্ড রায় টিম্বার মার্চেন্টস্...সেদিন কর্মচারীর সংখ্যা ছিল বারো জন, আজ রায় এণ্ড রায়ের মাইনের খাতার একশো বারো জনের নাম...তার মাইনে-করা এজেন্টের দল আসাবে, বর্মার, মালয়-উপবীপে.....

রায়ের কাঠের গোলায় সে তক্তাপোশ আর নেই...তার বদলে আজ দু-তলা বাড়ি জুড়ে রীতিমত আধুনিক অফিস...কর্তা হরবিলাস রায় যে-ঘরে বলেন, সে-ঘরের মেঝে কার্পেট দিয়ে মোড়া...সেই কার্পেটের ওপর বড় বড় সরকারী অফিসর, বড় বড় ফার্মের সাহেব-সুবো, বড় বড় এন্জিনিয়ারদের গুলোহীন দামী ছুতোর চাপ পড়ে...হরবিলাস রায় অকুণ্ঠভাবে ভুল ইংরেজীতে তাঁদের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলেন...ভুল ইংরেজী সত্ত্বেও তাঁরা সকলে হরবিলাস রায়কে শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা জানেন যে লোকটি বেকথা বলে, সে কথার নড়চড় হয় না...এক রকম কাঠের নহুনা দেখিয়ে অল্প রকমের কাঠ চালাবার চেষ্টা করে না, নিজের পাওনা কড়ার গণ্ডার নুক নেয়, অপরের পাওনাও কড়ার গণ্ডায় অবাচিতভাবে ডেকে বুকিয়ে দেয়...ব্যবসার ক্ষেত্রে এ-জাতীয় লোকের বিশেষ স্থান আছে...

হরবিলাস রায় আনতেন, কি কঠোর পরিশ্রমে, কি কঠোর নিষ্ঠায়, এই স্থান তাঁকে অধিকার করতে হয়েছে এবং তার জন্তে...

ভাবতে গেলেই ইহানীং এক অগভীর দীর্ঘশ্বাস সমস্ত বুককে ঢলিয়ে আপনা থেকে ঘেন বেরিয়ে আসতো...

সেই কিশোর-কাল থেকে আর আজ এই প্রৌঢ় পর্বন্ত, যারাই হরবিলাস রায়কে কাছে থেকে দেখেছে, তারাই জানে, একদিনের জন্তেও, আধাবেলার জন্তেও এই লোকটি কাজকে ঠিকি ঘেন নি, তাঁকে দেখলে বোকা যায় কাজের নেশা কাকে বলে...

সকালবেলা বাড়িতে সাতটা বাজতেই হরবিলাস রায় বাড়ি থেকে এসে অফিসে তাঁর চেয়ারটিতে বসতেন...সেই চেয়ারটিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা বস্তি বোধ করতেন। তখন তাঁর অফিসের কোন কর্মচারীই আসতো না...তিনি একা বসে বাতিল-রসিদের উলটো দিকের লাবা পাতার লাবা দিনের কাজের একটা চাট তৈরি করতেন...আগের দিনের চাট-টাও সেই সঙ্গে একবার বেখে নিতেন, গতদিনের কোন কাজ অসমাপ্ত আছে কি না...তার পর বরোরান ডাকের যে সব চিঠি দিয়ে যেতো, নিজে সেই সব চিঠি পড়ে তার ওপর ইন্সট্রাকশান লিখতেন...তারপর হশটা নাগাছ তাঁর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ নিবারণবাহু আসতেন...নিবারণবাহুর সঙ্গে এগারোটা পর্বন্ত নতুন মান লব্ধে আলোচনা করতেন...বাড়িতে এগারোটা বাজতো, হরবিলাস রায় চেয়ার থেকে উঠতেন। বাড়িতে দান-আহার সেরে ঠিক একটার সময় আবার অফিসে চেয়ারে এসে বসতেন...তিনি চেয়ারে বসলে চমকে বড়িতে একটা বাজতো, ফলে একবার বাড়িটার দিকে বেখতেন। তারপর রাজি আটটা পর্বন্ত লোকের সঙ্গে চীৎকার ক'রে, ঝগড়া ক'রে, কর্মচারীদের প্রত্যেকটি কাজের খুঁটিনাটির ওপর খবরদারি ক'রে, প্রজেক্টের বিল

৩ বাপ ও ছেলে

ঐন্দ্রপ্রেমক চট্টোপাধ্যায়

নিরে ছোটখাটো। সংগ্রাম ক'রে, নিবারণবাহুকে কারণে-অকারণে এবেশো বার হমকে যখন চোরার থেকে উঠতেন তখন নিবারণবাহু ছাড়া অফিসে আর কেউ থাকতো না। ঠিক আটটা পনেরো মিনিটের সময় নিবারণবাহুকে সঙ্গে নিয়ে মোটরে উঠতেন...এক ঘণ্টা মোটরে হাওয়া খেয়ে তাঁকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে দশটার মধ্যে বাড়ি ফিরতেন।

দিনের শেষে গল্পার দিকে রাস্তিরে যখন বেড়াতে যেতেন, দেখতেন চৌরঙ্গীপাড়ার বড় বড় ছোট্টেলে আলো জ্বলছে...বিলিতি বাজনার আওয়াজ আসছে...সিনেমার সামনে নিগুন আলোর কারদার বিচিত্র বিচিত্র সব ছবির বিজ্ঞাপন জ্বলছে নিভেচে...হেসে নিবারণবাহুকে বলতেন, নিবারণবাহু চলুন, নেমে একটু দেখে আসা যাক!

নিবারণবাহু শুধু নীরবে হাসতেন, তিনি জানতেন, হরবিলাস রায় জীবনে কাজ ছাড়া আর কোন আনন্দ উপভোগ করেননি...সব-আনন্দ, সব-উৎসব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে তিনি জীবনকে এমনভাবে কাজের বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছিলেন যে সত্যি ইচ্ছা থাকলেও কোথার যেন আজ সংকোচ লাগে, তিনি পারেন না.....

[২]

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ হরবিলাস রায় শহরের শ্রেষ্ঠ ধনীদের একজন.....বিপুল ধন সংগৃহীত হয়ে গিয়েছে, ধন-সংগ্রাহের আর আগ্রহ নেই, আছে শুধু একটা অভ্যাসের প্রেরণা...ত্রিশ বছর ধরে কাজ করে এসেছেন, নতুন নতুন কাজ তৈরি করে তাতে যেতেছেন, আজ ভেতরে কোণার রাস্তি বোধ হয়, কাজের নতুনদের আর কোন প্রয়োজন নেই...আজও তেমনি ঘড়ি ধরে অফিসে আসেন, তেমনি পরিশ্রম করে চলেন, কিন্তু অভ্যাসের বেশে...দিনের শেষে তেমনি নিবারণবাহুর সঙ্গে মোটরে হাওয়া খেতে যেতেন...চৌরঙ্গীপাড়ার সেই আলো-ঝলমল উৎসব-রূপের নৈশ আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়লেই ভেতরটা কেমন মোড় দিয়ে ওঠে, মনে হয় ত্রিশ বছর ধরে কাঠের গোলায় কাঠের পর কাঠ তত্তি করেছেন কিন্তু ভেতরটা সেই অমুপাতে যেন খালি থেকে গিয়েছে...কাজের নেশার মধ্যে অন্তরের শূন্যতার স-খবর ধরা পড়েনি, আজ কাজ থেকে নেশা চলে গিয়েছে, তাই সব কাজের ভেতর থেকে হালকা শোলায় মতন শূন্য মন ভেসে ভেসে ওঠে...রূপ-রস-গন্ধ-ভরা এই বিপুল ধরনীর বিচিত্র বাদ যখন নেবার বরষা ছিল, তখন মনের সব ধরন-জানলা বন্ধ ক'রে সেজন্য কাঠের সঙ্গে শাল কাঠের তকাত হুস্তেই কেটে গিয়েছে...আজ জীবনের ভাট্টার টানে যখন শাসনে বেগে উঠছে রাধেক্যের দালুচর তখন কোথা থেকে মনের ভেতর বেগে ওঠে, কেন বেগে ওঠে, আকুল-করা বিচিত্র সব কামনা?

● বাপ ও ছেলে
ঐক্যপত্রিক চট্টোপাধ্যায়

...ত্রিশ বছর ধরে প্রতিদিন যাবের সঙ্গে মিশেছেন, উঠেছেন, বসেছেন, আজ ফ্যাল-ফ্যাল করে তাদের যুগের দিকে চেয়ে থাকেন, দেখেন তাদের মধ্যে একজনও কেউ নেই যাকে বন্ধ বলে কাছে টেনে বসাতে পারেন, বার সঙ্গে মনের চুটো কথা মন খুলে বলতে পারেন! এ শূন্য মন কার সামনে তিনি তুলে ধরবেন?

এই ত্রিশ বছরের অন্ততঃ এক হাজার মাসুকের সঙ্গে এক-হাজার-রকম সম্পর্কের ভেতর একটাও অন্তরের সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি!

হরবিলাস রায় তাঁর প্রচণ্ড ঐশ্বর্য়ের মধ্যে সহসা অনুভব করেন, তিনি একা!

একদিন বাড়িতে ত্রীরা সামনে অশ্রুমনস্কভাবে বলে ওঠেন, একা একা বড় অস্বস্তি লাগছে!

ত্রী অবাধ হয়ে তাঁর যুগের দিকে চেয়ে থাকেন, বিস্মিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, অফিসে, বাড়িতে, চারদিকে তোমার লোক... একা একা আবার কি! কিসের অস্বস্তি?

হরবিলাস রায় কাউকে বোঝাতে পারেন না, তাঁর কিসের অস্বস্তি!

নিবারণবাহুকে ছ'একদিন বলতে গিয়েছিলেন, নিবারণবাহু হেসে বলেছিলেন, আপনায় আবার চঃখ!

[৩]

হরবিলাস রায়ের মাজিতে ঘুঘু হয় না।

বিরিচি বাড়ি...লোক-জন, আত্মীয়-স্বজনে ভিতি...সকলেই ঘুঘুছে...হরবিলাস রায় ঘুঘুতে পারেন না...

মাজিতে ঘুঘুতে পারেন না, সে কথা কাউকে বলতেও পর্যন্ত পারেন না।

ছেলেবেলা থেকে নিজেদের চোঁয় নিজেদের গড়ে তুলেছেন...

এই দস্ত একদিন তাঁকে শক্তি দিয়েছে, আজ এই দস্তই তাঁর লব্ধ চেয়ে বড় লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কান্নার কাছেই তিনি তাঁর নিজের অসহায়তার কথা বলতে পারেন না...

মাঝে মাঝে কান্নার মতন কি-একটা গলার কাছে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠে, কাঁদতে পারেন না, যদি কেউ দেখতে পায়, যদি কেউ শুনে পায়!

বে-কাজ তাঁর নেশার মতন ছিল, সেই কাজ আজ বিবাহ লাগে...অথচ কাজ করা তাঁর অভ্যাস...সারাদিন নিজেকে নিয়ে কি করবেন?

সারাক্ষণ মনের ভেতর এই প্রশ্ন মনকে উদ্ভাসিত করে তোলে...কাজে ভুল হয়ে যায়...

কর্মচারীরা লব্ধ বলাবলি করে, কি হলো কর্তার?

● বাপ ও ছেলে

ত্রিশপেরেক চট্টোপাধ্যায়

দেব দেউল

৮৫

[৪]

হঠাৎ একদিন বিজ্ঞান-কল্যকের মতন তাঁর মনে জেগে উঠলো...

শংকরনাথ তাঁর একমাত্র সন্তান... তাঁর বিরাট বাবল... তাঁর বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী... তাঁর জীবনকে আনন্দ-মুগ্ধ করে গড়ে তোলাই হবে তাঁর কাজ !

তার আনন্দের ভেতর দিয়ে তিনি নতুন করে পাবেন আনন্দের স্বাদ !

সুন্দর... স্বাস্থ্যবান... তারুণ্যের অমলিন জ্যোতিতে কলমল করছে চোখ-মুখ... পুত্রের মুখের দিকে চাইতেই সংগোপনে মনে এক বিপুল উল্লাস জেগে ওঠে !

পুত্র সশব্দে কোনদিন তাঁর মনে বিশেষ কোন ভাব ভাগেনি, পিতা বা স্বাভাবিক কর্তব্য নিষ্ঠাসহকারে তা পালন করে এসেছেন মাত্র, আজ সহসা পুত্রের দিকে চেয়ে তাঁর মনে জেগে উঠলো; পুত্র-নাথক নরক থেকে তাকে ত্রাণ করবে, কি করবে না, তা তিনি জানেন না... তবে জীবনের এই চরম অসম্পূর্ণতার বেদনা থেকে আজ সে-ই একমাত্র তাঁর ত্রাণকর্তা !

পুত্র শংকরনাথ, আজ তাঁর চোখে এক অপূরণ নতুন মূর্তিতে জেগে উঠলো... পুত্র আজ তাঁর ত্রাণকর্তা... তাঁর ইষ্ট... জীবনের সব নৈবেদ্য তার জন্তে !

[৫]

কিন্তু...

এতদিন ধরে পিতা আর পুত্রের মধ্যে যে-সবন্ধ ছিল, বাইরের দিক থেকে তা ছিল শুধু কর্তব্যের সন্ধর্ভ। সে-কর্তব্যে কোন ক্রটি ছিল না, কিন্তু প্রকৃত্ত কোন অমুরাগ ছিল না। উতাপ ছিল না।

হরবিলাস রায়ের মনে পড়ে, যখন শংকর সবে অদ্বৈত, যন্তরবাড়িতে বেথকে গেলেন... শান্ত্রী শিশুকে এনে তাঁর হাতে তুলে দিলেন... হরবিলাস লজ্জার সংকোচে শিশুকে কোলে নিতে পারলেন না... এই লজ্জা, এই সংকোচ নিঃশব্দে বেড়েই চলেছিল। হরবিলাস রায় বতাবতঃই সেই ধরনের মানুষ, যারা বাইরে অমুরাগে উচ্ছল হতে পারে না। বাইরে থেকে লোকে বেগে তাদের বলে, ওড়া মানুষ। হরবিলাস রায় ছিলেন সেই ওড়া মানুষ।

বড়লোকের বাড়ি, শিশুকাল থেকেই শংকরের দেখাশোনায় জন্তে বিশেষ বি-চাকরের বন্দোবস্ত ছিল... সেখানে কোন ক্রটিই হয়নি... তিন-চারজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিলেন তার পড়াশোনার জন্তে। যখন আরো একটু বয়স হলো, তখন কিশোর শংকরনাথের জন্তে একজন বিশেষ চাকর নিযুক্ত হলো, তার কাজ শুধু শংকরনাথের দেখাশোনা করা, বাড়ির পূর্বানো চাকর কেউ-র ওপরই সেই ভার পড়লো।

● বাপ ও ছেলে
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র চট্টোপাধ্যায়

শংকরনাথের খাওয়া-দাওয়া, শোয়া-বসা, ওঠা-ছাটা, সবই দেখতে হতো কেঠেকে। হরবিলাস পুত্রের খবর নিতেন কেঠের কাছ থেকে। পুত্রের বা-কিছু আবদার বারনা, তা কেঠের মারকতে তাঁর কাছে এসে পৌছত। শংকরনাথ সামান্যমনি পিতার কাছে বড়-একটা আবদার করবার সুযোগ পেতো না। সবাই হরবিলাস রায়কে কড়া মাহুয বলেই চিনতো, শংকরনাথও সেই আবদারগর পিতাকে ছেলেবেলা থেকেই ভয়ের চোখে দেখতে শিপেছিল। বালক-কালে এক-একদিন কেঠের সঙ্গে সে অফিসে যেড়াতে যেতো, কিন্তু দূর থেকে শুনতে পেতো হরবিলাস রায় কর্মচারীদের চীৎকার করে শাসন করছেন...সমস্ত অফিস ভরে তটহ...শংকরনাথ চুপি চুপি কেঠেকে বলতো, কেঠদা, চল, বাড়ি ফিরে যাই! হরবিলাস রায় বধন দিনের কাজ শেষে বাড়ি ফিরতেন, তখন বালক শংকরনাথ তার নিজের ঘরে ঘুমিয়ে থাকতো।

আজ শংকরনাথ গুল ছেড়ে কলোজে ভতি হয়েচে। কিন্তু আজও পিতাকে ভেমনি ভয়ের চোখে দেখে, পিতার কাছে কিছু চাইতে হলে সে সোজা পিতাকে গিয়ে বলে না, বলে কেঠেকে।

পিতা পুত্রের এই সঙ্কল্পের মধ্যে কোথাও যে কোন অস্বাভাবিকতা আছে বা কোন ত্রুটি আছে, তা কোনদিন হরবিলাস রায়ের মনে হয়নি।

আজ সহসা বৃষ্টিতে পারেন, কোথায় যেন কি ভুল হয়ে গিয়েছে। পুত্রকে নিবিড়ভাবে, অন্তরঙ্গভাবে কাছে পেতে গিয়ে তিনি বৃষ্টিতে পারেন, পিতা-পুত্রের সঙ্কল্পের মধ্যে এমন একটা আড়ষ্টতা গড়ে উঠেছে যাকে ডিঙিয়ে সহজ আর অন্তরঙ্গ হওয়া খুবই কঠিন। পুত্রকে একান্ত ভাবে কাছে টানতে গিয়ে দেখেন, পুত্র তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে। অথচ পুত্রের বিরুদ্ধে এতটুকু অভিযোগ করবার তাঁর কিছু নেই। সব কর্মচারী একবাক্যে শংকরনাথের প্রশংসা করে, হরবিলাস রায়কে শুনিয়া সুযোগ পেলেই তারা বলে, এমন বিনয়ী, এমন শান্ত এমন ভদ্র ছেলে আজকাল দেখা যায় না!

পুত্রের এই প্রশংসা শুনে হরবিলাস আগে মনে মনে লঙ্ঘন হতেন কিন্তু ইদানীং পুত্রের এই প্রশংসা শুনেই মনে মনে কেপে উঠতেন...আপনার মনে শুধরে উঠতেন...খুব বুঝে বাড়ি হেঁটে করে না থেকে, কেন সে হুসন্ত ছেলের মতন তাঁর কাছে এসে বাঁধি করে না? আজ যে তিনি তাকে সব সেবার জন্তে বলে আছেন, সেখানে যদি সে বাড়ি হেঁটে করে চুপ করে থাকে, কি করে তিনি তাকে বোঝাবেন, তাঁর জীবনের একমাত্র আনন্দ থেকে সে তাঁকেই বঞ্চিত করছে!

নেই সময় শহরে বিলম্ব থেকে এক বিখ্যাত নির্যায় হল এলো...তাদের নাচগান, অভিনয় দেখবার জন্তে শহর ভেঙে পড়লো।

● বাপ ও ছেলে

ঐক্যপত্রিক চট্টোপাধ্যায়

দেব দেউল

৮৭

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেধতে দেখতে হরবিলাসের চোখ জলে উঠলো !

নিজে গিয়ে চারখানা ভাল সীট রিজার্ভ করে টিকিট নিয়ে এলেন... জীবনে এই প্রথম !

বাড়িতে এসে শংকরনাথকে ডেকে পাঠালেন ।

শংকরনাথ এসে
দাঁড়ালো, গায়ে একটা
আধ-ময়লা অতি সাধারণ
টুইলের শাট, পায়ে একটা
স্ট্রাপ-হেঁড়া পু রানো
প্রিয়ার...

শংকরনাথ সাধা-
রণতঃ এই পোশাকেই
ঘোরে ফেরে কিন্তু তার
অস্বাভাবিকতা কোনদিন
হরবিলাসের নজরে
লাগেনি... আজ পুত্রকে
সেই পোশাকে দেখে
হরবিলাস ফেপে উঠলেন,
যেজ্ঞে ডেকেছেন সেকথা
ভুলে চাপা রাগে ভীকৃকর্থে
বলে উঠলেন,

—তু মি কি

লোককে জানাতে চাও, হরবিলাস ভীকৃকর্থে বলে উঠলেন—তুমি কি লোককে জানাতে চাও, তোমার বাবা
তোমার বাবা তোমাকে
খেতে পরতে দেয় না ?

শংকরনাথ বুঝতেই পারে না, হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন উঠলো, ক্যাল ক্যাল করে শিতার মুখের
দিকে চেয়ে থাকে !

—আবার অকসি বর বাঁট দেয় যে আঁচলু...তারও পোশাক তোমায় চেয়ে ভাল !

● বাপ ও ছেলে
শ্রীমদেবকান্ত চট্টোপাধ্যায়



শংকরনাথ কুণ্ঠিতভাবে নিজের পোশাকের দিকে চায়।

—কেন, আমি তো রাজাই এই রকম পরি...

হরবিলাস চাৎকার করে ওঠেন, কেন পরো? তোমার বাবার কি এমন পরসার অভাব...

কেট! কেট!

কেট এসে দাঁড়ায়।

হরবিলাস গর্জে ওঠেন, শংকরবাবুর আমা-কাপড় নেই, সেকথা আমাকে বলে না কেন? কিসের ভজ্ঞে তুমি আছ? কাছ করতে যদি আর ভাল না লাগে, পেনসন নিয়ে বাড়ি চলে বাও।

কেট কিছু না বলে, ঘরের ভেতর এসে আলমারিটা খোলে।

—দেখুন, আলমারি ভর্তি আমা-কাপড়...না পরলে, আমি কি করবো বলুন?...আর তো ছোট-টি নেই যে জোর করে পরিয়ে দেবো!

হরবিলাস দেখেন, বৃহৎ আলমারি ভর্তি থাকের পর থাক, কাপড়, জামা, কোট, প্যান্ট...

পুত্রের দিকে চেয়ে দেখেন, দেখেন শংকরনাথ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে...সারা মুখ যেন তার থম্ থম্ করছে!

—এ সব কাপড়-জামা যদি না পর, তৈরি করিয়েছ কেন?

শংকরনাথ একান্ত শাস্তকণ্ঠে বলে, আমি তৈরি করাইনি!

পুত্রের সেই শাস্ত প্রতিবাদের মধ্যে হরবিলাস মহা-আতঙ্কে উপলব্ধি করেন...যেন তাঁর পুত্র আর তাঁর মাঝখানে মহা-ভয়ংকরের মতন কে দাঁড়িয়ে!

হরবিলাস কণ্ঠস্বরকে সংযত করে বলেন, তুমি তৈরি করাওনি, সে আমি জানি...কিন্তু তোমার ভজ্ঞেই এই সব তৈরি হয়েছে, তা তো জান!

তেমনি শাস্ত নম্রকণ্ঠে শংকরনাথ বলে, এ সব জামা-কাপড়...আমার কোন দরকার নেই!

হরবিলাস জামার পকেটে বিশিষ্ট থিয়েটারের টিকিটগুলো আঙুল দিয়ে হুচড়ে হুমড়ে কেলেন। পড়ে-বাড়ির ভেতর বড়ো হাওয়ার আর্তনার মতন তাঁর মনে আর্তনাধর করে ওঠে সেই ছটি কথা—দরকার নেই!

সামাজ্য জামা-কাপড়ের বার দরকার নেই—তার ভজ্ঞে মনে মনে তিনি যে বিরাট ঐশ্বর্যের নৈবেদ্য লাঞ্চিতহে...

হরবিলাস রায় আর ভাবতে পারেন না। একবার চেষ্টা করলেন অিজ্ঞাপা করতে, কেন দরকার নেই? কিন্তু পুত্রের মুখের দিকে চেয়ে সাহসে কুলোলো না, বহি এর চেয়ে কোন আশ্রির কথা...

● বাপ ও ছেলে

ঐনুপেন্দ্রকাক চট্টোপাধ্যায়

দেব দেউল

৮৯

গভীরভাবে শুধু বলেন, যাও !

শংকরনাথ চলে গেলে, পকেট থেকে চারখানা টিকেট বার করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে ফেলে দিলেন।

[৬]

সারারাত হরবিলাস রায় ঘুঘুতে পারলেন না...

তার মনের কোণে একটা অস্পষ্ট ভাবনার ছায়া-মুতি জেগে ওঠে...শংকরনাথ কি তার অজ্ঞাতে কোন রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পড়েছে ? তার মতন ব্যক্তিহীন নরম-হাঁচের ছেলের পক্ষে কোন রাজনৈতিক নেতার প্রভাবে পড়া আশ্চর্য নয়...বিশেষ করে আজকাল, যুগোপ থেকে আমদানি হয়েছে সাম্যবাদ...

হরবিলাস রায় অন্ধকারে বিছানায় উঠে বলেন—

হঠাৎ মনে পড়ে, অফিসের জানালা থেকে সেদিন দেখেছেন এই রকম এক সাম্যবাদী দলের শোভাযাত্রা...শোভাযাত্রীদের পোশাক ঠিক শংকরের পোশাকের মতন, গায়ে আধ-ময়লা শাট, পায়ে ছেঁড়া শ্লিপার...

হরবিলাস রায় ভয়ে শিউরে ওঠেন।

মাইনে-করা লোক রেখে তিনি ভেবেছিলেন, ছেলের লব্ধে যা করা কর্তব্য তা তিনি ঠিকই করে চলেছেন...আজ নিদ্রাহীন নিশীথে স্পষ্ট বৃত্তে পারেন, যে লজ্জা পুত্রকে দেওয়া উচিত ছিল, তা তিনি দেননি...সেই ঠাঁকে তার পুত্র তাঁর কাছ থেকে বহু দূরে সরে গিয়েছে...

ভারতবর্ষের অরণ্যে অরণ্যে কোথায় কি কাঠ আছে, তা তিনি নিখুঁতভাবে জানেন কিন্তু তার নিজেই ছেলের, একমাত্র ছেলের, মনের থবর কিছুই জানেন না...

প্রতিজ্ঞা করেন, এ ক্রটি সংশোধন করতে হবে...এমন কায় এত প্রভাব, কিসের এত প্রভাব যে তাঁর ছেলেকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে ?

[৭]

চিরকাল প্রান করে কাজ করে এসেছেন এবং প্রত্যেক প্রানই তিনি সার্থক করে তুলেছেন...

রায় এও রায় কোম্পানির সমস্ত কাজ তুলে তিনি মনে মনে প্রান করেন, কি করে শংকরনাথকে তার আরস্তের মধ্যে আনবেন...বীয়ে বীয়ে শংকরনাথকে তার চেয়ারে বসিয়ে তিনি অবসর নেবেন...

● বাপ ও ছেলে

শ্রীমুগ্ধকাক চট্টোপাধ্যায়

বেটুকু জীবন অবশিষ্ট আছে, প্রতিটি মুহূর্ত তার আনন্দে উপভোগ করবেন... উপভোগ করবেন, তাঁর পুত্রের আনন্দের তেতর দিয়ে...

ঠিক করলেন, ঘটা করে শংকরনাথের জন্মতিথি পালন করবেন...

বাগান করবেন বলে গজার ধারে বিরাট এক বাগানবাড়ি কিনেছিলেন... গোড়ায় গোড়ায় ছুটির দিন সেখানে যেতেন... কিন্তু আজকাল আর ভুলেও সেদিকে যান না... মালীরা মাঝে মাঝে নানারকমের তরকারি পাঠিয়ে দেয়, তাতেই তিনি খুশি...

ঠিক করলেন, এই বাগানবাড়িতেই শংকরনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করবেন...

নিবারণবাবুকে পাঠিয়ে দিলেন, বাগান পরিকার করাতে।

নাম-করা ডেকরেটর মায়া কোম্পানিকে ডেকে পাঠালেন, শামিয়ানা, চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি দিয়ে বাগান সাজাতে...

শংকরনাথকে ডেকে পাঠিয়ে বলেন, তোমার বন্ধু-বান্ধবদের একটা লিস্ট আমাকে দাও! এবার তোমার জন্মতিথিতে তাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করো... প্রভুলবাবুকে দিয়ে একটা ভাল ডিজাইন করিয়ে নিয়ে কার্ড ছাপাও... লেটেষ্ট ভাল ছবি, কি দেখানো হচ্ছে?

উন্নীত হওয়া দুয়ে থাক, শংকরনাথের মুখের দিকে চেয়ে হরবিলাস বুঝলেন যেন সে নিজেকে বিপর্যয় বোধ করছে!

হরবিলাস চোটা করে শাস্তকণ্ঠে বলেন, ও রকম খোকার মতন মুখ করে আছি কেন?

শংকরনাথ কোন রকমে বলে, আমার জন্মতিথির দিন... আমি... বরানগরে বাব...

—বরানগরে বাবে? কেন?

—সেখানে... বামীজীর আশ্রমে...

হরবিলাস তার চীৎকার করে ওঠেন, কি বলো?

ভীত গুচ্ছ কণ্ঠে শংকরনাথ বলে, বরানগরে বামীজীর আশ্রমে বাব...

হরবিলাস মায়ের মনে আভ্যন্তরীণ যে ছায়াস্রুতি ছিল, তা যেন স্পষ্ট রূপ ধরে সামনে জেগে ওঠে। সারা গা দিয়ে যেন আগুনের হলুদ উঠতে থাকে। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে ভেতর থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে শাস্ত বাতাবিক কণ্ঠে হেসে বলেন, ও... ভালই তো... বামীজীর আশ্রমে না হয় আর একদিন বাবে...

শিঙার মুখে হাসি বেখে সহজ সরল শংকরনাথের মনে সাহস ফিরে আসে, সহজভাবেই বলে, অজ্ঞ দিন গেলে হবে না বাবা... সেদিন আমার জন্মেই বামীজী হোম করবেন... হোম না হওয়া পর্যন্ত আমাকে উপোস দিয়ে থাকতে হবে বলেছেন...

● বাপ ও ছেলে

ঐক্যবদ্ধ চট্টোপাধ্যায়

হরবিলাস রায় তেমনি হেসে বলেন, এই বানীজীর কাছে তুই প্রায়ই বাস্ বৃক্ষ ?

আখন্ডভাবে শংকরনাথ বলে, হ্যাঁ...তিনি আমাকে খুব ভালবাসেন...

—কই, তাঁর কথা তো আমাকে কিছু বলিস্ নি কোনদিন ?

—তুমি রাগ করবে বলে, বলিনি !

—কি করে জানলি যে আমি রাগ করবো ?

শংকরনাথ কোন জবাব দিতে পারে না।

তেমনি শাস্ত্রকণ্ঠে হরবিলাস জিজ্ঞাসা করেন, জন্মতিথির দিন চিরকাল হয়ে আসছে, ছেলেকে চতুর্থ ব্যঞ্জন দিয়ে খাইয়ে বাপ্-মায় আনন্দ...অর্থাৎ গরীব যে, সে-ও সেদিন ছেলেকে ভাল-মন্দ যা হোক খাওয়াতে চেষ্টা করে, সেদিন তুমি উপোস দেবে কেন ?

শংকরনাথ উৎসাহিতভাবে বলে, তিনি বলেছেন !

হরবিলাস রায় আর নিজেকে সংবত করে রাখতে পারেন না। ফুৎ সিংহের মতন গর্জন করে ওঠেন, তিনি যে-ই হোন, তিনি যদি স্বয়ং ভগবানও হন...আমার চকুম, জন্মতিথির দিন তুমি এক-পা বাড়ি থেকে বেরুতে পাবে না...যদি অবাদ্য হও, পায়ে শিকল-দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখবো...বাও ! যাও, আমার সামনে থেকে !

এতকণে হরবিলাস রায় বুঝতে পারেন পুত্র শংকরনাথের ময়লা শাট আর ছেঁড়া স্লিপারের রহস্য !

বোকার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে শিউরে ওঠেন।

আজ তাঁর একান্তভাবে দরকার তাঁর ছেলেকে...যে-আনন্দ নিয়ে কখনো ভোগ করেন নি, আজ পুত্রের সুখ দিয়ে সে-আনন্দ ভোগ করবেন...তার অচ্ছেদ্য মনে মনে হাজার মকহের নৈবেদ্য সাজিয়ে রেখেছেন...এর চেয়ে সহজ আকাঙ্ক্ষা আর কি হতে পারে ?

কল্পনাও করতে পারেননি, এই সব-চেরে-সহজ আকাঙ্ক্ষার পথে বাধা হবে, ধর্ম !

বহু শত্রুর সঙ্গে লড়াই করেছেন কিন্তু এ শত্রুর সঙ্গে কি করে লড়াবেন, তাঁর কোন সন্ধানই আনেন না !

নিজেকে নিতান্ত অসহায় লাগে।

তীব্র বেধনার তাঁর অন্তর থেকে প্রায় বেগে ওঠে !

যে গাছ ছায়া বিতো, ফল বিতো, ফুল বিতো, সে-গাছকে কেটে বারো উহন জালায় তাদের বিরুদ্ধে আইন আছে.....

অকালে জীবনকে বারো কেটে ওকিরে কেলে তাহের বিরুদ্ধে আইন নেই কেন ?

দেয় দেউল

[১]

এতদিন বা করেননি, আজ তা করতে বাধ্য হলেন হরবিলাস রায়...

পুত্র লব্ধকে তন্ন তন্ন করে খবর নিলেন।



শংকরনাথের বালিসের তলা থেকে একটা ফটো

পেলেন, বাঘের চামড়ার ওপর বসে এক স্বামীজী!

ধমক খেয়ে কেঁট বসো, ঘরে খিল দিয়ে থোকাবাবু

এই ফটো বায় করে তার সামনে চোখ বুঁজে বসে থাকে!

জেরা করতে ক্রমশঃ

সে প্রকাশ করলো,

থোকাবাবু মাংস খাওয়া

অনেকদিন হলো চেঁড়ে

দিয়েছে... ইমানীং বড়

মাছ হলে আর খায়

না... ছোট ছোট চুনো

পুটি হলে খায়... জুতোতে

কালি দিলে চটে যায়

...সাবান মাখে না...

স্নান করে চুল আঁচড়ায়

না... রবিবার দিন কারুর

সঙ্গে কোন কথা বলে

না... সে দিন কেউকে

আকারে ইজিতে বুঝে

নিতে হয় থোকাবাবু কি

বলছে...

হরবিলাস গর্জে ওঠেন, এসব কথা তুই আমাকে জানাসনি কেন?

হরবিলাস গর্জে ওঠেন, এসব কথা তুই আমাকে জানাসনি কেন?

কেউ বলতে বাধ্য হয়, এসব কথা যদি আপনাকে জানাই, তাহলে থোকাবাবু বাড়ি ছেড়ে চলে বাবে বলেছে!

৩ বাপ ও ছেলে

শ্রীশঙ্করচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দেব দেউল

৯৩

প্রচণ্ড রাগে হরবিলাসের সারা শরীরটা কেঁপে ওঠে, কিন্তু কার ওপর রাগ করবেন বুঝতে পারেন না!

সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়লো স্ত্রীর ওপর...সংসারে নেমে এলো অশান্তির ঘন কালো ছায়া।

বাড়ির ভেতরে যখনি ঘান, শংকরনাথের দেখা পান না! তাঁর বেদনার বুঝতে পারেন, তাঁর পায়ের শব্দ পেলেই শংকরনাথ সরে যার!

ঠিক করলেন, যত শীগগির পারেন ছেলের বিয়ে দেবেন!

কিন্তু স্ত্রীর মুখে শুনলেন, তেলে বলেচে বিয়ে সে কিছুতেই করবে না!

আহত বাবের মতন হরবিলাস রায় ভয়ংকর হরে ওঠেন...অফিসে চুপটি করে বসে থাকেন, কোন কাজ-কর্ম করেন না...নিবারণবাথু একটা অত্যন্ত দরকারি কাজের জেদে ফাইল নিয়ে গিরেছিলেন...ফাইলের দিকে চেয়েও দেখেননি...সমস্ত কাজ স্থাপহীন লাগে...জানলা থেকে মুখ বাড়ালেই নজরে পড়ে, বিরাট কাঠের গোলা।...সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, যেন কাঠের গোলায় আঙুন লেগে গিরেছে...চারদিক থেকে ঘোঁরা উঠেছে...

এক একবার শুধু মনের ভেতর অসীম দৌড়হল ভেগে ওঠে, শংকরনাথ কি বিদ্যুদ্গতি গতে পারছে না, অকারণে কি নিবারণ বাথা তাঁকে দিচ্ছে?

[১০]

শংকরনাথের জন্মদিনে ঘুম থেকে উঠেই হরবিলাস ছেলেকে ডেকে পাঠালেন...

সামান্যত ঘুমোতে পারেননি, একটা সিদ্ধান্তের জেদে ছটকট করেছেন...দেখকালে ঠিক করেন, সে যদি আজ স্বামীজীর আশ্রমে যেতে চায়, তিনি বাধা দেবেন না...

কেট এসে জানালো, খোকাবাথু বাড়িতে নেই!

—কোথায় গিরেছে?

শুককণ্ঠে কেট কোনরকমে বলে, কাল রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি!

হরবিলাস যেন কিছু বুঝতে পারেন না।

শান্তকণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করেন, রাত্তিরে বাড়ি ফেরেনি, কে?

তেমনি শুককণ্ঠে কেট বলে, খোকাবাথু!

হরবিলাস রায় গর্জে ওঠেন না, চীৎকার করেন না, কেটকে কোন রকম কপা বলেন না...

তাঁর ছেলে রাত্তিরে বাড়ি ফিরে আসেনি...তাঁর জন্তেই!

হরবিলাস রায় হেসে ওঠেন!

● বাপ ও তেলে

ঐক্যবদ্ধক চট্টোপাধ্যায়

একি স্বরে কোণা থেকে কান্নার জোয়ার তাঁর সারা দেহকে কাঁপিয়ে তোলে...ছোট ছেলের মতন কেঁদে ওঠেন !

এত বড় পরাজয় তিনি কি করে মেনে নেবেন ?

[११]

গাড়ি করে হরবিলাস রায় বরানগরে আসেন, স্বামী নিগমানন্দের মঠের সামনে এসে গাড়ি পারাতে বলেন।

গাড়িতে বসে তিনি খোলা দরজার ভেতর দিগে আশ্রমের দিকে চেয়ে দেখলেন, ...দেখলেন
আস। তাঁর সান্নিধ্য হয়েছে...গাড়ির আকর্ষণে সঙ্গে সঙ্গে আশ্রম প্রাঙ্গণের ভেতর ছোটোছুট
শুরু হয়ে গিয়েছে।

সামনেই খানতিনেক চিটে-ধেড়ার ঘর, মাঝখানে ছোট বাগানের মতন খানিকটা আরগা,
তাম ওপরে সান-বাথানো চম্বরের ওপর ছোট মন্দির...অসমাপ্ত...মন্দিরের গায়ে ভার্য বীথ
রয়েছে...

হরখিলাস দেখলেন, চব্বরের শিঁড়ি দিয়ে প্রায়-বৃদ্ধ সৌম্য-বর্শন এক সন্ন্যাসী খড়ম
পায়ে বরজার দিকে এগিয়ে আসছেন...

ହରଦିନାମ ଗାଢ଼ି ଥେକେ ନାଥେନ ।

সন্ন্যাসী নামনে আগতেই হরদিনাগ হাত তুলে নমস্কার করেন ..

মধুর হেসে সন্ন্যাসী বলেন, চিন্তে পারলো না !

হরবিলাস বলেন, আপনার দর্শন-প্রার্থী !

—ଆଶ୍ଚନ ! ଆଶ୍ଚନ !

সন্ন্যাসী লম্বাঘর করে হরখিলাসকে নিয়ে মন্দিরের চত্বরে বসেন। ইতিমধ্যেই একজন ভক্ত
হুখানি ভাল আসন সেখানে পেতে বিয়েছিল। একজন একটা হারিকেন লঠন এনে রাখে।

হেসে সন্ন্যাসী বলেন, বহিষ্কৃত আশ্রম, এখনো ইলেকট্রিক আলো নিতে পারিনি !

হরদ্বিনাস সে-প্রসঙ্গ না তুলে বলেন, আপনিই কি...

সঙ্গে সঙ্গে শেহন থেকে একজন প্রোট লোক মুখস্থ বলার মতন বলে ওঠেন, উনিই
 খ্রীষ্টাব্দী নিগবানক বহরাজ...এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা...আবাহের স্বাকাকর্তা!

শেখের কথাগুলো বলতে শুভ্রলোকের গলা যেন কেঁপে ওঠে।

বাগ ও ছেলে

अनुपमसुख छोटोनाथान

হরবিলাস স্বামীজীর দিকে চেয়ে বলেন, আপনার কাছে এক আবেদন নিয়ে এসেছি...কিন্তু...

হরবিলাস আশেপাশের ভক্তদের দিকে চাইতেই স্বামীজী তাঁদের একজনকে ডেকে বলেন, মধুসূদন, তোমরা এখন...

কি ইচ্ছিত করেন, সঙ্গে সঙ্গে ভক্তরা সরে যান।

হরবিলাস সোজাহুজি বলেন, বুঝতেই পারছেন শরাজীবন খনই সঞ্চয় করেছি...কিন্তু শান্তি পাইনি...আপনার কাছে আমার কিছু জীবনবার আছে...

স্বামীজী উন্নতিভাবে বলেন, বেশ তো...বেশ তো...যদি আমার দ্বারা আপনার কোন কাজ হয়...

—হবেই...তবে তার আগে আপনাকে আমার নিষয়গ্রহণ করতে হবে...আপনাকে একদিন আমার গুণানে আসতে হবে...আপনার সেবার কোন ক্রটি হবে না...সেখানেই আমার কথা আপনাকে নিবেদন করবো!

স্বামীজী সহজেই রাজী হয়ে গেলেন।

[১২]

নিদিষ্ট দিনে হরবিলাস মোটর পাঠিয়ে দিলেন। মোটরে গেলেন নিবারণকান্দু...নিবারণকান্দুকে তিনি শিখিয়ে দিলেন, তিনি যেন কোন কথাই না বলেন।

অফিসে তাঁর বিশ্রাম-কক্ষে স্বামীজীকে অভ্যর্থনা করবার বিশেষ ব্যবস্থা করেন।

নিজে স্বামীজীকে মোটর থেকে নামিয়ে তিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন।

ঘরের দরজা ভেঙিয়ে দিলেন।

হরবিলাসের সোজাহুজী হুত্ব হলেন।

প্রাথমিক কথাবার্তার পর হরবিলাস সোজাহুজি তাঁর কথা পাড়লেন,

—আমার একটি ছেলে আছে, বড় সরল...এই যে দেখছেন আমার ব্যবস্থা...তিনপুরুষের সন্তান তা গড়ে উঠেছে...প্রায় হাজার খানেকের মত লোক এই প্রতিষ্ঠান থেকে অন্ন পায়...আমার সাধ, আমার ছেলে এই বিরাট কর্ম-প্রতিষ্ঠানের ভার নেবে...আমি আনন্দে অবসর নেবো...

স্বামীজীর ক্রটা একটু কঁচকে ওঠে, জিজ্ঞাসা করেন, তাতে হুঁ কোন বাধা উপস্থিত হবে?

● বাপ ও ছেলে

শ্রীমৎস্যক কটোপাধ্যায়

দেব দেউল

—আজ্ঞে হ্যাঁ...আজকাল তো চেনেন, বেশে ধর্ম-ব্যবসারী সাধু-সন্ন্যাসীর অভাব নেই... এই রকম কোন সাধুর পাল্লার আমার ছেলেটি পড়েছে এবং সাধুর শিক্ষায় তার তরুণ মন একেবারে কর্মবিমুখ হয়ে গিয়েছে...আপনিই বলুন, যে ধর্ম তরুণ মনকে কর্মবিমুখ করে, সে কি ধর্ম?



মহারাজ কোথায়

যেন অস্বস্তি বোধ করেন, তবুও বলেন,

—না, না.....

আমাদের ধর্মে কর্মকে মস্ত বড় স্থান দেওয়া হয়েছে.....উপযুক্ত ভাবে কর্ম শেষ করলে, তবে সন্ন্যাসী...

হরবিলাস বলেন, যদি কেউ সন্ন্যাস না নেয়, সে কি সংসারে থেকে ধর্ম-পালন করতে পারে না?

মহারাজ অতিরিক্ত জোর দিয়ে বলেন, অবশ্যই পারে নিশ্চয়ই পারে!

—অথচ সেই

সাধুটির পাল্লার পড়ে আমার ছেলের ধারণা হয়েছে যে বিয়ে করাও অস্তায়!

হরবিলাস হিরকণ্ঠে বলেন, তিনি আমার সামনেই বসে আছেন।

মহারাজ জুঁকুকে বলেন, না...না...এ তো ঠিক নয়...বে সময়ের বা...সে সাধুটি কে?

হরবিলাস হিরকণ্ঠে বলেন, তিনি আমার সামনেই বসে আছেন!

নিপথবান্ধ মহারাজের মুখ শুকিয়ে যায়, তবুও নিষেধে সামলে নিরে বলেন,

বাণ ও ছেলে

ঐন্দ্রেশ্বরক চট্টোপাধ্যায়



হুমবিলাস হাত তুলে নমস্কার করেন

দেব দেউল

৯৭

—আপনি কি বলছেন ?

—আমি ছেলে শংকরনাথ আপনার আশ্রমেই যাত্রাভ্যাস করে...

বত চোঁয়ায় যেন মহারাজের অরণ্যে পড়ে,—ঈ, ঈ, শংকরনাথ...মনে পড়ে বটে। একটি ছেলে মাকে মধ্যে আসে বটে। আমি মনে করেছিলি মাদারগণের ঘরে ছেলে...

হরবিলাস কুন্তে পারেন, দাঁড় পড়ে মহাবাজ মিশ্রা কথা বলছেন। ঈ বাজ করে বলেন, ঈ তার জন্মদিনে ঘটা করে যজ্ঞ করেছিলেন ?

নিম্নমানিক মহারাজ অব বসে থাকতে পারেন না, উঠে পড়ান।

—দেখুন, ডেকে এনে আপনি এভাবে আমাকে

—বিচলিত হবেন না...আপনাকে অপমান করবার জন্যে আমি...আপনাকে সত্যি সত্যি জানাই ডেকেছি। একতরফা করে আপনার আশ্রমে আসা যাবে কত সুখ হয় ?

মহাবাজ ভিতরে ভিতরে আশ্বস্ত হন। যথেষ্ট হাসি কুটে গুটে।

—সে তো অনেক ঠিক হবে...পন্থে...কি দিশ হাজার মন্থন।

—আমি এখানেই আপনাকে দিচ্ছি...আপনি স্বপ্ন কণা দিন

হরবিলাসের কথা শ্য না হতেই উৎসাহের মহাবাজ বলে ওঠেন, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি। শংকরনাথকে আর আমি আশ্রমেই আসতে দেবো না...

—আপনি বসুন, আমি ঢেক নিয়ে আসছি...

তিনপুরুষে বাবসারী ঘরের বাইরে এসে দেখেন, নিবারণবাবুর সঙ্গে শংকরনাথ দাঁড়িয়ে.....

শংকরনাথ ঘাড় ঝেঁট কবে দাঁড়িয়ে

নিবারণবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে হরবিলাস ইচ্ছা করেই শংকরনাথকে বরজার কাছে ঠাঙ করিয়ে দেয়...যাতে সে নিজের কানে তার আরাধা শ্রুতির কথা শুনতে পায়।

হরবিলাস রায় তার চেয়ারে বসে ঢেক লিখছেন।

নিরবে শংকরনাথ ঘরে ঢেকে।

শান্তকণ্ঠে হরবিলাস জিজ্ঞাসা করেন, কি ব্যাপার শংকর ?

শংকর টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে বলে, এ ঢেক আপনি দেবেন না !

হরবিলাস দেখেন শংকরনাথের চোখ চল্ চল্ করছে।

শান্তকণ্ঠে বলেন, তাতে কি হয়েছে ? ব্যাঙ্গ্যে লাভ-লোকসান চট্ট-ই আছে ! আর এতে আমার লোকসান তো হবে না...লাভই হবে !

ঢেক হাতে নিয়ে হরবিলাস রায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।



—শ্রীমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বুনো আতার ঝোপ থেকে খাবার উপযুক্ত দু-একটা আতা সংগ্রহ করা যায় কি না এই মহাকাণ্ডে নবীন ছিল ব্যস্ত। ঝড়ের মতো ছুটে এসে অভী বলে—খবর শুনেহিস্ ?

নবীন এতক্ষণ খুঁজে পাকা আতা একটিও পায়নি। পাকবার সময় এখনও হয়নি বলে। সে আতার প্রদাস ছেড়ে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গা থেকে কুটোকাটা কাড়তে কাড়তে বলে—কি খবর ?

—ধূলোল গাঁয়ে মস্ত মেলা হবে, সামনের পুণ্যিমের দিন।

—বলিস্ কি রে ?

—ঠা, শুনে এলুম এইমাত্র। শুনেই তোকে খবর দিতে এলুম।

ধূলোল গ্রামের পক্ষে, বিশেষতঃ ধূলোল কলোনির ছেলেমেয়েদের পক্ষে এ একটা মস্ত খবর। এ রকম ঘটনা ধূলোল গ্রামের ইতিহাসে কখনো ঘটেনি—এই প্রথম ঘটছে।

ধূলোল গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে ধূলোল কলোনি। পথটা একথানা পাহাড়ের নীচে দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে গ্রামের সঙ্গে কলোনিকে যোগ করেছে।

এই পথ দিয়ে যাতায়াত করে পাথর বোকাই মাল বোকাই লরি আর জীপ্।

পথটা চক্রাকার বলেই গ্রাম থেকে কলোনির আসল দূরত্ব মোটেই পাঁচ মাইল নয়—পাহাড়টা টপকে কপূর বনের মধ্যে দিয়ে এক মাইলও নয় পায়ে-চলা রাস্তাটুকু। গায়েবর লোক কলোনিতে এবং কলোনির লোক গায়ে এই পথেই যাতায়াত করে। বাথানো রাস্তায় যায় খনি-ভাড়া পাথর লরি বোকাই হয়ে আর খনির কর্তাদের জীপ-গাড়ি।

কিসের খনি, কোথায় যায় খনি-ভাড়া পাথর এ সম্বন্ধে নবীন, অতীত এবং তাদের মতো ছেলেমেয়েদের ধারণা খুব অস্পষ্ট। তারা শুনেছে এই পাথর গুড়িয়ে নাকি আলুমিনিয়ামের বাসন তৈরী হয়। কিন্তু সত্যিই হয় কি না এ বিষয়ে তাদের সন্দেহ আছে। তা ছাড়া এ নিয়ে বিশেষ কেউ মাথাও ঘামায় না। কলোনির ছেলেমেয়েদের কাছে খনির বা খনির কাজের বিশেষ আকর্ষণ নেই। তাদের মনোজগতকে অধিকার করে আছে ধূলোল কলোনির চারিপাশের বন-প্রকৃতি। পাহাড় আর বন, পশু আর পাখালী, খোলা আকাশ, মেঘের খেলা, রোদের মেলা, ফুল আর লতা, কোপ কাপ ঘাসের বন এসব তাদের নিজস্ব। এ ছাড়া কপূর বনের মধ্যে আছে গরন', সেখানে চুপিসাড়ে বসে থাকলে হরিণ দেখা যায়। আর আছে বনের মধ্যে বড় বড় মোচাক—যারা সন্ধান জানে তারা চাক-ভাড়া মধু নিয়ে ঘরে ফেরে।

ধূলোল কলোনিতে কোনো ইন্সুল নেই। বনের মাটি ফুড়ে গজিয়ে উঠেছে এই কলোনি সব পঁচ বছর। যে ক-ঘর লোক এখানে খনির কাজ নিয়ে এসে বাসা বেঁধেছে তারা বেশীর ভাগই সংসার ঘাড়ে করে এখানে নিয়ে আসেনি। যারা এসেছে তারা নগণ্য কয়েক ঘর মাত্র, যেমন নবীন আর অতীত বাপ-মারা। শুধু এদের ছেলেমেয়েদের জঙ্গে তো একটা ইন্সুল হতে পারে না। কাজেই এদের ছেলেমেয়েরা ইন্সুল পড়ে না, পড়ে বনের পাঠশালায়। নবীন খুঁজে করে বুনা আতা, সোনালী পাখি আর বাবলার কোপে কাঠ-বিড়ালির বাচ্চা। অতীত মোমাছির পিছনে ছুট দিয়ে খুঁজে বার করে মধু-ভরা ছোট বড় চাক। কপূর বনের পথ দিয়ে ধূলোল গ্রামেও তারা যায়। কিন্তু সে শুধু বেড়াতে যাওয়া—হাঁটতে হাঁটতে বনের পথে গ্রামে পৌছে যাওয়া। গ্রামের মধ্যে এমন কিছুই নেই যা অতীত-নবীনকে আকর্ষণ করে। তাদের মন পড়ে থাকে কপূর বন আর তার আশপাশের পাহাড়ী জঙ্গলের মধ্যে।

পূর্ণিমার দিনে ধূলোল গ্রামে মেলা বসার ধবরটা তাই এমনই চমকপ্রদ যে নবীন আর অতীত চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীর রূপই বদলে গেল।

● বুনা আতা

ত্রিযোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

—কি থাকে রে মেলায় ?

—কে জানে কি থাকে। শুনি তো অনেক কিছু থাকে। ভাজাভুজির দোকান, খেলনার দোকান।

—হ্যাঁ রে, জিলিপি পাওয়া যাবে মেলায় ?

—নিশ্চয় যাবে। তিলেখাজাও আসবে। কাঠের ঘোড়াও তো থাকে মেলায়, না রে ?

—কোনগুলো ? সেই যে-গুলোতে চড়ে পাক খায় ? কত করে নেয় রে ?

—এক পয়সা করে। নাগর-দোলা নেয় দু-পয়সা।

—একটা বাঁশ কিনতে হবে মেলা থেকে। শিখবো ভেদেছি। ঐ যে ধূলোল গাঁয়ের কুলিগুলো সেমন বাজায় ? কি করে শেখা যায় বল তো ?

—কুলিগুলোকে বলেই শিখিয়ে দেবে—ও আর কি !

—না রে, আমি ওদের মতো স্তর বাজাতে চাই।

—ও-ও ওরা শিখিয়ে দেবে।

নবীন আর অতীর মন রঙে রঙে রঙিন হয়ে গেল। অমন সে বন, হরিণের পায়ের ছাপ-ভরা বরনার ভীর, সবই গেল তাদের চোখের সামনে থেকে লুপ্ত হয়ে। উঠতে বসতে কেবল তাদের কথা—কবে মেলা বসবে, কোথায় মেলা বসবে।

মেলায় দিন অবশেষে এল। বাড়ি থেকে দু-জনে একটা করে টাকা পেল। অতীর আরো খুচরো ক-আনা জমানো ছিল সেগুলোও সঙ্গে নিলে। মেলার খরচ, বলা যায় না তো, কখন কি চোখে পড়ে। কপূর বনের মধ্যে দিয়ে ধূলোল গ্রামে যাবার পথে অতী বললে—হ্যাঁ রে, মেলায় মাজিক আসে না ?

—কিসের মাজিক ? তাদের মাজিক ?

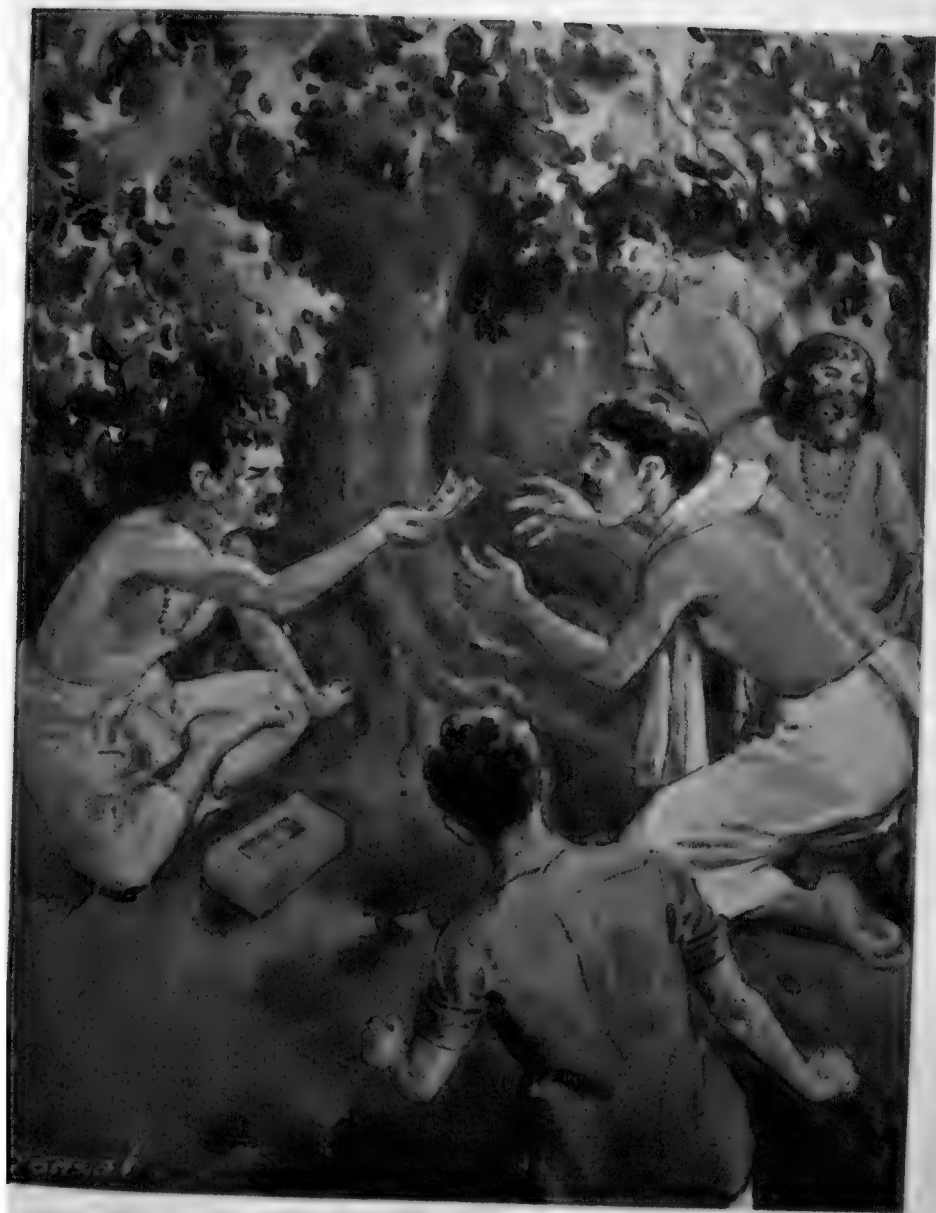
—না রে, তাদের খেলা তো সম্ভ্রাষ কাঁকা-ও দেখাতে পারে। কাটা-মুণ্ডু কথ কইবে, পেটির মধ্যে থেকে মানুষ উড়ে যাবে। যাবি দেখতে ?

—যেতে পারি।

মেলায় পৌঁছে নবীন আর অতী তাজ্জ্বল হয়ে গেল। এতগুলো মানুষই তারা একসঙ্গে দেখেনি। আর কি-সব মানুষ—কেউ কারুর দিকে তাকায় না। সবাই করে ধাক্কাধাকি ঠেলাঠেলি। সারি সারি কত দোকান বসে গেছে। কতরকম গন্ধ, কতরকম আওয়াজ, কতরকম সুর। পাক-খাওয়া কাঠের ঘোড়া, নাগর দোলা সবই আছে কিন্তু অতী খুঁজে বেড়াচ্ছে তখন মাজিক। কোথায় মাজিকওয়ালা ? কোথায়

● বুনো আঁতা

ত্রিবেণনলাল গঙ্গোপাধ্যায়



সে তার পসার জমিয়েছে? মেলার এক-প্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্ত পর্যন্ত খুঁজেও তারা ম্যাজিকওয়ালাকে পেল না।

নবীন বলে—ম্যাজিক আসেনি, চল্‌ খোঁজ চড়ে পাক খাবি।

এমন সময় অতীর হঠাৎ গোঁধে পড়ল একটা ডাল-পালা ছুঁড়ানো গাছের তলায় চট বিছিয়ে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসে রয়েছে—তার সামনে অদ্বুত সব জিনিস। মড়ার খুলি, ঘোঁসাপের চানড়া, হরেক বকম শিশি, মরা সাপ, গরগিটি, নান-না-জানা কতরকম সরীসৃপ আর টুকরো টুকরো হাড়, শুকনো ডাল শিকড় পাতার তুপ।

অতী নবীনকে টেনে নিয়ে বলে—দেখছিস?

মড়ার খুলি দেখে অতীর মনে হয়েছিল লোকটা হয়তো জাহ্ন-করই হবে কিন্তু কাছে গিয়ে শুনলে হাটের বজ্রি। ওর কাছে সব রোগের ঔষধ পাওয়া যায়।

শুনে তারা চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ দুজন লোকের ফিসফিস কণা শুনে তারা থমকে ঝাঁড়াল। তারা



চট বিছিয়ে একজন দাড়িওয়ালা লোক বসে রয়েছে—তার সামনে অদ্বুত সব জিনিস।

● বুনো আঁতা
প্রমোচনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

বলাবলি করছে যে দাড়িওয়ালা লোকটা একজন গুণীন। অস্তুত ক্ষমতা। নোট ডবল করতে পারে।

—বল কি? কি করে করে?

—মস্তের জোরে। মস্তপূত জল আর কি!

—দেখেছ?

—দেখিনি আমার? ঐ যে পিছনে থান-ইট চেপে শাগরেদ বসে ওর হাতে নোটখানা দিলে নোটটা রেখে দেয় ইটের নীচে।

—তারপর?

—তারপর হোমিওপ্যাথি শিশিতে থাকে মস্তভরা জল। ইটের উপর ছিটিয়ে দিলে একখানা নোটের জায়গায় হয় দুখানা।

অভীর গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। সে এইবার দেখলে গাছের পিছনে একটা কোপের আড়ালে আধখানা গা ঢাকা দিয়ে থান-ইটের উপর একজন লোক বসে রয়েছে। ঐই তবে গুণীনের শাগরেদ। সে নবীর কানে কানে বলে—আমার টাকাটা দিয়ে দেখব নাকি একবার?

নবীন কি বলতে গাচ্ছিল, এমন সময় একজন লোক এসে গুণীনের হাতে একটা একটাকার নোট এগিয়ে ধরল। কি হয় দেখবার জ্যে অভী নবীনকে টেনে নিয়ে এগিয়ে গেল।

গুণীন বললে—কি চাই বেটা?

আমতা আমতা করে লোকটা জবাব দিলে—ঐ যে কি বলে, ডবল করে দেবার কথা বলছিলুম।

গুণীন একটু হেসে বললে—কপালে থাকলে তো? তারপর কি ভেবে বললে—আচ্ছা দেখা যাক। দাঁও শাগরেদকে।

শাগরেদ কোনো কথা না বলে নোটটা ইটের তলায় চালান করে বসে রইল।

লোকটা উসখুস করছে দেখে গুণীন বললে—বোস বেটা। নোটে তা দেওয়া হোক।

অভী আর নবীন আরো কাছে ঘেঁষে এল।

গুণীন এইবার সেই লোকটার দিকে কেমন করে যেন দেখতে লাগল। বললে—কাছে আর তো।

লোকটা সরে আসতে বেশ বানিকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে দেখে তার

মনো আতা

ত্রিমোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়

দেহের অনেকগুলো গুপ্ত-রোগ সে ধরে কেললো। লোকটা অবাক। গুলীনের উপর বিশ্বাস তার বেড়ে গেল। রোগগুলো ভয়ানক। তার পরিণাম আরো ভয়ানক। সব শুনে লোকটার মুখ শুকিয়ে গেল। গুলীন তখন রোগের ওষুধের কথা বললে। ওষুধ তারই কাছে আছে। কিন্তু রোসো—আগে তোমার নোটের কি হল দেখি। তা দেওয়া হয়ে গেছে—বাচ্চা কুটবে মনে হয়—দাঁড়াও মস্ত পড়ি।

অভী আর নবীন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আরো কাছে ঘেঁষে এলো।

কিছুক্ষণ পরে গুলীন একটা হোমিওপ্যাথি শিশি জলে ভরে 'নয়ে' দ্রুত-উচ্চারণে একটা মস্ত পড়ে চললো।

কান খাড়া করে রইল অভী। একই মস্ত বার বার বলছে গুলীন। অনেকগুলো শব্দ শোনা যাচ্ছে—বাকিগুলো হয় অতি অশুভ নয় অতি দ্রুত উচ্চারণের ফলে ধরা যাচ্ছে না। অভী এগিয়ে এসে প্রায় গুলীনের পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল—যদি শোনা যায় মস্তটা। ঐটেই তো আসল। মস্তটা অভী শিখে নিতে চায়।

মস্ত পড়া শেষ করে গুলীন একবার কটনট করে অভীর দিকে তাকালো। অভী সরে যেতে গুলীন শাগরেরদের হাতে শিশিটা দিয়ে লোকটাকে বললে—তোমার নোট ডবল হয়ে যাবে। এবার তোমার ওষুধটাও দিয়ে দি, নাও। শরীরকে যত্নে রেখ, বুঝলে? লোকটা গদ গদ হয়ে উঠল। গুলীন তার হাতে ওষুধ-ভরা কয়েকটা শিশি গুঁজে দিলে। শাকরেন্দ ইঁটের নীচে থেকে দুটো নোট বার করে এগিয়ে ধরলে।

লোকটা বিস্ফারিত চোখে কম্পিত হস্তে নোট দুটো গ্রহণ করলে। অভী আর নবীনের মুখে রা নেই। গুলীনের মুখে স্মিত হাস্য।

লোকটা বলে—আজ্ঞে ওষুধের দামটা!

—শোন বেটা। এসব হল জীবন-দান ওষুধ। এর কি দাম হয়? তবে কিছু দাম না দিলে আবার ওষুধ লাগতে চায় না। তুই বরং পাঁচটা টাকা রেখে যা। সারা জীবন মনে থাকবে ওষুধের গুণ।

লোকটা মহা কৃতার্থ হয়ে খুঁট থেকে টাকা বার করে গুলীনের পা ছুঁয়ে চলে গেল।

এমন সময় এক হৈ হৈ ব্যাপার!

কোথা থেকে দু-জন পুলিশ এসে গুলীনের দু-হাত চেপে ধরে বললে—চলো এখান থেকে। আর দু-জন শাগরেরকে ধরল। গুলীনের মহা আপত্তি। দু-পাঁচজন ভক্ত ছুটে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। তারাও পুলিশের এই ব্যবহারে নিষম ক্ষেপে গেল। কিন্তু পুলিশের লোক কোনোদিকে দৃষ্টিপাত না করে গুলীন, শাগরেন্দ আর তাদের বালপত্র বেঁধে নিয়ে হুঁ হুঁ করে গ্রামের ধানার দিকে চলে গেল।

দেব দেউল

গোলমাল শুরু হতে অতী আর নবীন সেখান থেকে সরে পড়েছিল। এইবার অতী বললে—একটা মন্ত বিত্তে শিখে নেওয়া গেল রে নবীন।

নবীন বলে—কি বিত্তে?

—কেন, নোট ডবল করার নিজে। মন্তটা তো প্রায় শিখেই নিয়েছি—শুধু একটু অভ্যাসের দরকার।

—সে কি রে! ওকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল দেখলি নে! লোকটা চোর বাটপাড় নিশ্চয়, নইলে পুলিশে ধরে? ওর আবার মন্ত!

—পুলিসে কাকে ধরে তার ঠিক কি? তা ছাড়া চোরই হোক আর সাধুই হোক মন্তটা ওর খাটি। তুইও তো দেখলি। ঐটেই আসল!

—তুই নোট ডবল করতে পারবি?

—আলবত পারব, দেখিস্!

—পুলিসে ধরবে না?

—হাটের মাঝে করব নাকি? পুলিশের সাখা কি ধরে। জঙ্গলে গিয়ে মন্ত পড়ব।

চল্লম জঙ্গলে।

এই বলে অতী কপূর বনের দিকে এগল।

নবীন বলে—বেলা দেখবি নে? জিলিপি খাওয়া, খোড়ায় চড়া, বাঁশি কেনা, এসব কখন হবে?

অতী বলে—দাঁড়া আগে টাকা ডবল করে আনি, সব দুনো হুনো হবে! তুই এখন থাক মেলায়।

মেলায় আর অতীর মন ছিল না। দোকান থেকে একটা ছোট কাঁচের শিশি কিনে সে সোজা চলে গেল জঙ্গলে। তারপর করনার খারে বসে তার নোটখানা পাথর চাপা দিয়ে জলভরা শিশি মুখের কাছে রেখে উচ্চারণ করলো তার নতুন-শেখা মন্ত।

কিছুই ফল হল না। পাথর তুলে দেখা গেল নোট যেমন ছিল তেমনি আছে। অতী বুঝলে মন্ত পড়া অত সহজ নয়। নিভূর্ণ উচ্চারণ চাই—যেমন গুণীন বলছিল তেমনি অতি দ্রুত তালে বলা চাই। মন্তের সাধন চাই, নইলে মন্ত লাগবে না। সে করনার খারে বসে মন্তের সাধন শুরু করলে। সে কি সাধন! কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এল অতীর খেয়ালই নেই।

এদিকে সারাদিন নবীন একা-একা মেলায় ঘুরেছে। একটি পয়সাও খরচ করেনি। অতীর জন্তে অপেক্ষা করে আছে বেচারী। অতী এলে তবে বাঁশি কিনবে, খোড়ায় চড়বে, জিলিপি খাবে। সন্ধ্যায় হুলোল গ্রামের মেলা জমে উঠল। হুলোয়

● হুনো খাভা

ত্রিযোহনলাল গলোপাখ্যার

আকাশ লাল। মেলার গোলমালের শব্দ কপূর বনের গাছ-পাতার মধ্যে অতী যেখানে বসে সেখানেও এসে পৌঁছেছে। কিন্তু অতীর কানে কিছু যাচ্ছে না। তার মস্ত পড়া চলেছে। এখনও যথেষ্ট দ্রুত হচ্ছে না—

এখনও উচ্চারণের ওঠা-নামাগুলো দূরন্ত হচ্ছে না।

অতী বাহুজ্ঞানহীন।

নবীন তাকে খুঁজতে এসে করনার ধারে ঐ অবস্থায় আবিষ্কার করলে। চোখ লাল। মুখ

শুকনো। উশ্বাসপূর্বকো ঢল। নবীন ভেবে এসেছিল অতীকে নিয়ে মেলার ফিরে যাবে। কিন্তু তাকে ঐ অবস্থায় দেখে একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে গেল বাড়ি।

অমন যে মেলা, অতদিন ধরে যার জগ্গে অধীর হয়ে থাকে, তার কিছুই হল না। দু-জনে গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ল। নিস্তরঙ্গ ধলোল কলোনি থমথম করছে— লোকজন বেশীর ভাগই মেলায়। মেলা এতক্ষণ রীতিমত জমে উঠেছে। কিন্তু কপূর বন পার হয়ে কোনো আওয়াজ এখানে এসে পৌঁছয় না। নবীনের ভারি মন ঝারাপ। অতীর জগ্গে মেলাটাই মাটি। হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল অতীটা। নবীন শুয়ে-শুয়ে মেলার কথা ভাবছে, অতীটা কি ভাবছে কে জানে? ভাবতে ভাবতে সারাদিনের ক্লান্তির পর নবীন ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ভোরে উঠেই নবীন অতীরের বাড়িতে গিয়ে হাজির। গিয়ে দেখল অতী ভোরেই বেরিয়ে গেছে। এটা আগেই ঝানিকটা আঁচ করেছিল নবীন। সে



অতী পাথর তুলে দেখল নোট যেমন ছিল তেমনই আছে। [পৃষ্ঠা ১০৪]

চললো কপূর বনে। জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বরনার ধারে দেখে তপস্বীর মতো বসে আছে
অভী—বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছে—চোখের দৃষ্টি শূন্য!

নবীন বলে—কি করছিস অভী?

অভী চমক ভেঙে বলল—মন্ত্র পড়ছি দেখছিস না। তুই তো জানিস, আবার
জিজ্ঞেস করছিস কেন?

—না অভী, এটা আমার ভালো লাগছে না। কি দরকার তোর মন্ত্রে?

—নোটটা ডবল করব। দেখ না হয়ে এলো বলে। আর একটু অপেক্ষা কর।

নবীন খাড়া নাড়া দিয়ে বলে—অভী, ছেড়ে দে এসব। কি হবে তোর টাকা
ডবল করে? মেলা তো ভেঙে গেছে।

—আ? মেলা ভেঙে গেছে? অভীর চোখটা বিস্ফারিত হয়ে এল। তারপর
বলে—তা হোক। দেখি না মন্ত্রটা খাটাতে পারি কি না। তুই এখন যা। দুপুরের
দিকে বরং একবার আসিস।

নবীন রাগ করে চলে গেল। একবার ভাবলে অভীর বাবাকে বলে দেয়। কিন্তু
না, অভী তার বন্ধু—এমন মন-প্রাণ দিয়ে লেগেছে একটা কাজে, সেটাকে নষ্ট করে
দেওয়া বন্ধুর কাজ হবে না। কিন্তু কি করে সে এখন? দুপুর পূর্ণিম্ব একা-একা
কাটাখই বা কি করে? সব যেন তার শূন্য হয়ে গেছে। মেলার টাকাটা তখনও তার
পকেটে—একটি পয়সা খরচ হয়নি। অত সাধ ছিল তার বাঁশ কেনবার তা-ও কেনা
হয়নি। সবই অভীর দোষ। গুণীনকে দেখে অভীটা কেমন যেন হয়ে গেল। তার
এই খোর-খোর ভাব কি কাটবে? মন্ত্র কি তার লাগবে?

নবীন আবার বেরল কপূর বনে ঠিক দুপুরের আগে। গিয়ে দেখল এবার
অভী প্রায় ধ্যানস্থ। চোখ বুজেই মন্ত্র পড়ছে। পিছনে তার একখানা চাপড়া পাথর
যার উপর জলের দাগ। কিছুক্ষণ আগেই বোধহয় তাতে শিশির জল ঢালা হয়েছে।
নবীন অভীর পিছনে গিয়ে ঝাঁড়াতেও অভীর চেতনা হল না। আস্তে আস্তে সে
পাথরটা তুললে। দেখল অভীর নোটটা পাথরের তলায় বিছানো রয়েছে। যেমন পাথর
ছিল তেমনি আবার চাপা দিয়ে নিঃশব্দে সে উঠে ঝাঁড়িয়ে বরনা পার হয়ে ওপারে চলে
গেল বুঝে আতা খুঁজতে।

বরনার ধারে লম্বা ছুঁচোলো কাঁটার মতো খাসের ঘন ঝোপ, তারপর গোল-গোল
গন্ধগুয়ালা পাতা ভরা একটা সমান জমি। সেটা পার হয়েই পাথর-ভরা উঁচু জমি আরম্ভ
হয়েছে—তাতে ছোট বড় পাঁচমেশালি গাছ—তাদেরই মধ্যে থেকে এখানে ওখানে
আতাপাহের পাতা উঁকি দেয়—দূর থেকেই চেনা যায়।

● বুঝে আতা

শ্রীবোধনলাল গদ্যোপাধ্যায়

কিছুক্ষণের মধ্যে নবীন দুটি সুন্দর পাকা আতা আবিষ্কার করে ফেললে।
এতদিনে আতা পাকতে আরম্ভ হয়েছে। নবীন ভারী খুশী। এতগড় আতা-ও
সাধারণতঃ বুনো গাছ থেকে পাওয়া যায় না। অভীকে হাওয়াতে হবে একটা এখনই।

নবীন গোল-গোল গন্ধওয়ালা পাতা-ভরা জমিটা পার হয়ে করনার ধারে এসে
পৌছতেই দেখতে পেলেন অতী
তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে
—তার হাতে দু'খানা এক টাকার
নোট। তার চোখ খুলিতে উপচে
পড়ছে। নবীনকে দেখেই অতী
চৌচিয়ে উঠল—

—মস্তর লেগেছে নবীন।
দেখে যা ডবল হয়ে গেছে।

নবীন ছপ্, ছপ্ করে
ধরনা পার হয়েচলে এল। অভীর
দু আঙুলের ফাঁকে নোট দু'খানা
হাওয়ায় উড়ছে। অভীর চেহারা
অতীর চোখের দৃষ্টি আবার অভীর
মতো হয়ে এসেছে।

নবীন বলে—মস্ত পেলি
তাহলে?

—পাবো না? এ ত
কন্টের সাধনা?

—কি করবি টাকা দুটো
নিয়ে?

—কি করব? মেলায়—
ও, মেলা বুঝি ভেঙে গেছে,
না রে? তবে কি করা যায়?

নবীন আন্তে আন্তে বলে
—আমার কথা শুনবি অতী? নোট দুটো করনার জলে ফেলে দে। ও আর তোর
কোনো কাজে লাগবে না।



নবীন আন্তে আন্তে পাথরটা তুললে। [পৃষ্ঠা ১০৬

দেব দেউল

—ঠিক বলেছি নবীন। মেলাব জগ্নেই তো নোটটা রেখেছিলুম। মেলাই যখন ভেঙে গেল ওরাও যাক।

নোট দুটো জলে ফেলে দিয়ে অতী বলে—মস্তটার কি হবে নবীন? মস্তটা যে পেয়েছি!

—মস্ত্র তুই আমায় বলে দে। যতক্ষণ গোপন ততক্ষণ ওর শুন। আমায় বলে দে, গুণটা কেটে যাক। কি হবে তোর মস্ত্রে? ওর জগ্নে এমন মেলাটাই তো মাটি হল। কি তোর লাভ হল?

—কিছুই লাভ হল না। শোন তবে মস্ত্র।

এই বলে নবীনকে কাছে টেনে তার কানের কাছে মুখ দিয়ে গম্ভীর স্বরে অতী মস্ত্রটা উচ্চারণ করল।

অতীর গলা দিয়ে বেরল সে এক অদ্বীত স্বর। অতীর গলাই নয়। নবীনের সারা দেহে এক শিহরন বহে গেল। সে ভীত চোখে অতীর মুখের দিকে তাকালো। ক্রমান্বয়ে চোদ্দ খন্টা দ্রুত উচ্চারণের ফলে এ কি শিখেছে সে? এর সত্যিই কোনো ভয়ানক গুণ আছে নাকি?

কিন্তু না; অতীর মুখের চেহারা আবার সহজ হয়ে এসেছে। ভয়ানক মস্ত্র তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। নবীন এইবার আত্মা দুটো বার করে অতীকে বলে—নে ধর। এত বড় আত্মা দেখেছি?

অতী লাকিয়ে উঠে বলে—আরে বাসরে! কোথায় পেলি? আয়, বরনার ধারে বসে শেষ করি এ দুটোকে—যা' খিদে পেয়েছে।

দুই বজুতে আত্মা খেয়ে উঠে দাঁড়ালে। নবীন বলে—চল এবার বাড়ি।

পথে যেতে-যেতে অতী বলে—কি করলি তুই মেলায়? নাগর-দোলায় চড়েছি?

নবীন বলে—চড়িনি আবার? নাগর-দোলা, পাক-খাওয়া ঘোড়া। জিলিপি খেলুম—কত কি!

—ইস্ আমায়-ই হল না। কত খরচ করলি? পুরো টাকাটা খরচ করেছি?

—পুরো টাকাটা। কিছু বাকি নেই।

—বাঁশি কিনেছি?

নবীন হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেল। চোখটা হুলস্থল করে উঠল। তারপর সামনে নিয়ে বলে—এবারে আর কেনা হল না। সামনের বছর মেলা আবার হয় তো নিশ্চয় কিনবো!



হাত সাফায়ের বেগিমে পেলা।

পদিকার জবাক কানু দিতাম।



—ঐশ্বরী সাধনা দাস

আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম
শাতক ছঁদায় তাম্রি মেরে,
তেলটিটে এক ঘাগরা পরে,
দেশ হ'তে দেশ দেশান্তরে
মনের স্বখে একলা চলে' যেতাম।
আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম।

হরেক রকম পাখির ছানা,
কুকুর ছানা নাম না জানা,
চল্‌তি পথের পথিককে রে
বিকিয়ে দিতাম যখন যে দাম পেতাম।
আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম।

দেয় দেউল

পথিক যারা দেখতো চেয়ে
আমার দিকে অবাক হ'য়ে
হাত সাফায়ের দেখিয়ে খেলা
আরো তাদের অবাক করে দিতাম।
আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম।

খাটিয়ে তাঁর হাতে মাঠে,
সূর্য যখন বসত পাটে,
পাঁচ মিশালী সিঁদুর ক'রে
একলা ব'সে মনের সুখে খেতাম।
আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম।

ঝা'ড়ো হাওয়া উঠলে কভু,
উড়িয়ে নিলে ছিন্ন তাঁরু,
দাঁড়িয়ে তখন বর্ষাজলে
স্নানের পাল। এমনি সেরে নিতাম।
আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম।

যাযাবরের জীবন সম
শাধীন হ'তো জীবন মম
সপ্নে দেখা সুখের পরশ
নিত্য আমি এমনি ক'রেই পেতাম।
আমি যদি জীপ্সী মেয়ে হ'তাম।

দুই ওস্তাদ



— শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

“তোমার নাম?”

“হীরেলাল।”

“পুরো নাম বলো। হীরেলালের পর কী? উপাধি?”

“উপাধি জানি নে। ঐ হীরেলালই পুরো নাম।”

“কী মুশকিল! লিখুন ভজুর নাম হীরেলাল, উপাধি অজানা। তারপর?—
বাপের নাম কী?”

“বাপের নাম? বাপ-টাপ ছিল না কোনোদিন!”

হেসে উঠলো আদালতশুদ্ধ লোক। ছেলেটা বলে কী? বাপ ছিল না? বরং
বল—বাপের নাম জানা নেই; তার তবু একটা নামে হয়।

ন’দশ বছর বয়সের ছেলে; অত মানে-টানের খার সে খারে না। যে-
সমাজে সে বাস করে, সেখানে কোনো ছেলেরই বাপ নেই, অশ্রুতঃ ধরা-চোখার ভিতরে
নেই। তাদের সবাইয়েরই আছে এক ওস্তাদ, দাড়িওয়ালা কিংবদন্তি। সবাই

তাকে ওস্তাদ বলে ডাকে, খিদে পেলে তার কাছেই খাবার চায়। রোজগার হলে তার হাতেই এনে পয়সা বুঝিয়ে দেয়, আর কস্তর করলে তার হাতেরই চড়টা-চাপড়টা খায়। কিয়েণলাল ছাড়া আপনার-জন তাদের আর কেউ নেই। দশ-পনেরোটা ছেলে সব সময়েই থাকে কিয়েণলালের কাছে; কিন্তু বছরের পর বছর একসঙ্গে বাস করেও



“বেখে শুনে দাচ, বেখে শুনে! এখুনি ঢাকার তলায়
যাচ্ছিলেন বে!”

জুতো না থাকাতো বরং পথের লোক ওকে কাছাকাছি পাড়ার ছেলে বলে ভাবছিল, সন্দেহ করবার কথা মনেই ওঠেনি কারো!

বুড়ো উদ্দরলোক টাম থেকে নামতেই হীরেলাল ধরে কেলেছিল তাঁকে...পিছন থেকে কোমর আপটে ধরেছিল একেবারে। দরদ-ভরা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিল—“বেখে শুনে দাচ, বেখে শুনে! এখুনি ঢাকার তলায় চলে যাচ্ছিলেন বে!”

● ছই ওস্তাদ

ঐশ্বরীপ্রসাদ হুখোপাধ্যায়

কোনো-একটা ছেলে অপর-একটা ছেলেকে ভালোবাসতে শেখে না। শিখতে দেয় না কিয়েণলাল। উল্টে বরং সে চেন্টা করে—যাতে ছেলেগুলোর মধ্যে সব সময়ে একটা রেবারেখি ঝগড়াঝাটির ভান বজায় থাকে, যাতে একজনের গলদের কথা আর-একজনের মুখ থেকে সে শুনতে পায়, যাতে একজনের বিপদ ঘটলে অজ্ঞ সবাই তার দরুন মুখড়ে না পড়ে!

বিপদ হামেশাই ঘটছে কারও-না-কারও। যেমন আজ ঘটে গেল হীরেলালের। হাফ-প্যান্ট আর বুশ-সার্ট প’রে দিবা ভদ্রলোকের ছেলেটির মতোই সে সেজে এসেছিল। পায়ে অবশ্য জুতো ছিল না; তা পাড়ার ভিতরে কোন্ ছেলেটাই বা চকিবশ ঘণ্টা পায়ে জুতো এঁটে বেড়ায়?

ভদ্রলোক হুটকিয়ে গিয়েছিলেন। “চাকার তলায়?”—অবাক হয়ে ব’লে উঠেছিলেন তিনি। বজ্রকণ অপেক্ষা করেও টাঙ্গিনা পেয়ে তিনি ট্রামে উঠেছিলেন, ভাব-ভয় করছিল এ কথা ঠিক, কিন্তু নামবার সময় কোনো অসুবিধে তার হয়নি। ও! তিনি চাকার তলায় চলে যাচ্ছিলেন? কী করে যাচ্ছিলেন, তা তো তিনি টের পাননি! তবু ভেতনেটি বলছে যখন, নিশ্চয় একটা কিছু ঘটবার মতো হয়েছিল বৈ কি! হয়তো তার পা পড়তে থাকিল কনার খোসার উপর, পড়লে হয়তো হড়কে পড়ে যেতেন তখন, আর, পড়লে তো’ চাকার তলাতেই গিয়ে পড়ে সবাই!

তাই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছিলেন হীরেলালকে—
“বৈচৈ থাকো ভাই, বড়ভা
পড়িয়ে দিয়েছে আজ!”

“কিছু না দাও, কিছু না!”—বলতে বলতে পিছু হতে শুরু করেছিল হীরেলাল; আর আশ মিনিট সময় পেলেই সে একখানা চলতি বাসের আড়ালে গিয়ে পড়তে পারতো, এবং পকেটের মনি-বাগটা “স্বলভ ভাণ্ডারের” শোরগোড়ায়-দাঁড়ানো কহিনের হাতে তুলে দিয়ে...

কিন্তু সে-আশমিনিট সময় পেলো না হীরেলাল।

বুড়ো ভদ্রলোক দেখতে পেলেন—সামনেই ফুটপাথে একটি মেয়ে বসে আছে ঘোমটা দিয়ে, তার পাশেই একটা ঘুমন্ত শিশু, আর শিশুর চারপাশে ছড়ানো রয়েছে কতকগুলো নয়া পয়সা। মেয়েটাকে কিছু ভিক্ষে দেবার জন্য তিনি পকেটে



পালাবার স্থানও আর পেলো না হীরেলাল, পর পড়তে গেল বেচারী।

আর যাই হোক—বিদেশী ভ্রমলোকের কলকাতায় আসার কারণ কোটের অজানা থাকা উচিত নয়, এতে সুবিচারের ব্যাঘাত হতে পারে।

হাকিম তাই বাধ্য হয়েই ভুকুম দিলেন—“আপনাকে ওকথ তাহলে বলতেই হয় মহীতোষ বাবু। অবশ্য, সংক্ষেপে বলতে পারেন, গুটিনাটির ভিতর যাবার দরকার নেই।”

“সংক্ষেপেই তাহলে বলছি”—মহীতোষ বাবুর গলাটা যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা মনে হলো এবার। “আমি কলকাতায় এসেছিলাম, আমার গুরুদেবের আদেশে। তিনি সাদক মানুষ; ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান তার নখাগ্রে। তিনি বলেছিলেন—এ দিন কলকাতায় এলে আমি এখানে আমার সাত-বছর-আগে হারানো নাতিকে গুঁজে পাবো। নাতিটি চুরি যায় আমাদের গায়ের গাজনের মেলা থেকে। সেই থেকে এই সাত বছর কত ভাবে কত জায়গায় যে খুঁজছি তাকে!”

নবীন শামলাধারী রসিকতা করলেন একটু। বুদ্ধকে চোখ ঠেড়ে বলে উঠলেন—“দেখুন তো ভালো করে—এ কাঠগড়াতেই সে পাড়িয়ে আছে কিনা?”

সরকারী উকিল জোর-গলায় প্রতিবাদ জানালেন—“এ-রকম নির্ভর ঠাট্টা করা আমার মাননীয় সহযোগীর কখনোই উচিত হয়নি; তাছাড়া জবানবন্দীর সময় কথা কইবার অধিকারই তাঁর নেই; তাঁর প্রয়োগ আসবে জেরার সময়।”

শামলাধারীকে মুখ বন্ধ করতে হলো বটে, কিন্তু তাঁর টিপ্পনীটুকু নিয়ে কানাকানি শুরু হলো আদালতে। হাকিম পন্থ একবার হীরেলালের দিকে, আর একবার মহীতোষের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটা আশ্চর্য-রকম মিল সত্যি দেখা যায় দু'জনের চেহারায়। প্রায় ষাট বছর বয়সের তফাত সত্ত্বেও সে-মিল কারও নজর এড়িয়ে যাবার মতো নয়। চওড়া কপাল, টানা-টানা চোখ, লম্বা উঁচু নাক—তার উপর গায়ের রং! হীরেলালের গায়ে সাবানজল পড়লে সেও যে মহীতোষের মতো ফর্সা হয়ে উঠতে পারে, এটা বুঝতে কারও বাকী রইল না।

হাকিমটি উপহাস লেখেন; অল্প-একটু আকাশ পেলেই তাঁর কল্পনা ডানা মেলে মনের আনন্দে উড়তে শুরু করে। তিনি মহীতোষকে বললেন—“দেখুন, কিছু মনে করবেন না। পৃথিবীতে অনেক ব্যাপার সত্যিই ঘটে, যা রূপকথার চাইতে আশ্চর্য! আপনার হারানো নাতির গায়ে কোথাও কোনো চিহ্ন ছিল, যা সাত বছরেও মিলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই?”

হীরেলালের দিকে অপলক চোখে চাইতে চাইতে বুদ্ধ বললেন—“ছিল, হজুর!

তার কাঁধের কাছটা একবার ভীষণভাবে পুড়ে গিয়েছিল; সে পোড়া-দাগ জীবনে কখনো নিলিয়ে যাবে, এমন আশা আমরা করি নি।”

হীরেলালের মূণ থেকে একটা চাপা চীৎকার বেরিয়ে এলো হঠাৎ। পোড়া দাগ ? কাঁধে ?—আছে বৈকি...হীরেলালের আছে !

* * * *

বিরাট জমিদার-বাড়ি। হীরেলাল দেখে শুনে অবাক ! এই বাড়িরই ছেলে সে ? এত ধনদৌলতের মালিক সেট-ই হবে একদিন ? দাদু আর সে...এ-ছু'জনের মাঝে আর কেউ নেই ! হীরেলালের বাপ-মা ছেলে-হারানোর শোকেই নারা গিয়েছেন।

পকেটমারার নামলা আর বেশীদূর গড়ায়নি। সমস্ত অবস্থাটা বিবেচনা করে দেখে হাকিম হীরেলালকে ছেড়ে দিয়েছেন মহাতোষের জামিনে। মহাতোষ আর একদিনও দেৱী করেননি কলকাতায়; হারানিষি বুক ক'রে নিয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন।

কুসঙ্গে পড়ে ছেলেটা অকাজ-কুকাজ করেছে। তাতে আর কী এমন ক্ষতি হয়েছে ? এখন তাকে শুধরে নেওয়া শক্ত হবে না। ভালো ভালো মাস্টার রেখে দেবেন মহাতোষ, তাঁরা শিক্ষা দিয়ে উপদেশ দিয়ে মানুষ ক'রে তুলবেন হীরেলালকে। তাছাড়া গুরুদেব স্নয়ং রয়েছেন...তিন কাল বীর নখাগ্রে। তিনি অসাধ্য সাধন করতে পারেন। যাগযজ্ঞ ক'রে ছেলেটার মতিগতি তিনি কি ফেরাতে পারবেন না ?

গুরুদেব থাকেন নিজের আশ্রমে, নদীর ধারে। বাড়ি পৌঁছুবার ঘণ্টাখানেক পরেই মহাতোষ নাটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—আশ্রমের উদ্দেশে। প্রভুর পায়ে ছেলেটাকে কেল দিতে পারলেই তিনি এবার নিশ্চিন্ত ! গাঁয়ের লোক এখনও খবর পায়নি যে হারানো নাতি জমিদার ফিরে পেয়েছেন ; এমন-কি নায়েব গোমস্তারও পায়নি হীরেলালের খাঁটি পরিচয় ; গুরুদেবের অশ্রুমতি না নিয়ে মহাতোষ কোনো শোরগোল করতে রাজী নন। তাই, বাবুর সঙ্গে অচেনা একটি ছেলেকে দেখে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো বটে, কিন্তু স্বপ্নেও কেউ ধারণা করতে পারলো না যে একদিন এই অচেনা ছেলেটিই তাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবে !

সদর উঠানের মাঝখান দিয়ে ফুলের কেয়ারি-করা সোজা রাস্তা। সেই রাস্তা বেয়ে দেউড়ির দিকে হেঁটে চলেছেন মহাতোষ বাবু। হঠাৎ কাছারি-বাড়ির রোয়াক

● দুই ওতাব

শ্রীসৌরীজমোহন বুধোপাধ্যায়

থেকে একটা ছেলে লাফিয়ে পড়ে তাঁর দিকে ছুটে এলো কান্ডিতে কান্ডিতে। সেপাই বরকন্দাজ এসে তাকে ধরে ফেলবার আগেই সে জড়িয়ে ধরেছে বাবুর পা। “বাবু গো, আমার বাবাকে ওরা আজ ছ’ দিন কয়েদ করে রেখেছে। ঠুমি ওকে ছেড়ে দাও, এ ছ’ দিন বাবা একটু জলও খেতে পায়নি।”

“কে রে? কে তোর বাবা?”—ধমকে উঠলেন মহাতোষ।

“হারু মণ্ডল।”

“ওঃ, হারু মণ্ডল! এক নম্বর বদমাইশ! গুরুদেবের আশ্রমের লাগোয়া জমিটা কিছুতেই ছেড়ে দিচ্ছে না বাটা। তা বুক একশন! সেরেকার পাড়নাগড়া মটিয়ে দিক, কেউ তাকে আটকে রাখবে না।”

ততক্ষণে বরকন্দাজেরা এসে ধরে ফেলেছে ছেলেটাকে।

হারেলাল তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ওকে। তার বয়সীই হবে বোধ হয়। সেদিন মহাতোষের পকেট নারবার সময়ে যে-রকম একটা নীল প্যান্ট হীরেলালের পরনে ছিল, এ-ছেলেটাও সেইরকম একটা নীল প্যান্ট পরেছে। গা অবশ্য তার খালি; পাড়াগাঁয়ের চাষী ছেলেদের বুশ-কেটি নেই যে চব্বিশ-ঘণ্টা তাই পরে বেড়াবে!

ওরা ধরে নিয়ে গেল ছেলেটাকে। মহাতোষ নিজের মনে বিড়বিড় করতে লাগলেন—“ছোটলোকগুলো মাথায় চড়ে বসেছে। গুরুদেব বলেন—”

গুরুদেব কী বলেন, তা আর হীরেলাল শুনতে পেলো না। ওবে সহজেই সে আন্দাজ করে নিতে পারলো যে এই সব ছোটলোকদের আশ্রা না-দেবার পরামর্শই হয়তো তিনি দিয়ে থাকেন সাধারণতঃ।

দেখা হলো। টকটকে গৌর বর্ণে ধবধবে পৈতে কী চমৎকার মানিয়েছে! তার উপর কালো কুচকুচে লম্বা দাড়ি! হীরেলালের হঠাৎ মনে হলো—ওস্তাদ কিবেগলালের দাড়ির কথা। সে-দাড়ি এমন লম্বা, এমন ঘন আর এমন কালো হলেও, তাতে এমন চেকুনাই নেই! থাকবে কি করে? ফুলেল তেল মাখিয়ে ঘনঘন চিরুনি দিয়ে তো তার দাড়ি কেউ আঁচড়ে দেয় না!

গুরুদেব হাসলেন। মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন হীরেলালকে।

“পাপ তাপ দূরে থাক, পবিত্র হও, রায়চৌধুরী-বংশের যোগ্য বংশধর হও।”

আশীর্বাদ শুনতে শুনতে পাষণ্ড ছেলেটার কিন্তু কেবলই কিবেগলালের সেই কথা মনে পড়তে লাগলো—“তোমার হবে! তোর যে-রকম হাতসাকাই, শহরের সব পকেটমার একদিন তোকে ওস্তাদ বলে মানবে!”

দেব দেউল

ঐখানে বসেই উৎসবের একটা খসড়া তৈরি ক'রে নিলেন মহীতোষ। হোম করতে হবে এক মাস ধরে। গোটা দুই বেলগাছ দরকার। হাসিমন্দির একটা আছে, আর একটা আছে পরেশ মন্দিরের। পরেশ সেটা সহজে দিতে চাইবে না। গুরুদেব হেসে বললেন—“বীরভোগা! বস্ত্রধরা হে মহীতোষ! ধর্মার্থে



আহরণ করতে যাচ্ছ, এতে কোনো পাপ নেই। লোক পাতিয়ে রাতারাতি কেটে আনো গা ছ টা। তারপর, কী সে করবে? জ্বায়া দাম ধ'রে দিয়ে। হাজার ধেনু এক ব্রাহ্মণ চেয়েছিলেন রঘু-রাজার কাছে। রঘু তখন অতিরিক্ত দানে নিঃস্র হয়ে পড়েছেন। তি নি বরুণের গো শা লা থেকে হাজার ধেনু কেড়ে এনে দান করলেন ব্রাহ্মণকে। ধর্মার্থে আহরণ—ওতে পাপ নেই।”

গুরুদেব আশীর্বাদ করলেন হীরেলালকে—“রায়চৌধুরী-বংশের বোগা বংশধর হও।” [পৃঃ ১১৭]

যজ্ঞ, অনেক পূজা-অর্চনা, হরেক রকমের আমোদ-আহ্লাদের এক বিরাট লিস্টি তৈরি ক'রে নিয়ে মহীতোষ নাতির হাত ধরে বাড়ি ফিরলেন। এইবারে ঢাক ঢোল সানাই বাজতে শুরু হলো জমিদার-বাড়িতে। গাঁয়ের লোক অবাক হয়ে শুনলো—মহীতোষ ঘে-ছেলেটির হাত ধরে নিয়ে সকাল বেলা গুরুদেবের আশ্রমে

হোম ছাড়া আরও অনেক যাগ-

● দুই ওতা

ত্রিশোরাবোহন রথোপাখ্যায়

গিয়েছিলেন, সে-ছেলেটি আর কেউ নয়, তারই নাতি, একমাত্র বংশধর...সাত বছর আগে গাঁয়ের গাঁজনের মেলা থেকে যে হারিয়ে যায়।

পরেশ মিত্রের বেলগাছ কেটে আনা হলো। রাত্তিরে-রাত্তিরেই কাজ সমাধা হয়েছিল বলে পরেশ আগে কিছু জানতে পারেনি; তারপর যখন বর পেয়ে মহীতোষের কাছে এসে আপত্তি জানালো, তার বরাতে ছুটলো দরওয়ানের গলাধাক্কা। বেলগাছ চেরাই হয়ে গেল, হোমের আশ্রন উদ্ভল হয়ে বুলতে লাগলো...এক মাস ধরে গুরুদেবেরই বসন্তেজ খেন আশ্রনের আকারে উদ্ভল করে রাখলো মহীতোষের তিনমহলা বাড়িখানা।

মহা ধুমধাম চললো এক মাস ধরে। এমন দেবতানেই পুরাণে, মহীতোষের বাড়িতে যার পূজা হলো না; এমন পোশাক নেই বাজারে, যা হীরেলালের জ্ঞা কেনা হলো না। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগানে মুগ্ধ হয়ে রইলো সারা গ্রাম।

এক মাস যেদিন পূর্ণ হলো, গুরুদেবকে প্রণাম করলেন মহীতোষ একশো-মোহর দিয়ে। আর নিবেদন করলেন—“হাক মন্ডল শেষ পরশু তার জমিটা লেখা-পড়া করে দিয়েছে গুরুদেব। আপনি অনুমতি করুন, আমি ঐ জমিতে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তাতে আপনারই বিগ্রহ স্থাপনা করি।”

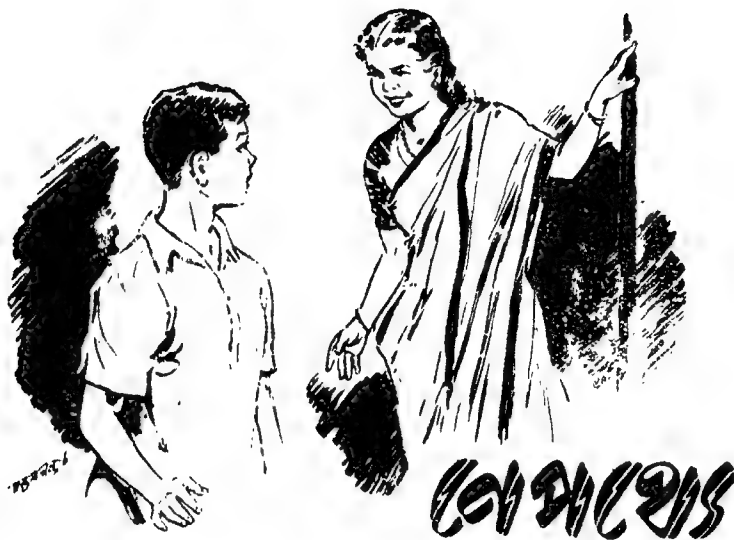
গুরুদেবের মুখ প্রসন্ন হাসিতে অপরূপ হয়ে উঠলো।

হীরেলালও দাহুর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করেছিল গুরুদেবকে। সে এই কথা শুনে দাহুর দিকে তাকিয়ে বললো—“দাহু, আমি বলি—মন্দির একটা না করে দুটো করো।”

“কেন? কেন? দুটো মন্দির কেন ভাই?”—অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন মহীতোষ।

হীরেলাল বললো—“একটাতে প্রতিষ্ঠা হবে গুরুদেবের মূর্তি, আর একটাতে প্রতিষ্ঠা হবে আমার ওস্তাদ কিশোরলালের মূর্তি। আমি এই এক মাস ধরে মিলিয়ে দেখলুম, দু'জনেরই শিক্ষা প্রায় একই রকম।”

—————



—বনফুল

তিমু সেদিন স্টেশন থেকে খুব উত্তেজিত ভাবে বাড়ি ফিরল। চাপা উদ্বেজনা, কারণ কথাটা কাউকে বলা চলবে না। তিনি কাউকে বলতে মানা করেছেন, কিন্তু জনকয়েককে তো বলতেই হবে। বিশেষতঃ মণিকে। একটা মালাও তো গাঁথতে হবে অন্তত, তাদের বাগানেই ফুল আছে। বাজারের কেনা মালা তাঁকে দেওয়া চমকে না। তাছাড়া কাকে কাকে খবরটা বলতে হবে সে-ও একটা সমস্যা। যাকে বাদ দেওয়া হবে সেই চটে' যাবে। কারণ শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবেই। এত বড় ব্যাপার সম্পূর্ণরূপে চাপা দেওয়া শক্ত। তাছাড়া আর একটা কথা, মেয়েদের কাউকে খবর দেওয়া হবে কি না। তার বোন অঞ্জলি, কিনা মণির বোন মুকুলকে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায়, কিন্তু ভয়, তাদের পেটে কথা থাকবে কি! অঞ্জলিটা যা বক্তিমার খিলিজি। শুধু যে তার পেটে কথা থাকে না তা' নয়, কথা বাড়িয়ে বলে। বেরাল দেখলে বলে বাষ দেখেছি। মুকুলটাও প্রায় তাই। মণির সঙ্গে পরামর্শ না করলে কিছুই ঠিক করা যাবে না। তাড়াতাড়ি জলখাবার খেয়ে সে

বেরিয়ে পড়ল মণির বাড়ির উদ্দেশ্যে। মণির বাড়িতে গিয়ে দেখল মণি নেই। এই আশঙ্কাই করেছিল সে। মণি ক্লাসের ভালো ছেলে, প্রায় প্রতি বিষয়েই প্রথম স্থান অধিকার করে, তাই মাস্টাররা তাকে ভালোবাসেন সবাই। খাউ মাস্টার তার কোণ মাস্টার তাকে বিনা পয়সায় পড়ান। তাই সে কোনদিন খাউ মাস্টার, কোনদিন কোণ মাস্টারের বাড়ি যায়। খাউ মাস্টার তাকে অল্প পড়ান, কোণ মাস্টার ইংরেজী।

দেখা হ'ল মণির বোন মুকুলের সঙ্গে।

“দাদা ত্রো বাড়িতে নেই। খাউ মাস্টার মশাহিদার কাছে গেছে কেন, আমরা কি দরকার”

মুকুলের বয়স বছর এগারো। এবটু ফাজিল যোজের।

“সিনেমার টিকিট যোগাড় করছে কুকি”

মুচকি হেসে বলল সে।

এ কথার জবাব না দিয়ে তিনু বলল—“তুই একটা বেগমজেন্না মালা গেল্পে দিতে পারিস ?”

“কেন ? বেগমজেন্নেদ মালা নিয়ে কি করবে এখন ? নিয়ে না কি”

“নিয়ে নয়, অল্য দরকার আছে”

“কি দরকার”

“তুই পারবি কি না বল না”

“পারব। কিন্তু মালা নিয়ে কি করবে তা বলতে হবে”

“আচ্ছা, সে যখন মালা নেব তখন বলব। তুই গেথে রাখিস তাহলে, আমি ঘুরে আসছি—”

“কতক্ষণ পরে আসবে”

“ঘণ্টাখানেক পরে। আমি যাচ্ছি এখন মণির কাছে। আমরা দু'জনেই আসব এক ঘণ্টা পরে। মালা গেথে রাখিস, বুকলি—”

“আচ্ছা—”

একটু দূর এগিয়ে গেছে, এমন সময় মুকুলের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

“তিমু দা—শুনে যা-ও”

ডাক শুনে কিরতে হ'ল তিমুকে !

“কি—”

“তুমি মাকে বলে' যাও, তা না হলে না আমাদের সন্দের পর গাছ থেকে কুল তুলতে দেবে না”

দেব দেউল

“কেন, সন্দের পর গাছ থেকে ফুল তুললে কি হয়”

“গাছের ঘুম ভেঙে যায়, কষ্ট হয়—”

মুচকি হেসে মুকুল ছুটে চলে’ গেল বাড়ির মধ্যে।

একটু বিব্রত হয়ে পড়ল তিস্তা। দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

মুকুলের মা ভাড়ার ঘরে ছিলেন, বাজার-থেকে-আনা জিনিসপত্রগুলো গুচ্ছিয়ে তুলে রাখছিলেন। সেইখানে গিয়ে তাজির হ’ল তিস্তা।

“কাকীমা মুকুলকে বলুন না, বেলকলের একটা মালা গোঁথে দিক। আপনাদের বাগানে তো প্রচুর বেলফুল”

“এত রাতে মালা নিয়ে কি করবে বাবা”

“ভীষণ দরকার”

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিস্তার মুখের দিকে। তাঁর মনে হ’ল ‘ভীষণ’ কথাটার মানেটা বদলে দিয়েছে আজকালকার ছেলেমেয়েরা। মুকুলের মা মূর্খ নন, বেগুন থেকে বি. এ. পাস করেছিলেন। কিন্তু বি. এ. পাস করলে কি হবে। মনটি একেবারে সেকেলে।

“কি এমন ভীষণ দরকার হ’ল এখন?”

“তা কাল বলব। যার জন্মে মালা দরকার আজ তিনি কথাটা প্রকাশ করতে বারণ করেছেন”

চুপ করে’ রইলেন মুকুলের মা।

তারপর বললেন—“কিন্তু রাত্রে যে ফুলগাছে হাত দিতে নেই বাবা। রাত্রে গাছেরা ঘুমোয়—”

“রাত্রে আমরাও ঘুমোই, কিন্তু খুব দরকার হ’লে কি আমাদের আপনি জাগাবেন না?”

মুকুলের মা হাসিমুখে চেয়ে রইলেন তিস্তার মুখের দিকে। মনে মনে বললেন, ছেলেটা বরাবরই জেদী। মহা মুশকিলে ফেললে দেখছি।

এর ঠিক পরেই কিন্তু তিস্তা যা করলে তাতে কাবু হয়ে পড়তে হ’ল মুকুলের মাকে।

তিস্তা আবদার-মাথা কণ্ঠে বলে উঠল, “ওসব কিছু শুনব না কাকীমা। মালা একটা চাইই আজ রাত্রে। না পেলো লজ্জায় অপমানে মাথা কাটা যাবে আমাদের। কাল সব কথা বলব আপনাকে”

“তবে বলে’ যা মুকুলকে গোঁথে রাখুক একটা। এত স্বালাস তোরা”

[২]

থার্ড মাস্টার মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি গিয়েই তিনু দেখতে পেল থার্ড মাস্টার মশাই মণিকে পড়াচ্ছেন। মনি পেন্সিল হাতে করে একটা খাতার দিকে চেয়ে ভুরু কচকে বসে আছে। তিনুর মনে হ'ল খুব সম্ভব শব্দ কোনও অঙ্ক দিয়েছেন। থার্ড মাস্টার মশাইও ভুরু কঁচকে চেয়ে আছেন মণির দিকে। পরিবেশটা খুব অশুভ মনে হ'ল না তিনুর। এ অবস্থায় ও ঘরে ঢোকা আর বাঘের মূখে পড়া একই জিনিস। হয়তো তাকেও দেখলে বসিয়ে দেবেন অঙ্ক করতে। বলবেন, “মনি এটা পারছে না, দেখ দিকি তুমি পার কিনা।” মনি যে অঙ্ক পারছে না তা সে নিশ্চয়ই পারবে না, নাকি থেকে সময় নষ্ট হয়ে যাবে খানিকটা। হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় খেলে গেল, থার্ড মাস্টার মশাইকেও বাপারটা বললে কেমন হয়। নতুন ইনসপেকটরের ভাইপো সম্প্রতি বি. এ. বি. টি. পাস করেছে, তাকে তিনি বসাতে চান, থার্ড মাস্টারের জায়গায়। তাই আজকাল তিনি নান্না রকমে থার্ড মাস্টারের খুঁত ধরছেন। গতবার এসে তিনি হ্যাঁ থার্ড মাস্টারকে অপমানই করে গেছেন ক্লাসের সামনে। থার্ড মাস্টার মশাই এই অশিষ্ট বাবুজারের প্রতিবাদ করে ওপরওয়ার কাছে চিঠি লিখেছেন কিন্তু কোনও প্রতিকার হচ্ছে না। তার দরখাস্তের জবাব পর্যন্ত আসে নি। সব নাকি মুখ শোকাশু কি আছে। ওপরওয়ারা নাকি সব অবাঙালী, বাঙালীর কোন নালিশই শুনতে চান না। মাস্টার মশাই তাকে যদি সব কথা বলে বলেন তাহলে হয়তো উনি কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারেন। তিনু তার নিজের বাবার কথাটাও বলবে ভেবেছে। কিছুতেই তাকে প্রমোশন দিচ্ছে না। তাঁর নীচের লোকেরা কেউ মিনিষ্টারের আক্ষীয়, কেউ শিডিউল্ড কাস্ট, কেউ বড়বাবুর ভাগনে বলে প্রমোশন পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু তার বাবার চাকরিতে উন্নতি হচ্ছে না। তাকে বললে উনি হয়তো কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। আর উনি বললে কি না হ'তে পারে।

হঠাৎ থার্ড মাস্টার মশাই চোখ তুলে বারান্দার দিকে চাইলেন।

“কে ওখানে দাঁড়িয়ে”

“আজ্ঞে আমি তিনু”

তিনু এসে ভিতরে ঢুকল।

“ও তুমি। এমন সময় হঠাৎ কি দরকারে”

“আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার”

দেব দেউল

“আমার সঙ্গে? প্রাইভেটলি? কি কথা—”

চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল তিমু। তার প্রতিমুহুর্তে ভয় হচ্ছিল এইবার



বুনি মাস্টার মশাই পমক দিয়ে উঠবেন। কিন্তু মাস্টার মশাই তা' করলেন না, ঝানিকক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, “হ্যাঁজা, বল, শুনি কি তোমার প্রাইভেট কথা।”

সব শুনে খাউ মাস্টার মশাইও অবাক হয়ে গেলেন। এ যে অপরিচিত, অথচ একথা বিশ্বাস করবার জগো তাঁরও মারা জদয় যে উদ্ভূত হয়ে আছে।

“তুমি ঠিক দেখেছ?”

“ঠিক দেখেছি সার।

আমার একটুও ভুল হয়নি”

“স্টেশনে ওয়েটিং রুমে বসে’ আছেন? এখানে নিয়ে এলে না কেন?”

“তিনি যে কিছুতেই আসতে চাইলেন না।

“আপনার সঙ্গে একটু প্রাইভেটলি কথা আছে সার” [পৃষ্ঠা ১২৩

বললেন খুব অরুচি দরকারে তিনি দিল্লী যাচ্ছেন। রাত্রি দুটোয় তাঁর গাড়ি। আপনি একবার চলুন সার—”

খাউ মাস্টার মশাই চুপ করে’ রইলেন।

“তিনি কি নিজে মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি—”

তার কথা শেষ করতে দিলে না তিনু।

“না, তিনি স্বীকার করেন নি যদিও, কিন্তু অস্বীকারও করেন নি। মুখের তেঁসে চূপ করে’ রইলেন। আমার ভাল হয় নি তার। তিনি আর একটা কথাও বলেছেন, খুব যেন জানাজানি না হয়—”

থার্ড মাস্টার মশাই ক্রকৃদ্ধিত করে’ বইলেন তারও কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললেন, “বেশ আর কাউকে বোলো না। তুমি তুমি তার মনি স্টেশনে মাঝে একটা মানা যোগাড় করে’ ফেল—”

“মানা পাগতে দিয়েছি সাহেব।”

“বেশ, একটা নাগাদ বেকর বাড়ি থেকে ঠিক সময়ে এসে মানাকে থেকে নিয়ে যেও।”

সোৎসায়ে তিনু বাড়ি ফিরে গেল।

[৩]

স্টেশনের কাছেই এক মন্দির ছিল। সেই মন্দিরের চত্বরে উপর দপদপ করে’ ফলছিল একটা বড় নক্ষত্র। অক্ষকালে মনে হচ্ছিল যেন কোনও বিরতি পুরুষ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। তার গগনস্পর্শী ললাটে যেন পরোক্ষ রশ্মিতে এক রতনময় অদৃশ মুকুট আর সেই মুকুটের মধ্যমণি যেন ওঠ নক্ষত্র।

তিনু, মণি আর থার্ড মাস্টার মশাই যখন স্টেশনে এসে পৌঁছিল তখন ঠিক একটা বেজেছে। মণির হাতে একটি মানা। মুকুট সত্তীত বেশ চমৎকার করে’ গেথে দিয়েছিল মালাটি। তিনুর হাতে একটি কাগজ। স্টেশনে কোনও লোক নেই বিশেষ। মফস্বলের স্টেশনে লোক থাকেও না বিশেষ এত রাতে। স্টেশনের বাবুরা শুধু জেগে কাজ করছেন নিজেদের আপিসে। গোটা কয়েক কুলি একধারে শুয়ে ঘুমুচ্ছে।

তিনু, মণি আর মাস্টার মশাই এগিয়ে গেল ওয়েটিং রুমের দিকে। ওয়েটিং রুমেই তার থাকবার কথা। তিনুকে সেই কথাই বলেছিলেন তিনি। তিনু ওয়েটিং রুমে উঁকি দিয়ে দেখল। প্রথমে দেখতে পেল না কাউকে। চেয়ার বেগি সব খালি। তারপর হঠাৎ দেখতে পেল কোণের দিকে আপাদমস্তক চাদর দিয়ে মুড়ে কে শুয়ে আছে। তিনু আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে তার পায়ে হাত দিতেই তিনি উঠে বসলেন তাড়াতাড়ি। এই যে তিনি। থার্ড মাস্টারও অবাধ হয়ে গেলেন। সত্যিই তো।

দেব দেউল

ভদ্রলোক উঠে বসেছিলেন, তিনি তিমুকে দেখে হাসিমুখে বললেন, “ও, তুমি এসে গেছ বুঝি। বস, বস। তারপর, ওটা কি”

আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তিমু বললে, “ওটা ফুলের মালা, আপনার জুড়েই এনেছি”

মণির হাত থেকে মালাটি নিয়ে তিমু তাকে পরিয়ে দিলে সেটি। তারপর প্রণাম করলে। মণিও করলে। থার্ড মাস্টার মশাইও করলেন। ভদ্রলোক হাসিমুখে প্রতি-নমস্কার করলেন কেবল, আর কিছু বললেন না।

তিমু তখন তার অভিনন্দনপরখানা গুলে পড়তে লাগল।

“হে নেতাজী, হে ভারতবরেন্দ্রা বাংলাদেশের স্বসম্মান, আজ যে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে আপনার দেখা পাব তা’ আমাদের স্তূদ্রতম কল্পনারও অতীত ছিল। আপনি যে এখনও জীবিত আছেন, একথা আমাদের দেশের অনেকে বিশ্বাস করেন, আমরাও করতাম। আজ তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেয়ে কৃতার্থ হলাম।

আজ বাংলাদেশের বড় দুদিন। স্বাধীনতা দেবার ছুতোয় ইংরেজ বাংলাদেশকে আবার দ্বিখণ্ডিত করে’ চলে’ গেছে। অসংখ্য বাঙালী পথে দাঁড়িয়েছে। স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, গৃহহীন বাঙালীর হাহাকারে চতুর্দিক পরিপূর্ণ, কিন্তু যারা স্বাধীনতার সিংহাসনে আজ সমাসীন তাঁদের কানে এ হাহাকার প্রবেশ করে না। উপরন্তু তাঁদের ব্যবহার দেখে মনে হয় যে বাঙালীরা যেন দেশের কেউ নয়, বাঙালীর’ যেন স্বাধীনতার জগু কিছু করে নি, যা করেছে সব অবাঙালীরা। চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালীর স্থান নেই, অগ্নয়ভাবে অত্যাচার করে’ তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে। আমার বাবা কখনও ঘুষ নিতেন না, এই জুড়েই তাঁর প্রোমোশন হয় না। প্রোমোশন হয়েছে মিনিষ্টারের এক ভাইপোর। ওপরওলাদের ইচ্ছে কর্মচারীরা সব ঘুষ নিক এবং টাকাটা সবাই মিলে ভাগাভাগি করে’ নেওয়া হোক। আমার বাবা তা’ করতে রাজী হন নি বলে’ তার উপর সবাই চটা। সর্বত্রই এই।

রাষ্ট্রভাষার নামে জোর করে’ হিন্দী আমাদের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। আমাদের বুলে নতুন যে অবাঙালী হেডমাস্টার এসেছেন, তিনি বাড়িতে তাদের আড্ডা বসিয়ে জুয়ো খেলেন, আমাদের থার্ড মাস্টার মশাই সে আড্ডায় যান না বলে’ হেডমাস্টার তাঁর উপর অপ্রসন্ন। নানা ছুতোয় ওঁর নামে অভিযোগ করেন ওপরওলার কাছে। বাংলাদেশে যে সব নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে তাতেও বাঙালীরা চাকরি পায় না, সেখানেও অবাঙালীদের প্রতাপ। স্বাধীনতার নামে যে জিনিস দেশে চালু হয়েছে, তা’ বাঙালীদের পক্ষে নির্ধাতনের নামান্তর। এ সময় আপনি

● নেপথ্যে

বনফুল

এমনভাবে আত্মগোপন করে' আছেন কেন? ভাবের-দীপ্তিতে আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনাকে পুরোভাগে রেখে আবার আমরা জয়-যাত্রায় অগ্রসর হই।

যে অঞ্চল অতান পক্ষপাতহীন স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে বাঙালীর ছেলেমেয়েরা দলে দলে আত্মজতি দিয়েছিল সে স্বাধীনতা' আমরা পাই নি। আমাদের ঠিকিয়ে, শাস্তি দিয়ে একদল চতুর লোক ক্ষমতা হস্তগত করেছে। 'আমাদের বাঙালীদের ভার' নিষ্পত্তি করে' মেরে ফেলেতে চায়, এ বিষয়ে তারা ইংরেজদের চেয়েও নিষ্ঠুর। তে নেতাজী, আপনি আবার আত্মপ্রকাশ করুন, আপনি এখানে আমাদের অশ্রুমতি দিন আমরা দামামা বাজিয়ে প্রচার করি আপনার অবিভাবের কথা, হাস্যমুখ হিমচল আবার জেগে উঠুক নব স্বাধীনতার নব আন্দোলনে। তে নেতাজী, আপনি আমাদের অশ্রুমতি দিন—"

ত্রিমুর গলা কাঁপতে লাগল, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল। সে থেমে গেল। অভিনন্দনপত্র আর একটু লেখা ছিল, কিন্তু সে আর সেটুকু পড়তে পারেন না।

তিনি নিবিস্তিচিতে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "এটা কি তুমি লিখে লিখেছ?"

"আমি খানিকটা লিখেছিলাম, তারপর নাক্টার মশাই বাকিটা লিখে দিয়েছেন"

খার্ড নাক্টার মশাই বললেন, "গোডার দিকটা ওর লেখা, শেষের দিকটা আমার।"

তিনি ত্রিমুর দিকে চেয়ে বললেন, "তুমি যা লিখেছ তা' চিক। স্বাধীনতার নামে দেশে নানারকম অনাচার অবিচার অত্যাচার চলছে এ কথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তোমরা একদিকটা মাত্র দেখেছ, এর আর একটা দিকও আছে"

"কি সেটা আমাদের বলে' দিন"

"তোমরা নিজের দোষের কথা কিছু বল নি। বল নি যে তোমরা দুর্বল বলেই নানারকম নারাজক রোগের বীজাণু তোমাদের আক্রমণ করেছে। তোমরা যদি জীবনৌশক্তিতে বলীয়ান হ'তে কেউ তোমাদের কিছু করতে পারত না। তোমরা অবিচার অত্যাচারকে মুখ বুজে মেনে নিচ্ছ, প্রতিবাদ করবার সাহস তোমাদের নেই, তোমাদের নৈতিক চরিত্র নেই, একতা নেই, শুলীকে শ্রদ্ধা করবার ইচ্ছে নেই, ক্ষমতা নেই, তোমরা সবাই স্ব স্ব প্রধান থাকতে চাও, একজন নেতাকে মুখ বুজে অশ্রুস্রবণ করবার মতো ধৈর্যও তোমাদের নেই, মনোবৃত্তিও নেই। শিকার ক্ষেত্রেও তোমরা পিছিয়ে পড়ছ। এরকম অবস্থায় দুর্দশা তো হবেই। তোমরা আগে মানুষের

দেয় দেউল

মতো মানুষ হও, বিজায় চরিত্রে নিজেদের যোগাতা প্রমাণ কর, তাহলেই তোমাদের দুঃখ ঘুচবে।”



নিজের ছোট পুঁচুলি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। [পৃষ্ঠা ১২৯

একটু থেমে
বললেন, “আ মা কে
তো ম রা এ খ ন
তোমাদের মধ্যে আত্ম-
প্রকাশ করতে বলছ।
খদি আত্মপ্রকাশ করি
তাহলে এর একটিনা
ফলই হবে, দলাদলি।
আমি যখন তোমাদের
মধ্যে ছিলাম তখন
আমাকে কেন্দ্র করে
যে কি কুৎসিত
দলাদলি হয়েছিল তা
তোমরা এখন বড় হয়ে
দেশের রাজনৈতিক
ইতিহাস পড়বে তখন
বুঝতে পারবে। তাই
আমি এখন তোমাদের
মধ্যে আসতে ইতস্তত
করছি, বুঝতে পারছি
আমার আদর্শকে রূপ
দেবার মতো যথেষ্ট
লোক নেই দেশে,
তোমরা যেদিন বড়
হ’য়ে উপযুক্ত হ’য়ে
আমাকে ডাক দেবে,
সেই দিনই আমি
আসব তো মা দে র



মণির হাত থেকে মালাটি নিয়ে তিরু তাঁকে-পরিষে দিতে গেল। পৃষ্ঠা—১১৬



কাছে। তোমরা নিজেদের তৈরি কর। সেইটেই এখন সব চেয়ে বড় কাজ। টেনের আর বেশী সময় নেই। আজ তাহলে তোমরা এস। তোমরা সত্যি সত্যি যেদিন বড় হবে সেদিন তোমাদের মহত্বের অকসণ্ণেই আবার আসবে তোমাদের কাছে। আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে এইবার একা একটু কথা বলব, তোমরা দু'জন যাইরে যাও।

তিনু আর মণি বাইরে চলে গেল।

তখন তিনি থার্ড মাস্টার মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, “আমি নেতাজী নই। আমি সামান্য লোক। কিন্তু নেতাজীর সঙ্গে আমার চেতনার অদ্বিত সাদৃশ্য আছে। অনেকই আমাকে নেতাজী বলে’ ভুল করে। বয়স লোকেরা যখন করে তখন আমি তাদের ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দিই। কিন্তু কিশোর ছেলেরা যখন নেতাজী বলে’ আমাকে ঘিরে দাঁড়ায় তখন আমি আর তাদের ভুল ভাঙিয়ে দিই না। আপনার ছাত্ৰটিকে যা বললাম তাদের তাই বলি। আপনিও যেন তাদের ভুল ভাঙিয়ে দেবেন না। নেতাজীকে ফিরে পাবার আশায় তারা নিজেদের ভাল করে’ গড়ে’ তুলুক। আর আপনারা তাদের সে গঠনে সহায়তা করুন।”

থার্ড মাস্টার মশাই নিবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বাইরে টেনের ওইসব শোনা গেল।

“আমার ট্রেন এসে গেল। আমি চলি—”

নিজের ছোট পুঁটুলিটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি। লোকবার আগে মাথায় একটা টুপি পরলেন আর মুখের নীচের দিকটা চান্দর দিয়ে ঢেকে নিলেন যাতে তার হুঁচটা কেউ না দেখতে পায়।

সংজ্ঞা: কর্ম/কৌশলের সরোবরমণি ন ত্যাগেৎ।

সংস্কৃত/কি দোষেণ পুংলিঙ্গাগ্রিবাবৃত্তাঃ।

—মীতা



মণিও মুক্তা

যার দাঁ কাছ, তা করতে গিয়ে যদি ফুটি
ভর, তাহলেও সে-কাছ ত্যাগ করা উচিত
নয়। কারণ, আগুন যেমন গোড়ায় ধূমের দ্বারা
আবৃত্ত থাকে, তেমনি সব কাজের আরম্ভেই
দোষ বা ফুটি থাকবেই।



‘ঠাকুরকুলের ভাগবত পাঠ’

—কবি জসিমউদ্দিন

গ্রামের জমিদার বাড়িতে কাশী হইতে এক ভাগবত ঠাকুর আসিয়াছেন। তিনি জমিদার বাড়িতে রোজ ভাগবত পাঠ করেন। পাঠ করিতে করিতে তিনি কত সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক গল্প বলেন। তাহা শুনিলে কত পুণ্য হয়। কিন্তু গ্রামের সাধারণ লোকদের সেখানে প্রবেশ নিষেধ। জমিদার তাহাদের নিমন্ত্রণ করেন নাই। কারণ জমিদারের মতে তাহারা ছোট জাত। কিন্তু চাষীরা গ্রামে সংখ্যান্ব পাঁচশত ঘর। তাহারা বলাবলি করে,—‘দেখ রে, পাঁচশ’ ঘর আমরা। যদি প্রত্যেকে একটাকা করিয়া চাঁদ তুলি তবে পাঁচশ’ টাকা ওঠে। আমরা তো ইচ্ছা করিলে একদিন ভাগবত আমাদের বাড়িতেই দিতে পারি।

গ্রামের মোড়ল ‘আরও দু’ একজনকে সঙ্গে লইয়া সত্য সত্যই একদিন ভাগবত ঠাকুরের নিকট যাইয়া উপস্থিত।

“ঠাকুর মহাশয়, প্রণাম হই।”

ঠাকুর মহাশয় স্নান করিয়া আফিকে বসিবেন, এমন সময় চাষীদের দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “কিগো ব্যাপার কি?”

“আজ্ঞে, আমরা একদিন আপনাকে আমাদের বাড়িতে লইয়া গিয়া ভাগবত শুনিতে চাই।” মোড়ল বলিল।

ঠাকুর মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা গরীব মানুষ। তোদের বাড়িতে গেলে আমাকে অনেক টাকা দিতে হইবে।”

গদাই মোড়ল হাত জোড় করিয়া উত্তর দিল, “আজ্ঞে আমরা গ্রামে পাঁচশ’ খর আছি। প্রত্যেকে একটাকা করিয়া দিলেও পাঁচশ’ টাকা ওঠে। দশজননে একসাথে যখন মিলিয়াছি তখন আমরা গরীব কিসের? আপনার ভাগবত পাঠে কত টাকা লাগিবে?”

ঠাকুর মহাশয় জমিদার বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিয়া বড় জোর যোজ পাঁচ টাকা পান। কিন্তু যদি বেশী টাকা পাওয়া যায় ছাড়ে কে। তিনি বলিলেন, “আমার ভাগবত তোদের বাড়িতে দিলে পাঁচশত টাকা লাগিবে।”

“আজ্ঞে কর্তা, আমরা গরীব মানুষ। কিছু কম করেন। আট আনার পয়সা দিব না। চারশ’ নিরানব্বই টাকা আট আনা, এর বেশী দিতে পারিব না।” উত্তর করিল।

ঠাকুর মহাশয় ভাবিলেন, আট আনাই বা কম লই কেন? তিনি বলিলেন, “না রে তা হবে না।”

গদাই মোড়ল গ্রামের মাতব্বর, দরদস্তর করিয়া ভাগবতের দান কিছু কম না করিলে তাহার মাতব্বরি থাকে না। সে বলিল, “আজ্ঞা না হয় আরও চার আনা আপনাকে ধরিয়া দিলাম। একুনে ঠাঁড়াইল, চারশ’ নিরানব্বই টাকা বার আনা। কর্তা এতেই রাজী হন।”

ভাগবত ঠাকুর মোড়লের দর কষাকষি দেখিয়া এবার তাগিয়া গিয়াছেন। বলিলেন, “দেখ, তোরা কি ইলিশ মাছের দোকান পাইয়াছিস?”

মোড়ল একটু হতভম্ব হইয়া পরে কানের মধ্যে গোঁজা একটি আখলা পয়সা বাহির করিয়া বলিল, “ঠাকুর যখন ছাড়িবেনই না, তখন ধরিয়া দিলাম আর এক আখলা। একুনে ঠাঁড়াইল গিয়া চারশ’ নিরানব্বই টাকা বারো আনা আখ পয়সা। এতেই আপনার খুশি থাকিতে হইবে।”

ঠাকুর দেখিলেন, ইহার পরে দর কষাকষি করিলে আর মান সম্বন্ধ থাকিবে না। তিনি বলিলেন, “যা এতেই হইবে। এখানে আর দু’দিন আমাকে ভাগবত পড়িতে হইবে। তারপরেই তোদের গুহানে যাইব। তোরা সব যোগাড় কর গিয়া।”

চাঘীরা বাড়ি ফিরিয়া চলিল। পথে ঘাইবার সময় ঘোড়ল তার সহচরদের খুব ভালমতই বুঝাইয়া দিল যে, সে না থাকিলে ঠাকুর মশায় পাঁচশত টাকার কমে কিছুতেই রাজী হইত না। সেই তো দর কষাকষি করিয়া পাঁচশত টাকা হইতে তিন আনা সাড়ে তিন পয়সা কমাইল।

বাড়িতে ঘাইয়া তাহার পরামর্শ করে, কোথায় ভাগবত দেওয়া যায়। কারও বাড়িতে এমন ঘর নাই যেখানে পাঁচশ' ঘর লোক একত্র বসিতে পারে। তখন স্থির হইল, একতনের ধানের ক্ষেত নষ্ট করিয়া সেখানেই ভাগবত দেওয়া হইবে। কিন্তু কার ক্ষেত কাটা যায়? দুখীরামের ক্ষেত কাটার কথা উঠিলে সে নয়ন পালের ধানের ক্ষেত দেখাইয়া দেয়, নয়ন পাল অগতঃরামের ক্ষেত দেখাইয়া দেয়। কার ক্ষেত কাটা যায়? শেষে মোড়ল যুক্তি দিল সকলের ক্ষেতই কাটা হোক। ভাগবত শোনার এমনই নেশা, তখন সকলে মিলিয়া মাঠকে মাঠ কাঁচা ধান কাটিয়া ফেলিল।

জমিদার বাড়িতে ভাগবত পাঠ শোনার সময় ভুললোকেরা তাকিয়া বালিশ হেলান দিয়া বসে। চাঘীরা গরীব মানুষ। এসব হাওয়ার কোথায় পাইবে। খুড় আর বিচালীর আঁটি বাঁধিয়া বড় বড় বালিশ তৈরি করা হইল। খুড়ের গদি তৈরি করা হইল। ঠিক ভুললোকেরা যে ভাবে ভাগবত শোনে তাহারও তেমনি আশ্রয় করিয়া ভাগবত শুনিলে।

কিন্তু জমিদার বাড়ির মতন বড় শামিয়ানা তো তাহাদের নাই। কি করিয়া শামিয়ানা যোগাড় করা যায়? মোড়লের পাকা বুদ্ধি। স্থির হইল যার বাড়িতে যত কাঁধা আছে, লেপ আছে, চাদর আছে সব একত্র সেলাই করিয়া শামিয়ানা তৈরি করিতে হইবে। প্রত্যেক বাড়ি হইতে রঙ-বেরঙের কাঁধা আসিতে লাগিল। কারও কাঁধা ছেঁড়া, কারও লেপের খানিকটা উইএ খাইয়া ফেলিয়াছে।

সমস্ত একত্র করিয়া এক বিচিত্র শামিয়ানা তৈরি হইল। শামিয়ানা সেই ধানের ক্ষেতে পাতিয়া চার কোণে চারটি খুঁটার সাঁথে তাহার চারি কোণ বাঁধা হইল। তাহার পর প্রকাণ্ড একটা বাঁশের মাথায় নারিকেলের মালা বাঁধিয়া সেই বাঁশ শামিয়ানার মাথায় ঠেকাইয়া সকলে মিলিয়া তৈলিয়া উপরে উঠাইল। সেই অল্পশ শামিয়ানার তলে খুড়ের গদি ও খুড়ের বালিশ পাতিয়া দেওয়া হইল। মাঝখানে এক ভাঙা জলচৌকি পাতা হইল। তাহার চার কোণে সিন্দুর দেওয়া হইল। চৌকির সামনে দুইটি কলসী, কলসীর উপর একটা আঘের শাখা। বামপাশে একটা গাড়ু। গাড়ুর উপরে একখান গামছা রাখিয়া দেওয়া হইল। মোট কথা বড়-

● শুকঠাকুরের ভাগবতপাঠ

কবি অসিমউদ্দিন

লোকের বাড়িতে ভাগবত সভা যেভাবে সাজান হয় তাহার চাইতে তাহাদের ভাগবত সভা কম করিয়া সাজান হইল না।

সমস্ত শ্রিত। আজই বৈকাল হইতে ভাগবত পাঠ হইবে। এমন সময় চাষীদের গুরুঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। তিনি তো এসব দেখিয়া অবাক—“কি রে বাপার কি?”

গুরুঠাকুরের পায়ে দুল মাখায় লইয়া মোড়ল বলিল, “কাণী হইতে জমিদার বাড়িতে এক ভাগবত ঠাকুর আসিয়াছেন। তিনি আজ আমাদের এখানে ভাগবত পাঠ করিবেন।”

শুক্লমহাশয় নিজে বাঁচিয়া থাকিতে তাহার শিষ্যসভাতে অল্প লোক ভাগবত পাঠ করিবে? ইমায় শুক্লমহাশয়ের সকল শরীর জ্বালা করিতে লাগিল।—“তা কাণীর ঠাকুর ভাগবত পাঠ করিবেন। কত টাকা লইবেন?” তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

মোড়ল খুব গর্বের সঙ্গে বলিল, “আগে তো তিনি পাঁচশ’ টাকার কমে ছাড়েন না, তবে অনেক বলিয়া কহিয়া তিন আনা সাড়ে তিন পয়সা কমাইয়াছি।”

“আমার মাথা করিয়াছ?” গুরুঠাকুর রাগ করিয়া বলিলেন, “ভাগবত পাঠ কি আমি জানি না, যে অল্প লোক আসিয়া তোদের বাড়িতে ভাগবত পাঠ করিবে? আর ভাগবত পাঠে কি এত টাকা লাগে রে মুণ্ডের দল! পাঁচ টাকা দিলে আমি ভাগবত পাঠ করিতে পারি।”

মোড়ল বলিল, “আজ্ঞে গুরুদেব, আপনি যে ভাগবত পাঠ করিতে পারেন, এ তো আমাদের জ্ঞান ছিল না। তাই—”

“আরে মুণ্ডের দল! তোরা তো কিছু বুঝিস না। আমি বেদগানও জানি—বামায়ণ গানও জানি, আবার ভাগবত আমার কণ্ঠস্থ। তবে তোরা গরীব মানুষ, টকাপয়সা দিতে পারিস না বলিয়া তোদের কাছে এসব বিভ্রাট ছাতির করি না।”

চাষীরা সকলে ভাবিল, তাইত, আমাদের গুরুঠাকুর নিজেই যখন ভাগবত পাঠ করিতে জানেন তখন আর অল্প লোকের ঘারে যাই কেন। তাছাড়া গুরুঠাকুর মোটে পাঁচটি টাকা চাহিতেছেন। সকলে শ্রিত করিল, তাই হোক। আমাদের গুরুঠাকুরই ভাগবত পাঠ করুন।

সরল চাষীরা যেমন লেখাপড়া জানে না, তাদের গুরুঠাকুরও তেমন লেখাপড়া জানেন না। কিন্তু একটু চালাক চতুর বলিয়া নানা কল-কৌশলে তাহাদের মধ্যে নিজের সম্মান বাঁচাইয়া রাখেন। হাজার হোক বাবুনের ছেলে—বিভে না থাকুক দুট বুদ্ধিতে কম ঘান না।

সন্ধ্যাবেলায় তিনি লহরে যাইয়া অনেকগুলো পুরাতন পত্রিকা সংগ্রহ করিয়া

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি অশ্বিনীকর

দেব দেউল

এক কুলির মাথায় দিয়া সভানগুপে আসিয়া উপস্থিত। শিগ্গেরা ভাবিল, আমাদের গুরুঠাকুর এতবড় সিংহান। তাঁহার বিজ্ঞা মাথায় করিয়া বহিবার জন্য কুলি লাগে।



গুরুঠাকুর অনেকগুলি পুরাতন পঞ্জিকা এক কুলির মাথায় দিয়া সভানগুপে আসিয়া উপস্থিত।

পাতা খুলিয়া গুরুঠাকুর নাকে নশ লইয়া কাসিয়া সেই ক খ গ ঘ অক্ষরগুলিকে একটু হুরের মত করিয়া উচ্চারণ করিয়া পাঠ আরম্ভ করিলেন, “কিয়, কিয়, বিয় শোন বাবা শিশুগণ! কিয়, কিয়, বিয়।”

- গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ কবি জসিমউদ্দিন

সকলে ধরাধরি করিয়া কুলির মাথা হইতে গুরুঠাকুরের বিজ্ঞার বোকা নামাইল, যত্ন করিয়া পা খোয়াইয়া তাঁহাকে সেই জলচৌকির উপর বসাইল।

প্রকাণ্ড ভূঁড়ি সমেত গুরুঠাকুর ভাঙা জলচৌকির উপর যাইয়া বসিলেন। বসিয়া একে একে সেই বিজ্ঞাপন ও পুরাতন পঞ্জিকাগুলি পড়িবার ভান করিলেন। যেন বেশ ভাগবত কত কঠিন কঠিন বইয়েরই না পাতা উন্টাইতেছেন। আসলে তিনি লেখাপড়া মোটেই জানেন না। ছোটকালে কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। সেখানে ক খ গ ঘ এই পর্যন্ত তিনি পড়িয়াছিলেন। আর এইটুকুই তাঁহার মনে আছে। বাহোক একখানা পুরাতন পঞ্জিকার

দেব দেউল

১৩৫

গুরুঠাকুরের সামনে চাষীরা সকলে জোড়হাতে চক্ষু বুজিয়া ভাগবত শুনিতে বসিয়া গিয়াছে। তাহারা গরীব লোক। কত জনের কত রকমের দুঃখ। সেই দুঃখ প্রকাশের এতটুকু সুযোগ পাইলেই তাহারা 'বানিকটা' কাঁদিয়া লয়। মহিম মারা গিয়াছে আজ দশ বৎসর। কিন্তু ভাগবত শোনার সুযোগ লইয়া মহিমের মাতা তাহার মৃত মহিমের জন্ম ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। বাবা মহিম বে, তুই কোথায় গেলি? তারিণী ঠাকুরের সঙ্গে মানলায় হারিয়া রাইমোহনকে তাহার বসতবাড়ি দেখিতে হইয়াছে। সে মহিমের মাতার সঙ্গে কামায় যোগ দিল। গ্রামের জমিদার সুখারামের পাটকেতে জোর করিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল, রানকানাই দশ বৎসর আগে মহাজনের বাড়ি হইতে দশ টাকা কর্ত্ত করিয়াছিল। সুদে ফুলিয়া সেই কর্ত্তের টাকা এখন একশত টাকায় পরিণত হইয়াছে। তাহার জন্ম তার মনে সব সময় কামা জন্ম হইয়া আছে। আজ ভাগবত শোনার সুযোগ পাইয়া তাহারা সকলেই ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মোড়ল দেখিল সকলেই কাঁদিতেছে। সে না কাঁদিলে লোকে মনে করিবে কি? তারও মনে বহু দুঃখ ছিল। সেবার সদর থানা হইতে দারোগা আসিয়া তাহাকে খাতির করে নাই। অত্যাচার মোড়লকে খাতির করিয়াছে। সেই কথা ভালমত মনে করিয়া মোড়লও কাঁদিয়া উঠিল। মোড়লের কামা দেখিয়া গুরুঠাকুর আরও উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন—“কিয় ক্ষিয় ঘিয়।”

এমন মধুর কথা আর কেহ কোনদিন শোনে নাই।

“বল বল ভক্তগণ কিয় ক্ষিয় ঘিয়।”

এইভাবে সারারাত জাগিয়া চাষীরা ভাগবত শোনে, আর দিন ভরিয়া ঘুমায়।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ওপাড়ার এক ভদ্রলোক পথ দিয়া যাইতে দেখিতে পাইলেন, চাষীরা এবাড়ি ওবাড়ি হইতে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালাইয়া দলে দলে সেই বানিম্যানার দিকে যাইতেছে। খবর লইয়া জানিলেন চাষীদের গুরুঠাকুর রোজ রাতে এমন ভাগবত পাঠ করেন যে তাহা শুনিয়া সমস্ত গ্রামের লোক কাঁদিয়া বুক ভাসায়। শুনিয়া ভদ্রলোকের মনে কৌতূহল হইল, যাই একবার শুনিয়া আসি, কিরূপ ভাগবত পাঠ হইতেছে। ভদ্রলোক আসিয়া একপাশে বসিলেন। বানিক শুনিয়া ভদ্রলোক তো অবাক। গুরুঠাকুর কেবল অনবরত “কিয়, ক্ষিয়, ঘিয়” এই শব্দ করটা উচ্চারণ করিতেছে আর বোকা চাষীরা শেয়ালের মত জাক ছাড়িয়া কাঁদিতেছে। কিছুক্ষণ বসিয়া গুরুঠাকুরের এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিলেন। যাইবার সময় অসতর্কে বলিয়া কেলিলেন, “ভাগবত না বোড়ার ডিম পড়ছে।”

এই কথাটি গুরুঠাকুরের কানে গেল। গুরুঠাকুর সহসা পাঠ বন্ধ করিলেন।

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি বসন্তকানিন

শিগেরা গুরুঠাকুরের মূখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গুরুঠাকুর বলিতে আরম্ভ করিলেন, “বেশ শিগ্যগণ, এই যে মধুর ভাগবত—ইহার মর্ম অ-রসিক লোকে কি বুঝিবে। তাইতো ব্রাহ্মরি বলিয়াছেন, কেবলমাত্র ভক্তের কাছে হরিনাম

করিও। কিন্তু আমার একটা কথা।”

মোড়ল জোড় হাত করিয়া বলিল, “কি কথা গুরুদেব?”

গুরুঠাকুর গম্ভীর হইয়া বলিলেন, “কথা আর বিশেষ কিছু নয়। এই যে যিনি উঠিয়া গেলেন, এই সব পোশাক-পরা লোকেরা ভাগবত পড়ার মর্মকথা বুঝিতে পারে না। তার জগৎ আমার কোন দুঃখ নাই। তবে কিনা তোমরা আমার পাঁচশ’ বর শিগ্য এখানে উপস্থিত থাকিতে আমার ভাগবত পাঠকে সে বলিয়া গেল ঘোড়ার ভিন্ন!”

মোড়ল গর্জন করিয়া উঠিল, “কি এতবড় কথা! কি করিতে হইবে গুরুদেব?”

গুরুদেব বলিলেন, “কি করিতে হইবে তাহা কি

আমাকে বলিয়া দিতে হইবে? তোমরা পাঁচশ’ শিগ্য ইহার বিহিত করিতে পার না?”

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি অমিনউদ্দিন



তহলোককে ধরির। চাহির। যার বত খুঁশি কিল চড়
হারিতে লাগিল। [পৃঃ ১৩৭]



সাপুবেশধারী ছোটতাই চীৎকার করিয়া উঠিল,
“পাইয়াছি যে পাইয়াছি।”

এই কথা শুনিয়া সকলে ক্ষেপিয়া গেল। ভদ্রলোক তখনও বেশী দূর যান নাই। তাহাকে ধরিয়া আনিয়া চাষীরা যার যত খুশি কিল ঘুঘি মারিতে লাগিল।

এত লোকের মার খাইয়া ভদ্রলোক অতিকষ্টে বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। গায়ের বাথায় ঠাঁহার খুব জ্বর হইল। পরদিন সকালে ভদ্রলোকের ছোটভাই জিজ্ঞাসা করিল, “দাদা, রাতভর তো তোমার খুব জ্বর দেখিলাম। আর গায়ের বাথায় এপাশ ওপাশ করিতে পারিলে না, এরূপ হওয়ার কারণ কি?”

মার খাইয়া কে তাহা স্বীকার করিতে চায়? ভদ্রলোক বলিলেন, “এমনই আমার জ্বর হইয়াছে। আর জ্বর হইলেই তো গায়ে বাথ হইত।”

কিন্তু ছোটভাই নাছোড়বান্দা। সে তবু জিজ্ঞাসা করে—“না দাদা, হঠাৎ তোমার গায়ে বাথাই বা হইল কেন আর জ্বরই বা আসিল কেন? নিশ্চয় ইহার কারণ আছে। মার খাইয়া সর্বাস্থে কালশিরা পড়িয়াছে, তাহা তো লুকানো যায় না।”

তখন ভদ্রলোক সমস্ত ব্যাপার ছোটভাইকে পুলিয়া বলিলেন। ছোটভাই বলিল, “দাদা, তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি ইহার প্রতিশোধ লইতেছি।”

ভদ্রলোক বলিলেন, “ওরা সংখ্যায় পাঁচশত। ওদের সঙ্গে লড়াই করিয়া তুমি পারবে না। আমারই মত মার খাইয়া ফিরিয়া আসিবে।”

ছোটভাই বলিল, “দাদা, তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি কোশলে ওদের গুরুঠাকুরকে জব্দ করিয়া আসিব।”

সারাদিন বসিয়া ছোটভাই নানারকম ফন্দি-ফিকির করিতে লাগিল। সন্ধ্যা হয় হুঃ এমন সময় সে একখানা নামাবলী গায়ে জড়াইয়া, কপালে বুকে ফোঁটা-ভিলক কাটিয়া দিবি এক সাধু সাজিয়া খড়ম পায়ে চটর পটর করিয়া ভাগবত সভার দিকে রওনা হইল।

বহুক্ষণ হয় ভাগবতপাঠ আরম্ভ হইয়াছে। গুরুঠাকুরের মুখে ভাগবত শুনিয়া চাষীরা মাঝে মাঝে জ্বর করিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে, এমন সময় খড়ম পায়ে নামাবলী গায়ে কপালে বুকে ফোঁটা-ভিলক পরিয়া ছোটভাই সেই সভামণ্ডপে গুরুঠাকুরের একেবারে সামনে বাইয়া মাটিতে শুইয়া পড়িয়া প্রণাম করিল। তারপর গুরুঠাকুরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিল, “গুরুদেব, অধমকে দয়া করেন।” একজন সাধুবক্তির এরূপ ভক্তি দেখিয়া গুরুঠাকুরও খুব খুশি হইলেন। তিনি আজ আরও উৎসাহের সঙ্গে পড়িতে লাগিলেন, “মধুরায়াঃ পত কৃষ্ণ ক্রসই দীর্ঘই ইঞ, বল ভক্তগণ সব—কিয়, কিয়, বিয়। এমন মধুর নাম আর কখনও শুনিবে না।”

সকলে একযোগে চিৎকার করিয়া উঠিল, “কিয়, কিয়, বিয়, কিয়, কিয়, বিয়।”

● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি অদিবতদিন

সামুবেশধারী ছোটভাই মাটির উপর আর একটি প্রণাম করিয়া ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

গুরুঠাকুর আরও উৎসাহের সঙ্গে চিৎকার করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন, “বল বল ভক্তগণ, কিয়, ক্ষিয়, শিয়।” তখন সকলে সমবেতভাবে ডাকিয়া উঠিল, “কিয়, ক্ষিয়, শিয়।”

সামুবেশধারী ছোটভাই এবার গুরুঠাকুরের একথানা পা টানিয়া লইয়া বলিল, “আহা হা গুরুদেব, কি মধুর কথা শোনাইলেন। আপনার পা'খানি আমার বুকের উপর রাখুন।”

উৎসাহ পাটয়া গুরুঠাকুর আরও জোরে জোরে বলিতে লাগিলেন, “কিয় ক্ষিয় শিয়, কিয় ক্ষিয় শিয়।”

রাত্র ভরিয়া এইভাবে ভাগবত পাঠ চলিতে লাগিল। সামুবেশধারী ছোটভাই একবার মাটিতে গড়াগড়ি খায়, আবার গুরুঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া মাখায় দেয়। আর মাঝে মাঝে গুরুঠাকুরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চায়।

অন্যল এইভাবে “কিয় ক্ষিয়, শিয়, কিয় ক্ষিয় শিয়” বলিতে বলিতে গুরুঠাকুর মাঝে মাঝে সামনের গাড়ুর উপর হইতে গামছাখানা লইয়া মুখ মোছেন। হঠাৎ সামুবেশধারী ছোটভাই গামছাখানার উপর হইতে কি একটা জিনিস পাইয়া ট্যাঁকে জ্বলিয়া পড়ম পায়ে উঠিয়া ঝাঁড়াইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, “পাইয়াছি রে পাইয়াছি।”

সভার সকল লোকে জিজ্ঞাসা করিল, “আরে কি পাইয়াছেন আপনি?”

সে পড়ম বগলে করিয়া নাচিতে লাগিল আর বলিতে লাগিল, “যে জিনিস পাইলে পুষ্পকরথে চড়িয়া স্বর্গে যাওয়া যায়, যে জিনিস তাবিজ করিয়া পরিলে কোন অসুখ থাকে না, যে জিনিস সঙ্গে থাকিলে মারামারিতে কেহ হারাইতে পারে না, আমি সেই জিনিস পাইয়াছি।”

চারিদিক হইতে তাহাকে ঘিরিয়া নানা জনে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। মোড়ল তাহাদিগকে ধামাইয়া জোড়হাতে বলিল, “আপনি কি জিনিস পাইয়াছেন আমাদিগকে দেখান।”

ছোটভাই তখন তাহার ট্যাঁক হইতে একগাছা দাড়ি বাহির করিয়া বলিল, “যে মুখ হইতে এমন মধুর ভাগবত বাহির হইতেছে, সেই মুখের একগাছা দাড়ি! ইহা যার সঙ্গে থাকিবে তার চৌদ্দ পুরুষ স্বর্গে যাইবে।”

মোড়ল তখন বলিল, “এখন জিনিস আপনি লইয়া যাইতেছেন, তাহা আমার দিব দা। ওটা রাখিয়া যান।”

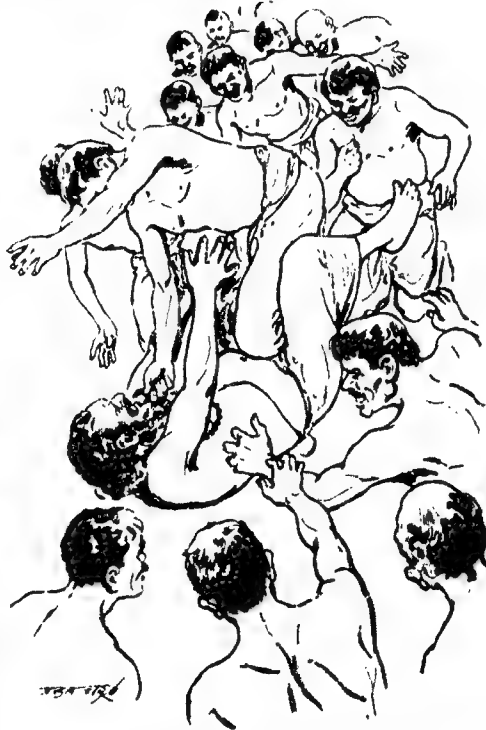
● গুরুঠাকুরের ভাগবতপাঠ
কবি কলিচাঁদ

ছোটভাই বলিল, “আমি তো মাত্র একটা দাড়ির আশ পাইয়াছি। গুরুঠাকুরের
মুখের কত দাড়ি আছে। তোমরা টানিয়া লও না কেন?”

যেমনি বলা অমনি পাঁচশত বোক: চাষী ছুটিয়া আসিল গুরুঠাকুরের দিকে।

গুরুঠাকুর কেবল বলেন,
“আরে তোরা করিস কি ?
করিস কি ?” কার কথা
কে শোনে। চোকির উপর
হইতে গুরুঠাকুরকে ঠাং
ধরিয়া টানিয়া আনিয়া
নাটিতে ফেলিয়া এক
একজন এক একগাছা দাড়ি
ধরিয়া টানিতে লাগিল।
দাড়ি ছেঁড়ার বাধায় গুরু-
ঠাকুর খতই চিৎকার করিয়া
কাদেন ততই তাহার। অতি
উৎসাহে দাড়ি ছিঁড়িতে
থাকে। সমস্ত দাড়ি যখন
ছিড়িয়া শেষ হইল তখন
পুণ্যলোভী চাষীরা গুরু-
ঠাকুরের মাথার চুলও বাদ
দিল না।

ইত্যবসরে ছোটভাই
খড়ম বগলে করিয়া সেখান
হইতে পলাইয়াছে। গুরু-
দেব মোড়লের পা
ধরিয়া চিৎকার করিয়া
কী দিয়া বলিতেছেন—
“বাবা, তুই আমার
চৌদ্দ পুরুষের গুরুঠাকুর।
তুই আমার বাঁচ।”



গুরুঠাকুরকে নাটিতে ফেলিয়া এক একজন এক একগাছা
দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল।

এ জন্যে বহু অপরাধ করিয়াছি,—আর নয়—এ বাঁচ।



তুধু একটা শ্যোলের গল্প

—দৃষ্টিহীন

[এ গল্পের কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন নীতি নেই, তুধু ঘটনা যেমন শুনেছিলাম,
তেমনি লিখেছি, তুধু একটু সাহিত্যের তুচ্ছিয়ে]

[১]

ডক্টর সেন তাঁর রিসার্চের সুবিধের জগে কলকাতার কাছ-বরাবর এক
পল্লী-অঞ্চলে জঙ্গল শুদ্ধ একটা প্রট কিনলেন।

খানিকটা জঙ্গল সাফ করে চমৎকার বাংলা প্যাটার্নের একটা ছোট্ট বাড়ি
তৈরি করলেন।

বাড়ির পেছন দিকে লোহার জালের দুটো ছোট ছোট ঘর করলেন, তাঁর
ধরগোশ আর গিনিপিগদের থাকবার জগে।

এই সব ধরগোশ আর গিনিপিগ তাঁর রিসার্চের জগেই দরকার। তিনি

অনেকদিন থেকে চেষ্টা করছেন, টি-বির একটা ওষুধ বার করতে। তাই নতুন নতুন ওষুধ তিনি খরগোশ আর গিনিপিগদের ওপর পরীক্ষা করে দেখেন।

এই পরীক্ষার দরুন অনেক খরগোশ আর গিনিপিগ মারা পড়ে...অশ্রু হয়...তখন ডক্টর সেনের আদেশমত ডুলু চাকর পেচনের জঙ্গলে মাটি গুঁড়ে তাদের সমাধি দেয়।

সেই মরা খরগোশের গন্ধে শেয়াল আসে, মাটি গুঁড়ে তাদের খাওয়া আর করে নিয়ে যায়।

[২]

লোহার তারের এই দুটি খর আর তার বাসিন্দার বিশেষভাবে আকর্ষণ করে অলককে। ডক্টর সেনের একমাত্র ছেলে এই অলক, মাঝে মাঝে পড়ার বয়স। অলকের আগে ডক্টর সেনের আর দুটি সন্তান হয় কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দুটি সন্তানই মারা যায়। তাই অলক বাপ-মায়ের চোখের মণি ছিল।

কিন্তু দুবস্থ ছেলে, সব সময়ই চেষ্টা করতো চোখের পাহারাকে এড়িয়ে নিজের জগতে একা ঘুরে বেড়াতে। বৈজ্ঞানিক বাপের কাছ থেকে পেয়েছিল অসীম কৌতূহল। যা কিছু নতুন দেখতো, তাতেই তার কৌতূহলী মন নেচে উঠতো, পরম বিজ্ঞের মত মা-বাপকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে উদ্ভাস্ত করে তুলতো।

একদিন তার প্রশ্নে উদ্ভাস্ত হয়ে মিসেস সেন বলেছিলেন, ডুলুকে জিজ্ঞাসা কর, ডুলু বলে দেবে।

অলক রীতিমত অপমানিত বোধ করে। তার প্রশ্নের উত্তর দেবে, ডুলু!

গম্ভীরভাবে মা-কে বলেছিল, আমি তো তবু তিনখানা বই পড়েছি... ডুলু অ অ ক খ-ও জানে না...হঁ...ডুলু কি করে উত্তর দেবে?

মিসেস সেন আর কিছু বলতে পারেননি।

[৩]

একটা জিনিস অলক লক্ষ্য করতো, খরগোশের ঘরে মাঝে মধ্যে খরগোশ কমে যেতো, আবার দেখতো তাদের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। রোজ তার কাজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, খরগোশের ঘরে এসে খরগোশ গণনা।

খরগোশ গুনে গম্ভীরভাবে ডক্টর সেনের কাছে গিয়ে বলতো, বাবা, তারের ঘরে আজ মলটা খরগোশ দেখলাম...কাল বারোটো ছিল...দুটো খরগোশ গেলকোথায়?

● তবু একটা শেয়ালের গন্ধ
দৃষ্টিহীন

দেয় দেউল

ডক্টর সেন হঠাত তখন কোন বিলিভী ম্যাগাজিন পড়ছেন, অশ্রুমনস্কভাবে বলেন, তোমার গুনতে ভুল হয়েছে।

অলকের চোখমুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ভীতভাবে প্রতিবাদ করে, খেং! গুনতে আবার ভুল হয় বুঝি?



অলক প্রতিবাদ করে, খেং! গুনতে আবার ভুল হয় বুঝি?

ডক্টর সেন বুঝিয়ে বলেন, সভ্যতার কল্যাণে যদি দশ বিশটা প্রাণী মারা যায়, তাতে কিছু যায় আসে না।

[৪]

কিন্তু বরগোশের সংখ্যা ক্রমশই কমতে লাগলো। মানুষের কল্যাণে যারা মরছে, তাদের হিসেবের বাইরেও বরগোশের সংখ্যা কমতে থাকে।

● তবু একটা পেমালের গর
দুইটান

ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে ডক্টর সেন তখন বলেন, না, তোমার গুনতে ভুল হয়নি, দুটো বরগোশ কাল রাত্তিরে মারা গিয়েছে!

এই উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর সেন জানতেন, তিনি বিপদ ডেকে আনছেন। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়, প্রশ্ন! কেন মরে গেল? কি হয়েছিল? এত শীগগির শীগগির মরে যায় কেন?

তখন বাধা হয়েই তিনি সত্যি কথা বলেছিলেন। নতুন নতুন ওষুধের পরীক্ষা তাদের ওপর করতে হয়...তার ফলে অনেক সময় তারা মরে যায়।

চোখ বড় বড় করে অলক শোনে। কিছুতেই বুঝতে পারে না, তাদের কেন মরতে হয়।

ডাক্টর সেন ভুলু চাকরকে সন্দেহ করেন, চুরি করে হয়ত সে বিক্রি করেছে।

ডেকে চাকরকে শনক দেন।

চাকর হাতজোড় করে বলে, হুজুর, শেয়াল।

ডাক্টর সেন ধমকে ওঠেন, তারের বেড়ার ভেতরে ঢুকে শেয়াল কি করে নিয়ে যায়?

দরজার বাইরে অলক কান খাড়া করে শোনে। সত্যিই তো, তারের খর, এর ভেতর থেকে শেয়াল কি করে নিয়ে যাবে?

বুড়ো চাকর বলে, আজ্ঞে, দরকার পড়লে শেয়াল কুকুরদেরও বুদ্ধি খোলে। মাটির তলা থেকে স্তূড়ঙ্গ কেটে তারের ঘরের তলায় এসে খরগোশ ধরে নিয়ে যায়। বাচ্চাগুলো যখন বড় হয়, তখন এমনি করে খাবার নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়।

ডাক্টর সেন বলেন, ঠিক আছে, আমি দেখছি, কত বড় তাদের বুদ্ধি।

অলক দরজা থেকে ছুটে পালায়, শেয়ালগুলোর ওপর তার শ্রদ্ধা বেড়ে যায়। তার শিশুমনে কোতূহল জেগে ওঠে, দেখতে হবে চাকরটার কথা সত্যি কিনা।

[৫]

সন্ধ্যার মুখে সকলকে ফাঁকি দিয়ে অলক পেছনের জঙ্গলে এক ঝোপের কাছে চুপচুপ করে বসে থাকে।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে চলার থস্ থস্ শব্দ হয়। অলক সচকিত হয়ে ওঠে। একটু মুখ বাড়িয়ে দেখে, চাঁদের আলোয় পরগোশ মুখে করে একটা শেয়াল এগিয়ে আসছে। অলকের শিশুমনে আনন্দ জেগে ওঠে, মনে মনে কল্পনা করে, বনের ভেতর কোথাও বাচ্চারা ক্রিদের জ্বালায় ছটকট করছে, কখন তাদের বাবা তাদের সঙ্গে খাবার নিয়ে আসবে!

শেয়ালটা সোজা তার ঝোপের সামনে এসে দাঁড়ায়। অলক চোখ বড় করে দেখে।

কি সন্দেহ করে শেয়ালটা একটু থামে, এদিক ওদিক চায়!

এখন সময় হড়াম্ করে একটা গুলির শব্দ হলো...শেয়ালটা ছুটে পালালো... আবার একটা হড়াম্ করে আওয়াজ হলো...

[৬]

বন্দুক হাতে ডক্টর সেন এগিয়ে আসেন।

কোথায় শেয়াল ?

ওটা কি পড়ে ?

ঝোপের কাছে মাথা নীচ করে ডক্টর সেন দেখেন, অসাড় গুলি-বিক্রেদে
তাঁর অলক পড়ে আছে।

ডক্টর সেনের হাত থেকে বন্দুক পড়ে যায়।

বনের ভেতর শেয়ালরা চীৎকার করে ওঠে—চক্কা চক্কা !

জোনালী কথা

পিনক্কিয়ো (চার্লস্‌ ক্রোডি)

এই একখানি বই লিখে ইতালীজান লেনক ক্রোডি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছেন। তৎপক্ষে যে তিন চারখানি বই চিরকালের শিশুদের কাছে লেখা হয়েছে, পিনক্কিয়ো তাগেরই একটি। পিনক্কিয়ো কোন রাজার নাম নয়, কোন রাজকুমারের নাম নয়, কোন দুই ছেলের নাম নয়, পিনক্কিয়ো হলো একটা কাঠের পুতুলের নাম। মিঃ চেদী নামে এক ছুতোর বিক্রী একদিন এক টুকরো কাঠ নিয়ে যথারীতি কাজ করছিল, হঠাৎ শুভেতে গেলো কে যেন কীপ করে বলছে, বড় লাগছে, জোয়ার রীংবা আছে ঢালাও। তুতুড়ে কাঠ মনে করে চেদী ছীত হয়ে ওঠে, এমন সময় তার হস্ত দেখেটো এনে প্রস্তাব করলো, কাঠটা আমাকে দিয়ে দাও, ঐ কাঠ দিয়ে আমি একটা পুতুল তৈরি করবো, সেই পুতুল বাড়ির দিন ঢালাবে। চেদীর কাছ থেকে সেই কাঠের টুকরো নিয়ে গির দেখেটো একটা পুতুল তৈরি করলো—তার হাতে ভৈরী হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভিন্ন পুতুল বাগুয়ের যত্ন ন্যস্তে শুরু করে গিলো। দেখেটো সেই অত্যন্ত জীবন্ত পুতুলের নাম রাখলো পিনক্কিয়ো। কাঠের পুতুল হলে হবে কি, তার বিভিন্ন কাণ্ড-কারখানার দেখেটোর জীবন আঁকিত হয়ে উঠলো। ক্রোডি তাঁর বইতে সেই অল্প কাঠের পুতুলের বিভিন্ন যে সব আড়ম্বক্যের কারিগরী লিখেছেন, বিশ্বের হেলেনেয়ে-স্থান-স্থান, সবাই তা পড়ে মুগ্ধ। বিশ্বসাহিত্যে পিনক্কিয়োর মোড়া নেই।





সিংহগড়ের সিংহবিক্রম

—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

এক

সেদিনের কথা মনে কর যেদিন ছিলেন আওরঙ্গজেব ভারতের সার্বভৌম সম্রাট। ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ সব দিকই তাঁহার পদানত। উড়িতেছে অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি পতাকা—দিকে দিকে দেশে দেশে নগরে-প্রান্তরে পন্নীতে পন্নীতে শোনা যাইতেছে ‘আলা আলাহো আকবর’। তখনও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের দপ্ত ও অতপ্ত আকাজকা তৃপ্ত হয় নাই। সমুদয় দাক্ষিণাত্য বিজয় করা ছিল তাঁহার বাসনা। সেজন্ত উচ্চাঙ্গ আয়োজনের কোন ক্রটি করেন নাই। আশ্রা দিল্লীর ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য, ধনভাণ্ডার পশ্চাতে কেলিয়া আসিয়াছিলেন অগণিত সৈন্যবাহিনীসহ দাক্ষিণাত্য প্রবেশে। সর্বদিকে ছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। পদানত করিবেন হিন্দুরাজ্য—এই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য ও পন।

দেব দেউল

বাদশাহ্ আলমগীর হিন্দুদের উপর ধার্য করিয়াছিলেন জজিয়া। তাঁহার সৈন্যসাম্রাজ্য যখন যে প্রদেশ জয় করিয়াছেন তখন সেখানে প্রজাদের পীড়ন ও হিন্দুদের উচ্ছেদসাধন করিয়া সর্বাধিক দিয়াই তাহাদের দমাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই সব অসিচার ও উৎপীড়নের, বিশেষ করিয়া জজিয়া করের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের নামে শিবাজী মহারাজ এক পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের একস্থানে লিখিয়াছিলেন—

“বাদশাহ্, সালাম! যদি আপনি খোদার কেতাব (অর্থাৎ কুরাণ)-এ বিশ্বাস করেন, তবে দেখিবেন সেখানে লেখা আছে যে ঈশ্বর সর্বজনের প্রভু (রব-উল-আলমীন), শুধু মুসলমানের প্রভু (রব-উল-মুসলমীন) নহেন। বস্তুতঃ, ইসলাম ও হিন্দুধর্ম দুইটি পার্থক্যাত্মক শব্দ মাত্র; যেন দুইটি ভিন্ন রং—যাহা দিয়া স্বর্গবাসী চিত্রকর রং ফলাইয়া মানবজাতির (মানাবগণ রতীন) চিত্রপট পূর্ণ করিয়াছেন।

...মসজিদে তাঁহাকে স্মরণ করিবার জগাই আজান উচ্চারিত হয়। মন্দিরে মন্দিরে তাঁহার অধেষণে রুদ্রের ব্যাকুলতা প্রকাশের জগাই বন্টা বাজান হয়। অতএব নিজের ধর্ম ও ক্রিয়াকাণ্ডের জগু গোড়ামি করা ঈশ্বরের গ্রন্থের কথা বদল করিয়া দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে।...যদি আপনি মনে করেন যে প্রজাদের পীড়ন ও ভয়ে হিন্দুদের দমাইয়া রাখিলে আপনার ধর্মিকতা প্রমাণিত হইবে, তবে প্রথমে হিন্দুদের শীর্ষস্থানীয় মহারানার রাজসিংহের নিকট হইতে জজিয়া আদায় করুন। তাহার পর আমার নিকট আদায় করা তত কঠিন হইবে না। কারণ আমি তো আপনার সেবার জগু সদাই প্রস্তুত আছি। কিন্তু মাছি ও পিপীলিকাকে পীড়ন করা পৌরুষ নহে।

বুঝিতে পারি না কেন আপনার কর্মচারীরা এমন অশুভ প্রভুভক্ত যে তাহারা আপনাকে দেশের অশ্রুত অবস্থা জানায় না, কিন্তু স্বলগ্ন আগুনকে বড় চাপা দিয়া লুকাইতে চায়।

আপনার রাজসূর্য গৌরবের গগনে দীপ্তি বিকীর্ণ করিতে থাকুক।”

আলমগীর বাদশাহ্, শিবাজীর এই লিপি পাঠ করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। ‘পার্বত্য সুবিধ’ শিবাজীর পরাক্রম ধর্ম করিবার জগু সম্পূর্ণভাবে পরহাসিত করিবার জগু পাঠাইলেন অসংখ্য মুঘলবাহিনী দাঙ্গিপাত্য প্রবেশে। হিন্দু মুসলমানে আরম্ভ হইল ভীষণ সংঘর্ষ।

• [শিবাজীর লিখিত যে চিঠিখানা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা লেখকের মতে ঐতিহাসিক সোপাইটের দ্বিতীয় প্রতিলিপির অন্তর্গত। আচার্য বরনাথ সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও অনূদিত।]

● সিংহদেবের সিংহচক্র
ঐবোগেন্দ্রনাথ ওপা

দুই

শিবাজী অপূর্ব বীরত্ববলে, অতুল সাহসে, অসামান্য বিক্রমে, বিশূল অশ্বাসসায় সহকারে অর্গাধিপ গরীয়সী পুণ্যময়ী জম্মভূমি বঙ্গার জগা স্তম্ভ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া অচল অশিল গিরিরাজের আয় দাঁড়াইলেন—বাদশাহ আলমগীরের বিরুদ্ধে। ‘হর হর বম্ জম্ জম্ মা ভবানী’ ধ্বনি দিকে দিকে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

শিবাজীর বীরত্ব স্বর্ষ করিবার জগা বিরাট সৈন্যবাহিনী স্তম্ভ সেনাপতির নেতৃত্বে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন বাদশাহ আলমগীর। খোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল দক্ষিণাভ্যে সর্বত্র। দিকে দিকে আগুন জ্বলিতে লাগিল। একবার মুঘলসৈন্য-বাহিনী শিবাজীর অধিকৃত দুর্গ অধিকার করিতেছে, আবার অত্মদিকে শিবাজী অধিকার করিতেছেন মুঘল দুর্গ। একবার মুঘলের জয়, অত্মদিকে শিবাজীর জয়। দক্ষিণাপথ মুঘল ও মাওয়ালী সেনাদের পদভরে কম্পিত, অঙ্গধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিত। উভয় পক্ষের রণভেরীর মিনামে, যুদ্ধের ভৈরব গর্জনে দক্ষিণাত্য-প্রদেশ প্রকম্পিত।

আওরঙ্গজেবের বীর সেনাপতি মহারাজ যশোবন্ত সিংহ, শিবাজীর দুর্ভেজ দুর্গ সিংহগড় অধিকার করিয়াছেন। জয়পতির প্রাণপ্রিয়তম সিংহগড় দুর্গ, দুর্ভেজ সে গিরিদুর্গ। চারিদিকে নীল সমুদ্র পর্বতমালা মেঘলার আয় ইহাকে বেড়িয়া আছে। চারিদিক বেড়িয়া অতি দুরারোহ পর্বতশ্রেণী, শৈলকাননকুস্তলা ধরণীর শ্যাম লোভা। “নীলগগন সে মিশে গেছে নীল তনুতে সোহাগ করি”—মেঘ তাহার অঙ্গে অঙ্গে বেলা করে। সিংহগড়ের প্রহরীসদৃশ পর্বতশ্রেণী প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রাচীররূপে দাঁড়াইয়া আছে।

শিবাজীর এই সুরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিয়াছেন আলমগীর বাদশাহের সেনাপতি মহারাজা যশোবন্ত সিংহ। এই দুর্গ মুঘলের হস্তগত হওয়ায় শিবাজী মহারাজা পড়িয়াছেন গভীর চিন্তায়। কিভাবে মুঘলবাহিনীকে পরাজিত করিয়া সিংহগড় পুনরায় অধিকার করিবেন—কেমন করিয়া বিশূল বিপক্ষদলকে পরাজিত ও পৃথক করিয়া প্রকৃতির প্রাচীর বেষ্টিত সিংহগড় দুর্গ পুনরায় অধিকার করিবেন সেই হইল তাঁহার মনের একান্ত বাসনা—হর হর বম্ বম্ জম্ জম্ মা ভবানী, ভূমি হও আমার সহায় মা জননী। স্থির করিলেন একদিন রাজ্যবাসে আক্রমণ করিবেন সিংহগড় দুর্গ। নব বলে নব উৎসাহে তাঁহার প্রাণ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

দেব দেউল

ভিন্ন

মহাবীর শিবাজী ছিলেন পরম মাতৃভক্ত। তাঁহার জন্মনী এবং আরাধ্যা দেবী ভবানীকে তুল্য জ্ঞান করিতেন। যুদ্ধে গমনকালে মাতার চরণতলে ভক্তিপ্রণত হইয়া তরবারি ধারণ করিয়া যুদ্ধে যাইতেন। যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষ কর্তৃক ধোরতরভাবে আক্রান্ত হইলে—সেই ভীষণ বিপদকালে জন্মনীর নাম স্মরণ করিয়া আবার নবীন উৎসাহে যুদ্ধ বাধিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন। মাতৃআশীর্বাদ মনে করিলেই তাঁহার প্রাণে জাগিত অভিন্ন কর্মশক্তি, প্রাণে আসিত নব উৎসাহ, নব আশা বিজয়ের। মাতৃশক্তি তাঁহার প্রাণে জাগাইয়া দিত শতগুণ উৎসাহ, শতগুণ অধ্যবসায়। আশা ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত হইয়া মহাবীর শিবাজী অটল বলে আক্রমণ করিতেন শতগুণ বিপক্ষবাহিনীকে। জয়লাভও করিতেন শিবাজী। মাতৃনাম স্মরণেই তাঁহার হৃদয়ে জাগিত মহাশক্তি।

চার

হেমন্তের সন্ধ্যা। আকাশ কুজ্বটিকায় সমাচ্ছন্ন। চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে। এমন সময়ে শিবাজী তাঁহার প্রিয় অম্বারোহণে সঙ্গে মাত্র দুইজন মাওয়াণী সেনা লইয়া নিষিড় নির্জন শ্যামল তরুবাধির পথে চিন্তামগ্ন মনে আসিলেন মাতৃদর্শনে। শিবাজী বীরে বীরে প্রবেশ করিলেন মাতৃভবনে।

জন্মনী জীজাবাই তাঁহার পূজার মন্দিরে বসিয়া তখন পূজা করিতেছিলেন উমা-মহেশ্বরকে। ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় উদ্ভূত হইয়া উঠিতেছিল, কণ্ঠে তাঁহার স্নানিত হইতেছিল স্তম্ভুর শিবসংগীত—

হর হর শিব শঙ্কর ভোলা,
জাহ্নবী শিরে, বিগলিত নীরে
কণ্ঠে ঘোড়ল হাড়মালা।
কপিরাজ ভূষণ বিভূতি ছাধন
জটাজ্জটিলম্বিত প্রমথ মেলা।
কল কল গঞ্জে নৃত্যভরঞ্জে
শ্মশান ভীষণ অনল ছালা।
সংহার! সংহার! শব্দ ভীষণ
করধৃত ত্রিশূল প্রলয় ছালা!

সংগীত শেষ হইলে শিবাজী মায়ের চরণে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন। তারপরে করজোড়ে নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলেন মাতৃসমীপে।

মাতা প্রাণাধিক বীরপুত্রের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন : 'শিবা, তোমার কুশল তো ?'

শিবাজী। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে আমার সর্বদাই কুশল, জননী।

জীজাবাই। আজ এমন অসময়ে কেন এলে শিবা ?

শিবাজী। না, আপনার আশীর্বাদ লাভ করবার জ্ঞ।

জীজাবাই। কোন্ দুর্গ জয় করবে ?

শিবাজী। সিংহগড় দুর্গ জয় করতে চাই মা মূবলের হাত থেকে।

জীজাবাই। কবে কোন্ তারিখে, বল।

শিবাজী। আমি আজই যাব গভীর রাত্ৰিকালে।

জীজাবাই। আজই ?

শিবাজী। হ্যাঁ মা জননী। আজই মূলবাহিনীকে আক্রমণ করবো সংকল্প করেছি।

জীজাবাই কি যেন ভাবিলেন, তারপর ধীরে মধুর কণ্ঠে কহিলেন—শোন শিবা, আমি দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে তোমার রণবিজয় প্রার্থনা করেছিলাম। শিবা, দেব শংকরের আশীর্বাদে তোমার বিজয়লাভ হবে। যাও বৎস! আক্রমণ কর সিংহগড়। তোমার জয় হউক—উমা-মহেশ্বরের এই আশীর্বাদ। গ্রহণ কর এই পুষ্পাঞ্জলি বিম্বপত্র, গ্রহণ কর এই বিজয় তিলক।

মাতা দিলেন শিবায় মস্তকে আশীর্বাদী পুষ্পাঞ্জলি। স্নেহবিগলিত নয়নে ললাটে পরাইয়া দিলেন চন্দন তিলক, হাতে দিলেন মাতা ভবানীর চরণস্পৃষ্ট তরবারি।

শিবাজী মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন। মাতা পুত্রের মস্তকোদ্ভাগ করিয়া পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন। 'এসো শিবা, বিজয়ী হয়ে এসো বৎস! এই নাও তোমার ভবানী-তরবারি। বিজয়ী হয়ে এসো শিবা। জয় মা ভবানী!'

শিবাজী মাতার আশীর্বাদ লাভ করিয়া ক্ষম্মে অমিত বল ও সাহস লাভ করিলেন এবং বজ্রমুষ্টিতে তরবারি ধারণ করিয়া মেঘমস্ককণ্ঠে কহিলেন : 'মা জননী, আপনি আমার আরাধ্যা দেবী। আপনিই আমার আরাধ্যা দেবী ভবানী, আপনি মহাশক্তিময়ী অতুল শ্রীসময়িতা বশপ্রহরণধারিণী দেবী ভগবতী। মা, তোমার শুভ আশীর্বাদে নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হব।'

দেব দেউল

শিবাজী যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি মাতৃ-মন্দির হইতে নববলে উদীপ্ত হইয়া নিশীথে নীরবে যাত্রা করিলেন—শত মত্ত মাতঙ্গ দলের স্তায় অসীম বলে। মহামাতৃভক্ত শিবাজীর মা মা ধ্বনি সন্ধ্যার মৌন আকাশ প্রতিধ্বনিত করিল। মাতৃনাম ধ্বনিত হইল আকাশে-বাতাসে বনে-বনে প্রান্তরে প্রান্তরে।



মাওরাণী সৈন্যসহ শিবাজী সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ করিলেন।

চার

রাত্রি দ্বিপ্রহর।
নিতুঙ্ক ধরণী। চারি-
দিকে গভীর ঘন
অন্ধকার। ঘোর
কুজঝটিকায় চারিদিক
সমচ্ছিন্ন। আকাশে
ভারৱা শুধু জাগিয়া
আছে। নীড়ে নীড়ে
পাখীদের পক্ষবিধ্বনন
শব্দ শুনা যাইতেছে।
এমন সময় নীরবে
সাবধানে অতি
সতর্কতার সহিত
সতর্ক পদবিক্ষেপে
রক্তবিনির্মিত অধি-
রোহিণী আশ্রয় করিয়া
একে একে ধংশে ধংশে
সহস্রে সহস্রে অযুতে
অযুতে বাওরাণী
সৈন্য অতি সন্তর্পণে
হুয়ারোহ সিংহগড়

- সিংহগড়ের বিবাহবিহীন
ঐবোধেন্দ্রনাথ ভট্ট

দুর্গের উপর উঠিতেছিল। যেখানে রজ্জু অধিরোহীণ সাহায্যে উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, সেখানে পর্বত শিলাখণ্ড এবং বৃক্ষলতা অবলম্বন করিয়া উঠিতেছিল মাওয়ালী সৈন্যদল। ক্রমে তাহারা উঠিল পর্বতোপরি দুর্গাশয়ে। এমন সমুপগে উঠিল যে আওরঙ্গজেবের উক্তি ‘পার্বত্য মূষিক’ বলিয়া শিবাজীর উপর প্রযুক্ত লঙ্ক অসংগত হয় নাই।

অত্মদিকে দুর্গাশয়ের দুর্গরক্ষী মুঘল-সেনাদল আরামে কল্লাচ্ছাদনে সুখনিদ্রা ভোগ করিতেছিল। এমন সময় মাওয়ালী সেনার সমস্ত পদাঙ্কেপে মুঘল দুর্গরক্ষীদের সুখনিদ্রা ভাঙিল। তন্দ্রানির্জড়িত চক্ষে তাহারা সন্ধ্যায় শব্দ শুনিতে দেখিল বিপক্ষ সেনার দ্বারা দুর্গ পূর্ণ হইয়াছে। অমনি বাজিল রণভেরী ঘন ঘন, জাগিয়া উঠিল দুর্গের মুঘল প্রহরীগণ, মুঘল সৈন্যদল ও সৈন্যগণ। বাজিল রণদামামা ভৈরবরবে। অস্ত্রোত্তীর্ণ সহস্র আক্রমণ—মুঘলসেনা কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহারা সব বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল সৈন্যদলগণের সুশৃঙ্খল লঙ্কাগুণে ক্ষণকালের মধ্যেই সকলে সংবল হইল। আরম্ভ হইল ভীষণ আক্রমণ—মুঘলসেনারা আক্রমণ করিল শিবাজীর সৈন্যদলের উপর।

আরম্ভ হইল হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ। উভয় পক্ষের সেনার ঘোর গভীর গর্জন পর্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে হইয়া উঠিল গর্জনমুখর। মুঘলসেনার ‘আল্লা আল্লাহো আকবর’ পনি শিবাজীর মাওয়ালী সেনার ‘হর হর মহাদেও’, ‘বম্ বম্ হর হর হর হর ভবানী’ ধ্বনি চারিদিকে এক মহাপ্রলয় মিনাদের সৃষ্টি করিল।

উভয় পক্ষের প্রজ্বলিত মশালের দাপিতে চারিদিকের পর্বতশিখর, বনানী করিল সমুজ্জ্বল।

শিবাজীর নির্দেশে মাওয়ালী সেনারা দেখিতে দেখিতে দুর্গরক্ষী মুঘল সৈন্যদলকে প্রবল বিক্রমে আক্রমণ করিয়া হতবল করিয়া কেলিল। দৈববলপ্রদীপ্ত মাওয়ালীদিগের অচণ্ড আক্রমণে ও অগ্ন্যবাতে মুঘলবাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হইল এবং শত শত মুঘল সেনানী প্রাণ হারাইল। দুর্গম গিরিশিখর হইতে পলায়ন করিতে গিয়া অনেক আহত হইয়া পড়িল। বিকৃত দুর্গপ্রান্তরে শত শত নিহত মুঘলসেনার, সৈন্যদলগণের মৃতদেহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। পরাজিত হইল মুঘল সৈন্যগণ। যশোবন্ত সিংহ বীর বলে একদিন যে সিংহগড় দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন সেই দুর্গ শিবাজীর বিজয়-প্রভাবে আবার তাহার হাতে আসিল। বীরবত্তে বিজয় প্রভাবে শিবাজী অব্যাহত দুর্গশিরে ঝাঁড়াইয়া উড্ডীন করিলেন নবীন বিজয় সৈন্যিক পতাকা! সেদিন প্রভাতে নবীন ভগ্ন নবীন কিরণ বিস্তার করিয়া চারিদিক স্বর্ণ-আলোকে উজ্জ্বল

করিতেছিল। শিবাজীর কঠোর সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বিখ্যাত বিজয়ী মাণ্ডলালী সৈন্যগণ নবোন্নাসে পর্বত-প্রান্তর ধনিত করিয়া বিজয়ধ্বনি করিল—হর হর বম্ বম্ জয় মা ভবানী মাতাজী জয়—জয় মাতাজী জীজাবাইকা জয়—বম্ বম্ হর হর জয় জয়পতি শিবাজী মহারাজাকি জয়!



জোনালী কথা

ডক্টর জিতাগো (বোরিস প্যাস্টার্নাক)

এই নভেলপানি নিচে সারা জগতে তুমুল আলোলন চলছে।
এই নভেলের লেখক হলেন রুশ সাহিত্যিক বোরিস প্যাস্টার্নাক।
এই নভেলের অন্ত্রে প্যাস্টার্নাক এবার সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান।
কিন্তু রাজনৈতিক কারণে তিনি নোবেল প্রাইজ প্রত্যাখ্যান করেছেন,
কেউ কেউ বলেন প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছেন। একটা আন্দোলনের ব্যাপারে, যদিও
এই নভেল রুশ ভাষায় লেখা কিন্তু এখনো পর্যন্ত তা সোভিয়েট রাশিয়ার ভাষায় হয় নি।

এই নভেলপানি হলো উরি আল্ফ্রেডভিচ, জিতাগোর জীবন ও অভিজ্ঞতার কাহিনী।
জিতাগো একটি কালমিক চরিত্র এবং এটি চরিত্রের ভেতর দিয়ে প্যাস্টার্নাক নিজের জীবনের
অভিজ্ঞতার গল আর নিজের কবি-মনকেই সূটিয়ে তুলেছেন। জিতাগো আসলে কবি ও দার্শনিক
কিন্তু তিনি জীবিকার জন্যে ডাক্তারের পুত্র গ্রহণ করেন। নভেলের আরম্ভ হচ্ছে জিতাগোর
বৈশ্যব হিসেবে কাহিনী নিয়ে। জিতাগোর শৈশবের ভেতর দিয়ে লেখক বিশাল লতাকীর
একদমের গোড়ার জারের রাশিয়ার পরিচয় দিয়েছেন, তখন সারা দেশের মধ্যে ঘিরে ঘিরে
ভার ভারের অনাচারের বিরুদ্ধে যথাবিস্তার প্রেক্ষিত পিকিত হলেও বিতোহা যোষণা হচ্ছে। তখন
জিতাগোও এই বিদ্রোহ-আন্দোলনে যোগদান করেন। তারপর এলো প্রথম মহাযুদ্ধ ও তার
সঙ্গে বোলশেভিক বিপ্লব। জিতাগো তার চোখের সামনে এই বিদ্রোহের খে-চেহারা দেখেছেন,
তাকে একান্ত বাস্তবভাবে বর্ণনা করেছেন। বিদ্রোহের প্রথম জয়ের মূল বিদ্রোহী যে সব তুল
করেন, যে সব অনাচার করেন, জিতাগোর অস্তর তাকে খুঁজি হর এবং জিতাগো ক্রমশঃ এই
বোলশেভিক আলোলন থেকে বিরুদ্ধে সরিয়ে দেন। এই নভেলের ভেতর জিতাগো জীবনভাবে
কমানিস্ট কর্মনীতির বহু জিনিসের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। ১৯২৯ পর্যন্ত স্টালিনের সোভিয়েট
রাশিয়ার বাস্তব যদি এই নভেলে আছে। সেই বছরেই মস্কো শহরে এই নভেলের ন্যাক
ডক্টর জিতাগো হেঁদরকা করেব। এইখানি মূল নভেলের শেষ। কিন্তু লেখক তার পরেও
আর একটি অধ্যায়ে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত ঘটনার ব্যাপারে নিয়ে আসেন। নভেলের
শেষে ডক্টর জিতাগোর লেখা বলে ২৬টা কবিতা আছে। এই কবিতাগুলি প্যাস্টার্নাকের
কবি-প্রতিভার অপরূপ বিবর্তন। এই নভেলে প্যাস্টার্নাক কমানিস্টবাদের ধর্মহীনতা এবং হিস-
নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন।



পাষাণী

—সুখলতা রায়

পরিচয়—প্রতিমা—রাজকুমারী। নীলা, মোতি, পাশ, চুনি—সঙ্গিনী।

ভিখারী বালিকা। দেবদূত : প্রহরী, বুড়ী, অক্ষ, খোঁড়া প্রভৃতি।

প্রথম দৃশ্য

(রাজবাড়ির বাগান, নীলা ও মোতি কল তুলছে।
দূরে প্রহরী)

(নাচতে নাচতে চুনির প্রবেশ। নাচের সাথে
গানও থাকতে পারে)

মোতি। জাম্ ভাই,
আজকে একটা নতুন কিছু চাই।
রাজার ঘেয়ের মনটা তার তার,
পুরোনো খেলা ভাল লাগে না তার ;
বলছি তাই,
আজ একটা নতুন কিছুই চাই।

নীলা। এও বিষম ব্যাপার।

নিতি নতুন কোথায় পাওয়া যায় ?

চুনি। নিতি যেখা নতুন যেনে,
তেনে যেনে
সেই দেশেতে চল না যাই মোরা—
যো। যিহে কেন গোল করিস লো
তোরা ?

টেরটি পাবি
পিটটি যখন বাবি
রাজকুমারীর হাতে।

(পান্নার প্রবেশ)

পান্না। আঁহা! ভয় করি না তাতে।

নামটি প্রতিমা,

রূপেও সে যে সত্যি প্রতিমা।

নী। কিন্তু পাথরের।

যো। লক্ষ্য কতিন ঠাণ্ডা পাথরের।

চু। বল্‌ল,

কবে এই পাষণ হবে জল;

কবে অত্যাচারের হবে শেষ,

শান্তি পাবে সকল দেশ?

(রাজকন্যা প্রতিমার গবেশ)

প্র। বলি, নীলা মোতি পান্না চুনি,

এত কিসের গল্প, শুনি?

যো। কি খেলা আজ খেলতে তোমার সাথ?

প্র। স্বগড়াকাটি, বিবাদ-বিসম্বাদ।

যো। কার সাথে?

প্র। তোমার সাথে।

চু। বাঃ বাঃ, বেশ হবে।

আয় পান্না, আয় তু ভবে

চিখটি কাটি তোরে। (গালে চিহ্নটি)

পা। উঃ! এত জোরে?

আয় ডেকো না মোরে।

...আড়ি আড়ি, তোমার সাথে আড়ি।

চু। ঈল, দেবিল বেন, বাসমে চলে বাড়ি।

(বুয়ে খোঁড়া তিখারী বালিকা)

বালিকা। আমি খোঁড়া মেয়ে,

কিরি, এক বুঠো চাল চেয়ে।

বেলা বেল, কখন যাব ঘরে,

যা যে আমার আহেন করে প'ড়ে;

ভাইটি বুঝি কেঁদে হ'ল সারা,

সকাল থেকে যায়নি বেচারী।

সারা দিনে পাইনি কিছু হায়—

প্রতিমা। কে রে ওই ভিখুঁষে মেগে যায়?

ডাক না মোতি, মজা করি কিছু।

নী। আঁহা, লেগে না ওর পিছু;

দুঃখী ও যে, বড়ই অসহায়।

প্র। দুঃখী কে, কি দেখেই চেনা যায়?

(বালিকার প্রবেশ)

ওরে মেয়ে, এদিক পানে আয়।

বালিকা। ডাকছ কি আমায়?

প্র। নিয়ে যা ভিক্ষা।

(গলার সোনার হার দেওয়)

বা। কেন পরীক্ষা?

রাজকুমারি, আমি হার চাই নাই;

মাত্র দুটি পয়সা পেলে, প্রাণে বেঁচে যাই।

প্র। নিয়ে যা না, বেচে বাবি!

বা। পাছে লোকে চোর বলে,

তাই মনে ভাবি।

আচ্ছা দাঁও;

বেঁচে থাক, সুখে থাক,

গরীবের পানে সদা চাও।

(প্রস্থানোচ্চত)

প্র। প্রহরী, প্রহরী, চোর, চোর!

(বালিকাকে প্রহরী ধরল)

প্রহরী। কী,—এত আশ্পর্শি তোর?

সাজা পাড়িএর জন্তে।

বা। (কাঁতে কাঁতে) এ কী কথা রাজকন্যে!

নিজে দিলে। দেবে কি আইনে সাজা?

সাকী আহেন অগভের রাজা।

● পান্না

জ্বলতা রাও



‘নিরে বা না, বেচে খাবি!’ [পৃষ্ঠা ১৫৪

পায়ে ধরি, ছেড়ে দাঁড়ি ঘোরে,
বেলা গেল, যেতে হবে ঘরে।
প্রতিমা। (হাসতে হাসতে) যা চ’লে,
কমা পেলি, মন ঘোর গুলী আছে ব’লে।
(হার কলে বিয়ে বালিকার প্রস্থান)

প্র। ছাখ্‌ সখী পাশা,
ঠাট্টা বোকে না ওয়া, জানে কামা।
(বেবদূতের প্রবেশ)
বেবদূত। পরে দুঃখ দিয়ে যেবা স্তব পাশ,
কেউ তারে কতু নাহি চায়।

● পায়সী
ব্রজলতা মাও

পাষণে জন্ম গড়া, করুণা না জানে,
ভালবেসে চায় না কারো পানে।
পাষণ হয়েই থাক তাই চিরদিন।
শোন' প্রাণহীন,
এই শাস্তি, এই শাস্তি দিহু তোরে—
পাষের মূর্তি হয়ে রসে পথধারে।
সখীরা। না—না। নয় চিরদিন!
(হাঁটু গেড়ে) নয় চিরদিন!

দে। তবে শোন বন্ধু,
তার প্রিয় বন্ধু,
অভিলাপ সে আনল ডেকে নিজে;
পাষণ তিজে
করবে যেদিন জল,
দুটি আঁখির জল,
সেদিন হবে ভোর
পাষণীর, এই রজনী খোর।

দ্বিতীয় দৃশ্য

(পথের ধারে রাজকন্ডার পাষণমূর্তি। তাকে
ঘিরে সখীরা। দূরে প্রচরী।)

মোতি। চোখের জল
করুক অবিরল।

নীলা। কিন্তু কেমন ক'রে?
চোখের জল কতিন পাশর
ভাঙবে কিসের জোরে?

মো। দেবদুত্তের বাণী যখন এই,
একথা তো মিথ্যে হতে নেই।
কাঁদতে হবে ওকে,
অনের দুঃখে, প্রাণের গভীর শোকে।

পামা। তাহ'লে আর দেরি কেন ভাই?
চল যাই কাঁদাই।
চুনি। এনে ওর সখের জিনিস যত,
প্রিয় জিনিস যত,
ফেলব ভেঙে টুকরো টুকরো ক'রে।
পা। কাপড় জামা, গয়নাগাঁটি আনব
দু'হাত ভ'রে,
ওর স্তম্বে ফেলে
দেব আগুন ছেলে।

(চুনি ও পামার প্রস্থান)

মো। যাও প্রচরী, নিয়ে এসো ডেকে
কানা খোঁড়া অন্ধ আতুর,
পার যেখান থেকে।

নী। পড়ব যত দুখের গাথা,
এইখানে ওর কাছে,
গাইব যত করুণ গান আছে।

মো। খাঁচার দুয়ার ফেলব খুলে,
সাধের ময়না যাবে উড়ে
উধাও হয়ে দূরে;

কিরবে না তো আর।
দেখলে পরান কাঁদবে না কি তার?

(বড়ীর প্রবেশ)

নী। ওই আসছে দুমড়ে-পড়া বুড়ী,
চুলগুলি তার যেন শপের মুড়ি।

বুড়ী। শপের মুড়ি অনেক ভাল
পাশর কুটির চেয়ে।
দুমড়ে-পড়া শরীর নিয়ে,
এসু পজা নেয়ে।

● পাষণী
সুখলতা রাও



শান্তি দিও তোরে—

পাপের বৃত্তি হয়ে হবে পথদ্বারে । [পূর্বা ১৪৬

আর ভোমারের ইনি !

সাধ্য কি যে চিনি ।

ঠায় ঝাড়িয়ে আছেন পথের পাশে ;

ভাকিয়ে ভাকিয়ে পথের লোকে হাসে ;

চি-চি প'ড়ে গেছে যে দুর্নাম ।

ছি—ছি, হিঃ, রাম রাম !

● পায়গি

হৃৎলতা রায়

(অঙ্কের প্রবেশ ও বৃদ্ধীর খাড়ে পড়া)

বু। হ্যাঁ গা, কেমন লোক ?
গায়ের উপর পড়ছে এসে,
কোথায় আছে চোখ ?
অ। নেই বাছা ; খাড়ে পড়ি জোকের
তাইতে ত।

কার নামেতে পড়ল টি-টি এত ?
বু। এই আমাদের রাজকুমারীয়—
রাজকুমারীয় গো !
অ। আরে ছোঃ !

(বৃদ্ধি ও অঙ্কের প্রগান : খোঁড়ার প্রবেশ)
খোঁড়া। মিথ্যে তো কয় না !
এই রাজকুগা ?
সেদিন তবে ঠিক বললে
কেনারাম ঘোষ—
বেধে এস, খোঁড়া পায়ের
ধাকবে না আকলোস।
একটা পা-ই গেছে আমার,
অফটাতে চলি,
হাতে খাই, মুখে কথা বলি,
আছে চোখ, নাক, কান,
নেই কোনো রোগ।
আর এঁর ?
একেই লোকে বলে কর্মের ভোগ।
(গ্রহান)

মো। বল বল, বল যত আছে
রুচ কথা তোমাদের কাছে।
বাক্য-বাণে দীর্ঘ হোক কঠিন অর্থ,
খুলে থাক অশ্রুপট, প্রাণস্থধামর।

● পায়নি
জন্মকথা রাত

তৃতীয় দৃশ্য

(রাজকুমার পায়ণমূর্তির পাশে নীলা
মোতি পারা চুনি)
মোতি। সব চেক্টা বৃথা হল হায়,
নিরাশায় মন ভেঙে যায়।
দয়া হল না তো,
দুঃখ পেল' না তো ?
যে আসে সে টিটকারি দিয়ে বলে
কত কিছু ;
লাঞ্জে মাথা হল না তো নীচু !
চুনি। এত আশা হবে কি বিফল ?
এওই দুর্লভ আশা সেই অশ্রুজল ?
পার্সা। এস ভাই, এইখানে থেকে যাই তবে ;
হেথা, আমাদের ঘর হবে ;
যায না কো ফিরে।
নীলা। আমাদের ভালবাসা থাক ওকে
থিয়ে।

(গান)

কবে বল হবে ভোর এ চখে রজনী বোর,
ও মুখে ফুটিবে বাণী জাগিবে পরাগখানি।
আমাদের ভালবাসা আকুল আকাঙ্ক্ষা আশা,
হবে কি বিফল হায়, দিবে না জীবন আনি।
(ভিখারী বালিকার প্রবেশ। একটি চোখ বাধা)

বালিকা। কারা গান গায় ?
কার প্রাণ করে 'হায় হায়' ?
(উকি খেয়ে) বেধে চিনি চিনি মনে হয়,
কিস্ত লাগে ভয়।
ওই মুক্তি কার ?
রাজকুমার প্রতিমার ?



‘...আর তোমাদের ইনি!
সাধ্য কি যে তিনি!...’ [পৃষ্ঠা ১৫৭]

মোতি। (উঠে এসে হাত ধরে)

এস এস, কিন্তু একি ?

এত রোগা কেন দেখি ?

নীলা। চোখে কি হয়েছে, বল।

বা। সব বলি, চল।

(হৃতিকে ঘিরে সকলের বসা। বালিকা

হৃতির পায়ের কাছে বসে, তার হৃৎকের
দিকে চেয়ে বলতে লাগল)

যেই দিন ‘চোর’ বলে,

দিলে মোরে লাজ,

সেদিনের কথা কিগো মনে পড়ে আজ ?

দিলে তুমি ত তাড়িয়ে,

প্রহরী দিল ত’ ভাগিয়ে।

পথে যেতে এক পাল ছেলে

পিছু নিল, মোয়ে ইট, কাঠ ঢেলা কেলে ;

● পাখাপি
স্বপ্নতা হাও

প্রাণ নিয়ে পালালাম ছুটে,
তবু তারা ভুটে
'চোর চোর' বলে তেড়ে এল;
একখানা ঢোলা চোখে লেগে গেল।

(মুতির চাকলা ও একটু নড়া)

রইলাম ঘরে বদ্ধ;
চোখটা গে হল অন্ধ,
কে বা ভিক্ষা নিতে যাবে,
ভাইটিও কিবা বল খাবে?
ওষুধ? কেই বা এনে দেবে মাকে!
হারালাম তাঁকে।

(মুতির মাথা টেট)

ভাইটিরে নিয়ে ফিরি পথে পথে,
আধপেটা খেয়ে বাঁচি কোনো মতে।
দুঃখ পেতে জন্মিয়েছি, দুঃখ পাব
বার বার।
কিন্তু, এত ধন, এত স্বর্থ ছিল যাঁর,
এক বশা তাঁর? হায় হায়,
দেখে বুঝ যে মোর কেটে যায়।

(হাত জুড়ে)

হে দেবতা, আমার এ ছাঁর প্রাণ দি
আধখানা দৃষ্টির বিনিময়ে
যদি হয় কোনো কাজ—,
সব নাও আজ;
ফিরে দাও রাজকুমারীর দেহ মন,
আর-সে জীবন।
প্রতিমার মূর্তি। ওগো ক্ষমা কর,
ক্ষমা কর।

(অগ্রপাতি)

চনি। এই তো কৈদেছে, কৈদেছে!
পায়। বেঁচেছে, বেঁচেছে!
নীলা। সব দুঃখ শেষ হল,
ঘরে ফিরে যাই চল।
মোতি। (বালিকার প্রতি)
আজ হতে তুমি আমাদের একজন,
আদরের অতি ছোট বোন।
(দুকে জড়াইয়া ধরিল)

স্ববিনীকা

নাতি বিহাসনঃ চকুনাতি সত্যাসনঃ ভূপঃ।
নাতি হাসননঃ দুঃখঃ নাতি ত্যাগননঃ দুঃখঃ।

—সহ্যাদারত



মণি ও মুক্তা

বিহার মত চকু আর নেই, লতোর চেয়ে
বড় ভগ্নতা আর নেই। আসক্তির চেয়ে বড়
দুঃখ নেই, ত্যাগের চেয়ে দুঃখ আর কিছু নেই।





২০ বদল

—আশাপূর্ণা দেবী

“পাজী গুণ্ডা ইয়ার ছোকরা!” গর্জে উঠলেন পিকলুর দাদু, “কের ভুমি লাড়াছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিলে? তোনার ওই ঘুড়ি-নাটাই যদি না আজ আমি প্তার জলে ফেলে দিয়ে আসি তো আনার নাম নেই।”

দিনে দশবার নিজের নামকে ‘নেই’ করে দেন পিকলুর দাদু। যদিও প্রায় গোটা আন্টেক অক্ষর দিয়ে তৈরি মস্ত একটা নাম তাঁর আছে।

দাদুর নাম ত্রিভুবনরঞ্জন চৌধুরী।

পিকলু সব সময় মনে মনে ভেড়ায়—আহা ত্রিভুবনরঞ্জন! মা-বাপ কী নামই বেছেছিলেন! এর চাইতে কানাছেলের নাম পললোচনও সহ্য হয়! ত্রিভুবনরঞ্জন না হয়ে ওঁর নাম ‘ত্রিভুবনভাড়ন’ হলেই ভাল হতো! সন্তি কী বদমেজাজী খিটখিটে রাগী লোক! আর যত রাগ যেন ওঁর পিকলুর ওপর! “পাজী গুণ্ডা ইয়ার

চোঁকরা"—এই হল তাঁর নাতি সম্ভাষণের ভাষা। উঠতে বসতে এই আদরের ভাষাটি প্রয়োগ করেন তিনি পিকলুর প্রতি।

পিকলুর নাকি সব মন্দ।

দাদু নাকি তাঁর আটখড়ি বছর বয়সের মধ্যে এমন ধুরন্ধর ছেলে দেখেননি।

কী করবে, পিকলু নেছাত ছেলেমানুষ তাই। নিরুপায় হয়েই মুখে চাবি দিয়ে থাকতে হয় তাকে। নইলে তারও বলতে ইচ্ছে করে 'আমারও এই এগারো বছর বয়সে তোমার মতন এমন ধুরন্ধর দাদু আর দেখিনি।'

বলতে পারে না। কিছু না বলেই এত বদনাম, বললে কি আর রক্ষে ছিল। ও খালি মনে মনে নানা কথা ভাবে আর নিশ্বাস ফেলে। নিশ্বাস ফেলবার কারণটা অবশ্য একটু বেশী গোপনীয়, তবে কিনা তোমাদের কাছে বলা যায় চুপি চুপি, তোমরা তো! আর বলে দেবে না রিডুবনরঞ্জনকে? না, চোটরা অত অধিখাসী হয় না, অন্তত আমি কখনো তাদের অনিখাসের কাজ করতে দেখিনি।

নিশ্বাস ফেলবার কারণটা হচ্ছে এই, আজ পদগু হিসেব করে দেখেছে পিকলু, জগতে তার বয়সী যত ছেলে আছে তাদের মধ্যে তিনভাগ ছেলেরই বেশ কেনন দাদুর নামের আগে চন্দ্রবিন্দু। বেচারি পিকলু, ভগবানের একটু ইচ্ছে থাকলে তো অনায়াসেই ওই তিনভাগের মধ্যে থাকতে পারতো সে! তা নয় পিকলুকে মার সেই একভাগের দলে পড়ে থাকতে হয়েছে। ওর দাদুর নামের আগে সবসময় গোটা গোটা করে লিখতে হবে 'ত্রিযুক্ত বাবু'।

নাঃ! এক একসময় পিকলুর নিজেরই চন্দ্রবিন্দু হয়ে যেতে ইচ্ছে করে।

আচ্ছা বেশ হলই না হয় পিকলু ওই একভাগের মধ্যে। কিন্তু আর সবলের দাদু আর পিকলুর দাদু? তাঃ, যেন আকাশ আর পাতাল, যেন সোনা আর সীসে, যেন চাঁদ আর ফাঁদ! আরও অনেকগুলো তুলনা তৈরি করেছিল পিকলু, এখন ভুলে গেছে।

আর সকলের, মানে 'দাদু'ওলা যে যে ছেলের সঙ্গে ভাব আছে পিকলুর, সকলকেই জিগোস করে করে দেখেছে পিকলু, আর তুলনা করে করে হতভম্ব হয়ে গেছে। বাড়ির আর যার কাছে যে রকমই হোন, নাতীদের কাছে তাঁরা কেউ বীণা, কেউ বৃদ্ধ, কেউ গাঙ্গী, আর সকলেই কল্লতরু!

তাঁদের পয়সাকড়ির বাপার মানেন্দ্র করতে দাদু, পড়া কাকি দেওয়ার খবর 'হাপিস' করে কেলেতে দাদু, বাবা মা বকুনি দিতে এলে তাঁদের ধরে বকুনি লাগিয়ে দিতে দাদু, এককথায় দাদু মানেই আশ্রয় আর প্রশ্রয়!

কিন্তু পিকলুর দাড়া ভাগি সব দিকে তেতুলগোলা। নিজে পরসা দেওয়া তো নারের কথা, পিকলু মাকে জপিয়ে জাপিয়ে যদি দাঁচারটে পরসা নিল তো অমনি ডাকলো : “পরসা কোথা পেলি ? কে দিলে পরসা ? বৌমা, আমার ছোলের হাতে পরসা দিয়েছ ? ছেলেটাকে উজ্জ্বল না দিয়ে দেখছি ছাড়বে না ভূমি”—এই সব বাক্যাবলি।

আর পড়া ফাঁকি ?

এর ভগবানকে ফাঁকি দেওয়া যায় তো দাতকে নয়। সকাল মফো দুটি দুটি করে দুটা নিজে পাহারা দিয়ে পিকলুকে পড়ার ঘেরিলে বসিয়ে থাকবেন তিনি।

তাই তোলবার জো নেই, বই খুলে উদাসমুখে চুপচাপ দু’দণ্ড বসে থাকবার জো নেই, এমন কি নশা কামড়ালে একটু প্যা চুককোবার জো নেই। শুধু একটানা পড়ে যেতে হবে।

দাড়া যখন পিকলুকে পাহারা দিতে তার বিশাল দেহখানি নিয়ে সালানে পাহারি করতে থাকেন, কালে কালে বুকটার ওপর যখনই ঐশ্বর গোছটি ঢুলতে থাকে, আর ভারী ভারী পায়ের আড়ম্বাজে এ খবটা পদস্থ গম্ভীর করে, তখন পিকলু হতাশ নিশ্বাস ফেলে।

নাঃ কোন আশা নেই !

পিকলু চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাবার পরও দাড়া শ্রীমুগ্ধ থাকবেন নিশ্চিত।

কতদিন ভাবে পিকলু, এবার থেকে আর ভয় করবে না দাতকে, চোপা করবে পদ্রনত। আর কোন ছেলেই যখন ভয় করে না, আর চোপা করে, সেই বা নয় কেন ? কিন্তু সামনে এসেই কেনন বুক গুর গুর করে।

তবু আজ পিকলু সাহসে বুক বেঁধেছিল, কিন্তু তার ফলে যা হয়ে গেল একেবারে চরম।

গাড়াছাঁতের কথা তুলতেই পিকলু গোঁ গোঁ করে বলে উঠেছিল, “এও যদি ইয়ে, ছাত গাড়া করে রেখেছ কেন ? নশুমেণ্টের মতন উচু পাঁচিল ঘিরে রাখতে পারনি ? নিজেই তো করেছিলে বাড়ি !”

“আঁ আঁ ! কী বলি ?”

দাতকে যেন বিছে কানড়ালো ! “যুখে যুখে কথা ? ভেবেছিস কি ?”

পিকলু তো আজ মরিয়া ! তাই বলে ফেলে, “ভাববো আবার কি ? দিনরাত বালি বকুনি আর বকুনি। গাড়াছাঁত থেকে পড়ে মরে গেলেই বাঁচি আমি।”

“বটে বটে বটে !”

দেব দেউল

বাস্!

তারপরই কানে একটা ভয়াবহ আকর্ষণ!

সে আকর্ষণে পিকলুর কান মাথা হাত পা সব স্কন্ধ, যেন কোন সমুদ্রে তলিয়ে গেল। চোখের সামনে রইল শুধু অন্ধকার।



বাস্! তারপরই কানে একটা ভয়াবহ আকর্ষণ!

মিজের কথা ভাবতে ভাবতে কখন একসময় দাহুর কথাই পিকলুর মন জুড়ে বসে! দাহুর কথা মানে আর কি—দাহুর শাস্তির কথা! পিকলুর এই

তারপর?

তারপর এং.

পিকলুকে ঘাঁটের ঘণ্টা বন্দী করে রাখা হয়েছে। মানে যে ঘণ্টা অস্তুতঃ পাঁচিশটা ইঁদুর, একশটামাকড়সা, বাতায় হাজার আরশোলা, আর তেইশ কোটি মশা আছে।

গায়ে মশার জল-বিড়ুটি, পায়ের কাছে ইঁদুরের সররর, ওদিকে বিকেল পড়ে অন্ধকার হয়ে আসছে। আত্ম-হত্যার যত্নরকম নিয়ম-কানুন আছে, সব এক একবার করে ভাবল পিকলু—জল, আগুন, বিষ, দড়ি। কিন্তু কোথায় সে সব? মা ঠিকই বলেন, “পরকারের সময় কিছু যদি হাতের কাছে পাওয়া যায়।”

● রং বদল

আশাপূর্ণা দেবী

এগারো বছর বয়সের মধ্যে যত রকম শাস্তির কথা কানে এসেছে তার—জেল, ফাঁসি, চাঁপাস্তুর, শূলে চড়ানো, ‘কেটে রক্তদর্শন’—সবই একে একে দাতুর জগো বাবস্থা করলো সে, কিন্তু দূর ছাই শুধু ভেবে আর কি হবে ? দাতুকে শাস্তি দিচ্ছে কে ?

এক যদি ভগবান... !

(‘সররর’ করে ইঁদুর চলে গেল একটা পায়ের কাঁচ দিয়ে। সমস্ত শরীরে শান্তনের জ্বালা।)

যদিও ভগবানের ওপর খুব বেশী আস্থা আর নেই পিকলুর, তবুও সে মনে মনে কল্পনা করে ভগবান বলে একজন কেউ আছেন, তিনি পিকলুর দুঃখে ‘বিস্মিত’ হয়ে—

বসবস করে সমস্ত গাটা চুলকোতে চুলকোতে দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় উচ্চারণের মত করে ভাবতে থাকে পিকলু, তিনি পিকলুর দুঃখে বিগলিত হয়ে হঠাৎ পৃথিবীর দিকে ‘তাক’ করে ছুড়ে মারলেন তার হাতের সেই দাঁতালো মদনচক্রখানা।

বাস, ‘চক্র’ তার কাজ করে ফেলল।

কংস আর শিশুপালের মত ত্র্যমুক ত্রিভুবনরঞ্জনও (অন্ধকার খাচ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফড়ফড় করে আরশোলা উড়তে শুরু করেছে) —হ্যাঁ—দাঁতে দস্তরমত শব্দ করে চাঁপনাটা শেষ করে ফেলে পিকলু, ত্রিভুবনরঞ্জনও এদিকে মুখু ওদিকে পড় ফেলে হঠাৎ ত্রিভুবন ত্যাগ করে ফেলবেন !

একমনে ভাবতে ভাবতে কান খাড়া করে রইল পিকলু—দোতলা থেকে খপাস করে কোন আওয়াজ আসে কিনা, হৈ-হৈ করে কোন গোলমাল ওঠে কিনা !

কিন্তু কই ? সব নিথর নিস্তব্ধ !

অগুনি এ সময় দোতলার দালানে বসে টেঁচিয়ে টেঁচিয়ে পড়তে হয় পিকলুকে, তবু শব্দ হয়, আজ তো তাও না ! শব্দ যা, সে সবই এখেরে। মশার শব্দ, আরশোলার শব্দ, ইঁদুরের শব্দ !

না, ভগবান নেই !

কিন্তু ভগবান না থাকলে আর রইলই বা কি ?

শুধু মশা ? শুধু আরশোলা ? শুধু ইঁদুর ? আর শুধু দাহ ? তাহলে মানুষের ভরসা কোথায় ?

হঠাৎ একসময় কের ভগবানের ভরসাই করতে শুরু করে পিকলু।

ধরো সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে ফেলে দিলেন ভগবান ত্রিভুবনরঞ্জন চৌধুরীকে। ঠাণ্ড ভেঙে গেল ঠাঁর। কিংবা ভয়ংকর একটা ডাকাত এসে—অথবা খুব জোরালো একটা সাপ এসে—

ভাবতে ভাবতে মাথাটা ঝিম ঝিম করে আসে পিকলুর! আর কিছু ভাবতে পারে না। ক্রমশঃই যেন কোন অন্ধকার অতলে তলিয়ে যেতে থাকে।

সেখানে কোন শব্দ নেই স্পর্শ নেই, মশা নেই ঈঁড়র নেই, এমন কি দাঁড়ও নেই।

তারপর!

তারপর কোথা থেকে যেন আলোর বান ঢেকেছে, কী মিষ্টি ঠাণ্ডা একখানি হাত, পিকলুর সব্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে। কারা সব কি বলাবলি করছে। কোথায় এসেছে পিকলু? কি কথা বলছে ওরা?

মার গলা, বাবার গলা, আর আর—বোধ হয় দাঁড়ও গলা।

কিন্তু ঠিক দাঁড়র গলা কি? কেমন যেন অগরকম।

চোখ খুলতে সাহস হলো না পিকলুর। সমস্ত মন আর কানটা খাড়া করে পড়ে রইল চোখ বুজে।

হ্যাঁ, এবার বুঝতে পারছে পিকলু—মার ঘরে মার বিছানায় শুয়ে রয়েছে সে। মা ওর গায়ে হাত বুলাচ্ছেন। পিকলুর সমস্ত গা-টা উঁচু-নীচু না কি? নইলে মার হাতটা অমন উঁচু-নীচু হয়ে বুলাচ্ছে কেন? ওঃ, এগুলো মশার মহিমা! সেই তেইশ কোটি মশা পিকলুকে ‘চিপি গোবিন্দ’ করে তুলেছে।

তবু কী আরাম! কই মা তো কখনো—

চোখ খুললেই আরামটা মিলিয়ে যাবার ভয়ে চোখ আর খোলে না পিকলু।

“না না, আর আমি মত্ত বদলাবো না—”

বাবার কথাটা এবার স্পষ্ট শুনতে পেল পিকলু, কেমন যেন একটা রাগ রাগ জ্বলের স্বর—“কুলের বোভিঙেই রেখে দেব ওকে! এসব আর বরদাস্ত করা যায় না।” কী হলো! বাবাও রাগ করছেন না কি?

বাবার কাছে আবার কি দোষ করলো পিকলু! আন্তে আন্তে চোখের কোণটা একটু কীক করে দেখতে চেষ্টা করে পিকলু। কিন্তু এ কী, বাবা যে দাঁড়র দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন!

আর দাঁড়! দাঁড়র এ অবস্থা কেমন?

অবাক হতে হতে পিকলু ভুলে ভুলে চোখটা প্রায় আঁবাঁবাঁই খুলে ফেলে।

দেব দেউল

১৬৭

দাত্তর মাথাটা নীচু, আর কালো মুখটা ঠিক পোড়া কয়লার মত সাদাটে সাদাটে !
দাত্ত বলছেন, “আমি তোমাদের কাছে মাপ চাইছি বিদ্যু, আমি আর—”

এবার পিকলুর মা কথা বলেন, লাল লাল মুখ চোখ দিয়ে জল পড়ছে মার,
“বকলাম দুটু ছেলে, তাই বলে কি মেরে ফেলতে হবে ?”

“রাগের মাথায় খেয়াল করিনি বোমা, ওঘরে অস্ত্র নশা। ভেবেছিলাম অথকায়েরে
ভয় পেয়ে কাদবে”, দাত্তর গলার শকটটা যেন বসে যাচ্ছে, “তা—হুওভাগা ছেলে
টু শকটিও তো করেনি।”

পিকলুর বাবা বিদ্যু বলে
উঠলেন, “টু শক। মারা
যে পড়ে নি এই ঢের ! না না,
দয়া করে আপনি আর কিছু
বলবেন না বাবা, অনেক সহ্য
করেছি, আর নয়। আমি
কালই বোভিঙের ব্যবস্থা
করে ফেলবো। আপনারা
সেই আবহমানকাল থেকে
শিখে এসেছেন, ছেলে শাসন
করতে হয়, ছেলেকে মেরে
আর যন্ত্রণা দিয়ে। আমাকেও
আপনি—” বাবার গলায়
বাপের স্তর ফুটে ওঠে—
“হয়তো গা খুললে এখনো
আপনার হাতের পাখাপেটার
দাগ খুঁজে পাওয়া যাবে।”



দাত্তর মুখটা আরও সাদা
হয়ে যাচ্ছে যে !

“আমি তোমাদের কাছে মাপ চাইছি বিদ্যু—”

কী অদ্বুত বেচারী বেচারী দেখাচ্ছে দাত্তকে ! বুকের ভেতরটা কেনন
করে ওঠে পিকলুর ! উঠে বসবার জগে মনটা ছটকট করে।
কিন্তু সমস্ত শরীরটা যেন বাধায় আড়কট !

হাত পা নাড়তে পারছেন না পিকলু। শুধু শুনছে।

সেই বেচারী বেচারী মুখে দাঃ বলছেন, “আমি তো স্বীকার করছি কিন্তু আমার ভুল হয়েছে! কি জানো—ভাবি যে যা দিনকাল পড়েছে, পাঁচটা বদ ছেলের সঙ্গে মিশে ছেলেটা ধারাপ হয়ে যাবে! যতটা শাসনে রাখা যায়!”

“শাসনেরও একটা সীমা আছে—” পিকলুর বাবা থমথমে মুখে বলেন, “আর নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে বাবা! আপনি কি আর আপনার যেকাজ বদলাতে পারবেন? তার চাইতে ও চোখের আড়ালে থাকাই ভাল।”

ও কী, ও কী!

ধড়মড় করে উঠে বসে পিকলু। দাদুর চোখে জল নাকি?

ঠ্যা, সত্যিই তো!

কী ভয়ানক দুঃখী দুঃখী দেখাচ্ছে দাদুকে! রাত্তার সেই বুড়ো ভিথিরীটার মতন যে! দাদুর এরকম মুখ! দাদুর চোখে জল! জীবনে এসব আর কখনো দেখেছে পিকলু! আর—আর—জীবনে কখনো জেনেছে দাদুর চোখে জল পড়লে পিকলুও চোখে জল এসে যায়? বুকটা ভীষণ কেমন এক রকম বাধা করে! হঠাৎ মা আর বাবার ওপর ভয়ানক রাগ হয় পিকলুর! থু—ব খুব রাগ!

দাদুকে এত কষ্ট দেবার মানে কী?

ওঃ বলা হচ্ছে আবার—“নিষ্ঠুরতারও একটা সীমা আছে।”

নিজেরা কী তোমরা?

নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর, খুব নিষ্ঠুর!

দাদু শাসন করেছেন পিকলুকেই করেছেন, তোমাদের তো করতে যাননি?

পিকলু উঠে বসতেই মা তাড়াতাড়ি বলেন, “থাক থাক—উঠিস না! শুয়ে থাক আর একটু।”

আর দাদু পিকলুর মুখের দিকে বোকার মত ক্যাল ক্যাল করে একটু তাকিয়ে নিয়ে বাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলেন, “ছেলেকে কোথাও পাঠাতে হবে না কিন্তু, আমিই ভাবছি দেশে গিয়ে থাকবো।”

বাস! করণ কর একগালা জল গড়িয়ে পড়ে দাদুর ভিথিরী ভিথিরী চোখ ছুটো দিয়ে। আর সেই মুহূর্তে মনে হয় পিকলুর কে যেন দাদুকে ভয়ানক কী একটা শাস্তি দিয়েছে! জেল কাসি বীপাস্তরের চেয়ে, শূলে দেওয়ার চেয়ে আর হৃদয়চক্রে ছুঁ টুকরো করে কেলার চেয়েও অনেক বেশী কোন শাস্তি!

সঙ্গে সঙ্গে হাট থেকে নেমে পড়ে পিকলু, আর ছুটে গিয়ে দাদুকে দু’হাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, “আমিও তাহলে তোমার সঙ্গে দেশে চলে বাব দাদু, কখনো এখানে থাকবো না।”



মৃত মৃষ্মিক

—কালিদাস রায়

(জাতক কাহিনী)

ব্রহ্মদত্ত করে রাজত্ব যবে বারাণসীধামে
শ্রীবোধিসত্ত্ব শ্রেষ্ঠ সেথায় চুল্লচোট্ট নামে ।
যত জানী তিনি তত ধনী আর ততই হৃদয়বান্,
বারাণসী-অধিপতির পরেই তাঁর মর্যাদামান ।

বলিতেন তিনি—“ব্যবসায়ে কতু মূলধন বড় নয়,
অধ্যবসায়ী ব্যবসায়ে লাভে জয় ।”
একদিন তিনি চলিতেছিলেন আপন শিবিকা চড়ি
দেখিলেন পাশে ছোট এক মরা ইঁদুর রয়েছে পড়ি ।

দেব দেউল

বলিলেন—“অই মরা ইহরের দাম নয় এক রতি,
এরে মূলধন ক’রে ব্যবসায় হওয়া যায় কোটিপতি !”

সে কথা শুনিয়া একটি যুবক সেটা নিল হাতে ক’রে
ঝুলাইয়া লেজ ধ’রে ।



একটি দোকানী যুবারে ডাকিয়া

বলিল দোকান হ’তে—

“দিয়ে যাও ওটা পোষা বিড়ালের

আহার হইবে ওতে ।”

একটি পয়সা দিল যুবকের হাতে,
যুবক দোকানে

গুড় কিনে নিল তাতে ।

আর নিল সাথে

একটি কলসী জল,

বসিল পথের ধারে যেথা দিয়ে

চলেছে মালীর দল ।

যুবা তাহাদের গুড় জল দিয়ে, তার

বিনিময়ে পেল তিন চার মুঠা

তাজা ফুল উপহার ।

ফুলের বাজারে গিয়ে

চার পয়সা সে পেল ফুলগুলি দিয়ে ।

এক ভাঁড় গুড় কিনে সেই পয়সায়

দাঁড়াইল যুবা এক শ্রেষ্ঠর বাগানের দরজায় ।

দেব দেউল

১৭১

ঝড় হয়ে গেছে পূর্ব দিনের রাতে
বহু ডালপালা ভেঙে পড়ে গেছে তাতে ।
কেন্নে সরাই মালী ভাবে তাই—যুবা বলে, “ডালগুলি
দাও যদি মোরে নিয়ে যেতে পারি তুলি ।”
দেখিল যুবক পথের উপরে খেলিতেছে বহু ছেলে,
তাহাদের ডাকি ভাঙুর গুড় হাতে হাতে দিল ঢেলে ।
বলিল তাদের—“ভাই সব, দেখ আমোদ হইবে বড়,
ডালপালাগুলি এসো পথে করি জড়া ।”
চলেছে কুমোর হাঁড়ি বেচিবার তরে,
এক কুচি কাঠ নেই আজ তার ঘরে ।

হাঁড়িগুলি রেখে ডালপালা দিয়ে বোঝাই করিয়া গাড়ি
ফিরিয়া গেল সে বাড়ি ।

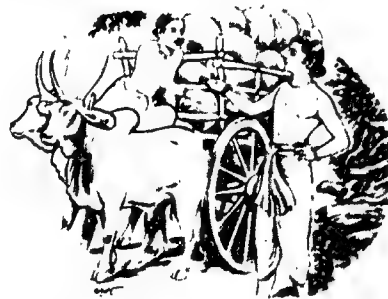
পায়ে হাঁড়িকুড়ি

দিয়ে যুবা ডালপালা
বেচিল বাজারে । হাঁড়ির সঙ্গে
ছিল এক বড় জালা ।
জালা ভরি জলে

গেল সে মাঠের ধারে,
যেই পথ দিয়ে ঘেসেড়ারা চলে ঘাস নিয়ে ভারে ভারে ।

জল খেয়ে খুব খুশি হ'লো ঘেসেড়ারা
এক আঁটি ক'রে ঘাস দিয়ে গেল তারা ।

শুনেছিল যুবা বিদেশী ব্যাপারী ঘোড়া বেচিবার তরে
আসিবে নগরে আট-দশ দিন পরে ।



দেব দেউল

জমাতে লাগিল যত ঘাস পেল এই কয় দিন ধ'রে ।
 আসিল ব্যাপারী, বেশ কিছু লাভ করিল বিক্রি ক'রে,
 সে টাকায় নানা ফল ফেরি ক'রে নগরের রাস্তাতে
 পঁচশত টাকা সাত-আট মাসে জমিল তাহার হাতে ।

আসে মাঝে মাঝে নৌকাবহর লাগে বন্দর ঘাটে
 যুবা শুনেছিল হাটে ।

মালের নৌকা যখনই আসিয়া পড়ে
 সস-সসে বণিকেরা সবই কিনে লয় চড়া দরে ।

যেই পথ দিয়ে মালের নৌকা আসে
 সেই পাথে নদীকিনারে রহিল যুবা এক পটবাসে ।
 এক মাস পরে দেখিল আসিছে পঁচটি মালের তরী,
 মাঝ-গস্যায় ভেটিল তাদের একটি ডিঙায় চড়ি ।

পঁচশত টাকা আগাম দাদন দিয়ে
 সব মাল নিজে রেখে দিল আটকিয়ে ।
 তাঁরুটি উঠিয়ে এলো বন্দরে । বহর লাগিল ঘাটে
 সাড়া পড়ে গেল শহরে বাজারে হাটে ।

এলো দলে দলে বণিকেরা ঘাটে মাল-ব্যাপারীর কাছে
 শুনিল—সে মাল দাদনে আটক আছে ।

যুবার নিকটে ধনী বণিকেরা নিবেদিল বারবার—
 যত টাকা চাও ছেড়ে দাও অধিকার ।

চলিল তখন নিলামের দর ডাকা,
 দখল ছাড়িল যুবা হাতে পেয়ে আঠারো হাজার টাকা

দেব দেউল

১৭৩

এই টাকা তার হলো মোটা মূলধন
ক্রমে হলো যুবা কারবারী মহাজন ।
লক্ষ মুদ্রা সঞ্চিত হ'লে পারে
গেল যুবা সেই চুল্লী শেঠের ঘরে ।
হাতে এক খলি স্বর্ণমুদ্রা ঢাকি উত্তরী-বাসে
প্রণাম করিয়া বসিল চরণপাশে ।

কহিলেন তিনি—“কে তুমি কেন এ এনেছ স্বর্ণভার ?
কোনদিন তুমি নিয়েছিলে বুঝি ধার ?”
কহিল যুবক, “মনে পড়ে সেই মরা ইঁদুরের কথা ?
প্রভু আপনার মুখের বদনে হয় কভু অশ্রুতা ?
সে মরা ইঁদুর হতেই আমার ভাগ্য হয়েছে শুরু,
আজি দক্ষিণা এনেছি চরণে, আপনি আমার গুরু ।”

চুল্লী শ্রেষ্ঠী কিছুখণ তার মুখ পানে চেয়ে থেকে
বলিলেন কাছে ডেকে—
“বৎস তুমি কি হইয়াছ বিবাহিত ?”
কহিল যুবক—“সময় পাইনি পিতঃ ।”
বলিলেন শেঠ—“এসব এনেছ কেন ?
আমার যা কিছু সকলি তোমার জেনো ।
একটি অনৃত্য হুহিতা ভিন্ন নেই মোর সন্তান ।
শুভদিন দেখে তোমারি হস্ত তাহারে করিব দান ।”



বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীড

—দ্বিবিম্ব মুখোপাধ্যায়

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, কুয়াশায় ভরে ছিল চারিদিক। খুব কাছের মানুষ ছাড়া দূরের বিশেষ কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু তবুও, ভোরের কনকনে ঠাণ্ডা, কুয়াশা আর বৃষ্টির মশোও কাতারে-কাতারে লোক এসে জড়ো হয়েছিল টেনিস নদীর তীরে বধ্যভূমিতে। ফাঁসির মঞ্চের কাছে এগিয়ে যেতে চাইছিল সকলেই একসঙ্গে। সেজ্ঞো টেনার্সেলি আর তড়োতড়ি হচ্ছিল বেশ খানিকটা। হঠাৎ এই তড়োতড়ি আর উত্তেজনার ভেতর থেকেই সমস্রের একটা চিংকার উঠল : হয়ে গেল, হয়ে গেল সব— সব শেষ হয়ে গেল !

কী শেষ হয়ে গেল ? শেষ হয়ে গেল—বিখ্যাত জলদস্যু ক্যাপটেন কীডের জীবন ! দীর্ঘদিন ধরে থাকে নিয়ে সারা শহরে আর গ্রামে গ্রামে উত্তেজনার শেষ ছিল না, থাকে নির্দোষ নিরপরাধ বলেও মনে করত অনেকে তার ফাঁসিতে উত্তেজনা হবে বইকি ! মৃত্যুর স্বর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ল সারা ইংলণ্ড আর আমেরিকায়। ‘কীডের গল্প’ নামে বই ছেপে বিক্রি হতে লাগল হাজারে-হাজারে। নানা রকমের গান বাঁধা হ’ল জলদস্যু কীডের নামে। এবং সেই থেকে আজও জলদস্যুদের ইতিহাসে ক্যাপটেন কীডের নাম অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

বিচারকের মুখ থেকে ফাঁসির আদেশ শোনার পরও ক্যাপটেন কীড বলেছিল : ধর্মবতার, অত্যন্ত অবিচার্য, কর্তা হ’ল আমার উপর—আমি নিরপরাধ, নির্দোষ। কিন্তু ক্যাপটেন কীড যে নির্দোষ ছিল না, তা তার রোমাঞ্চকর জীবনের ইতিহাস, লুণ্ঠন ও

হঠাৎ-কাহিনী থেকেই জানা যায়। তাছাড়া তার লুপ্ত গুপ্তধনের সন্ধানে আজও বহু ভাণ্ডারসম্বন্ধী ঘুরে বেড়ায়, পৌঁড়াখুঁড়ি করে দেখে সন্দেহজনক স্থানগুলিতে। অজস্র ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিল কীড সমুদ্রপথে দস্যুগিরি করে। সে সব ধনরত্নের পুরো সন্ধান যদিও আজ পাওয়া যায়নি, তবুও জলপথে তার দস্যুগিরির বহু সত্য কাহিনী প্রমাণসহ বিচারের সময় প্রকাশিত হয়েছিল জনসাধারণের কাছে।

কাপটেন কীড সমগ্র সর্বচেয়ে অশ্রুচরিত্রের বিবরণ ছিল এই যে, একজন দাশ-চল্লোলক, এবং লিথাসী লোক, জলদস্যুদের শাসন করা ও তাদের বাণিজ্যপোত গুলিকে রক্ষা করার জন্য বেবিয়, নিজেই তাকে কয়েকজন দাশ জলদস্যু সঙ্গে নিয়েছিল, তার হৃদয়-হাস্যও সঠিক কেউ ধারণা করতে পারেনা।

খটনা টি খটে সমুদ্রশাস্ত্রাবিদদের একে-দাবের শেষের দিকে। ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের তখন তুমুল যুদ্ধ চলছে। ইংল্যান্ডের রাজা উইলিয়ম দি থার্ড তার দেশের বাণিজ্যপোত গুলিকে জলদস্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভার



দেন তার অন্তরঙ্গ বন্ধু অর্ল অব বেলমন্ট-এর উপর। অত্যন্ত পিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক ছিলেন এই অর্ল অব বেলমন্ট। তিনি উইলিয়মের অমুমতি অমুসারে ইংলণ্ড ও আমেরিকার কয়েকজন ধনী সওদাগরের খরচায় একটি জাহাজের ব্যবস্থা করে কীডকে তার কাপটেন নিযুক্ত করেন। আমেরিকার বতলাংশ তখন ইংল্যান্ডের অধীনে এবং কীড ছিল আমেরিকার অধিবাসী। আমেরিকা থেকে ইংলণ্ডে

বিখ্যাত জলদস্যু কাপটেন খটনা—দুই
একখান অত্যন্ত লুটের পর ফ্রান্সে
দেওয়া হয়েছে।

- বিখ্যাত জলদস্যু কাপটেন কীড
শ্রী বিনয় কৃষ্ণাচার্য

এং ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় জাহাজে করে মাল সরবরাহ করত কীড। বেলমন্ট-এর প্রস্তাবে কীড প্রথমটা রাজী হয়নি বটে, কিন্তু পরে মাহিনার উপর জলদস্যুদের কাছ থেকে চিনিয়ে নেওয়া ধনসম্পত্তির কিছুটা অংশ পাওয়ার লোভে শেষ পর্যন্ত রাজী হয়ে যায়।

চৌবিশটি কামান বসানো একটি মজবুত জাহাজ 'ও' তার রক্ষণাবেক্ষণের উপযুক্ত লোক-লব্ধর নিয়ে অসীম সাহসী কাপটেন কীড একদিন এই অভিযানের আয়োজন সম্পূর্ণ করে যাবা করে সমুদ্রপথে, এবং এইখান থেকেই আরম্ভ হয় আমাদের এই বিস্ময়কর কাচিনীর উত্তীর্ণ।

১৬৯৬ সালের এক বসন্তকালে কীড ইংলণ্ড থেকে সমুদ্রের বুকে পাড়ি জমায় এবং অল্পকালের মধ্যেই ফরাসীদের একটি ছেলে বোটকে গ্রেপ্তার করে আমেরিকায় গভর্নমেন্টের হাতে সমর্পণ করে। প্রথম অভিযানেই এই ফরাসী বোটটিকে আটক করার ফলে সরকারের কাছে কীডের মাদা বিশেষভাবে বেড়ে যায়। এই যাত্রার প্রথম দিকে কীড আমেরিকায় গিয়ে কয়েকদিন তার নিজের বাড়িতে থেকে যায়, তারপর তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার ভেসে পড়ে সমুদ্রের দিগন্তবিস্তারি পথে। আটলান্টিক সমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে আফ্রিকার দিকে, এবং তারপর ক্রমশঃ কেপ অব গুড হোপ ঘুরে ভারতবর্ষের দিকে যেতে আরম্ভ করে কীড। এই ভাবে কলকিনারাহীন সমুদ্রের বুকে দীর্ঘ ন'মাস ঘুরতে ঘুরতে ভারত সমুদ্রের কাছাকাছি এলে দেখা যায় বাবার জিনিসে টান পড়েছে। এর উপর ঐ সময় আরও এক বিপদ দেখা দেয়—নাবিকদের অসুস্থতা। প্রথমতঃ বাবার ফুরিয়ে আসার দরুন এটা-ওটা ষা-তা ষাওয়ার জগে নাবিকদের মধ্যে অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং অনেকের দুরারোগ্য কলেরা রোগ দেখা দেয়। বাকি তখনও যারা সুস্থ ছিল, এই অবস্থায় তারাও অত্যন্ত ভীত ও সন্দেহ হয়ে ওঠে। ক্রমশঃ অবস্থা হয়ে ওঠে অত্যন্ত সঙ্কট। কিছু না খেয়ে মাথায় ঘুঞ্জে পারে কতক্ষণ? তখনই প্রায় আধ-পেটা খেতে আরম্ভ করেছে সকলে, এরপর সব ফুরিয়ে গেলে একেবারেই ভরা-ডুবি!

জাহাজের নাবিকদের নিয়ে এই বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে কাপটেন কীড প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়ল। কিন্তু সহজে সে সমবার পাত্র নয়। টেলিস্কোপের পরকলায় চোখ রেখে কীড তখন কেবল দেখতে লাগল, অথ কোন বাণিজ্যপোত কোথাও দেখা যায় কিনা। সত্যিই অথ কোন বাণিজ্যপোতের সন্ধান করতে না পারলে তার আর রক্ষে নেই! জাহাজসুদ্ধ লোক-লব্ধররাও তাকে তখন অথ কোন জাহাজ থেকে বাতাসবা সংগ্রহ করে আশ্রয়না করার জন্ত প্ররোচিত করতে লাগল।

● বিখ্যাত লণ্ডন ক্যাপটেন কীড

জীবিত বুধোপাখ্যায়


দেব দেউল

394

কিন্তু কোথায় সেই জাহাজ; কোথায় সেই লক্ষাবস্থা? পাল তোলা প্রাচীন অবশেষেও বাতাসের বেগে ছুটে চলেছে ভারত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে। জাহাজ নিয়ে তারে ভিড়ানোই ছিল তখন কাপটেন কীডের একমাত্র লক্ষ্য। কোন একমে তাঁরের মতি ছুতে পারলে, স্বাবারের একটা-না একটা কিছু লাবস্থা সে করতে পারবেই। হঠাৎ এই সময় দূরবীনের মধ্যে ভেসে উঠল যেন একটি মোটার খোলার মত 'ক' 'জ' নিস। টেউয়ের তালে তালে হেলছে-তুলছে সেটি, কিন্তু চলছে বলে মনে হচ্ছে না। তাগে তুল দেখছে না তো কীড। চোখটা জামের কোন দিয়ে একবার রসমুখে নিয়ে আবার ভাল করে লক্ষ্য করল কাপটেন। টে লি সো পের ভেতর দিয়ে। না, এ আর তুল হবার নয়; পেয়ে গেছে কীড তার বাচার রাস্তা।



কোণায় ভীর, কোণায় পাশ, কোণায় ভাঙা—না'বকেব।
সব মর্মান্থবের 'লোক' চাপ' ব'ল' অ'ল'ক' কর'চে ।



দক্ষিণ ভারতের নানাবার
উপকূলের কাছে প্রায় একেজো
হয়ে আটকা পড়েছিল একটি
করাসী জাহাজ। শত্রু-নিয
য়ে পক্ষেরই হোক, এ অবস্থায়
বাঁচার জগ্গে ঐ জাহাজের
উপর চড়াও হওয়া ছাড়া
পতাস্থর নেই। এই স্বরটা
শোনার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজহুক
লোকের খড়ে যেন প্রাণ এলো।
অমূল্য বাতাসে দ্রুত পাড়ি
জমিয়ে লঙ্গর করা একেজো জাহাজটির কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হ'ল তারা। ঐ
করাসী জাহাজের নাবিকরা তখন ছোট ছোট ছুঁতিনটি নৌকে' ক'রে তীরে নেবে
সবে মাত্র তাঁবু খাটাতে আরম্ভ করেছে। এরপর খাবারলাবার ও মূল্যবান জিনিসপত্র
নাবাবে তারা। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে, কীড তার জাহাজের কোলানো
নৌকোগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিলে। বলবান স্থল নাবিকরা সেই নৌকোয় চড়ে,
তীরবেগে গিয়ে, ঐ জাহাজে যা কিছু বাতাসামগ্রী ও মূল্যবান মালপত্র ছিল, সবই
নিজেদের জাহাজে নিয়ে এসে তুললো। জাহাজের মধ্যে কানান, গুলি-গোলা

দেব দেউল

ও অগ্রসর হইল বেশ কিছু। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেগুলিকেও দখল করে নিলো কীড।

শত্রুপক্ষের এই জাটাজকে নাগালের মধ্যে পেয়ে, রসদপত্র কেড়ে নেওয়া



তাকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করার মধ্যে অগ্রসর যদিও কিছু ছিল না এবং এটিকে চির দস্তাবেজি যদিও দখল চলে না, কিন্তু এর পর থেকে একে একে যে ঘটনাগুলি ঘটতে লাগল, সেগুলিকে দস্তাবেজি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ক্রমশঃ সমস্ত নীতি ও আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে কীড আপিয়ে পড়তে লাগল একটির পর একটি জলযানের উপর, এবং নিবিচারে হত্যা ও লুণ্ঠন আরম্ভ করে দিল মরিয়া হয়ে। কীডের অদীনস্থ জাহাজের অগাধ কর্মচারীরা বলত : সেই সময়

কীড হুঙ্কারে সোলমাজ মুরকে জাহাজের উপরেই হত্যা করলো। [পৃঃ ১৭২]

কীডের উপর যেন শয়তান এসে ভর করে বসেছিল। কিছুদিনের মধ্যে একেবারে যেন অমানুষ হয়ে উঠেছিল ক্যাপটেন কীড। সে সময় তাকে কেউ কোন বিষয়ে বাধা দিলে সে সে-বিষয় প্রক্ষেপ তো করতই না, এমন কি তার উপর অমানুষিক অত্যাচার পর্যন্ত করতও বিধা করত না।

- বিখ্যাত অলিম্পিয়া ক্যাপটেন কীড
ত্রিবিজ্ঞ হুখোপাখ্যায়

এই সময় লোহিত সাগরের উপকূল অঞ্চলে স্থানীয় বাবসারীদের একটি দল তালাবড় নৌকো থেকে বত টাকার লক্ষ্য করিয়া ও কফি লুণ্ঠন করতে গেল, কয়েক জন নাবিক কীডকে বাধা দেয়। এই বাবসারেনকারী নাবিকদের দলপতি 'জন গোবিন্দজ' উল্লিখিত যুগে। কীড এ বাপারে অগ্রসর হচ্ছিলেন, বিদ্রোহী 'জাহাজ' অনেক জাহাজের উপরেই সকলের সামনে হত্যা করে।

কিন্তু বিচারের সময় ক্যাপটেন কীড এ কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বলে যে, উল্লিখিত যুগের আভাবিক দৃষ্টান্তে, 'জাহাজ' কীড 'জাহাজ' বলে যে, জাহাজের নাবিকরা তাকে দস্তারভিত্তি কাজে প্ররোচিত করলেও, সে তাদের প্রত্যাহার করে এবং প্রত্যাহার করে নাবিকদের কয়েকজনের সঙ্গে তার সংঘর্ষ ঘটে।

দেশী ও বিদেশী
বড় বাগি জা পোত
থেকে বড় মূল্যবান
সোনারপোর জিনিস
ও তাঁর-জহরত লুণ্ঠন
করেছিল কীড, এবং
এই স্বরগুলি ছড়িয়ে
পড়লে পাছে সে ধরা
পড়ে এই ভয়ে, লুণ্ঠিত
জাহাজ বা নৌকো-
গুলিকে ডুবিয়ে দেওয়া



আবদ জাহাজখন কীডকি আদর্শই কীড কীডের
পড়লে তার ওপর। পৃষ্ঠা ১৮০

অথবা আগুন ধরিয়ে দেওয়া তার তখন একটা নেশার মধ্যে হয়ে গিয়েছিল।

আবদ দেশের লোকেরা সে সময় ছিল ফরাসীদের দিকে। কিন্তু জলপথে বাবসার-বাগিজের জন্য তারা জায়গা বিশেষে জাহাজে নানাবকনের পতাকা উড়িয়ে ঘোরাকেরা করত। অর্থাৎ দূরে কোন ফরাসী জাহাজ দেখতে পেলে, মিত্রপক্ষ হিসাবে তারা ফরাসী পতাকায় জাহাজে রেখে দিত; আবার উপরেজদের জাহাজ দেখলে তাড়াতাড়ি বিপদ এড়াবার জন্য ফরাসী পতাকা নামিয়ে উপরেজদের পতাকা তুলে দিত জাহাজে।

এইভাবে একবার একখানি আবদ জাহাজ কীডকে নিম্নান্ত্র করার চেষ্টা করে। দূর থেকে ইংলণ্ড-এর পতাকা উড়িয়ে আসছিল ঐ জাহাজটি, কিন্তু কীড বুঝতে পারে যে ওটি মিত্রপক্ষের জাহাজ নয়। তখন সে নিজে তাড়াতাড়ি ফরাসী পতাকা জাহাজে

● বিখ্যাত জলরত্ন ক্যাপটেন কীড
শ্রীশ্রী সুশোণাখ্যার

দেব দেউল

উড়িয়ে দেয় এবং দেখে যে, ঐ আরব জাহাজটিও সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের পতাকা নাবিয়ে, ফরাসী পতাকা তুলে, আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে তাদের দিকেই। কীড এই স্থল স্রোতের সরাবহার করতে এতটুকুও সময় নষ্ট করেনি। বিপক্ষের জাহাজটি কাছে আসা মাদই সে ঐ জাহাজটির উপর কাঁপিয়ে পড়ে সমস্ত মালপত্র পিনা বুদ্ধেই লুণ্ঠন করে নিজের জাহাজে তুলে নেয়, এবং কোন দয়া-খর্ব না দেখিয়ে, অতল সমুদ্রের বুকে লোকজনসহ বন্দী জাহাজটিকে ডুবিয়ে দেয়।

এই ধরনের একই কৌশলে খোদা ব্যবসায়ীদের আর একটি পোতকেও ঘায়েল করে কীড। সেই পোতটিতে মোনা, ক্রপো, মসলিন প্রভৃতি বস্ত্র মূল্যবান মালপত্র ছিল। খোদাদের ঐ জাহাজটি ছিল খুব মজবুত ও সুন্দর। কীড এই সময় নিজের জীবপ্রায় জাহাজটি পরিত্যাগ করে ঐ জাহাজটি ব্যবহার করতে থাকে।

এই অগাধ গ্রন্থ লাভ করার পর ও জাহাজ পরিবর্তন করে কীড পুরোপুরিই জলদস্যুতে পরিণত হয়। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে তখন তার যোগাযোগ প্রায় সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, এবং জলদস্যু হিসাবেও নাম ছড়িয়ে পড়েছে চারিদিকে। খোদা ব্যবসায়ীদের লুণ্ঠিত গ্রন্থ নিয়ে কাপটেন কীড মাডাগাসকারের একটি পোতাশ্রয়ে এসে উপস্থিত হয়। সেখানে বিখ্যাত জলদস্যু কালফোর্ডের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। বতপূর্বে কীডের অধীনেই জাহাজে কাজ করত ঐ লোকটি। এরপর কীডকে ভাগ করে সমুদ্র পথে দস্যুরাতি করতে আরম্ভ করে। কীড বন্ধুত্বের ভান দেখিয়ে তাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে, কালফোর্ড সোজাতুজি কীডকে বলে দেয় যে, তুমি আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করলে, এখন আমিই তোমাকে বন্দী করতে পারি বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে। তার চেয়ে যে পথে তোমার নাম ছড়িয়ে পড়েছে, সেই পথ নিয়েই থাকো জলদস্যুদের বন্ধু হিসাবে।

এই কথায় কীডের কোথায় যেন আঘাত লাগে, কিছুটা যেন পরিবর্তন আসে তার মনে। সে তখন সোজাতুজি সেখান থেকে দেশের দিকে ফেরার চেষ্টা করে। জাহাজের অধিকাংশ কর্মচারীকে লুণ্ঠিত ধনহত্বের কিছু কিছু অংশ দিয়ে, বিভিন্ন পোতাশ্রয়ে সে নামিয়ে দিতে থাকে, এবং নিজেও লুণ্ঠিত দ্রব্যগুলি যথাসম্ভব বিক্রি করে, নগদ টাকায় রূপান্তরিত করে ফেলে। কিন্তু তখন কাপটেন কীডের নাম দ্রুতই জলদস্যু হিসাবে প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানেই সে যায়, যেখানেই তার জাহাজ ভেড়ে, সেখানেই লোকেরা তার সঙ্গে কেনা-বেচা করতে রাজী হয় না এবং সম্মান দেওয়া তো দূরের কথা, অত্যন্ত হীন রাজদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতক লোক বলে দুগার চোখে দেখতে থাকে।

● বিখ্যাত জলদস্যু কাপটেন কীড

জীবিত হুখোশাখা

এই অবস্থায় জাহাজের সমস্ত ধনসম্পদ লুকিয়ে ফেলার জগৎ কাপটেন কীড গার্ডিনার্স দ্বীপে গিয়ে কয়েকটি লোহার সিন্দুক করে ঐ লুপ্ত গ্রন্থের সমস্ত মটির তলায় পুতে ফেলে। জন্ম গার্ডিনার নামে একজন অত্যন্ত প্রাণপ্রিয় লোক ছিলেন তখন ঐ দ্বীপের সবেসবার। কাপটেন কীডের জাহাজ ঐ দ্বীপে গিয়ে প্রথম নঙ্গর ফেললে, গার্ডিনার নিজেই এগিয়ে গিয়ে প্রথম তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। প্রথমটা গার্ডিনার কীডের প্রস্তাবে রাজী না হলেও, শেষ পর্যন্ত তার দ্বীপের কথা, তিন তার দ্বীপে বসন্তের সোনারানা ও মণিযুক্ত লুকিয়ে রেখে দিতে রাজী হন। কীড সে সময় এই কথাই বলে যে, সে কি ছু দিনের মধ্যেই ফিরে এসে ওগুলি আবার নিয়ে যাবে। গার্ডিনারের



লোহার সিন্দুক করে কীড তার সমস্ত ধনসম্পদ
মটির নীচে লুকিয়ে ফেলে।

দ্বীপে ঐ সময় কীড অনেক দামী দামী জিনিসপত্র উপহার দেয়।

কীডের বিচারের সময় সাধী হিসাবে গার্ডিনার ঐ গুপ্ত ধনসম্পদের কথা উল্লেখ করেন বটে, কিন্তু তা যে ঠিক কোথায় কীড লুকিয়ে রেখে গিয়েছিল তার কথা গার্ডিনার বলতে পারেননি। অবশ্য ঐ গ্রন্থের জগৎ সরকার পক্ষ ও সাধারণ অমুসন্ধানী দলের পক্ষ থেকে অনেক গোঁজাগুলি হয়েছিল সন্দেহজনক স্থানগুলিতে, কিন্তু কোন কিছুই সন্ধান বার করে ওঠা সম্ভব হয়নি।

এ ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত অনেকের ধারণা হয়েছিল যে, গার্ডিনার ও গার্ডিনারের

- বিখ্যাত জলদস্যু কাপটেন কীড
প্রিয় যুগোপাধ্যায়

দেব দেউল

বৌ দু'জনে ঐ সমস্ত গুপ্তধন কীড ধরা পড়ার পর মাটির তলা থেকে বার করে নিঃশব্দে অগ্নি কোথাও সরিয়ে ফেলে।

গাভিনার্স ট্রাপ থেকে নগ্নর তুলে কীড ডেলাওয়ার বেঁচে এসে একবার থামে, তারপর তার যাবতীয় গুপ্ত তথ্য নিউইয়র্কের দিকে। কিন্তু নিউইয়র্ক-এ নেনে নিউইয়র্ক পোতাশ্রয় থেকে বেশ খানিকটা দূরে লন্ডন-আইল্যান্ডের পূর্ব দিকে জাহাজ এনে নগ্নর করে কাড, এবং তাঁরে নামার আগে জাহাজ থেকেই অর্ল অব বেলমন্টকে সংবাদ পাঠাবে বলে স্থির করে। অর্ল অব বেলমন্ট তখন আমেরিকার বোস্টন-এর গভর্নর এবং বোস্টন ওশন ইন্সপেক্টর শাসনাবধীন।

কীডের স্বা ও ছেলেমেয়েরা দানদিন পরে জাহাজে কীডের সঙ্গে দেখা করতে আসে এবং সেই সঙ্গে একজন উকিল বন্ধুকেও নিয়ে আসে তারা কীডের কাছে। কীড তার সাহায্যেই অর্ল অব বেলমন্ট এর কাছে একটি চিঠি লিখে জানায় যে, তার সম্বন্ধে এখানে যা রটেছে তা সবই মিথ্যা, কাজেই সে নিজে অর্লের কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলতে চায়।

কয়েক দিনের মধ্যেই সেই চিঠির উত্তর আসে। অর্ল বন্ধুভাবেরেই জানান যে, তিনি তাঁর মন্থনা-পরিষদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছেন, অতএব কীড ইচ্ছা করলে অনায়াসেই এখন এখানে আসতে পারে।

উত্তরে কীড জানায় যে, সে এখনি যাত্রা করছে।

কিন্তু বোস্টনের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কীড বুঝতে পারে যে, তাঁর ভাগ্য প্রতিকূল—অর্ল অব বেলমন্ট তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। হঠাৎ দু'পাশ থেকে দু'জন বলিষ্ঠ লোক কীডকে এসে জড়িয়ে ধরে পেছন থেকে এবং জোর করে ছাতকড়া পরিয়ে, একেবারে কারাগারের মধ্যে এনে বন্দী করে। অর্ল নিজেই কীডকে তাঁরে নামার সঙ্গে সঙ্গে বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলেন। বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা ছাড়া অর্ল অব বেলমন্ট-এর অগ্নি কোন উপায় ছিল না। তাছাড়া ঐভাবে কীডকে স্তোকবাক্য না দিলে সে আবার হয়ত জাহাজ নিয়ে গা-ঢাকা দিত জল-পথে।

কীড যে সত্যিকারের একজন অপরাধী সে সম্বন্ধে বেলমন্ট-এর কোন সন্দেহই ছিল না। তাছাড়া একদিন কীডকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করার ফলে, ইংল্যান্ডের বহু সম্ভ্রান্ত লোক তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তাঁদের ধারণা জন্মেছিল যে, বেলমন্ট কীডকে প্রোথার না করে হয়ত প্রথায়ই দেবেন। কাজেই এ অবস্থায় নিজের মর্যাদা রক্ষা করার জন্ত বেলমন্ট কীডকে প্রোথার করে

● বিখ্যাত কলকাতা ক্যাগটেন কীড

জীবিত সুযোগ্য্যার

দেব দেউল

১৮৩

সকলের কাছে এইটাই প্রমাণ করলেন যে, তিনি অত্যাচার প্রভাবশালীও নয় এবং দণ্ডা কীডের বন্ধুও নয়।

এক মাস, দু'মাস করে দীর্ঘ ছ'মাসের বেশি ভাঙে-পায়ে বেড়ি দিয়ে বোর্স্টনের জেলে বন্দী করে রাখা হয় কাপটেন কীডকে। তারপর মনোনাথকেই বন্দী অবস্থায় জাহাজ করে আনা হয় তাকে ইংলণ্ডে। ইংলণ্ডের কারাগারেও প্রায় এক বছর কেটে যায় কীডের বন্দীদশায়। তারপর মরেছে হয় তার চাকলাকার 'বিচার'। এই উদ্বেজনাপূর্ণ বিচার সারা ইংলণ্ডকে সন্দেহের মধ্যে ফেলে। বড় খুঁগা, জরানী, নোবেল ও লুটরাও এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। প্রথম দিকে যে সামান্য সামান্য কিছু লোক কীডের পক্ষে এবং কিছু বিপক্ষে ছিল, তা ক্রমে ক্রমে বিরাট ঢুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলে পরিণত হয়।

বিচারালয়ে বিপক্ষের লোকেরা প্রমাণ করতে চায় যে, মালাবার কোস্টে কীড যে খোলা বাবসায়ীদের জাহাজ লুট করেছিল, তাতে কোন ফরাসী পতাকাও ছিল না, অথবা ফরাসীদের কোন মূল্যবান কাগজপত্রও ছিল না।

এর উত্তরে কীড বলে, হ্যাঁ, অনেক মূল্যবান কাগজপত্র ছিল তাতে।

তখন তাকে প্রমাণস্বরূপ সেই সব কাগজপত্র দেখাতে বলা হয়।

কীড উত্তরে বলে যে, সে সমস্ত কাগজপত্র আর্মি অব বেলমন্টকে দিয়ে দিয়েছে।

তখন রাজ-তরকের ভারপ্রাপ্ত কোর্ট অফিসার হাসতে হাসতে বলেন যে, আপনি জানেন, এই মামলা আরম্ভ হবার পূর্বেই বেলমন্ট নারা ঘান। তাঁর কাছে যদি



বোর্স্টনের জেলখানার বন্দী অবস্থায়
কাপটেন কীড।

● বিখ্যাত অবস্থায় কাপটেন কীড
প্রসিদ্ধ মুখোপাধায়

কোন দরকারী কাগজপত্র থাকত, তাহলে তা নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে সরকারের হস্তগত হ'ত।

এরপর অগতম বিখ্যাত জলদস্যু ক্যালফোর্ড-এর কাছে কীড যা-যা বলেছিল, সে সব কথাও ওঠে বিচারের সময়। তাছাড়া কীডের জাহাজের কয়েকজন নাবিককেও এই ব্যাপারে সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত করা হয়। তারা সকলেই একবাক্যে এই কথাই বলে যে, কীড তাদের শেষ পন্থা জলদস্যুত্ব গ্রহণ করতেই 'প্ররোচিত' করে। কিন্তু এসব ছাড়াও সবচেয়ে যা কীডকে অপরাধী সাব্যস্ত করতে সাহায্য করেছিল, তা হচ্ছে : জাহাজের গোলন্দাজ উইলিয়ম মুরকে হত্যা করার ব্যাপারটি।

জুরিরা সকলেই একমত হয়ে হতাপরাধে কীডকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এছাড়া জলদস্যুত্বের জগৎ বিচারে সে অপরাধী স্বীকৃত হয়। এবং এক সঙ্গে এই দুই অপরাধের জন্য বিচারক তার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

এই ফাসির আদেশ শোনার পরও কীড সকলের সামনেই বিচারকের উদ্দেশ্যে তার শেষ বক্তব্য পেশ করে ভাড়া ভাড়া গলায়। সে বক্তব্যের কথা গোড়ার দিকেই তোমরা একবার শুনেছ। এই দুর্ধর্ষ মানুষটির চোখ তখন জল-ভারে নত; দীর্ঘ দিন জেলে থাকার ফলে শরীর ভেঙে পড়েছে—উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠায় প্রাণ ওষ্ঠাগত।

কিন্তু অস্বাভাবিক আবেগের সঙ্গে বিচারকের উদ্দেশ্যে কথাগুলি বললেও, কীডের ভাগ্যবিধাতা তখন বিরূপ। জায়ের দণ্ড হাতে বিচারপতির সিদ্ধান্তের আর কোন নড়চড় হ'ল না। ১৭০১ সালের ২৩শে মে ইতিহাসের-প্রসিদ্ধ জলদস্যু কাপটেন কীডের জীবনাস্ত হ'ল ফাসির মকে।

গুরু বিন্ মিলে বা জ্ঞান, ভাগ্য বিন্ মিলে বা সফল
যোগ বিন্ মিলে বা রাজ, বল বিন্ হাটে না দুর্জন।

—সত্যকাশ

মনি ও মুক্তা



গুরু ছাড়া জ্ঞান পাওয়া যায় না, ভাগ্য
ছাড়া সফলের সন্ধান হয় না, কর্কশলের যোগ-বাগ
ছাড়া ঐশ্বর্য পাওয়া যায় না, আর দুর্জন
বে, বলপ্রয়োগ ছাড়া সে হটে না।



নারী

—নরেন্দ্র দেব

(রূপকথা)

এক

অনেকদিন আগের কথা।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি পুত্র জনপ্রিয়। প্রজার শব্দটী তাঁকে ভাবি ভাগবাসতো। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশ পরে গ্রামাদি থেকে চুকিয়ে বেড়িয়ে পড়তেন। রাজধানী ছাড়িয়ে আশেপাশের গ্রামে এসে ঘুরে বেড়াতেন। নিজের চোখে দেখে আসতেন প্রজারা কেমন আছে। শুনতেন তারা নিজদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। তাদের অভাব অভিযোগ কি জানবার চেষ্টা করতেন। রাজকর্মচারীগণ কেউ তাঁদের উপর কোনো অত্যাচার করছে কিনা তার খবর নিতেন।

একদিন হয়েছে কি, এমন ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে রাজা এক গ্রামে পিড়ে পড়লেন।

সেখানে বেশিরভাগই দীন-ভগীদেব বাস। তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। রোদের তাপ বেড়ে উঠেছে শুব। পথে ঠাটতে রাজা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে এসেছিলেন গ্রামের বাইরে এক গাছতলায়। রাজার খুব তৃষ্ণা পেরেছিল। গলা শুকিয়ে উঠেছে দেখলেন কাছেই বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ছোট কুটার। রাজা দীর্ঘে দীর্ঘে সেই কুটারের দ্বারে গিয়ে ঢাক দিলেন—বাড়িতে কে আছেন?

দরজা খুলে একটি মধ্যবয়স্ক মহিলা বেরিয়ে এলেন। চমকে রাজাকে দেখেই দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। সবিনয়ে জানতে চাইলেন আপনি কাকে খুঁজছেন?

মহিলাটিকে দেখে রাজার মনে চ'ল তিনি দরিদ্র হলেও নিশ্চয় কোনো বড় ঘরের মেয়ে। তাই সসন্মানে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, আমার বড় পিপাসা পেরেছে। একটি বদী ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন মা বড় উপরুত হবো।

মহিলাটি তাঁকে তড়াতিড়া একপানি আসন এনে বসতে বলে, তখনই চলে গেলেন কয়েক থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে আনতে।

পঞ্চাশ রাজা আসনে এসে বসলেন। এই কুটারটি রাজার খুব চেনা। তিনি বহুদিন এপথে যেতে যেতে এই ফুলের বাগান-ঘর কর করে সুপরিচ্ছন্ন কুড়েরখানি দেখেন আর ভাবেন এ হলি পল্লীতে এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে কারা এই পৃথিবীতে থাকেন? মাঝে মাঝে তাঁর চোখে পড়ে একটি পরমাত্মকরী মেরে রত কখনো রান করে উঠে এলোচলে শুভ শাড়ি পরে একটি সাজি তাতে ফুল তুলছে, অথবা কোনোদিন বকমকে নিকানো মাটির বাগার লক্ষীপুজার আল্পনা দিচ্ছে। কখনও বা এক ধারে বসে একমনে পুঁজি নিয়ে নিবিষ্টমনে পড়ছে। কখনও বা দেখেন মেরেটি বসে ছবি আঁকছে। আবার কখনও বা দেখেন নিপুণ তাতে কুলোর করে ধান চাল ঝড়ঝড় করছে। নয়তো! কুরো থেকে জল তুলছে। মেরেটিকে দেখে রাজার মনে কেমন যেন একটা মারা পড়ে গিয়েছিল।

রাজা বাগার বসে ভাবছিলেন সেই মেরেটিকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে আজ কি করছে? সে কি বাড়িতে নেই? দরজার কীকে উঁকি দিয়ে দেখেন মেরেটি আজ ঘরের ভিতর বসে ছুঁচুতা নিয়ে একমনে কি যেন একটা সেলাইয়ের কাজ করছে। ইতিমধ্যে মহিলাটি একটি কপোর মতো মাঝাঝা বকমকে কাঁসার সুদৃশ্য খচিত রাজাকে পরিষ্কৃত ঠাণ্ডা জল এনে দিলেন।

রাজা জলপান করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘরের মতো ওই যে মেরেটিকে দেখতে পাচ্ছি ওটি কি আপনারই মেরে? মেরেটির নাম কি মা?

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহিলাটির হুই চোখ জলে ভরে উঠলো। বাস্তব-

269

५६

● मायू

বিবাহ হয় এবং সে স্বামীর ঘরে চলে যায়। কিন্তু, তোমার ঘে কেউ নেই! আমি চলে গেলে তোমার কে দেখবে মা?

মা বুকের মধ্যে ঘেরেকে টেনে নিয়ে আঁবর করে বললেন, ভরে! যাঁদের কেউ নেই তাদের ভগবান আঁছেন। তুই চলে গেলে তিনিই আমাকে দেখবেন। আমি স্বার্থপরের মতো তো'ব জীবনটা আমার এ চড়াগা জীবনের সঙ্গে অড়িয়ে বার্থ হতে দেবো না। যদি ভাল ছেলের সন্ধান পাই তোর বিবাহ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবে! লাবু। নইলে যে মরেও আমি শাস্তি পাব না।

লাবু মাথা ঠেট করে মান মুখে বসে রইল।

এমন সময় বাটরে সেই অতিথির কণ্ঠ শোনা গেল, কইগো মা! কোথা গেলেন? আশ্রন,

আশ্রন, সব ঠিক করে ফেলেছি।

আঁচলে চোখ মুছে লাবু মা ছুটে বেরিয়ে এলেন। অতিথিকে সম্মানে স্বাগত সস্তাখণ জানিয়ে বসতে বললেন

ছগবেশী রাজা বললেন, আমার

আজ বসবার সময় নেই মা। আপনাদের মেয়ে কুমারী লাংগাপ্রভার জন্মে আমি একটি স্ত্রযোগ্য পাত্র ঠিক করে ফেলেছি তাঁরা মেয়েটিকে দেখে আশীর্বাদ করতে চান। আমি মেয়েটিকে নিতে এসেছি। আপনাদের যদি কোনও আপত্তি না থাকে, একে এখন আমার সঙ্গে দিন। এই নিন, আপনাদের মেয়ের বিয়ের খরচপত্রের জন্ম আপাততঃ পাঁচ হাজার বর্শদ্রা রেখে দিন। হীরে মুক্তোর গহনা বা লাগবে আমি গড়াতে দিয়েছি। বেনারসী শাড়ি, মাদুরার চেলী ইত্যাদি কনের কাপড়-চোপড়ও কেনা হয়ে গেছে। কোথার? যেতে কই? ডাকুন তাকে।



আপাততঃ এই পাঁচ হাজার বর্শদ্রা রেখে দিন মা!

● লাবু

মেরেছে বেশ

দেব দেউল

১৮৯

মহিলার আনন্দ আর ধরে না। ছুটে ঘরের ভিতর গেলেন লাড়কে খুঁজতে। মাংস খিঁচুর
দিশায়ের পালা শেষ হতে রাজা লাড়কে নিয়ে চলে গেলেন। বড় এসে বুড়িরপেই আশ্রয়
করছিল।

মহিলাটি এবারও আক হয়ে এই দয়ালু সদাশয় পাবাদকব' ভদ্রলোকের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে
বইলেন। ভাবতে লাগলেন, তাই তো! চিনি না, ডানি না, সম্পূর্ণ অদর্শিত। এক
ভদ্রলোক আমার সোনার প্রতিমা' মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। পাঁচটি কে? কি করে? কে? কে?
পাঁচ? কোনও পরিচয়ই তো দিলেন না উনি! বিয়ের সবচেয়ে জড় পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা
'দিয়ে গেলেন। গয়নাগাঁটি, লাড়ি কাপড়ও সব কেনা হয়ে গেছে বললেন। 'বদল' মতোক ম'দি
বদলকের পছন্দ না হয় তখন কি হবে?

অবশ্য লাড় আমার অপছন্দ হবার মতো
নয়। যে দেখবে তারই ভাল
লাগবে। কিন্তু, যিনি লাড়র জন্ম এই
করছেন, তাঁর পরিচয়টা আজও
'জিজ্ঞাস' করতে ভুলে গেলুম। লোকটি
জাকোর নয়ত? পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা
'দিয়ে আমার মেয়েকে কিনে নিয়ে
পালানো না তো? লাড়র মা মনে মনে
'শুঁড়ে উঠলেন। না না, লোকটি
ভাল। ভালমন্দ মায়ুব তাদের আচরণ
পেকেই বোঝা যায়। দুই লোক ভাই!
আর ভাবতে পারিনি। ভগবানের
মনে বা আছে তাই হবে।

ভিন্ন

তারপর হ'ল কি, রাজার ছিল
চার-চারটি ছেলে। কিন্তু যেয়ে ছিল না
একটিও। রাজপ্রাসাদে একটি রাজকন্যা
না পাকায় রানীর মনে কোনও স্থখ ছিল



লাবু বললে, চলুন না বাবা, আর একটু বেড়িয়ে আসা যাক! [পৃষ্ঠা ১৯০]

না। কিন্তু রাজার রথ যখন রাজপুরীতে এসে পামলো এবং রাজা যখন লাংগাপ্রভার হাতখানি সম্মুখে পরে রানীর কাছে নিয়ে এলেন, লাংগাপ্রভার কপলাবণা দেখে রানী একেবারে মুগ্ধ। সমাদরে লাবুকে নিজের মচলে তুলে নিয়ে গেলেন রানী। বললেন 'লাবু' আমারই মেয়ে।

সেদিন থেকে রাজবাড়িতে লাবু রাজকন্ডার মতোই বিশেষ সম্মানজনক স্থান অধিকার করে বসলে। রানী তাকে রাজকুমারীর উপযুক্ত আদরেই প্রতিপালন করতে লাগলেন। চার চারজন রাজকুমারও এতদিন পরে একটি বোন পেয়ে ভাবি খুশী। বোনটিকে কে বেশি ভালবাসে এই নিয়ে চাব ভাইয়ের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেল। লাবুর যখন বা দরকার তখনই চার ভাই ছুটে গিয়ে তাই এনে তাক্স করতো। কিন্তু, লাবুর সবচেয়ে বেশি ভাব হয়ে গেল ছোট রাজকুমারের সঙ্গে। বড়বা, মজবা, সেলবা লাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো কিন্তু ছোট রাজকুমারকে লাবুর প্রায় সমবয়সী বললেই হয়। মাত্র ত'তিন বছরের বড়। তাই ছোটোর সঙ্গেই খেলাধুলো ও মেলামেশ করতে লাবুর একটুও কুষ্ঠা বা সংকোচ বোধ হ'ত না।

রাজকুমারেরা লাবুকে রাজকুমারী বলেই ডানতে। কিন্তু লাংগা যে রাজকন্ডা নয়, সে যে রানীমার পালিতা মেয়ে, রাজপুত্রের কেউ তা না-জানলেও, রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা সবাই এটা জানতো। মহারাজ যে তাকে দরিদ্রের কুটার থেকে নিয়ে এসেছেন সারথির কাছে এ খবর তার আগেই শুনেছিল।

এদিকে লাংগাপ্রভা রাজপ্রাসাদে রাজকন্ডাবি মতোই আদরবৃত্তে ও রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গেই প্রতিপালিত হ'জিল। তার চোঁরার আর আচার-আচরণে কেউ দৃষ্টিতেই পারতো না যে সে রাজবাংশের মেয়ে নয়। তাকে দেখলে মনে হ'তো যেন সে এই রাজপ্রাসাদেই জন্মেছে। ঘরিরের কুটারে যেন সে কোনও দিনই প্রতিপালিত হয়নি। এমনিট আভিজাত্যপূর্ণ ছিল তার চালচলন।

একদিন ছোট রাজপুত্রকে লাবু বললে, চলুন না দাদা, আজ এমন রমণীর অপরাহ্নে একটু নদীর ধারে আরামে বেড়িয়ে আসা যাক। সারথিকে রথ আনতে বলুন। কিন্তু, শুধু আমরা দুজন যাবো। আর কেউ নয়।

ছোট রাজকুমার খুশী হয়ে তখনই ছুটলেন নিজের সারথিকে রথ আনবার কথা বলতে রাজপ্রাসাদের স্তম্ভনশালায়। বললেন, সারথি! অবিলম্বে তুমি রাজকুমারীর মহলে রথ নিয়ে হাজির হও। রাজকন্ডা নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন। একটুও যেন ঘেরি কোর না।

সারথি ছোট রাজকুমারের কথায় ধরনে বিরক্ত হয়ে বললে, ইস! তবু যদি উনি সত্যিই রাজকন্ডা হ'তেন! তাহলে তো দেখছি আপনি আমাবের হাতে বাধা কাটতেন!

● লাবু

নবোত্তর বংশ

দেব দেউল

১৯১

ছোট রাজকুমার লাবণ্যকে ভয়ানক ভালবাসেন। সবদিন এই রকম অপ্রজ্ঞা করে কখনো চাক্ষুণ্য হয়ে বাপার কি সব আনতে চাইলেন। সবদিন তখন এই মেয়েটির সমস্ত ইচ্ছাসংকলনকে বশে বললে। ছোট রাজকুমার তখন আনন্দে উৎসব হয়ে দাদামহলের কাছে ছুটে গিয়ে পবনকে ডাকিয়ে দিলে বললেন, লাবণ্য যখন সন্ধ্যায় আমাদেব বেগন নয় তখন হামবাবো একই তরক দিয়ে কববে পারি তা! কি বলে?

বড় ভাই শুনে পূর্ণা হয়ে বললেন, নিশ্চয় পারি। বড় রকম একটা কপাল দিয়ে তুমিই আমায় দুর্জ ছিন্‌ম। আমিই একে দিয়ে কববে।

মজবাজকুমার বললেন, বাবে। তখন আমাদেব বেগন নয় তখন আমায় একে দিয়ে কববে না কেন?

মজবাজকুমারও সেই কথা বললেন।

ছোট রাজকুমার তখন কাতরকণ্ঠে বললে, লাবণ্য! আমাদেব বেগন নয় এটা পবন দিয়ে আমি তো আমাদেব কাছে একে দিয়ে কববাব অসম্ভব নিজেই এসেছিলাম। আমি তো একে তোমাদের সঙ্গে নিয়ে গেছি ভালবাসি।

লাবণ্যে নিয়ে তখন চার ভাইয়ের মধ্যে শুভ-নিশ্চয়ের স্বপ্ন বেধে গেল।

বাজার কানে পবনটা পৌঁছতে তিনি তৎক্ষণাত রাজকুমারদের একে আনিয়ে বললেন, তোমরা চার ভাই পূর্ণবীর চারদিকে বেরিয়ে পড়ো। তোমাদের মধ্যে যে লাবণ্যপ্রভাব ভক্ত মল-বিশেষ করে সবচেয়ে আশ্চর্য আর অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করে এনে লাবণ্যকে উৎসব দিয়ে পাববে তার সঙ্গেই লাবণ্যের বিয়ে দেব আমি।

রাজার আদেশ শোনবামাত্র চার ভাই সেইদিনই তড়ন্ত করে পূর্ণবীর চার দিকে ছুটলো। সবচেয়ে আশ্চর্য আর অমূল্য জিনিস খুঁজে আনতে। যাবার সময় রাজা তাদের বলে দিলেন, ঠিক তিরিশটি দিন সময় পাবে। তোমাদের মধ্যে যে যা সংগ্রহ করে আনতে পারবে তার ভিতর সবচেয়ে আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস হবে যার, সে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে। কিরতে যদি কারুর একদিন দিন হয়ে যায়, সে বড় ভাল জিনিসই আশ্চর্য, ব্যতীল হয়ে পাবে।

চার

রাজার চকুমে চারজন রাজকুমার পূর্ণবীর চারদিকে বেরিয়ে পড়লেন আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস খুঁজে আনতে। বড় রাজকুমার চললেন উত্তর দিকে। মেজ রাজকুমার দক্ষিণ দিকে। সেজ রাজকুমার

পশ্চিম দিকে। আর ছোট রাজকুমার পূর্বদিকে। উত্তরে অনেক দূর যাবার পর বড় রাজকুমার দেখলে একটি বুদ্ধ কারিগর একটি রাজহাঁসের মতো ডানা মেলা স্তম্ভের রথ তৈরি করছে। বড় রাজকুমারে দেখে তারি পছন্দ হল। তিনি বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি রথখানি বেচবে? বড়ো বললে, দাম পেলেই বেচবো। রাজকুমার জানতে চাইলেন, কত দাম? বড়ো বললে, একলা স্বর্ণমুদ্রা! রাজকুমার চমকে উঠে বললেন, তোমার বেচবার ইচ্ছা নেই বোধহয়! নইলে এই সামান্য একখানা ঠাসগাড়ির এত দাম চাইবে কেন? বড়ো হেসে বললে, তুমি এর গুণ জান না তাই দাম বেশি মনে করছো। এটা ঠাসগাড়ি নয়। এর নাম ‘পুষ্পকরথ’। এই রথে চড়ে যখন যেখানে যেতে চাইবে একমুহূর্তে আকাশপথে উড়ে এরূপ তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাবে! বড় রাজকুমার একথা শুনে তেঁা তারি খুশী। মনে মনে ভাবলেন এমন আশ্চর্য মূল্যবান জিনিসই তেঁা আমি কিনে নিয়ে যেতে এগেছি। আর কোনও কথা না বলে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বড় রাজকুমার ‘পুষ্পকরথ’খানি কিনে ফেললেন।

এদিকে মেজ রাজকুমার দক্ষিণে অনেকদূর যাবার পর দেখতে পেলেন এক বুদ্ধ কারিগর বসে বসে একমনে একখানি স্তম্ভের আরনা তৈরি করে কাকাকারকরা হাতীর দাঁতের ফ্রেমে বাঁধাচ্ছে। মেজ রাজকুমারের আরনাখানি দেখে তারি পছন্দ হল। জিজ্ঞাসা করলেন, কারিগর, তুমি কি আরনাখানি বেচবে? বড়ো বললে, দাম পেলে নিশ্চয় বেচবো। মেজ রাজকুমার দাম কত জানতে চাইলেন। বড়ো বললে, এর দাম দেড় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা! মেজ রাজকুমার আরনার দাম শুনে হেসে উঠলেন। বললেন, কারিগর! তোমার কি মাথা পারাপ হয়ে গেছে? সামান্য একখানা আরনার এত দাম চাইছো? ও আরনা কি হীরে, মতি, পাশা দিয়ে গড়া? বড়ো বললে, এ সাধারণ আরনা নয়। এর নাম ‘মারাবপণ’। তোমার আপন জন যে যেখানে যত দূরেই থাকনা কেন, তাকে যদি দেখবার জন্ত তোমার মনপ্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, এই আরনার দিকে চাইলেই দেখতে পাবে সে কি অবস্থার কোণার আছে। মেজ রাজকুমার আরনার গুণ শুনে তৎক্ষণাৎ দেড়লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আরনাখানি কিনে ফেললেন।

এদিকে সেজ রাজকুমার পশ্চিম দিকে যতদূর যান, কিছুই আশ্চর্য বা মূল্যবান জিনিস দেখতে পান না যে কিনে আনবেন। প্রায় যখন পশ্চিম দিকের পথ শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সেজ রাজকুমার দেখতে পেলেন একজন বড়ো কারিগর বসে একটি ছোট রূপোর কোটো তৈরি করছে। কোটোটি এত স্তম্ভের যে সেজ রাজকুমারের দেটি কেনবার ইচ্ছা হল। তিনি কারিগরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোটোটি কি তুমি বেচবে? কারিগর বললে, বেচবো না কেন, কিন্তু তুমি কি এর দাম দিতে পারবে? এ কোটোর দাম হ’ল লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। কারণ এর নাম ‘মালদ্বীপের অক্ষর

● লায়
নদেহে বেধ



দেব দেউল

249

'এব' মণ্ডো টাকার খাতিয়ে সে টাকা কখনও ব্যয় করেনি। সমস্ত অর্থই তিনি সঞ্চয় করে রাখেন।



ডাট্ট বাজকুমার তার কথা শ্রবণে
একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বলিলেন,
“কহুন।” তুমি কি আশা করিতে
নিস্থ ভাবেছো। একটা সামান্য
মতের আশ, স্বীকার করি খুব ভালই
হইবে, কিন্তু অত চাইছো
‘ক’ বলে ?

শ্রদ্ধা হেসে বললে, সত্যিই কুমি
নিবেদ্য। নাম শুনে দুঃখে পারভো
নামে এটি সামান্য জিনিস নয়। এ
অমূল্য ধন। এর নাম 'অমৃত ফল'।

ସଂସ୍କୃତ 'କୃତ' ଶବ୍ଦ ।

ডোঁট রাঙ্গকুমার তখন আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে সেই অমৃত কণটি কিনে বাড়ির পথে পা ফড়ালেন। কারণ, ত্রিবিংশ দিন পূর্ণ হতে আর বাকী দেরি নেই।

পাঁচ

কোরার পথে এক সরাইখানার চার ভাইয়ের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাই সবাইয়ে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি কিনেছো? তুমি কি কিনেছো? কিন্তু কেউ কাউকে বলতে চায় না। ছোট রাজকুমার বললেন, চলো ভাই বাড়ি যাই। লাভণ্যর অগ্র আমার বড়ই মন কেমন করছে। প্রায় এক মাস চলে চললো থাকে দেখিনি। আমার তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে!

মেজ রাজকুমার বললেন, ভাবিসনি। তোকে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি ঠান্ডা গুলির ভিতর থেকে সেই 'মাসাদপর্ণ'খানি বার করলেন। বললেন, চেয়ে দেখ, এর মধ্যে লাভণ্যকে এখনি দেখতে পাবি। লাভণ্যকে দেখবার ইচ্ছে সবাই মনে ছিল তাই সবাই কুঁকে পড়লে আরনার মধ্যে তাকে দেখতে। দেখে কিন্তু সবার মুখ শুকিয়ে গেল। লাভ কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যা বীচবার কোনও আশা নেই। প্রাসাদে ফিরতে আর মুহূর্ত বিলম্ব করলে লাভণ্যর সঙ্গে শেষ হবে না! কী হবে? কেমন করে যাবে তারা? রাজধানী এখনও অনেকদূর।

তখন বড় রাজকুমার বললেন, ভয় নেই কিছু, আমি এক আশ্চর্য 'পুষ্পক রথ' কিনেছি। তাইতে চড়ে এই মুহূর্তে আমরা রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হবো। শোনবামাত্র চার ভাই পুষ্পকরথে চড়ে রওনা হতে যাবে এমন সময় সরাইখানার মালিক এসে বললে, আমার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে না দিলে আমি কাউকে যেতে দেব না এখান থেকে। সব জিনিসপত্র কেড়ে নিতে বাজেরাপ্ত করবো। চার ভাই অথকোম খুলে দেখে কারের কাছে এক কর্পর্কও নেই! কী হবে? কেমন করে সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে তারা বাড়ি যাবে? তখন সেজ কুমার বললেন, কিছু ভয় নেই, আমার কাছে আছে 'মালক'র অক্ষর বাঁপি'। বড় টাকা চাই দিতে পারবো। শুনে সবাই যেন হাঁক ছেড়ে বাঁচলো! তখন সেই ছোট্ট রূপের কোটো খুলে সরাইওয়ার পাওনা মিটিয়ে পুষ্পক রথে চড়ে চার ভাই একমুহূর্তে ভ্রম করে রাজপ্রাসাদে উড়ে এল।



এসে বেঁচে লাভণ্যপ্রভার অস্থখ সেদিন খুবই বেড়েছে। রাজবৈদ্য বলে গেছেন জীবনের কোনো আশা নেই। আর অরুণের মধ্যেই মৃত্যু স্থানান্তিত। এ রোগের কোনও ওষু নেই রাজা রানী বিষম ও চিন্তিত। ছোট রাজকুমার তখন এগিয়ে এসে বললেন, আমার অস্থমতি করুন পিতা, আমি লাভণ্যপ্রভাকে এখনি আরোগ্য করে দিচ্ছি। বলেই, ছোট রাজকুমার তাঁর গুলির ভিতর থেকে সেই আদটি বার করে লাভণ্যপ্রভাকে একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন। লাভণ্যপ্রভা এতদিন

● লায়ু

নবোদয় বৈশ

কছু খাচ্ছিল না। ছোট রাজকুমার এসে তাকে 'খাও' বলতে, বাজকুমারের দিকে চেয়ে একটু মনে মনে নীষবে আমটি খেলে।

দেখতে দেখতে মরণোন্মুখ লাবণ্যপ্রভা আবার স্তম্ভ সঙ্গীত হয়ে উঠলো। 'নাশ্চল্য' নৃত্যরূপে তাকে ফিরে আসতে দেখে সবার মুখে আনন্দেব হাওয়া দুলিলো। বাজকুমারের সঙ্গীত এনে এতদিনে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

লাবণ্যপ্রভা সম্পূর্ণ সেরে উঠে দিক অপের মতো আবার হাঁটু মুড়ে ফল খবো খাওয়া করবার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে দেখে রাজা খুশিমনে একদিন চাষ বাজকুমারকেই কাজে লাগে আঁকতে বললেন, 'আমার চার জনেই আশ্চর্য ও ষটমূল্য 'জিনিস' সংগ্রহ করে এনেছ, তার মধ্যে লাবণ্যপ্রভা যথেষ্ট মুখ্য একে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে।' কিয়, আমাব দিকেচন্দ্রা ছাড়া রাজকুমারের সঙ্গে তার 'বদাংক হস্ত' উচিত কারণ, তার ঐ আমটি না থাকলে লাবণ্য বাঁচতো না।

বড় রাজকুমার সবিনয়ে বললেন, বৃন্দলুম 'কিয়, আমার 'পুষ্পক রথ' না থাকলে, আমি 'ক' দিক সময়ে এসে পৌঁছাতো? মজ বাজকুমার বললেন, 'আমার 'মায়ামণ্ডল' না থাকলে লাবণ্যের অস্ত্রপের ব্যবহার, তা'কউ ভানতে পারতো না! সত্য রাজকুমার বললেন, 'আমার 'প্রাণ' ক'সকলকল্লু হয়ে পড়েছিলুম। আমার কাছে 'মালিন্দীর অক্ষয় ঝাঁপি' না থাকলে, সবার্তেকে 'ক' 'অজগৎ' টাকার দায়ে সরাইখ'নাওয়ালার হাতে বন্দী হয়ে থাকতে হ'ত।

রাজা তখন খাঁর ভাবে ছলেদের দু'খিয়ে বললেন, বাজকুমারের 'মায়ামণ্ডল' লাবণ্যের 'আসর' নৃত্যর পবর পেয়েছো তোমরা একপা' দিক, বড়কুমারের 'পুষ্পক রথ' না থাকলে এক লম্ব 'কউ রাজ-প্রাসাদে এসে পৌঁছতে পারতে না, একপাও দিক, আর 'সজকুমারের 'লক্ষীর ঝাঁপি' না থাকলে সরাইখ'নার মালিক তোমাদের আটকে রাখতো, একপাও দিক, 'কিয় একবার ভাল করে ভবে লগ—ছোট-কুমার 'অমৃত কল' নিয়ে তোমাদের সঙ্গে না এলে, শুধু তোমরা এসে কি লাবণ্যকে প্রাণে বাঁচাতে পারতে? আর একটা কণা—বড়র 'পুষ্পক রথ' বজায় আছে, মজর 'মায়ামণ্ডল' অক্ষয় 'অভে', সেজর 'লক্ষীর ঝাঁপি' অক্ষয় হয়েই রয়েছে 'কিয় ছোট রাজকুমারের 'অমৃত কল' তা'স রাখেই একটুও 'সব দিয়েছে লাবণ্যকে খাইয়ে। সুতরাং ছোট রাজকুমারই লাবণ্যকে 'বদাংক' করবার 'অ'সকারী। কারণ প্রকৃতপক্ষে ছোটোই লাবণ্যের প্রাণলান করেছে।

তখন তিন ভাই ছানিধুণে এসিয়ে এসে ছোট ভাইয়ের হাতেই লাবণ্যকে দিবে দিলে।



ডিনসেন্ট ভ্যানগগ, অমর-পল গর্গা

—ঐপ্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে একশ বছরেরও আগেকার কথা। ডিনসেন্ট, ভ্যানগগ ভূমিক্ত হলেন হুলাঙে—১৮৩৫ সনে।

ছেলে বটে একখানা। পাগলাটে ভাব, কোন কিছুই ধার ধারে না। এইটুকু জীবনে সে কী করেনি বল? দোকানে চাকরি নিল মাল বিক্রির কাজে, চলল কিছুদিন এইভাবে। তারপরই বেধা গেল সে দস্তুরমত গুরুগম্ভীর চালে স্থলখাস্টার হয়ে বেত হাতে করে ছেলে পড়াচ্ছে। শেষে তাও গেল। এরপর?—এবার হয়ে গেল মিশনারী। 'আলখামা পরে' বাইবেল হাতে নিয়ে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করে বেড়ায়। মোট কথা, কোন কিছুই স্থিরতা নেই, যাকে বলে "জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ" কিছুই আর করতে বাকি নেই। শেষে হঠাৎ একবার খেয়াল হল—এসব নয়, তাকে চিত্রশিল্পী হতে হবে। মাঝায় কিছু একটা ঢুকলে তো আর রঞ্জে নেই! অমনি শুরু হয়ে গেল মন দিয়ে শিল্পসাধনা।

বয়স তখন তার সাতাশ বছর।

দেব দেউল

১৯৭

রং নিয়ে ভ্যানগগ শুরু করলেন এক নতুন ধরনের খেলা। তার সম্মুখীন
নামচাঁচা মনের তীব্র অনুভূতি ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন রংয়ের বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য।

তলাগুণ্ডে তখন নতুন ভাবের বগা এসেছে—নব শিল্পীদের ধর্ম দাঁট। আমেরন
ম. জেমস মরিস, জোসেফ ইজরায়েল প্রভৃতি শিল্পীরা তাঁদের চাঞ্চল্য আসর চাকির
জমিয়ে বসেছেন। এই নবাতন্ত্রীরা যে সব ছবি অকতেন ভাবে বাকের কাউন্টার
বাস্তবতার ভেতর কোরট আর মিলেটের কল্লোবিল্যাসের স্বাক্ষর করেছেন।
ভ্যানগগের ছবিতে তখন মিলেটের আকার অনুকরণে কতকটা ছাপ এসে পড়েছে।
কিন্তু রংয়ের মোলায়েম সমাবেশের ভেতর দিয়ে বাস্তবতার আত্মপ্রকাশ যেন পরিষ্কৃত।
তক এমনি সময়ে নতুন যুগের বার্তা নিয়ে এলেন থিয়োডোর।

থিয়োডোর ভ্যানগগের ভাই। তিনি প্যারীর গৌপিল গ্যালারিতে চাকরি
করেন। নিতা নতুনের সেলাই বল, আর শিল্প সাহিত্যের কথাই বল, এর রঙ্গভূমি
এই প্যারী নগরী। এরই কাছে ভ্যানগগ প্রথম শুনলেন—“ইমপ্রেসোনিজম্”এর কথা।
চোখে যা দেখি সেইটেই তার আসল রূপ নয়, তার বাস্তব রূপ আর ভিন্ন শিল্পীর
মনে যে ভাবের ইঙ্গিত করে সেইটেই তার সত্যিকারের স্বরূপ—এইটেই থিয়োডোর
ভাল করে বুঝিয়ে দিলেন ভ্যানগগকে। ফ্রান্সের চিবকলাজগতে বিচিত্র বিশ্ববের
কথা শুনে ভ্যানগগের চিরচঞ্চল অশান্ত মন উদ্ভাস হয়ে উঠল। চলে এলেন তিনি
ভাইয়ের সঙ্গে প্যারী নগরীতে।

প্যারীতে এসে ভ্যানগগ, ক্যামেলী পিসারো আর সিউরেটের দলবলের সঙ্গে
ভেঁদে গেলেন। এই সময়ে ফ্রান্সে পিসারো আর সিউরেট ছিলেন শিল্পীদের
মধ্যমণি। দেশশুদ্ধ লোক তাঁদের শ্রদ্ধা করত, বিশেষতঃ সিউরেটের তেঁা কথাই
নেই। এঁদের কাছেই নতুন করে হাতেখড়ি হল ভ্যানগগের। এই সময়কার
ভ্যানগগের আঁকা যত ছবি সবগুলোই প্রায় বিশ্ববিখ্যাত হয়ে আছে আজ।

যাই হোক, সিউরেটের প্রভাব ভ্যানগগের ছবিতে কিছুটা এসে পড়লেও তার
একটা নিজস্ব ধারাও গড়ে উঠল। অতি তীব্র রংয়ের সমাবেশ, তার মধ্যে নেই কোনরকম
মিশ্রিত রংয়ের বালাই, অথচ আছে একটা চাকলের জীবন্ত প্রদীপ্তি। শিল্পীর
মনের জোরের প্রত্যক্ষ ছাপ! তারই কলে সৃষ্টি হল বিশ্ববিখ্যাত ছবি “সানফ্রান্সিসকো”
প্রভৃতি আরও অনেক ছবি। আজকের এই সব বিশ্ববিখ্যাত ছবির সেদিন কিছু কোন
সাময়ই ছিল না। ছবি আঁকেন ভ্যানগগ, বড় আশা করে প্রদর্শনীতে দেন সেগুলো
—কিন্তু ভাগ্যবোঝে কদর হয় না ছবিগুলোর। ব্যর্থতার অভিধানে ভেঙে পড়ে
শিল্পীর মন। সে এক দিন বটে!

● ভিনসেন্ট ভ্যানগগ আর পল গগ্যা
শ্রী প্রতুলচন্দ্র বসুস্বপ্নাচার্য

ঠিক এমনি সময়ে আর একটি লোক দলে এসে জুটলেন উদ্ধার মত। নান তাঁর পল গগ্যা। ইনিও আর একটি উৎকট খেলার মানুষ! হু'জনার মধ্যে ভাবি ভাবও হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ইনিও পিসারোর ছাত্র। প্রতি রবিবারে পিসারো গগ্যাকে নিয়ে দৃশ্য আঁকতে বেরুতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে গগ্যা ছবি আঁকার পদ্ধতি নিয়ে সকলের বিরুদ্ধে তাঁর সমালোচনা করে বেড়াতে লাগলেন। নতুন মত প্রচার করলেন গগ্যা, বললেন, সহজ জিনিসকে অনর্থক এরা জটিল করে রংয়ের চাতুরী ফলিয়ে। আদিম ভাবই হবে ছবির প্রাণবন্ত। রংও হবে এমন, যা ছিল আদিম মানুষের পরিচিত একান্ত আপনার বস্তুটি। বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন গগ্যা অতি আধুনিক চিন্তাবাদের বিরুদ্ধে। (Neo-Impressionism) সহজ আর সরল হওয়া কী যায় না? যায় না লোকদেখানো সভ্যতার বাঁধাধরা আইনকানুনের গণ্ডি ডিঙিয়ে মুক্ত মানুষ হয়ে যেতে? যেখানে থাকবে না সামাজিক আইন, সভ্যতার বন্ধন, ভ্রষ্টতার মুখোশ। এসো, রং ও রেখায় ফুটিয়ে তুলি—প্রাণ যা চায় তাই।

এ কথা একমাত্র গগ্যার মুখেই সাজে। চৌদ্দ বছরের ছেলে তখন গগ্যা। ঘর পাণিয়ে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে সাগরের বুকে একটা জাহাজ ধরে। ঘুরে বেড়াচ্ছে গোটা পৃথিবীটা, দেশে বেড়াচ্ছে বিচিত্র মানুষ, সপক্ষ হচ্ছে অভিনব অভিজ্ঞতা। বিশেষে তাহেতি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে প্রাণ খুলে। দেশে কিরে এসে আবার ঢুকে গেলেন শেয়ার মার্কেটে, করলেন কিছুকাল দালালি। বেপরোয়া বলতে একমুহুরের বেপরোয়া মানুষটি। এহেন গগ্যা এসে জুটলেন ভ্যানগগের সঙ্গে। এ যেন হ'ল মণিকাকনের সংযোগ!

গগ্যা নিজের খেয়ালমত নতুন ধরনের ছবি আঁকতে শুরু করলেন। অনেকখানি জায়গা জুড়ে এক-একটা রংয়ের প্রলেপ, তাতে ফুটে উঠল কত সহজে ছবির বিষয়বস্তুকে রূপ দেওয়া যায় তারই একটা প্রচেষ্টা। ক্রাসের ললিতকলার ইতিহাসে যে ম্যান্টে নবাতন্ত্রের আমদানি করেছিলেন রংয়ের মাধ্যম আর ভাবের সীমাহীনতার সম্পর্কে, তাঁর বিরুদ্ধে যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন গগ্যা। মোটা মোটা রেখার বন্ধনী দিয়ে আঁকা সে সব ছবিতে ফুটে উঠল অসংস্কৃত মনের অন্তত খামখেয়ালীর আবেশ, যেন তার সর্বক্ষে বুনো গন্ধ মিশিয়ে আছে। এ ছবি কার ভাল লাগবে আর কার ভাল লাগবে না—সে পরোয়া নেই গগ্যার।

ভ্যানগগ আর গগ্যার মতবাদ বিভিন্ন—এ নিয়ে হু'জনার মধ্যে বিলক্ষণ তর্ক বেধে যায়, তবুও হু'জান হু'জানকে হু'গু ছেড়ে থাকতে পারে না। যে চোখ রাগে

❶ তিনসেট ভ্যানগগ আর পল গগ্যা

ঐ প্রকল্পে ব্যোপাখ্যায়

হ'ল' হয়ে ওঠে ক্ষণিকের জন্মে, সেই চোখ দু'টিই আবার প্রীতির স্পর্শে জলধরা হয়ে ওঠে পরস্পরের সহানুভূতিতে।

ভানগগের অতিকষ্টে দিন চলে। সব সময় ছবি দিক্রি হয় না। আবার কলেভ্রে যদি বা বিক্রি হয়, দু'এক পাউন্ডের বেশী দাম দেয় না কেউ। গগারও তথৈবচ। তবুও ভানগগের ভাই থিয়োডোর প্রতিমাসে যথাসাধ্য সাহায্য করেন এই যা রক্ষে। এর ওপর থেকে থেকে ভানগগের মাথারও গোলমাল দেখা দেয়—দুর্ভাগ্য তো আর একা আসে না ?

ওদিকে গগা বিয়ে করে সংসার পেতেছেন। যার মহিষির নেই, তার আবার সংসার করা। খেয়াল হ'ল, সংসার ফেলে গগা আবার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে, কান এক বীপে গিয়ে বনোদের মধ্যে কাটিয়ে এলেন কিছুকাল। পাঠাতে 'ফরে এসেই ভানগগকে ধরে বসলেন—যেতে হবে তারলেন্সে' রে'ল-কলমল আরলেন্স। শীত কম, ভারি আরামের জায়গা। সেখানে গিয়ে ছ'ব আকশেনে দু'জনে—প্রাণের বাসনা। প্রথম বারের মাথা খারাপের পর তখন একটি স্থল অবস্থা—রাজী হয়ে গেলেন ভানগগ।

আরলেন্সে এসে মনের আনন্দে দু'জনে ছবি এঁকে বেড়ান, আলাপও হয়েছে দু'চারজনের সঙ্গে। এই পরিচিতদের মধ্যে একটি মেয়েও ছিলেন। তখন সেটা শীতকাল। সামনেই বড়দিন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে ভানগগ মেয়েটিকে ডংশ করে বলছিলেন, "আমার তো আর পয়সা নেই যে বড়দিনের সময় তোমাকে কিছু উপহার দিই..." বড় ডংশের সঙ্গেই বললেন ভানগগ। মেয়েটি ভারি রসিকা। ঠাট্টা করে ভানগগকে বললেন, "কেন ? পয়সা নাই বা থাকলো, তোমার এত বড় বড় দুটো কান, একটা না হয় উপহারই দিলে বড়দিনের সময় আমাকে..."

এ একটা কথার কথা মাত্র; কিন্তু ভানগগ ভুললেন না সে কথা। বড়দিন এসে গেল। একদিন মেয়েটির কাছে একটা প্যাকেট এসে তাজির। মেয়েটি প্যাকেট খুলে দেখে তার মধ্যে সম্ভবতঃমাথা একটা মানুষের কাটা কান। কান দেখে তো তার চক্ষু চড়কগাছ,—শিউরে উঠল ভয়ে তার সর্বাঙ্গ। বুঝতে বাকি রইল না এ কার কাজ।

ওদিকে ভানগগ নিজের হাতে ক্ষুর দিয়ে নিজের কানটি কেটে মেয়েটির বাড়িতে রেখে এসে নিজেই ব্যাণ্ডেজ বেঁধেছে কাটা-কানে। তারপর বসে গেছে হা তুলি নিয়ে নিজের ছবি আঁকতে আয়নায় দেখে দেখে।

● তিনলেক্ট, ভানগগ আর পল গগা
প্রব্রলচর বক্ষোপাখ্যায়

বাপার দেখে গগ্যার মত
অসংসারী লোকও ভড়কে গেল।
সাত ভাড়াভাড়ি থিয়েটারকে
চিঠি লিখে দিলেন পার্বাতে।
খবর পেয়ে থিয়েটার নিয়ে
গেলেন ভানগগকে পার্বাতে,
— প্রতি করে দেওয়া হল
হাসপাতালে। নিজের যে ছবিটি
কানকাটা অবস্থায় ভানগগ
আকলেন তার নাম দিলেন
“L Romme a' Loreille”
অর্থাৎ “কানকাটা মানুষ”।
পৃথিবীতে যত বিখ্যাত আর



কানকাটা ব্যাওজ বাবা অবস্থার ভানগগ!

কটা কান দেখে তো মেয়েটির চক্ চক্‌গাছ! [পৃষ্ঠা: ১২২

বতমুলা ছবি আছে তার মধ্যে আজ এটিও
একটি।

আবার ভানগগের মাথার গোলমাল দেখা
ছিল। যেদিন একটু ভাল থাকতেন সেদিন বসতেন
ছবি আঁকতে। এমনি অবস্থা যখন, সেই সময়
একদিন তাঁর চোখের সামনে কুটে উঠল নিজের

● তিনসেট্ ভানগগ আর পল গগ্যা
শ্রী প্রভুলক্সে বন্দোপাধ্যায়

জীবনের ছবিগুলো,—মনে হ'ল, এক সমাজ-পরিহাস উন্মাদ,—জীবন যুগে আর নিজের কণ্ঠস্বরে বার্থ। চোখের সামনে ভবিষ্যতের ছবিও মুটে উঠেছে—সেখানে আনন্দ নেই, নেই কোন ভরসা,—নিভে গেছে আশাকুচিকার মায়াময় আলোক দীপ্তি। সহ্য হল না আর ভানগগের এই মহারিক তার উৎকট উপহাস। আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন পিস্তল—শেষ করে 'দিলেন নিজের ত'জস্ব জীবন নিজ হাতে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুলাই ফ্রান্সে ফেলল তার রক্তচাপারের মহারক্তটি।

ভানগগের মৃত্যুর দশ বছর পরে, তার আঁকা ছবিগুলো প্রদর্শনীতে দেওয়ার পর সুখী-সমাজ আঁকার করে নিলেন 'শিল্প-নিপুণের শ্রেষ্ঠতা'। ঘুমন্ত জাহতীর যেন ঠঠাৎ ঘুন ভাঙল। যুগে যুগে ভানগগের নাম চড়িয়ে পড়ল দেশবিদেশে—তারপর সমগ্র পৃথিবীতে। এই তো সেদিন ভানগগ পারীর মন্টনারের কুটপাতে ছবি সাজিয়ে 'বিক্রির আশায় দিনের পর দিন রোদ-রক্তি মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকতেন! বড় আশা,—কেউ যদি দয়া করে একখানা ছবি কিনে ধুয়ে দেয়। কেউ তো কিরেও চায়নি সেদিন।



আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে তুলে নিলেন পিস্তল।

ভানগগের ছয়ছাড়া জীবনের শেষ অব্যাহত তার প্রিয় বন্ধু গগার কথা না বললে কিছু বাকি থেকে যায়। ভানগগের এইরকম শোচনীয় মৃত্যুতে গগা একেবারে ভেঙে পড়লেন। প্যারী আর ভাল লাগে না তার। আবার স্রীপুত্র ফেলে চলে গেলেন তাহেতি ধোপে। বন্ধুদের চিঠি লিখলেন—“তোমাদের সভা আগত থেকে

পালিয়ে এসে গুব ভাল আছি। অত বাঁধাধরা সভ্য সমাজ—যার কোনটাই সত্য নয়—আমার আদৌ পোষাবে না।” কিন্তু কিছুদিন পরে গগ্যা আবার প্যারীতে এসে হাজির, তাতের পয়সা বোখহয় ফুরিয়েছে। প্যারীর ডুরাণ্ড রুয়ে গ্যালারিতে প্রদর্শিত হল গগ্যার আঁকা ছবি, কিন্তু বিক্রির দিক দিয়ে কিছুই তেমন সুবিধে হল না। শেষে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জীবনের মত ইউরোপ ত্যাগ করে তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের কোন এক দ্বীপে যাত্রা করলেন। সেখানেই দারিদ্র্য আর রোগে ভুগে তাঁর জীবন-প্রদীপ নিভে গেল আন্তে আন্তে। সভ্য সমাজ সে খবর রাখেনি সেদিন। দীত থাকতে দীতের মর্ম কে কবে বুঝেছে ?

আজ ভ্যানগগ আর গগ্যা নেই—কিন্তু তাঁদের আঁকা ছবিগুলো অমর হয়ে রয়ে গিয়েছে। সে সব ছবির দাম এখন লক্ষ লক্ষ টাকা। এমন সব প্রতিষ্ঠান আর ধনকুবের আছেন যাঁরা অমূল্য রত্নভাণ্ডারের বিনিময়ে এঁদের একখানা ছবি পেলে নিজেকে খণ্ড মনে করেন আজ।



জোন্সালী কথা

মোগলী (জাংগল টেলস্)—রাডিয়ার্ড কিপলিঙ্

বাঘের রাজ্য, শের বা মানুষের এক বাচ্চাকে শিশু অবস্থায় সাবাক্ত করে ফেলতে চেষ্টা করি কিন্তু কাণ্ডের করে শিশুকে ফেলে সে পালায়। অসহায় মানুষের শিশুকে শের খাঁর দুখ থেকে উদ্ধার করে, বেকড়েদের মধ্যে যে ছিল দলপতি, সেই রক্ষক বেকড়ে। বেকড়ে গৃহিণী মিজের বাচ্চাকে সঙ্গে সেই মানুষের বাচ্চাকে মানুষ করে। বেকড়ে মার দুখ খেয়ে সেই মানুষের বাচ্চা বেকড়েদের মধ্যেই থেকে যায়। বেকড়ে মার মানুষ করা এই মানুষের বাচ্চায় বাঘ মৌলী। ইংলন্ডের বোবেল-লারিট কিপলিঙ্ এই অদ্ভুত চরিত্রের স্রষ্টা। মৌলীকে কেন্দ্র করে কিপলিঙ্ অনেকগুলি গোট গল্প লিখেছেন, যে গাভের হাট পরের আর ফোঁড়া সেই। কিপলিঙ্ের গল্পগুলির সাধারণ নাম হচ্ছে, Jungle stories—জঙ্গলের গল্প। এই জঙ্গলের গল্পের নায়ক হচ্ছে, বাঘ, সিংহী, বেকড়ে, শেহাল, বাঁকর ইত্যাদি অরণ্যবাসী সব জন্তু। আর তাদের সাহায্যে এক মানুষের বাচ্চা মৌলী, নিজেকে জঙ্গলেরই একজন বনে করে এবং পালক বেকড়ে বা-বাগ্পক মিজের বা-বাগ্পের সন্তই হয়ে। এই সব অরণ্য জঙ্গলের কাহিনীর তত্ত্ব কিপলিঙ্ অরণ্যবাসী জন্তুদের প্রতিভাবের জীবনের তত্ত্ব থেকে যে জগুর্ রস-সুটী করেছেন, জগুর্ের সাহিত্যে তা অদ্ভুতময়ী। অরণ্যবাসী জন্তুদের কাছে মানুষই সর্বশ্রেষ্ঠ পশু, সেই মানুষের বাচ্চা ভাবের তত্ত্বের থেকে অরণ্যের বিস্তা প্রতিদ্বন্দ্বিতার জীবন নিয়ে এলো নতুন বাটীলীয়া।



—শ্রীনবগোপাল সিংহ

ভক্ত তুলসীদাস,
রাম গুণ গানে রাম রূপ ধ্যানে
আনন্দে করে বাস ।

একদা গভীর রাতে
ভক্ত তুলসী গান গেয়ে ফিরে
কছু বনপথে কছু নদীতীরে
খজনি ল'য়ে হাতে,

দেব দেউল

সহসা বিজনে দেখা হ'য়ে গেলো
ডাকাত দলের সাথে ।



ডাকাতেরা ভাবে, এ কোনো গুপ্ত-চর
এসেছে এ নির্জনে,
জেনে যেতে চায় আস্তানা কোথা
কোথায় বা বাড়ি ঘর
আমাদের এই বনে ।
ডাকাতেরা মনে ভাবে
এ হুম্মনেরে জিজ্ঞাসা করা যাবে—
আমাদের সাথে রহিবে সে-কিনা
ছাড়িয়া যাবেনা অমুমতি বিনা,
এ দলে মিলিতে যদি সে না চায়
তবে,
হত্যা করিতে হবে ।

উদাসীন হলো রাজী,
কহিল রহিব তোমাদের সাথে
করিব যে কোনো কাজই ।
চলিব নিয়ম মনে
সেখায় যাইব যেখায় আমারে
লইয়া যাইবে টেনে ।

দেব দেউল

২০৭

ডাকাতেরা দেখে লোক তো মদ নয়।
সহজেই রাজী হয়।
তস্কর সনে ভক্ত তুলসীদাস
পথ চলে খুশী হ'য়ে,
অন্তরে রঘুনাথের চিন্তা লয়ে।

নগরের এক ধনীর প্রাসাদে আসি
ডাকাতেরা গেলো অস্তঃপুরে—
নতুন সাথীরে দিয়ে গেলো এক বাঁশি।
কহিল তাহারে, তুমি তো জানো না
ডাকাতির কোশল।
ক্রমশঃ তোমারে শিখাইব সে সকল।
আপাততঃ তুমি রহ বাহিরেতে
দৃষ্টি রাখিও চতুর্দিকেতে
যদি বোঝা কেহ দেখিছে মোদের কাজ
তখুনি ক'রো আওয়াজ।

তুলসী কহেন হাসি
কেহ তোমাদের দেখিছে দেখিলে
তখুনি বাজাবো বাঁশি।
ডাকাতেরা নির্ভয়ে
প্রাসাদের মাঝে প্রবেশ করিল
সম্মদ সংগ্রহে।

দেব দেউল

সহসা বংশীধ্বনি ।

তঙ্কর সবে বাহিরে আসিল বিষম বিপদ গনি ।

ভক্ত তুলসীদাসে

ডাকাতেরা আসি প্রস্তু কণ্ঠে সাগ্রহে জিজ্ঞাসে,

কেহ কি মোদের দেখিয়া ফেলেচে ?

কোথায় সে কোন্ জন ?

নতুবা এ বাঁশি বাজাইলে কি কারণ ?

উল্কে তুলিয়া হাত

কহে নবাগত, আমি দেখিতেছি

তোমাদের 'পরে তাঁহারি দৃষ্টিপাত ।

বিশ্বপ্রস্টা, সর্বদ্রষ্টা যিনি

আমি তো তাঁহারে চিনি ।

তাই তোমাদের ক'রে দিনু সাবধান

তোমাদের চুরি দেখিছেন ভগবান ।



ডাকাতেরা শুভিত

এ কাহারে তারা ধরিয়া এনেচে,

সকলেই চিন্তিত ।

অত্র ত্যজিয়া নতজানু হ'য়ে সবে

জোড় করে কহে, মোদের ক্ষমিতে হবে ।

বল তুমি কোন্ জন ?

আমরা করিনু তোমার চরণে আত্মসমর্পণ ।

দেব দেউল

১০৭

সন্ত তুলসীদাস—
রসাকরেরই মত অবিরাম
জপিতে কহিল শুধু রাম নাম,
পুরাইল অভিলাষ ।

সাগুসঙ্গের এই তো মহিমা
বিস্ময়কর জাহ,—
মূহূর্ত্তকের একটি কথায় তস্কর হলো সাধু ।

ওঁ ভক্ত্যং কর্ণেতি সুপুত্ৰাম দেব।
অত্রঃ পশ্চৈমাকতিধিকত্যাঃ ।
শিবৈরৈকৈকটু বাসেতুন্মত্বপেদম
দেবহিতঃ বহাদুঃ ॥

মণি ও মুক্তা

—অণববোধ



হে দেবতা, আমরা যেন কান দিই না
মঙ্গল তাই শুনি; এট চোপ দিই না স্তম্ভর
তাট যেন দেখি; সপল ও স্তম্ভর জোয়ারের
অঙ্গগান করে এট জীবন যেন দেবকর্মে
নিয়োজিত করতে পারি ।



—নীহাররঞ্জন শুক

॥ ১ ॥

বয়স পনেরর থেকে খোলই হবে।

মোগা ডিগ্‌ডিগে। পরনে একটা ময়লা ছিটের হাফ প্যান্ট, গায়ে একটা ছেঁড়া ফুলহাতা শাট।

শাটের স্লট। লায় প্যান্ট পয়স্ট ডেকে দিচ্ছে।

খালি পা।

হুখটা গোল। নাকটা ভোঁতা। দুই চোখের দিগ্‌ল তারার দৃষ্টিতেও একটা বোকা বোকা ভাব।

এক মাথা ঝাঁকড়া চুল ঝেং কটা। গায়ের রঙটা বেশ ফর্সা, ধুলোবালিতে ও অংকোও সেটার সবটা ঢাকা পড়েনি।

কথা বড় একটা বলে না তবে কারণে-অকারণে হালে।

সব কিছু মিলিয়ে একটা বোকাটে ভাব।

দেব দেউল

100

১ম ইয়ত একটা ছিল কিন্তু লোকের সঙ্গে যোগে গিয়েছে।

दाकः ।

গান্ধী স্টেশনটির আশেপাশে বা স্টেশনের দক্ষিণ দিক দিয়া প্রায় ১০০ ফুট দূরত্বে একটি লৌহেরা ও নীচা ধরনের দোকানপাট যেখানেই ব্যবসা চলছে প্রায় ১০০ ফুট দূরত্বে।

কখনো কখনো স্টেশনে ও থ্রাউকবমে ও পদেত . . .

স্টেশনের দ্বারে যে ছোট্ট লোকটি—গোবর্ধন চণ্ডীদেবের ছায়া, তাই সে ছায়াই।

শও হোটেলের ব্যয়-পড়তি খাত : কিছু হারানো হয়

সম্মানে রাষ্ট্র-রাষ্ট্র বা স্টেশনে প্রাটিকরম করে, যাতে কোনও ক্ষতি হয় না।
একটি উপরে একপাশে শুয়ে রাতটা কাটাবে।

মণি মণি দেখা যাক ছোট একটি পোশাক দাঁত নিয়ে শুভবাস্তবতার পেরে অসুখ হয়ে
'হ' ন মনে বাজিয়ে চলেছে।

শেষের আশেপাশে যে সব রক্তবর্ণ কাটাটুক, তার মধ্যবর্তী মনে মনে হয় যে কোনো
 ক্ষেত্রেই গুলে গুলে পক্ষ একটা বাঁধে সব

ଅନୁତ ମୁର ।

১. যেন কান্দছে কেউ নিশ্চয় রাত্রির অকণাবণে কাণে যত ঝুঁপে ঝুঁপে

কোথা থেকে কবে য় এলে? ভুলে? কেউ হয়ত জানে না। অদৃশ্য মা'র হৃদয় কখনো
 'ম'র মনে সে জন্ম।

যেখানে থেকেই আসুক না কেন, এসেছে। তাতে মঙ্গা ঘাটাব'রই এক অ'ল'স

কত বেওয়ারিশই তো! ছন্নছাড়া রাস্তায় রাস্তায় ঘরে বেড়ায়, তার জন্তু করেই এ মাদারকো।

রাষ্ট্রায় রাষ্ট্রায় ঘোরে, তারপর একদিন হৃদয় রাষ্ট্রকে মনের পাড় খাঙে

ମଧ୍ୟ ଚଳାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କର ନୃପତି ପଡ଼େ ଦାମେ, ସେହି ଭିକ୍ଷୁଟା ନା ?

হঁ। তাই হো!

কেউ কখনো বলে ন', আহ! মরে গেল !

ওদের বেঁচে থাকার ক্ষমতাও যেমন করে, কোন বিষয় নেই যেমন মুক্তিতেও ওদের কাছে, কোন বিষয় নেই।

অন্য থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অত্যন্ত একটা বাতাবিক ঘটনা।

দেব দেউল

বোকার সম্পর্কেও তাই বুঝি কারো কোন কৌতূহলই ছিল না। অনেকে ধর বোকা নাম জানলেও অনেকেই কিছু আবার জানত না।

স্টেশনটা কলকাতা থেকে পূর্ব বঙ্গা দূরে না হলেও বড় স্টেশন। সব মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনই ওখানে দায়ে। সে দিক দিয়ে স্টেশনটার একটা গুরুত্ব ছিল।

সবদাট যাত্রীর ভিড়।

স্টেশন অফিস ও টিকিটবরের বাবুদের এটা ওটা দুটু-ফরমাশ পাটতে; বলে বোকার স্টেশনে টিকিটঘরে মায় স্টেশন মাস্টারের ঘরেও একটা আবাস গতিবিধি ছিল।

কিছু চঠাৎ একদিন পূর্বাতন স্টেশন মাস্টার রসময় বাবুর বদলী এলো এক মাঝবয়সী আংলো স্টেশন মাস্টার।

ডেভিড্ সাহেব।

লম্বা—অত্যন্ত ঢাটা—রুক্ষ কর্কশ চেহারা।

কুচকুচে কালো রং।

ঘন নিগোদের মত মাগার চুল। নিম্নুতভাবে দাড়ি গোফ কামান।

মুখে ইংরেজী বুলি ছাড়া অল্প বুলি নেই।

ডিউটির বাপারে অত্যন্ত সচেতন। নিয়ম ও আইনকানুনের বাপারে অত্যন্ত কড়া।

সবকণ্ঠই টিপ্ টপ্ ড্রুম।

তু'দিনেই কর্মচারীদের হাজারো রকমের খুঁত ধরে ধরে তাদের একেবারে নাজেহাল করে তোলে ডেভিড্ সাহেব।

রসময়ের আমলে যে গয়গোছ ভাবটা ছিল সকলের তু'দিনেই সেটা লোপ পায়।

ডিউটি, ডিউটি আর ডিউটি।

তু' কি কর্মচারীরাই—ঝাড়পাররা পর্যন্ত তটস্থ হয়ে ওঠে।

চঠাৎ ডেভিড্ সাহেবের নজরে সেদিন তু'পুরের দিকে পড়ে গেল বোকা। মালবাবুর পান আর সিগারেট নিয়ে শুধামঘরে ঢুকছিল।

ডেভিড্ সাহেবের বুঝেবুধি পড়তেই ডেভিড্ সাহেব থিঁচিয়ে ওঠে, হু আর ইউ!

চলতি ক্রচারটে ইংরেজী বাক লোকের বুঝে বুঝে শুনে বোকার রগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

সে তাড়াতাড়ি বলে, আই বোকা।

বোকা! ওয়াট্ ডাট্!...

অন্তঃপর বোকা চুপ। কারণ তার ইংরেজী শব্দের স্টক তখন বৃষ্টি ঝড়।

● বোকা

নীহারমকন গুণ

দেয় দেউল

২১১

ঐ সময় অ্যাসিস্টেণ্ট স্টেশন মাস্টার রজনবাবু ঐ পথ দিয়ে চিকিৎসকের বাড়িতে, কংক্রিট পেয়ে ডেভিড সাহেব এখানে প্রগাটা তাকিয়ে করে, হুইজ দিস বার 'মাস্টার'।

রজনবাবু বলে, ও এই অ্যাসিস্টেণ্ট থাকে, কেউ নেই জানেছি। সত্যি বাক্য বলে থাকে বাট দিস বেগারস্।

—দে আর গিভস্।

—চোট্—

না, না—ভেলেট্।

কম কিছু নয়। রাপার

আমি উইল টাইপ—

নাও তুমি ওইড্—

নো! ডোন্ট

কোও দিস পপল ইন-

সাইড্ দি স্টেশন

অ্যারিং এট ভোকব

—গেট আউট্—

বোকাকে তখনি

দেপরে দেয় ডেভিড

সাহেব।

অতপর বোকাকে

অর স্টেশন চক্রে দেখা

দয় না। চকরের বাইরেই

সে ঘোরে।

অবিশ্রি দিনের

বলান্তেই।

রাত্রির অন্ধকারে বোকা কিছু গুহারপ্রিজটার উপরে চলে যায়। সেখানেই যে বরাবর সে ঘুমায়।

ডেভিড সাহেব ব্যাপারটা জানতে পারে না।

কিন্তু জানতে না পারলেও পর পর চুই রাতে আর বারটা সাড়ে বারটা নাগাধ হানীর

● বোকা

নীহাররজন শুভ



ডেভিড সাহেব খিঁচিয়ে ওঠে—“ত ব্যার টাই!”

[১৪১০]

ইওরোপীয়ান ক্লাব থেকে আকর্ষণ নেশা করে কোয়ার্টারে ফিরবার পথে ওভারব্রিজের তলা দিয়ে কারণ কোয়ার্টারে যাওয়ার ইটাই শটকাটি, বোকার বাশি শুনে পরদিন বোসকে শুধাল, হ্যাং বোস, তোমাদের ঐ ওভারব্রিজে নিশ্চয়ই কোন ঘোষ্ঠ—প্রত্যাঙ্গা আছে।

বোস বিস্ময়ে বলে, কে বললে তোমাকে?

টমাস আট গার্ড সামগ্রান রেঞ্জিং ফ্লুট—অদৃত বাজনা, প্রেতাচারিা শুনেছি রাত্রে ওরাও বাজায়।

বাগাবটো কুন্তে রক্তনের দেরি হয় না।

কিন্তু কণাটা মশ পকাশ করে না, শুনেলেই হয়ত লোকটা বোকাকে বাত্রের ঐ আন্তানিা পোনেই তাড়িয়ে ছাড়বে।

বলে, তা হলে। শুনেছিলাম বটে ঐ ওভারব্রিজের উপর থেকে একটা লোক লাফিয়ে এসে শুটসাইট করেছিল।

ফল অবিশ্রুত ভালই হলো! ডেভিড্ সাহেব অত্রের ঐ শটকাটি ছেড়ে অত্র পপ ধবে দাঁতপাত করতে লাগলো।

বোকাও নিশ্চিন্ত রইলো।

॥ ২ ॥

ডেভিড্ সাহেব একা মাগুয। শোনা যায় আট দশ বছর আগে নাকি তাব দ্বী মারা গিয়েছে তার পর আর বিয়েথা করেনি।

সঙ্গে আছে লোকটার জ্ঞান বলে এক ক্রিস্চান সাঁওতাল শ্রৌত। সেই ডেভিড্ সাহেবের একগাধার বেয়ারা ও বাচ্চি।

ডেভিড্ তার কাজকর্ম নিয়েই থাকে। সন্ধ্যার পরে একমাত্র স্টেশনের অনতিদূরে যে ইওরোপীয়ান ক্লাবটা আছে সেখানে পতাহ একবার করে নেশা করতে যাওয়া ভিন্ন সে বড় একটা কোণারও যায়ই না।

ঐ জায়গাটার গোটা ছই ছুট মিল থাকায় সেই মিলেরই ইওরোপীয়ান কর্মচারীদের চোঁটার ক্লাবটি গড়ে উঠেছিল এক সময়।

ডেভিড্ সাহেব ওখানে স্টেশন মাস্টার হয়ে আসার মাস ছই কেটে যাবার পর একদিন বিশ্রহতে রক্তন বোস বখন তার স্টেশনের নিজস্ব অফিসঘরে বলে কাজকর্ম করছে এমন সময় মিহি

● বোকা

নীহাররক্তন শুধ

দেব দেউল

২১৩

দেবদারীকর্তে ইংরেজীতে প্রশ্ন শুনে বোস চোখ তুলতেই এক ভদ্রমহিলার ম'হিলার সঙ্গে দেখা হ'ল।

বাং, এখানকার এস. এম. কি মিঃ ডেভিড্‌স্‌সাহেব!

হা—আপনি?

আমি! ভদ্রমহিলা যেন মুহূর্তকাল কি ভাবলেন তাবন্দ পড়লেন, তার সঙ্গে আমি একবার দেখা করতে চাই। দেখা হতে পাবে কি?

ভদ্রমহিলার বয়স বোধকরি পরব্রিশেব বৎসর বেশী। বোম্বে, চেন্নাই, কলকাতা, কলংকট, ইত্যাদিতে একটা স্বামীর জোন্স আছে।

হাতে একটা কালো এয়ার ট্রাভেলিং ব্যাগ

বাস বলালে, বসুন, লাক্ষেব দবে এখনে ডেভিড্‌সাহেবের বাড়ীতে। যদি তাই হ'লে নিশ্চয়ই দেখা হবে। আপনি যদি তাঁর কোয়ার্টারে যেতে চান তা বাবুজী করে নিয়ে আসি।

কোয়ার্টারটা কোথায়?

উনিশত' রেলওয়ে কোয়ার্টারে থাকেন না? সিগন্যাল দ্বারের বাঁদিকে একটা গুহা'র মত ছায়া, সেখানেই একটা বাড়ি নিয়ে থাকেন। তা সেখানে কি থাকেন?

হা—যদি কাইনড্লি একজন গাইড্‌সেন?

বাস বোধকরি গাইডের জুই টুল ডেডে উঠে দাড়ায়। ঠিক তখন একটা ক্যাবলে জুড়িয়ে পৌঁছল পান ও এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে বোকা এসে ঘরে ঢুকল।

এই বোকা, ওটা ঐ টেবিলে বেগে পানী পাড়কে একবার ডেকে দেবে।

বোকা ঘরে ঢোকায় সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রমহিলা এর দিকে তাকিয়ে ছিলেন এবং দৃষ্টি তাঁর আঁখি সরে না।

একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। এবং সে শুধু দৃষ্টিই নয় যেন গিলছেন তিনি তাঁর দৃষ্টি দিয়ে বোকাকে। বোকাও চেয়ে ছিল আগন্তুক মহিলার চোখের দিকে।

তারপরই বোকা লজ্জা মাথা নীচু করে ঘর থেকে বের হ'য়ে গেল। এবং সে ঘর থেকে বের হ'য়ে যেতেই যেতাজিনী শুধালেন—ত, ত ইচ্ছা কি?—কে ও?

উত্তরেনার গলার খর তখন তাঁর কাঁপে।

একটু যেন বিস্মিত হয়েই বোস মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কখন কখন বলাচেন?

ঐ—ঐ যে এখানে এসেছিল!

ও তো বোকা!

● বোকা
নীহাররজন গুপ্ত

বোকা! কোণার বাড়ি ওর, কোণার থাকে ?

বাড়ি ঘর দোর যতদূর জা'নি কিছুই ওর নেই! এখানেই রাস্তায় রাস্তায় থাকে।

রাস্তায় রাস্তায় থাকে। বাড়ি—

বাটরে ঐ সময় ভুতোর মচ মচ শব্দ পাওয়া গেল। ডে'ভিড্ সাহেবের ভুতোর আওয়াজ।
বোস চিনতে পারে। তাই বলে—ডে'ভিড্ সাহেব বোধহয় আসছেন—

স'তাই গুটি।

ডে'ভিড্ গোয়েমশট এসে ঘরে ঢুকলো। এবং ঢুকেই খেতাজিনী ম'হলাকে দেখে বলে ওঠে
—মারপা, ক'তক্ষণ ?

ডে'ভিড্। এই আস'ছি—

এসো, এসো—আমার অ'ফিস ঘরে এসো। ডে'ভিড্ যেন একপ্রকার ভদ্রম'হলাকে টেনে
নিরে গিয়ে তার অ'ফিস ঘরে ঢুকলেন।

একটু পরেই বোকা এসে বলে পানী পাড়ে'কে কোণা ও পাওয়া গেল ন'।

বোস বোকাকে তাড়াতাড়ি স'রিয়ে দেয়—এই শিগগিরি য'—স'হেব এসে গিয়েছে।

বোকা চলে গেল।

পাশের ঘরটিই স্টেশন মাষ্টারের ঘর।

বাটরে ঘিরে একটি দরজা থাকলেও বোসের অ'ফিসঘর ও এস. এম.-এর অ'ফিসঘরের মধ্যবর্তী
একটা দরজা আছে, যদিচ স'দারপত্ত: বন্ধই থাকে। বোস গিয়ে সেই মধ্যবর্তী দরজার বন্ধ কপাটের
গায়ে কোঁচুলে কান পেতে দাঁড়াল। বোকাকে দেখে মেমসাহেবের চমকে ওঠা, তারপরই তার
এগ্নগুলো এবং ডে'ভিড্ সাহেবের মেমসাহেব মারপাকে দেখে বিব্রত বোধ করা ইত্যাদি ব্যাপার-
গুলোই রজন বোসকে কোঁচুলী করে তুলেছিল। বেশ উচ্চকণ্ঠেই পাশের ঘর থেকে কণাবর্তা
শোনা যায়।

নো, নো—তুমি মিথ্যা কথা বলছো, তুমি মিথ্যুক! এখন' বলো ও কে। মারপার গলা।

তুমি বিশ্বাস করো মারপা! ও রাস্তায় একটা ভিক্ষুক! শ্রেক তোমার চোখের ভুল। ডে'ভিড্
বলে।

ও কে—ওকে ডাকো।

তুমি কি কেপে গেলো? একটা রাস্তায় ভিক্ষুক—এখন তোমার কাল কারবার কেমন
চলেছে বল ?

● বোকা

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

তবে সোনি মরেনি। তুমি আগাগোড়াই আমাকে দাঙা পিঠেটা ডেউড় মারবা আবার বলে ওঠে ডেউড়ের পুঁজের প্রশ্নে কান না দিয়েই।

কি দাগলের মত এখনো বকছে। বলত মারবা ডেউড়ের বকবক মারবামার মারবামার গিয়েছে।

বেশ। তুমি বোকা না কে তাকে ডাকে, আমি বর সঙ্গে কত মরবো।

না। অসম্ভব—ডেউড়ের গলাব সব শুকু ও কুঁড়ো।

॥ ৩ ॥

রজন বোস অবাক হয়ে যায়। বাপারটা কেমন বহুতখন মনে হয়, পানি খেতে চাকে রজন বোস। ওদিকে পাশের ঘরে ডেউড় সংগ্রহের শুকু ও কুঁড়ো কতগুলো মারবা। এতগুলো যে বিচলিত হয়নি বাকি যায়। কারণ সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মারবার কতগুলো গলা, হোমার ই গলা শুনে ভয় পাবে আমি তুমি যদি ভেবে থাকো ডেউড়, তা হল কবেই আমি হুগুন গিরে থানায় সব কথা জানাবো।

জৌকের মুখে যেন তখন পড়ল। ডেউড় সংগ্রহের গলাব সব শুকু সঙ্গে সঙ্গে খাচ্ছে নেমে এলো—সে তুমি ইচ্ছা করলে বিপোটি করতে পারে। কিন্তু জেনো জেনে করে তুমিও শুকু পাবে না। তাড়াড়া আরো একটা কথা ভেবে দেখো, আমাকে সেটা চার বছর আগে সোনির মৃত্যু হয়েছে, তুমি নিজের সেটা ডেউড় বডি যে সনাক্ত করে এসেছিলে পুলিশের কাছে। তার সমালোচনা আছে। আজ আবার যদি গিরে তুমি উল্টে বল তে তুমাকেও তার চাকি করবে।

ডেউড়ের শেষের কথায় এবারে যেন মনে হলো মারবা হ্যাং চুপ করে গেল। আর তার গলা শোনা গেল না।

তারপর তখনই কিছুক্ষণ চুপচাপ।

এবং আরো কিছুক্ষণ পরে ডেউড় আর মারবা তখনই পর থেকে বের হয়ে গেল।

রজন বোসের মনে কেমন একটা যেন সন্দেহ জাগে। স্টেশনের পানী পাড়েকে ডেকে বোকাকে বুঁদে আনবার অস্ত্র বলে।

কিন্তু বস্তাখানেক বাবে পানী পাড়ে এসে বলে, বোকাকে কোথায়ও নে পেল না।

এদিকে দৃষ্টান্তানেক আগে সেই যে মারথাকে নিয়ে ডেভিড্ সাহেব স্টেশন থেকে চলে গিয়েছিল তারও আর দেখা নেই।

এবং বিকেল চারটে পগস্ত ডেভিড্ সাহেব ফিরল না।

তারপর রজন নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, 'দ্বিপ্লহরের বাপারটাও তেমন আর মনে ছিল না। সন্ধ্যা নাগাদ ফিরে এলো স্টেশনে ডেভিড্ সাহেব একা।

সন্ধ্যা পাঁচটার পর 'ডেউটি অফ' রক্তনের। সে বাড়ি অর্থাৎ কোয়ার্টারে ফিরছিল। লাইনের ধার দিয়ে এসে সরাসরি চলার পথটা, সেট পথ ধরেই আসছিল রজন। রাস্তার ধারে একটা বড় চাপা গাছ ছিল তারই কাঁচাকাঁচ এসে চঠাং দাঁড়িয়ে গেল রজন বোকা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চাপা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে মারথার আর বোকা মুগোরুথি। রজন চমকে ওঠে।

বোকা বলছে, আমি তো তোমাকে বলছি বার বার আমি বোকা, তোমার সোনি নয়।

স্পষ্ট ঠংরেজীতে কথা বলছে বোকা। রজন বোকার মুখে ঠংরেজী শুনেই চমকে উঠেছিল।

মারথা বলে, তুমি আমাকে কমা কর সোনি। আমি তোকে তখন দেখেই চিনেছিলাম আর তখন বৃষ্টিতে পেরেছিলাম সব ঐ শয়তান ডেভিডের বড়বয়।

বড়বয় একা ডেভিডের না তোমারও। চঠাং বোকা বলে।

বিশ্বাস কর কিছুই আমি জানতাম না।

জানতে না। ঐ ফণা তোমার আমাকে বিশ্বাস করতে বল।

সোনি—শোন—

না, তোমারও বড়বয় ছিল নইলে এতদিন তুমি আমার খোঁজ করনি। তুমিই ক্যাণ্ডাটের উপর নিয়ে গিয়ে আমাকে অন্ধকারে ধাক্কা মেরে নীচের খালে ফেলে দিয়েছিল ডেভিড্ সে কার পরামর্শে? নিশ্চয়ই তুমিই পরামর্শ দিয়েছিলে। তারপর সেই রাতেই ট্রেন ডিরেলভয়ের পর অস্তিত্ব হৃতদেহবদের সঙ্গে আমিও চাপা পড়েছিলাম ভেবে তোমরা নিশ্চিত ছিলে।

সোনি, লক্ষী ভাই, শোন আমার কথা! মারথার কণ্ঠে অশ্রু আভাস।

না, না—তুমি আমার দিদি নও, কেউ নও।

সোনি, শোন আমার কথা! বিশ্বাস কর। কেন তোকে আমি মারবো?

তার কারণ তোমাদের দুজনার গোপন ব্যবসার সব ধবদহ আমি জেনে কলেছিলাম আর ডেভিডকে আমি বদেছিলাম পুলিশে সব আমি জানাবো, সেই ভয়ে—

সোনি! যেন আঁতর্কণে চিংকার করে ওঠে মারথা।

● বোকা

দীর্ঘায়রজন শুণ



नेहाप्रवचन ७५

রীতিমত একটা বচসা বেশে যায়।

সেই কীকে চট্ট করে মারণা হাতে একটা আটাঁচী কেস নিয়ে কামরার অল্প দূর পথে প্রাটফরমে নেমে ছুটতে থাকে।

পালাল, পালাল, একজন অফিসার চিৎকার করে ওঠে।

অকের মত প্রাটফরমের উপর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে হঠাৎ বোকার মুখোমুখি হতেই সে বলে, দাও—ঐ আটাঁচী কেসটা আমার হাতে দাও দিদি শিগগির।

কিন্তু ততক্ষণে পলাতককে অনুসরণ করে একজন অফিসার পিগুলা ফারার করে।

একটা আঁত চিৎকার করে বোকা প্রাটফরমের উপর গড়িয়ে পড়ে স্টুটকেসটা হাতের মুঠোর মধ্যে ধরেই।

মারণা হাত থেকে ইতিমধ্যেই বোকা আটাঁচী কেসটা ছিনিয়ে নিয়েছিল।

গুরুতর আহত অবস্থাতেই বোকা হাসপাতালে পুলিশের কাছে জবানবন্দী দিল—নাম তার সোনি, সেই অফিসার গুলি করে বেড়াতে। মারণা বা ডেভিডের কোন অপরাধ নেই। পুলিশ বার বার সোনিকে সত্য কথার বলবার জন্য অনুরোধ করতে লাগল কিন্তু সোনির সেই একই কথা।

সেই দোষী। মারণা ও ডেভিড সম্পূর্ণ নির্দোষ।

মুঠাপাথরার মায়ের পেটের ভাইয়ের মাথাটা বুকের মধ্যে জড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে মারণা, এ তুমি কি করলি।

ডেভিডকে তুমি ভালবাস আমি জানি দিদি। আমার জন্য দুঃখ করো না, একটা কথা শুধু মনে রেখো—পাত্রী—খামিক জনসনের ভাইকি তুমি! সংপথে চলো, বিদায়—কথাটা বলতে বলতে যার দুই হেঁচকি তুলে দ্বির হয়ে গেল সোনি।

পাশেই ডেভিড দাঁড়িয়েছিল, তারও চোখে জল।

রজন বোস সব জেনেও কোন কথা বলেনি সেদিন।

মারণাকে আর দেখা যায়নি ওখানে পরের দিন সকালে। শেষ রাত্রে রিকে সেই যে মারণা রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে বের হয়ে এসেছিল আর তার কোন সন্ধান কেউ পারনি।

বিন দেশক বাধে ডেভিড গোমেস ও চাকরি ছেড়ে দিয়ে কোথায় চলে গেল।

রজন তারপরও বছর দুই ঐ স্টেশনে ছিল! আর সেই দুই বৎসর প্রতি রাতে ওভারব্রিজের ওখান থেকে শুনে যেত পেরেছে সে সেই অজুত বাঁশির সুর।

বাঁশি হো নয় বেন কায় কারা।

কাঁদছে বেন কে!



যজ্ঞি বাড়ির ব্যাপার

—অপলবুড়ো

এক মাস আগে থেকে সোরগোল উঠেছে বাড়িতে। চল্লিশো'র গায়ের জমিদারের একমাত্র কন্যা কল্যাণীয়া কুতুহলীর বিষে।

তা একটু সাড়া জাগবে নৈকি।

যে পুকুরে কোনো দিন ঢেউ ওঠে না—সেখানেও যদি কোনো ঢল, খেল তিল ছোঁড়ে তবে একটা বুকের তরঙ্গ জাগে। আর এই নিম্নরঙ্গ চল্লিশো'র গায়ের জমিদারের মেয়ের বিষেতে যদি কোলাহলই না উঠে, দুটে-দুটি করে কাজ দেখাতে গিয়ে যদি দশ-বিশটা মানুষ অজাডই না খেল, তবে আর নিয়ে বাড়ি কী?

জমিদার বাড়ির দুই কর্মকর্তা—ছত্রধারণ আর গর্তখোঁড়নবাবু। ছত্রধারণ হচ্ছেন রাজকারের বাজার সরকার। কিন্তু বাড়িতে বৃহৎ কর্ম তলে গর্তখোঁড়নবাবুর ডাক পড়ে! সঙ্গে সঙ্গে ছত্রধারণবাবুর যুখখানি টাড়িপানা হয়ে ওঠে। সারা বছর ধরে তিনি বাজার সরকারি করবেন, আর যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার চলেই গর্তখোঁড়নবাবু এসে তাঁর পাওনা-গণ্ডায় ভাগ বসাবেন—এই বা কেনন কথা?

তবু হুতধারণবাবু মুখ ফুটে জমিদারবাবুর কাছে আপত্তি জানানতে পারেন না, কারণ গর্তগোড়নবাবুর সঙ্গে জমিদার গিন্নীর লতায়-পাতায় কি একটা সম্পর্ক যেন রয়েছে। সামান্য প্রতিবাদ করতে গিয়ে কি এ-বাড়ি থেকে চাঁচি-বাচি তুলতে হবে? তার চাইতে ভাগাভাগি করে পাওয়াই ভালো।

একমাস আগে থেকে কেবলি ফর্দ করা হচ্ছে, আর ছিড়ে ফেলা হচ্ছে। কর্মকর্তাদের মতের মতো হচ্ছে না কিছুতেই।

হুতধারণবাবু ইতিমধ্যেই একদল উড়ে বামনকে হাত করে ফেলেছেন। তাদের নিয়ে গুজ-গুজ সূত্র-সূত্র চলছেই দিন রাত। মসলাপাতির যে ফর্দ শেষ পর্যন্ত তৈরী হল—তাতে হুতধারণবাবুর বেশ মোটা মুনাফা থাকবে। অবশ্য উড়ে বামনদেরও বেশ কিছুটা শুলী রাখতে হল। নৈলে তারা ফর্দটা মনোমত বাড়িয়ে পেশ করবে কেন?

গর্তগোড়নবাবু কাজেই তাড়াহাড়ি আসরে নেমে পড়েছেন। তিনি যেতে উঠেছেন দৈ আর মিষ্টি হিসেব নিয়ে। স্বয়ং জমিদার গিন্নীর আকীয হয়েও যদি এই বিয়েতে কিছু গুচ্ছিয়ে নিতে না পারেন, তবে তাঁর জীবন ধারণের কি প্রয়োজন? বাড়ির লোকজনও যে তখন তাঁর গায়ে থু থু দেবে।

অতি সহজেই গমলাদের হাত করে ফেললেন গর্তগোড়নবাবু। তিনি দলের যোড়লকে ভেকে বললেন, দেখ হে ঘোষের পো, জমিদারবাবুর সামনে আমি তোমায় খাসা-দৈয়ের বামনা দেবো। কিন্তু আসলে বলা বইল—তুমি দুর্গা দৈ—মানে জলো দৈ দিয়ে হিসেব বুঝিয়ে দেবে। অবশ্য প্রত্যেক হাড়ির ওপরটা যেন বেশ জমাটি থাকে। ভেতরে তুমি ঘে কামড়াই করো না কেন কেউ ত' আর ডুব দিয়ে দেখতে আসছে না! আর একটা ব্যাপারে খুব সাবধান করে দিচ্ছি। ওই হুতধারণবাবু যেন কিছুটা জানতে না পারে! হাজার হোক—ও হচ্ছে বাজার সরকার, আর আমি জমিদার গিন্নীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। যাকে বলে—একেবারে রক্তের সম্বন্ধ।

গর্তগোড়নবাবুর সব কথা শুনে ঘোষের পোর সবগুলি ঠাঁত একসঙ্গে বেরিয়ে গেল।

সে জবাব হিলে, বাবু, আপনি পায়ের ওপর পা রেখে আরাম করুন গে। এসব কাজে আমাদের হাত-যশ আছে। তিন পুরুষ ধরে আমরা এই কাজ করে আসছি। বললে বিখেস করবেন না বাবু, আমার ঠাকুর্দা (বুড়ো দাদা গেছে, তাই হাত তুলে গমলায় পো প্রণাম জানালে) হাতে ধরে শিখিয়ে গেছে—কি করে ওপরটা খাসা, আর তলাটা জলো দৈ করা যায়।

এইবার গর্তগোড়নবাবু অনেকটা স্বস্তির নিখাস কেলে বাঁচলেন। হুতধারণ-

দেব দেউল

২২১

বার কিছু কিছু সরাবে। তা সরাব। এসব যজ্ঞবাড়ির ব্যাপার। একটুখানেক আলগা না করলে চলে ?

ক্রমশঃ দিন এগিয়ে আসতে লাগলো। ছত্রধারণবাবু যদি হয়নি হৈরার ব্যাপারে আকরার বাড়ি আনাগোনা শুরু করেন, তবে গর্তপৌড়নবাবু হাড়পাউ জমিদার গিন্নীর অনুরোধ নিয়ে সরাসরি কলকাতায় চলে যান—এর কনের দাঁত, কান, জোতা, শাড়ি-ব্লাউজ ইত্যাদি পছন্দ করে আনবার জোগে।

এইভাবে বাজার করার একটা প্রতিযোগিতা মেন জন্মে ওঠে

আর কেনাকাটার ছাফায়াই কি কম ?

একদিকে ঘি-ময়দা, চাল ডাল থেকে শুরু করে হাড়পাউর বদল, তপস্বীদিক দৈ-মিষ্টি, ক্ষীর, ছানা থেকে আরম্ভ করে মাছ মাংসের ব্যবস্থা বরাবর বদল।

নাচের জোগে অবশি ভাবনা নেই। জমিদার বাড়িতে দুটো পুরু

একটা সদরের দাঁধি, আর একটা খিড়কি পুকুর। দুটো গোট প্রায় মাছ কিলবিল করছে। জাল নিয়ে জেলেরা নেমে পড়লেই জল মাংসের ব্যবস্থা করেছেন ছত্রধারণবাবু। তাঁর মাস আগে থেকে এক পাল পাঁচ জমিদার বাড়ির বাইরের ময়দানে ঘাস খাচ্ছে আর গায়ে-গতরে পুকুরে হুয়ে উঠছে। গায়ে শুকু লোক তাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকায় আর আপনমনে 'জিব চাবি' শব্দের 'শিরোমণি মশাই ত' একদিন আনন্দের আতিশয়ো ছড়াই কেটে বসলেন :

ক'চি পাঁচ

তুক মেঘ—

দধির অগ্র

ঘোলের শেষ—

এই ব্যবস্থা থাকলেই বলব, প্রকৃত ভূরিভোজনের আয়োজন করা হয়েছে।

গর্তপৌড়নবাবু পানের ছোপ-লাগানো হাতগুলি বের করে ছোপে ছোপে শব্দে হেসে ওঠেন। বলেন, সব হবে শিরোমণি মশাই, আয়োজনের কোনো ত্রুটি থাকবে না ! নইলে এ শর্মা রয়েছে কি করতে ?

ছত্রধারণবাবু দেখলেন, এ সময়ে তার কিছু না বললে ভালো দেখায় না। তাই তিনি আঙুল বাড়িয়ে চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন, পোলাওয়ের জোগে সে চাল আনা হয়েছে—হাত দিয়ে বুঝবেন, যেন দুস্তার দানা।

—আবার পোলাওয়ের ব্যবস্থাও করেছে নাকি ছে ? তুক চরগোবিন্দ খোমের চোখ দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। ডানহাতের অ'গুলটা আকড়ে ধরে তার নাভনী

দেব দেউল

পুটি দাঁড়িয়ে ছিল। সে জিজ্ঞেস করলো, দাদু, পোলাও কি? হরগোবিন্দ পুলকিত হয়ে একেবারে উচ্চাঙ্গ প্রকাশ করে ফেললেন।

পুটির নাকটা নেড়ে দিয়ে বললেন, খাবি রে, খাবি। সে একেবারে খিচপুচপ্, ব্যাপার। পোলাও হচ্ছে—হালুয়ার ঠা কুর্দা,—বুঝলি?

পুটি কি বুঝল সেই জানে। তবে ঘন ঘন তার ছোট মাথাটি দোলাতে লাগলো।



ধমক খেয়ে বাসীর আল গকে মাহের বড় বড় টুকরোগুলো ছড়িয়ে পড়লো। [পৃষ্ঠা ২২৩]

কাটল ধরেছে। মাতঙ্গী বহুদিনের রি। কাজেই তার কাজকর্মগুলিও পরিষ্কার। সেই কাটলগুলির ভেতর বড় বড় মাহের টুকরোগুলি পুরে

অবশেষে বিয়ের দিন এসে উপস্থিত হল। দুটি পুকুরেই জাল ফেলেছে জেলের দল।

বড়-ছোটো, মাঝা রি—না না জাতের মাছ উঠছে। যেগুলো নেহাতই ছোট সেগুলোকে আবার পুকুরে ফেলে দেয়া হচ্ছে। ছত্রধারণ-বাবু ও গর্তখোঁড়নবাবুর আর ছুটোছুটির অন্ত নেই।

এ যদি একটা মাছ সরান ত' অপরজন তিনটি মাছ বাড়ির বাইরে পাচার করে দেন।

মাতঙ্গী কি—সব মাছ কোটাকুটির পর ঝালুইতে পুরে পুকুরে গিয়েছিল সেই মাছগুলি বুতে।

পুরোনো ভাঙা ইট বাঁধানো ঘাট। তারই কোকরে কোকরে

● বজ্রিবাড়ির ব্যাপার
বপনবুড়ো।

দেব দেউল

২২৩

বেখে, মাছ ধোয়ার কাজ শেষ করে, পান চিবুতে চিবুতে অন্যদিকে এসে হাজির হল।

খানিক বাদেই মাতুলীর ছোট মেয়ে দাসী—আগের থেকে লম্বা—মুণ্ড—সখা ঘাটের কাটল থেকে মাছের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে কাপড়ের ওলোয় লুকিয়ে রওনা হয়েছে—একেবারে পড়বি তা পড় ছেদধারণবাবুর সামনে।

ছেদধারণবাবু ভংকার দিয়ে বললেন, এই দাসী তোর আঁচলের ওলোয় কুড়িয়ে কি রে?

দাসী কীদো কীদো হয়ে জবাব দিলে, আঁচর ও কিছু না। খাতল থেকে কাপড় ধুয়ে চলেছি কিনা—

—তা ' কাপড় ধুয়ে চলেছিস। বের কর ওর ছেতর'ক আছে—

ধমক খেয়ে দাসী আঁচলটা ছেড়ে দিতেই পড় পড় মাছের টুকরোগুলো ওর পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল।

ছেদধারণবাবুর হৃদিতালি তখন দেখে কে—‘—এ’ দিকটা ন। দখলের—একেবারে পুকুরচুরি হয়ে যাবে! ভাগিস আমি এ সময়টা এসে পড়েছিলাম।

সেদিন ছেদধারণবাবুর মুখের সামনে দাঁড়ায় সাধি কার?

গর্তগোড়নবাবু দেখলেন, সবকিছু বাহবা একা ছেদধারণবাবুর পেয়ে গাচ্ছিল; তিনি একটা কিছু না করলে আর মান-মরাদা থাকে না। তত্ব তিনি তাকে তাকে রইলেন।

হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, উড়ে বামুনরা গাড়ি নিয়ে কুমারগুপ্ত পারখানার দিকে ছুটেছে। সবাইকারই পেট খারাপ চল নাকি একদিনে? না, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।

ঘাপটি মেয়ে রইলেন একটা কোপের আড়ালে। যেই আর একটা উড়ে বামুন গাড়ি নিয়ে ছুটেছে দেখতে পেলেন, অমনি বাধের মতো পেছন থেকে লাফিয়ে পড়লেন গর্তগোড়নবাবু।

উড়ে বামুনটিও এই অতর্কিত আক্রমণের জগে প্রস্তুত ছিল না। বাবু—বাবু করে ধমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

—কি আছে তোর ওই গাড়ুর ভেতর দাঁখি?

বামুনটা কিছুতেই গাড়িটা হাত-ছাড় করতে চায় না। তখন হঠাৎ এগিয়ে এসে ওর হাত থেকে গাড়িটা ঠ্যাচকা টানে সরিয়ে নিতেই দেখা গেল—গাড়ি ভটি খাঁটি গাওয়া ঘি। খানিকটা ঘি ছলকে পড়েছে মাটির ওপর। দিলিা ভুরভুরে গন্ধ।

দেব দেউল

—ত' ! এতভাবে ঘি পাচার করছ বাইরে ? আমি দেখে নেবো সব ব্যাটাকে, কাউকে ছাড়বো না। দারোগাবাবু আসবেন নেমন্তন্ন খেতে। সবাইকে হাতকড়া লাগিয়ে থানায় চালাব যদি না দিমেছি ত' আমার গর্তগোড়ন নামটা গঙ্গার জলে বিসর্জন দেবো।



হাউমাউ করে তখন বামুন ঠাকুর গর্তগোড়নবাবুর পায়ে পড়তে পথ পাশ্চাত্য।

বললে, আমিই প্রাণে মারলেন না বাবু। আমার কে'নো দোষ নেই। ওই চব্বারগাবুই ত' আমাদের সব শিখিয়ে দিলেন। তিন চারটে গাড়ি ও নিজের ভাড়ার ঘর থেকে বের করে দিলেন। নইলে কি আমরা সাহস পাই ? বললেন, দশ আনা ছয় আনা বখরা।

গর্তগোড়নবাবু উত্তেজিত হয়ে উত্তর করলেন,—ত' ! দশ আনা ছয় আনা বখরা !

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, আমি মিছে কথা কইচি না। গুর দশ আনা আর আমাদের ছ' আনা।

—ত' ! দেখাচ্ছি মজাটা !

চোখ দুটিকে একবার নাচিয়ে নিয়ে চটিজুতো ফুটফুট করতে করতে গর্তগোড়ন চলে গেলেন আর এক দিকে !

'ত' ! দশ আনা ছয় আনা বখরা—দেখাচ্ছি মজাটা !'

একটু বেশী লগে বিয়ে।

তাই গ্রামের লোককে আগে খাইয়ে দেয়া হচ্ছে। বয়স্কীর দল বায়না বরেকে—
বিয়ে না দেখে কেউ পাতে বসবে না।

- হজিবাড়ির বাগার
বপনবুড়ো।

দেব দেউল

২২৫

আচ্ছা, তাই হবে! বরযাত্রী নয় ত'—এক একটি ক্ষুদে দিল্লীর বাপস! এদের কথা খসাতে-না-খসাতে সব জিনিস এনে হাজির করতে হয়।

চায়ের পরেই খোলার সরবত? আচ্ছা, তাই সই।

কাজেই সন্ধ্যার পর বরযাত্রীদের একটা মোটা রকম জলখাবারের ব্যবস্থা করতে হবে।

গায়ের ছেলেরা সকল রকম পরিবেশনের ভার নিয়েছে।

হঠাৎ দেখা গেল,—একটা বড় পেতলের বালতি ভর্তি লেডিকেনি নিয়ে একটি ছেলে খিড়কির পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। ছত্রধারণবাবু অমনি থপ্ করে তার হাত ধরে ফেলেছেন!

চোরেরাই চুরির ব্যাপারের হদিস রাখে বেশী।

ছত্রধারণবাবু চোখ গরম করে জিজ্ঞেস করলেন, এত বড় পেতলের বালতিটা নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল শুনি?

ছেলেটা সঙ্গে সঙ্গে ভায়া করে কঁদে ফেললে। বললে, আমার কোনো দোষ নেই ছত্রদা। কাল শিরোমণি ঠাকুরের বাপের বাধিকী। আমার হাতে ধরে বললেন, তিলু, তোরাই ত' বাবা বরযাত্রীদের পরিবেশন করবি। এক ফাকে এক বালতি লেডিকেনি আমার বাড়িতে ফেলে দিয়ে যাস—কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না।

কৌসু করে উঠলেন ছত্রধারণবাবু। ত' কাক-পক্ষীতেও জানতে পারবে না! কিন্তু এদিকে যে শিকারী বাজপাখি বসে আছে—শিরোমণি মশাই বুঝি তার সন্ধান রাখেন না? এতগুলো লেডিকেনি, আর সেই সঙ্গে পেতলের বালতিটা অবধি হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল! কী সর্বনেশে ঠাকুর রে বাবা! চুরির মিষ্টি দিয়ে বাপের বাধিকী! বাপের জন্মে কখনো এমন কথা শুনিনি!

এইবার বরযাত্রীদের ষাওয়ানোর পালা। একটি বড় হলধরে ভালো আসন পেতে জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। জমিদার বাড়িতে কাপেটের আসনের অভাব নেই। নানারকম নক্সা-করা সুন্দর সুন্দর আসন, আর সেই সঙ্গে নতুন কঙ্ককে থালা-গেলাস-বাটি। তার ওপর ঝাড়-লগনের আলো এসে পড়েছে। দিকমিল করছে নয়া বাসনগুলি।

প্রথমে গরম পোলাও পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রস্তাব ছিল—প্রতিটি পাতের সামনে একটি করে রুইনাচের মুড়ো দেওয়া হবে।

● হজিবাড়ির ব্যাপার
বপনবুড়ো

থালয় হাত দিয়েই বরযাত্রীর দল এদিক-ওদিক তাকায়। সব কিছু পাতে
সামনে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে—কিন্তু সেই বহুআকাঙ্ক্ষিত মাছের মুড়ো কোথায়?

হঠাৎ একজন তরুণ বরযাত্রী বলে উঠল, মাছের মুড়োগুলো কি আবার পুকুরের
জলে পালিয়ে গেল ছত্রধারণবাবু?

সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন উঠল—এপাশে-ওপাশে।

একজন গোঁফওয়ালা বয়স্ক ব্যক্তি চিৎকার করে উঠলেন, উঠে পড় হে সবাই
মাছের মুড়ো যখন পুকুরে পালিয়ে গেছে তখন পোলাওয়ার পিণ্ডও আঁস্তাকুড়ে।
যাক্।

হাঁ—হাঁ করে এগিয়ে এলেন গর্ভখোঁড়নবাবু। বললেন, আপনারা উঠবেন
না—উঠবেন না। যে গামলাতে মাছের মুড়োগুলো আঁলাদা করে রাখা ছিল সেটিকে
আজ দুপুর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাই এই বিপত্তি। আসছে কাল বর
ভোজনের সময় আমরা এ ক্রটি সংশোধন করবো।

কিন্তু তখন কার কথা কে শোনে! জলের গলাস উল্টে, পাতা মাড়িয়ে, পোলাও
ছিটিয়ে বরযাত্রীর দল দক্ষযজ্ঞ শুরু করে দিলে।

বরকর্তা এগিয়ে এসে বললেন, আমি আমার ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো—

তখন বরযাত্রী ও কণ্ঠযাত্রীর মধ্যে যে কোলাহল শুরু হল তাতে কান পাতে
কার সাধি।

শিরোমণি মশায় একটিপ নশ্টি নিয়ে বললেন, বৃহৎ কর্মে এরকম হয়েই থাকে
হে ভায়ো! একি তোমার-আমার বাড়ির বিয়ে! যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপারই আলাদা!

কুমা হি সর্বরোপাং ব্যাধিঃ জেষ্ঠমঃ দ্যুতঃ।

স চারোপ লোপেব নব্বতীহ ন সংপদঃ।

—শৈব-সংহিতা

মণি ও মুক্তা



পৃথিবীতে যত ব্যাধি আছে, তার মধ্যে
কুমাই হলো সবচেয়ে বড় ব্যাধি। এবং এই
ব্যাধির একমাত্র ঔষধ হলো, জর। অর্থাৎ
কুমা নিরস্তির অস্ত্রেই থাকে, কুমাটীন অবস্থার
থাকে না।



—ঐতিহাসিক চিত্র—

সিপাহী বিদ্রোহের যুগ। বারাকপুরে যে আশ্রয় জুটছিল, তাইই স্কুলটি ছড়িয়ে পড়েছিল সারা ভারতে। নির্মম হস্তে বিদ্রোহ সমন্বিত করত ইংরাজরা এসে পড়লো মধ্যভারতে। ইংরাজ বাহিনী কাশী আক্রমণ করলো। কাশীর উপর লোভ ছিল তাদের অনেকদিনের, এখন অজুহাত পাওয়া গেল—বললো—কাশীর রানী বিদ্রোহী সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন।

রানী লক্ষ্মীবাই দুর্গ রক্ষার জন্য তৈরি হলেন, বললেন, মেয়ী কাশী দুঃখ। নেহি! ইংরাজ বাহিনী বার বার দুর্গ আক্রমণ করলো, কিন্তু প্রতিবারেই ব্যর্থ হয়ে তাদের হটে আসতে হলো। কাশীর দুর্ভেদ্য দুর্গ ইংরাজদের সমস্ত যুদ্ধ-কৌশল ব্যর্থ করে দিল। ইংরাজরা এবার অস্ত্র সুর্যোগের সন্ধান করতে লাগলো। বিশ্বাসঘাতক চাই। অর্থের লোভে যে দুর্গের দ্বার খুলে দেবে। পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে ইংরাজ অনেক ব্যাপারে এই ধরনের বিশ্বাসঘাতক সংগ্রহ করেছে এবং কার্গোকারও করেছে। এবারও তাই চাই! দিকে দিকে ইংরাজের চর ঘুরছে বিশ্বাসঘাতকের সন্ধানে।

এদিকে দিন যায়। মধ্যভারতের গ্রীষ্মকাল দুঃসহ। রাতের অনেক সময়

দেব দেউল

এমন থমথমে হয়ে থাকে যে ঘুমোনো যায় না। কাপটেন জনসন সময় সময় তাঁবুর বাইরে এসে ক্যাম্পচেয়ারে বসে রাত কাটিয়ে দেন। এখানকার লড়াইটা তাড়াতাড়ি শেষ হলে হয়। এতো দূর দেশে এতো কষ্ট করে আর তিনি চাকরি করতে পারছেন না। ইস্তফা দিয়ে চলে যাবেন। নেহাত লেখাপড়া শিখতে পারলেন না বলে, কোঁকের মুখে এত দূর দেশে চাকরি নিয়ে চলে এলেন, কিন্তু এখানকার আবহাওয়া সহ্য করা সহজ নয়। তিনি চলে যাবেন।



তাঁবুর বাইরে জনসন ক্যাম্পচেয়ারে বসে ছিলেন, চোখ বুঁজেই বসে ছিলেন। চোখে ঘুম নেই, তবু রাতের অন্ধকারে চোখ চেয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না। সহসা প্রহরীর হাঁক শুনে তিনি চোখ মেললেন।

—জুমদার!

—হা বি ল দা র
পিয়ারেলাল!

চাঁদে র আলোয় দেখা গেল মাঠের উপর দিয়ে দু'টি মানুষের ছায়া এগিয়ে আসছে। জনসন একটু নড়েচড়ে সজাগ হয়ে বসলেন।

লোক দু'টি বরাবর তাঁরই সাধনে এসে ঝাঁড়ালো।

—সেলাম সা'ব!

—কে, পিয়ারে-
লাল? কি খবর?

হরালদাধ শাস্তকর্মে বললো—কিয়ার হয়েছিল। গুলে বেবো। [পৃষ্ঠা ২২৯

—জরুরী খবর সা'ব। ঐকে সঙ্গে এনেছি। ইনি রানী লক্ষ্মীবাসীর

দেব দেউল

২২২

পূজারী দয়ালরাম। দশ হাজার রুপেয়া 'ইনাম' পেলে ইনি 'কান' কতে করতে পারেন।

—দশ হাজার!

জনসন পিয়ারেলালের সঙ্গীর আপাদমস্তক একবার দেখে নিলেন। তাঁদের আলোয় যেটুকু দেখা যায় তাতে মানুষটি জোয়ান ও বলিষ্ঠ বলেই মনে হয়। কোন ভূমিকা না করেই জনসন তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি টুঁমি করলে?

দয়ালরাম শান্ত কণ্ঠে বললো—কিন্নার দরোয়াজা পুলে দেবো।

—টারপর?

—তারপর যা করতে হয়, আপনারা করবেন।

—টাকা কখন দিটে হবে?

—টাকা আগে চাই।

—এ বাপারে আগে টাকা দেবো কেন? টাকা নিয়ে পালিয়ে গেলে কি করবো?

—কাজ শেষ হবার পরে যদি আপনারা টাকা না দেন, তেঁা আমি কি করবো?

—কাজ না হলে টো টাকা লুকসান হইয়ে যাইবে।

—তাই যদি মনে কর সাহেব, টাকা দিও না, কাজ হবে না।

—টাকা দেবো, কাজও চাই। টুঁমি পাঁচ হাজার টাকা আগে নাও পরে পাঁচ হাজার নেবে।

—পরে ভূমি আমাকে চিনতে পারবে না সাহেব।

—হামি চিনি আর না চিনি টাটে কি চইবে, আমি টোমাকে ভাললি লিখে দেবে। কোম্পানির যে আপিসে যাবে, ডলিল দেখাবে, টাকা পাবে। পিয়ারেলাল জামিন রইল। মরদ কি বাট্ হাটিক দাঁট। হামি না চিনবে কিন্তু পিয়ারেলাল টো চিনবে!

পিয়ারেলাল মধ্যস্থ হলো, জনসন ও দয়ালরামের সঙ্গে নিম্নস্বরে কিছুকণ কথাবার্তা হলো। তারপর জনসন দয়ালরামকে বিদায় দিল, বললো—কাল সন্ধ্যার পরে এসে পাঁচ হাজার রুপেয়া নিয়ে যেও।

পরদিন ইংরাজ বাহিনী পূর্ণোজ্জবে কাসী দুর্গের উপর চড়াও হলো। তৃতীয় সংগ্রাম শুরু হয়ে গেল। তার উপর চললো দু'পক্ষের অবিশ্রান্ত গোলাবর্ষণ। তৃতীয় দিন রাত্রে ব্রিটিশ বাহিনী কেল্লার উপর চড়াও হলো। অত্যধিক গোলমাল হৈ-চৈয়ের

● পুরাণো বহু

শ্রীকৃষ্ণলাল বসু

মধ্যে কোন এক সময় দয়ালরাম কেল্লার দরজা খুলে দিল। কি করে কি হলো ঠিক বোঝা গেল না, জলপ্রোত্তের মত তেলেঙ্গা সেনা এসে ঢুকলো কেল্লার মধ্যে। হাভাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গেল। তুঘল বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। রানী দেখলেন কেল্লা আর রক্ষা করা যাবে না। নিরুপায় হয়ে রানী পোদ্দুপুত্র দামোদরকে পিঠে বেঁধে নিলেন, তারপর উত্তর দিকের প্রাচীর ডিঙিয়ে বিশ্বস্ত পাঠান সেনাদের সাহায্যে কাঁসী দুর্গ ছেড়ে চলে গেলেন। কাঁসীর বাসিন্দাদের কাছে সে এক মহাদুর্যোগের রাত্রি। নগরের পথে পথে লড়াই হলো, প্রতিটি গৃহের প্রতিটি বাসিন্দা, শিশু ও বৃদ্ধ খুন হলো, প্রতিটি গৃহ লুণ্ঠিত হলো, প্রতিটি গৃহে আগুন লাগানো হলো। কাঁসীর আকাশ সেদিন আগুনে আগুনে লাল হয়ে গেল।

দয়ালরাম ইংরাজ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রত্যাষে জনসনের কাছে এসে বললো—আমার যাবার একটু ব্যবস্থা করে দাও, আমি যাই।

জনসন জিজ্ঞাসা করলেন—বাকি পাঁচ হাজার নেবে না ?

—তোমাদের হাত-চিঠি সঙ্গে নিলাম সাহেব, পরে তোমাদের কোন কুঠি থেকে টাকাটা নিয়ে নেবো।

—বেশ, চল, আমিই তোমাকে তোরণ অবধি এগিয়ে দিয়ে আসছি।

—ভূমি নিজে কেন যাবে সাহেব, একজন সিপাহীকে লুকুম দাও—

—ঠিক আছে, চল।

জনসন নিজেই দয়ালরামের সঙ্গে অগ্রসর হলেন।

নগরে তখন লুণ্ঠরাজ ও হৈ হৈ হচ্ছে। নগরী পিছনে রেখে জনসন দয়ালরামকে তোরণ পার করে দিলেন। ঢালু টিলা থেকে নেমেই সামনে উন্মুক্ত প্রান্তর—খোঁড়া ছুটিয়ে চলে যাওয়া শুখ। সাহেব বললেন—টুমি কোন্ দিকে যাবে ?

—বেনারস।

—সে তো অনেক পট। এটো টাকা সঙ্গে নিয়ে টুমি একা বেনারস যেতে পারবে ?

—এ পথ আমার জানা, সাহেব, ভূমি ভেবে না।

—তোমার কটা আমি ভাবছি না, আমি ভাবছি টাকার কটা।

—আমি থাকলে আমার টাকাও থাকবে।

—টুমি টাকাগুলো আমার কাছে রেখে যাও, পরে আমি পাঠিয়ে দেবো। নাহলে চৌমার বিপদ হবে।

—ঠিক আছে সাহেব।

দেয় দেউল

২৩১

—না না, টোমাকে বিপদের মাঝে আমি ছেড়ে দিতে পারি না। টাকাগুলো
টুমি রেখে যাও।

—সে কি সাহেব?

—সেই কটা বলটেই আমি টোমার সঙ্গে এটো দূর এসেছি।

—না সাহেব না, টাকা আমি কারও কাছে রাখবো না।

—আমি ভাল কটা বলছি।

—না সাহেব, না।

—সব না রাখো, অর্ধেক
রেখে যাও।

—না, না সাহেব!

দয়ালরাম আর দাঁড়ালো
না, তীরের মত বোড়া ছুটিয়ে
দিল।

জনসনও প্রস্তুত ছিলেন,
কোমর থেকে রিভলভার টেনে
নিয়ে ছন্দ করে এক গুলি করে
বসলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য। বোড়ার
পিঠ থেকে দয়ালরাম ঘুরে পড়ে
গেল। সাহেব এগিয়ে এসে
বোড়ার জিনের নীচে থেকে
একটা খলি বের করে নিলেন।
খলিটা মোহরে ভরা ছিল।
দয়ালরামের পাগড়ির ভিতর
থেকে পাঁচ হাজার টাকার
হাত-চিঠিটাও জনসন বের করে নিলেন। তারপর সাহেব কিরে এলেন ঠাবুতে।



জনসন রিভলভার টেনে
নিয়ে ছন্দ করে এক গুলি
করে বসলেন।

লড়াই শেষ হলো। নগর লুণ্ঠন শেষ হলো। ব্যাপক হত্যাকাণ্ড শেষ
হলো। মধ্যভারতের সমৃদ্ধ নগরী কান্দী শাসন হয়ে গেল। ব্রিটিশ বাহিনী লাখ
লাখ টাকা লুণ্ঠ করে বিজয়ীর আনন্দপ্রসাদে কয়েকদিন বিশ্রাম করলো। ইতিমধ্যে
সংবাদ এলো পলাতক রানী লক্ষ্মীবাই তাঁতিয়া টোপি ও নানাসাহেবের সঙ্গে

● পৃথগো বহু
প্রিয়ব্রজলাল ধর

মিলেছেন। তাঁরা গোয়ালিয়র দুর্গ দখল করে বসেছেন। গোয়ালিয়রের রাজা পালিয়ে গেছেন। ব্রিটিশ বাহিনী ছুটলো গোয়ালিয়রের পথে। ক্যাপটেন জনসনের উপর ঝাঁসী দুর্গের ভার রইল। জনসন নিজের কৃতিত্বে তখন মশগুল। এবার ভাগ্যদেবী তাঁর উপর প্রসন্ন হয়েছেন। দয়ালরামের নগদ দশ হাজার টাকা তাঁর হাতে এসেছে, আর তারই সঙ্গে পেয়েছেন রানীর একটি কণ্ঠহার। এক তেলেক্সা কোথ। হতে কণ্ঠহারটি সংগ্রহ করেছিল, জনসন দেখতে পেয়ে কেড়ে নিয়েছেন, সাতটি হীরে বসানো আছে সেই কণ্ঠহারে। এগুলো নিয়ে এখন কোনরকমে বিলাতে ফিরে যেতে পারলে হয়। জনসনের মন বেশ প্রফুল্ল।

সেদিন তুমুল ঝুটি হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর খবর এলো কেল্লার অদূরে টিলার মাথায় যে কামানটি আছে, সেটা বসে গেছে, হেলে পড়েছে। ওই কামানটিই এদিকের ভরসা। জনসন তখনই বেরিয়ে পড়লেন কামানটি সম্পর্কে তদারক করতে।

কামানটি ঠিক জায়গায় সরিয়ে এনে ঠিকমত বসাতে দু'ঘণ্টা সময় গেল। তখনও কিম্বিক করে ঝুটি পড়ছে। টিলা থেকে যখন জনসন নেমে এলেন, তখন তাঁর সর্বাত্মক ভিজ্ঞে গেছে। জনসন তাড়াতাড়ি কেল্লার দিকে পা চালালেন।

তোরণের সামনে এসে জনসন থমকে দাঁড়ালেন। কে একজন পথের মাকে ধাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলেন—কে?

জবাব হলো—পুরাণো বন্ধু!

—পুরাণো বন্ডো! কে বন্ডো?

—বন্ধু দয়ালরাম।

—দয়ালরাম!

—ঝাঁসীর কেল্লার দয়ালরাম।

জনসন চমকে উঠলেন, বললেন—দয়ালরাম তো মরে গেছে।

—তুমি তাকে গুলি করে মেরেছ। আমি সেই দয়ালরাম।

মরা মানুষ আবার ফিরে আসে নাকি? সাহেব তো থ'! তখনই নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—কি চাই তোমার?

—আমার টাকাগুলো ফেরত চাই।

—তুমি তো মরে গেছ, টাকা নিয়ে তুমি এখন কি করবে?

—বাই করি, আমার টাকা ফেরত দাও।

জনসন মনে করলেন, এ কোন দুই লোকের চালাকি। তাই তিনি বললেন—

● পুরাণো বন্ধু

ঐক্যবদ্ধবাহিনী





দেব দেউল

২৩৩

টাকা কি আমি সঙ্গে নিয়ে ঘুরছি যে চাইবে আর দিয়ে দেবে? আমার বাড়িতে এসো, দেবো।

—বেশ, তাই যাবো।

চকিতে মানুষটা রুটির জলের সঙ্গে মিশে গেল যেন। জনসন সামনে আর কাউকে দেখতে পেলেন না। তবে তিনি এতক্ষণ কথা বললেন কার সঙ্গে? একবার আগে জনসন কিছু দেশী মদ খেয়ে বেরিয়েছিলেন, মদের নেশাটা কি তাহলে এখন জমে উঠলো নাকি? এটা কি তাহলে সেই নেশার আবেগ? কিন্তু এমন ছবার তো কথা নয়, মদ তো তিনি আজ নতুন করে খাচ্ছেন না। কিন্তু এরকম ঘটনা তো কখনও ঘটেনি। চোখের সামনে মানুষ কথা বলে আবার মিলিয়ে গেল।

জনসন ভালো করে চারপাশে তাকালেন। প্রশস্ত পথ কেন্দ্রার ফটক অবধি চলে গেছে। একপাশে কেন্দ্রার প্রাচীর আর-এক পাশে ঢালু পাহাড় নেমে গেছে, এখানে কারও তো লুকিয়ে থাকার স্থান নেই। তার উপর আবার দুত দয়ালরাম এলো কোথা থেকে? মরা মানুষ কি আবার ফিরে আসে নাকি? বাপারটো কি রকম হলো? জনসন চিন্তিত মুখে এসে ঢুকলেন কেন্দ্রার মধ্যে।

কেন্দ্রার উত্তর দিকের শেষপ্রান্তে প্রাচীরের পাশেই একখানি ঘর। কয়েকটি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে তবে এই ঘরখানি। সিঁড়ির দরজাতেই একজন রকী পাহারা দিচ্ছিল, জনসনকে দেখেই সেলাম দিল।

জনসন হরিতপদে সিঁড়িগুলি অতিক্রম করে ধরে এসে ঢুকলেন। ঢুকেই চমকে উঠলেন। ঘরের মধ্যে একখানি কুসির উপর কে বসে আছে?

—সেলাম সাহেব।

—কে?

—চিনতে পারছেন না সাহেব, আমি আপনার পুরাণো বন্ধু দয়ালরাম।

—দয়ালরাম!—জনসন ভালো করে সামনের পানে তাকালেন, লষ্ঠনের আলোয় দেখতে পেলেন সত্যিই একজন মানুষ কুসির উপর বসে আছে। তবু সচস করে জনসন বললেন—দয়ালরাম তো মরে গেছে।

—মরে গেছে! ঠাঁ—মরে গিয়েও শাস্তি নাই, টাকা দাও চলে যাই।

দয়ালরাম হাতখানি বাড়িয়ে দেয় জনসনের দিকে। জনসন সেই হাতের পানে তাকিয়ে চমকে ওঠেন। হাতের কোথাও এতটুকু মাস নেই, একখানি কঙ্গাল। জনসন ভাড়াভাড়ি পিছিয়ে আসেন।

জনসন যত পিছিয়ে যান, হাতখানি ততো এগিয়ে আসে।

দেব দেউল

দেখতে দেখতে জনসন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে দাঁড়ালেন একেবারে সিঁড়ির কিনারায়। হাতখানি তখনও এগিয়ে আসছে। এবার জনসন আর এক পা পিছু হটে গিয়ে হুড়ুড় করে পড়ে গেলেন সিঁড়ির নীচে। আর উঠলেন না।

সাক্ষী ছুটে এলো—কি হলো।

সাক্ষীর সাড়া পেয়ে ছুটে এলো আরো কয়েকজন।

কেল্লার সিঁড়ির পাশে কোন রেলিং নেই, দশ-বারোটা সিঁড়ি উপকে জনসন একেবারে নীচে এসে পড়েছিলেন। মাথাটা খেঁতলে গিয়েছিল।

সকালে জনসনের দেহকে কবর দেওয়া হলো।

সেই থেকে প্রতিবাত্রেই কেল্লার সেই ঘরুটায় কিসের যেন একটা গোলমাল শোনা যেত। বাইরে যে সাক্ষী পাহারা দিত, তারা উঁকি মেরে দেখেছে, কিন্তু কিছুই দেখতে পায়নি। এই ঘরখানি সম্পর্কে সিপাহীদের মধ্যে কানাঘুষো শুরু হলো। ঘরখানি খালি পড়ে রইল অনেকদিন। শেষে সেটি বারুদখানা করে দেওয়া হলো।



আনন্দের কথা

জেনু আরার (সার্লটী ব্রোনটী)

সার্লটী ব্রোনটী এই একখানি নভেলের জন্ম ইংরেজী সাহিত্যে অমর হয়ে আছেন। জেনু আরার জগতের সর্বকালের স্রেষ্ঠ নভেলের মধ্যে একটি। এই নভেলের নারিকী জেনু আরারের নাম থেকে এই বই-এর নামকরণ হয়েছে। ভাষা-পরিভাষক জেনু আরারকে শিশুকাল থেকেই অবশ্যে অন্যায়ের পরের দয়ার বাতুল হতে হয়েছে। তাই জীবনে সে সাহস করে কিছুই চাইতে পারে না। যখন বয়স্ক হলো তখন জেনু নিজের পায়ের নিজে দাঁড়াবার জন্মে এক বড়লোকের বাড়ি একটি ছোট ঘরের ভাড়াখানের ভাড়া নিলো। সেই বাড়িতে এসে ভাড়া মনে হলো সে বুকুড়ে বাড়িতে এসেছে। হাফের ওপর থেকে নানারকমের বিচিত্র আওগাম সে শুনতো। সেই আওগামের উৎস সত্যের জন্মে ঢেঁাও করে, কিন্তু বাড়ির যেটন কড়াভাবে জামিয়ে দেব, বাড়ির কর্তার হুকুমে হাফের ওপর বাবার কাকুর অবিকার নেই, শুধু একটা পানলা দি সেইখানে থাকে। কিন্তু কালক্রমে আরার যেদিন জামতে পারলো সেই হাফের রক্ত, তার আবেই বাড়ির কর্তার সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা টিক হতে সুরুতে। সেই পরম আশ্বস্তের মুহূর্তে আরার জামলো, হাফে সত্যিসত্যিই একজন থাকে, সে হলো বাড়ির কর্তার বিবাহিত স্ত্রী, একেবারে উদ্ধার হয়ে গিয়েছে। সে যখন জানার সঙ্গে সঙ্গে আরার সেই বাড়ি এড়ে এসে যায়। কিন্তু ভাষা আরার তাকে কিরিয়ে আনে সেই বাড়িতে এবং বাড়ির কর্তার সঙ্গে অবশেষে তার বিবাহ হয়।



‘বীরাজতা, পরাক্রমে ভীমা-সমা’

—ঐবেদ্যেন্দ্রকৃষ্ণরায়

এক

রণরঙ্গে বীরসুনা সাজিল কোঁচুকে .—
উপলিল চারিধিকে দ্রুন্ততির কানি,
বাহিরিল বাহাদুর বীরমণ্ডে মাতি,
উলসিতা অসিরাশি, কাহুক টংকারি,
অকালি ফলকপুটে ।

—মাইকেল মধুসূদন

বেশে বেশে রণরঞ্জিণী রমণীর কাহিনী শোন। যার,—কেবল কল্পিত গল্পে নয়, সত্যিকার ইতিহাসেও । চলতি কথার এমন ঘেরকে বলা হয় ‘রায়বাহিনী’ ।

ভারতের রানী লক্ষ্মীবাই, রানী দুর্গাবতী, চাঁদ সুলতান, ইংলণ্ডের বোডিসির ও ফ্রান্সের জোয়ান অব্ আর্ক প্রভৃতি রণরঞ্জিণী বীরনারীর কথা কে না শুনেছে ?

কথিত হয়, সেকালের কাম্বোডেশিয়ার বীরাজনারা বাস করত নারীরাণ্যে—যেখানে পুরুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ ! পুরুষদের সঙ্গে সন্মুখবুৎে কোনদিনই তারা পিছুপাও চরনি। আধুনিক নিউসিনিতেও এমন দেশের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যাবে যাবে তারা আবার বাইরে হান।

দিয়ে পুরুষ দেখলেই বন্দী ক'রে নিয়ে যায়! একালের স্পেন, রুসিয়া ও চীন প্রভৃতি দেশে হাজার হাজার নারী-যোদ্ধার দেখা পাওয়া যায়। এবং এই অতি-আধুনিক যুগেও তিব্বতে শ্রীমতী রিপিয়েডোর্ডেন্স প্রায় এক হাজার রণযুগো নারী-যোদ্ধা নিয়ে কমিউনিস্ট চীনের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্রমে যুদ্ধে নিযুক্ত আছেন।

কিন্তু আর এক শ্রেণির বীরনারীদের কথা নিয়ে বড় বড় ঐতিহাসিকরা মাথা ঘামান না এবং এর কারণ বোধ হয় তাঁরা হচ্ছেন কালো আফ্রিকার কাকলা মেয়ে!

এঁদের প্রধানার নাম নাসিক। আজ এঁরই রক্তাক্ত কাহিনী বর্ণনা করব। কিন্তু তার আগে গুটিকয় গোড়ার কথা বলতে হবে।

প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে জনৈক পুস্তকাত্ম লেখক The Rising Tide of Colour-নামক পুস্তকে সত্তরে এই মর্মে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : 'যেতান্নরা এখনো আন্দাজ করতে পারছে না, অশ্বত্থ আতিয়া (পীত, তাম্র ও কৃষ্ণ বর্ণের) ক্রমেই অধিকতর শক্তিশালী হয়ে যেতান্নদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। অবিলম্বে তাঁদের সাবধান না হলে চলবে না।'

তারপর গত এক যুগের মধ্যেই তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে—গোয়ান্নরা সাবধান হয়েও পীতান্ন ও কৃষ্ণান্নদের ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

প্রায় সমগ্র এশিয়া থেকেই তাম্র ও পীত বর্ণের প্রভাবে স্বতবর্ণ বিলুপ্তপ্রায় হয়েছে এবং তারপর বেঁকে দাঁড়িয়েছে এককালের পশ্চাদপদ আফ্রিকাও। একে একে যেতান্নদের বেড়ি ভেঙে স্বাধীন হয়েছে মিশর, সুরান, মরক্কো ও ঘানা এবং আরো কোন কোন দেশ প্রস্তুত হয়ে আছে স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে কিংবা ইতিমধ্যেই স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করেছে।

যেমন লত-স্বাধীন ঘানার প্রতিবেশী ডাহোমি। পশ্চিম আফ্রিকার টোগোলাণ্ড ও নাইজেরিয়ার মধ্যবর্তী আটলান্টিক সাগর-বিধৌত ভূতট্রদেশে আটত্রিশ হাজার বর্গমাইল জায়গা জুড়ে ডাহোমির অবস্থান। তার লোকসংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। গত শতাব্দীর শেষভাগে কনাসী দস্যুরা হানা দিয়ে ডাহোমির স্বাধীনতা হরণ করেছিল, কিন্তু সম্প্রতি কর্তার চেয়ার ছেড়ে আবার তাদের দর্শকের গ্যালারিতে সেরে দাঁড়াতে হয়েছে।

দুই

স্বাধীন ডাহোমির সব চেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল, সেখানে দেশরক্ষা করত পুরুষরা নয়, নারীরা! সাধারণভাবে বলা যায়, ডাহোমির রাজাদের কোঁজে সৈনিকের ব্রত পালন করত সমস্ত নারীরা।

আগেই বলা হয়েছে, নারী-কোঁজ কিছু নৃতন ব্যাপার নয়। এই শ্রেণীর রণচণ্ডী

❶ 'বীরাসনা, পরাক্রমে ভীষা-সনা'

ত্রিবেশজকুমার রায়

দেব দেউল

২৩৭

নারীদের নাম দেওয়া হয়েছে 'আম্যাজন'। স্প্যানিয়ার্ডরা দক্ষিণ আমেরিকা আক্রমণ করলে গণ্যে বিভিন্ন নারী-বাহিনীর কাছে বারংবার বাধা পেয়েছিল। তাই তারা সেই দেশের ও সম্প্রদায় প্রদান নবীর নাম দিয়েছিল যথাক্রমে 'আম্যাজোনিয়া' এবং 'আম্যাজন'। পুর্নবীঃ আম্যাজন আজও বিখ্যাত নবীদের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে—তার সৈন্য তার হাতের পাঁচালী এক মাইল।

তবে অজ্ঞাত দেশে পুরুষদের সঙ্গেই নারীরা যুদ্ধে যোগদান করিতে। কিন্তু ভারতীয় প্রদান যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুষের ছায়াও দেখা যায়নি, সেখানে শত্রুদের সঙ্গে শক্তিশালী করেই কেবল রণরঙ্গিণীরা। সেখানে আম্যাজনদের নাম হচ্ছে 'অ্যাম্যাজি'। সব পশ্চিম আম্যাজন সকলেই অ্যাম্যাজিদের ভয় করে সত্যসত্যই রায়বাঘিনীর মত।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে যখন মোগল সাম্রাজ্যের প্রবলতা, এমনই ভারতীয় নারী সেনাদল গঠিত হয়। প্রথমে রাজা আগাদগা বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সেপাহীরা বাড়িবার জন্তে কোঁজে পুরুষদের সঙ্গে নারীদেরও সহায়তা গ্রহণ করেন। সেখান হার, শিরে ও বগনিপুণ্ডার নারীরা হচ্ছেন অ্যাম্যাজি। তখন অটম চাঁল, ভারতীয় পুর্নবীঃ অ্যাম্যাজি যেরকম পনেরো বছর বয়স হলেই কোঁজে যোগ দিতে হবে, বরাবর চলে আসতে সেই নিয়মই।

আনুমান্য ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গেজে সিংহাসন পেয়ে সুদীর্ঘ চারশ বৎসর কাল রাজা-চালনা করেন। তাঁর আগেও ডাহোমির মেরে-সেপাইরা অল্প দূরে শাসন করত বটে, কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সৃজলা ছিল না। রাজা গেজেই সর্বপ্রথমে নারীবাহিনীকে সৃজনবৃত্তি ও অধিকতর শক্তিশালী করে তোলেন এবং তার সাহায্যে পশ্চিমবর্তী দেশের পর পর জয় করে নিজের পটভার তলায় আনেন।

সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করবার পর কুমারীদের কঠোর শিক্ষাদানের ভিতর দিয়ে পশ্চত চেষ্টে হ'ত—একটু এদিক-ওদিক হলেই ছিল প্রাপদভয় আশঙ্কা। কিন্তু কাল সৈনিকজীবন বাপন করবার পরই তারা কেবল তরবারি, তীর-ধনুক, বর্ম, বন্দুক ও বেগমেন্ট চালনাতেই সুপটু হয়ে উঠত না, উপরন্তু নিরস্ত্র বারান্দা তাদের দেহও হয়ে উঠত পুরুষের মত বলিষ্ঠ ও পৌনঃপুন্য। একবার এই রণরঙ্গিণীদের বিশজন অরণ্যে গিয়ে এক ম'নিটের মধ্যে বস করেছিল সাত সাতটা হাতী! সেই থেকে নারী-বাহিনীর একটা বিশেষ বল 'মাতলমহিনীর বল' নামে বিখ্যাত হয়ে আছে।

১ 'বীরাবনা, পরাক্রমে তীরা-সমা'
প্রতিবেশকুবার রায়

তিন

ব্যাপারটা একবার ভালো ক'রে তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করুন।

একটিমাত্র ক্রুদ্ধ হাতীর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় পায় দলে-ভারী পুরুষ-শিকারীরাও। কিন্তু বনচর হাতীর পালের সামনে গিয়ে 'বৃদ্ধ দেহি' ব'লে আশ্বাসন করতে গেলে যে কতখানি বৃকের পাটার দরকার সেটা অনুমান করতে গেলেও কল্পিত হয়।



মিনিটখানেকের মধ্যে সাত সাতটা হাতীকে ধরাশায়ী করল।

পাশ্চাত্য শিকারীদের হাতে থাকে অধিক-
তর শক্তিশালী আধুনিক বন্দুক এবং যার খোল-
নলচের ভিতরে থাকে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত হাতী-
মারা দুলেট। কিন্তু দলবল নিয়ে তার সাহায্যেও
হাতী মারতে গিয়ে কতবার কত লোককে যে
মরণধারার পড়তে হয়েছে শুনে তা বলা যায় না।

মেরে-সেপাইরা তেমন বন্দুক চোখেও
দেখেনি, এবং সেই বিশজনের প্রত্যেকেরই
হাতে যে বন্দুক—অর্থাৎ খেলো বন্দুক ছিল,
তাও নয়; অনেকের হাতে ছিল খালি সেকলে
তীর-ধনুক 'ও বনম-তরবারি। হাতীর পালে
কত হাতী ছিল তা প্রকাশ পায়নি, তবে
বিশজন মেরে যখন মিনিটখানেকের মধ্যে
সাত-সাতটা হাতী মেরে ধরাশায়ী করতে
পেরেছিল তখন হস্তিযুগ যে যন্তবড় ছিল সেটুকু
বুঝতে মেরি হয় ন্যু।

কিন্তু এখানে সপ্তহস্তীবধের চেয়ে আশ্চর্য
কথা হচ্ছে সেই দুর্ধর্ষ বীরাক্ষনাধের প্রচণ্ড সাহসের
কথা। এমন কাহিনী আর কোনদিন শোনো
যায়নি।

ভাওয়ানির রাজা বিপুল ধন্যের বীরাক্ষনাধের সাহস অনুসরণ করে বললেন, “আজ থেকে
ভোবাবের উপাধি হবে ‘মাতঙ্গবাহিনী’!”

● ‘বীরাক্ষনা, পরাক্রমে ভীরা-সবা’
ঐক্যবোধকুমাৰ দাস

۲۵۵

কিন্তু তাদের উপরেও নারী-বাহিনীর আর একটা দল ছিল। বঙ্গ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম পদক্ষেপেই মেয়ে-সৈনিকদের নিয়ে সেই দল গঠিত হ'ত। তাদের প্রত্যেকের আঁকাবঁকা হাত-বাঁকি ও লম্বাচওড়া এবং কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তাদের প্রধান অস্ত্র বেংগেলি বা কিরীট। তাৎক্ষণিকভাবে খাকত নীল ও শাদা রঙের জামির ডোরাকাটা আর হাতকাটা চাম্বা এবং টুপি পরিষ্কার পাড় ঘাগুরা।

আর এক, ধনুকাবিরণীর দল। এই দলের মেয়েরা ছিল ফোতের মধ্যে ১৬.৫% আরবরাও ৭ দেখতে রূপসী। হাতাহাতি লড়াবার অন্তে তারা ছোঁরা; শব্দে রাপত।

আড়াই শত বৎসরের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফলে মেরু-সুদার' সংকোচনের চাক্ষুণ্য বিষয়ে
তাঁরাই রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। তাঁদের প্রধান একটি 'ক'র 'চল, অতিক্রম শতকের
আক্রমণ।

কবি মাইকেল মধুসূদনের ভাষায় নাস্তিক্য হচ্ছে—

হ্যাঁ, যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন অগূৰ্ব তার গুণগণনা, হেমনি তরাল তার বিরগণনা। প্রকাশ, তার শব্দে
হাতাহাতি সাধর্বে প্রাণধান করতে হয়েচে পাঁচশত শত্রু-বোঁদাকে! অমোঘ তার অস্ত্রধারণের শক্তি!
এবং অক্রান্ত তার সৈন্তচালনার দক্ষতা!

যে পুরুষ-কবি সর্বপ্রথমে নারীকে অবলা বলে বর্ণনা করেছিলেন, নালিকাকে বচসে দেখলে

● 'বীরাদনা, পরাক্রমে ভীমা-দনা'
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

তিনি সত্তরে মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হতেন। প্রত্যেক অঞ্চলে নাসিকার দেহতটে যখন উচ্ছৃঙ্খল হতে থাকত বলিষ্ঠ ধোবনের ভরাট জোয়ার, তখন তার চুই চক্ষে ঠিকরে উঠে বীর্ষবস্তার তীব্র বিদ্যুৎ শব্দর চিত্তে আগিয়ে তুলত আসন্ন অশনিপাতের আশঙ্কা।

এই নাসিকার সঙ্গে ঘুরোপ থেকে আগত ফরাসী দম্ভাদের তীব্র শত্রুতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়েচে।

কারণটা খুলে বলা দরকার।

বরাবরই দেখা গিয়েছে যুরোপীয় দম্ভারা সওদাগরের বা পরিব্রাজকের বা ধর্মপ্রচারকের ছদ্মবেশ ধারণ ক'রে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশে দেশে গিয়ে অতি নিরীহের মত ধরনা দিয়েছে, তারপর সময় বুঝে ধীরে ধীরে নানা অভিলাষ গোপনে শক্তিসঞ্চয় ক'রে হঠাৎ একদিন নিজমুখি ধরে রক্তধারায় মাটি ভাপিয়ে এবং দিকে দিকে মুক্তা ছড়িয়ে সর্বাঙ্গাস ক'রে বসেছে।

যেতান্নরা এইভাবে ভারতবর্ষে এসে শিকড় গেড়ে বসেছিল। আফ্রিকাতেও তারা গোড়ার দিকে সেই চালই চালে এবং অধিসন্ধি বুঝে নেয়। কিন্তু ভারতের তুলনায় আফ্রিকা ছিল প্রায় অরক্ষিত, কারণ আয়েরারক কতকণ ও কতটুকু বাধা দিতে পারে তরবারি, বল্লম ও তীরধনু? দেখতে দেখতে নানাদেশী যেতান্নরা আফ্রিকার উপরে কুপিত রাক্ষসের মত কাঁপিয়ে পড়ে তার নানা অংশ ভিনিয়ে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি ক'রে নিলে।

পশ্চিম আফ্রিকার উপরে কাঁপিয়ে পড়ল ফরাসী দম্ভারা। ছলে-বলে-কোশলে অনেকখানি জায়গা দখল ক'রে নিয়ে অবশেষে তাদের শনির দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ডাহোমির উপরে।

ডাহোমি তখনও বাধীন। তার সিংহাসনে আসীন রাজা গেলেল।

বেয়ল হচ্ছেন ফরাসীদের এক পদস্থ কর্মচারী। একদিন তিনি এলেন রাজা গেলেলের কাছে—
হুগে তাঁর শাস্তিহুতের মুখোশ।

রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন হাসিমুখে। বলা বাহুল্য, বেয়লের মুখে মিষ্ট মিষ্ট ব্লির অভাব হ'ল না। নয়ল রাজা ভুলে গেলেন কথার ছলে।

নাসিকা ছিল নারী-বাহিনীর অন্ততম পরিচালিকা। অতিশয় বুদ্ধিমতী বলে তার সুনাম ছিল যথেষ্ট। সে ছাখনহাসি বেয়লের মিষ্ট কথার ভুট্ট হ'ল না—ফলিবাক ফরাসীদের স্বরূপ চিনে কেলেছিল তার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বেয়লের ফলি বার্থ করবার অস্ত্রে নাসিকা নানা ভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

কিন্তু সে কিছুই করতে পারলে না—ক্রমে ক্রমে রাজা হয়ে পড়লেন বেয়লের হাতের কলের পুতুলের বদ। বেয়ল বা বলেন, রাজা ভাইতেই সায় দেন।

● 'বীরাদনা, পরাক্রমে ভীরা-সমা'

ঐক্যেন্দ্রকুমার রায়

দেয় দেউল

২৪১

নাসিকা তখন বেশের শত্রুকে বধ করবার জন্তে গোপনে চক্রান্তে প্রস্তুত হ'ল।
খবরটা রাজার কানে উঠল। খাঙ্গা হয়ে বললেন, "আমার বড়ব বন্ধকে চক্রান্ত! বন্ধী কর
নাসিকাকে! লাগাও পিঠে সপাসপু কোড়ার বাড়ি! বেয়ল যতদিন আমার রাজধানীতে থাকবে,
ততদিন তাকে কারাগার থেকে মুক্তি দিও না।"

তাই হ'ল। বেত্রদণ্ডের পরে নাসিকা হ'ল বন্দী।

তারপরই কিন্তু নাসিকা রাজার মনে যে সন্দেহের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে গেল, ক্রমে তা হ'ল
নিজলা সত্যে পরিণত। একটু একটু করে রাজার চোখ দুটোতে লাগল বটে, "ক'র তিন কান ক'র
করবার আগেই নিজের কাজ ফতে ক'রে বেয়ল বিদায় নিয়ে ফিরে গেলেন।

নাসিকা আবার কারাগারের বাইরে এসে পাড়ালে।

তারপর কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ একদিন হুৎপাড়ার আক্রান্ত হয়ে রাজ্য পড়লেন
মৃত্যুমুখে।

প্রজারা হাহাকার করতে লাগল—ভায়, হায়, এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত!

নাসিকা সুযোগ বুঝে দিকে দিকে রটয়ে দিলে—"এ হচ্ছে দেশের শত্রু ফরাসীদের কায়দা!।
এমন ভাবে মাহুব মারা পড়ে না। গুটী বেয়লের বশীকরণ-মণ্ডে বশ হলেই রাজ্য আমার পড়েছেন—
কুংকী ফরাসীদের দেশ থেকে এখনি ভাড়াও!"

অরগ্যরাজ্য ডাহোমির নিরক্ষর সব প্রজা—রাজনীতি, দটনীতি প্রভৃতি অতশত কিছুই বোঝে
না, নাসিকার কপাই তারা। এবসত্য বলে মেনে নিলে ফরাসীদের উপরে সকলে ঝড়োপু
হয়ে উঠল।

নূতন রাজ্য হয়ে ডাহোমির সিংহাসনে বসলেন বেহান্জিন্ নাসিকা। ছিল তার প্রায়পাত্রী।
তিনি বললেন, "নাসিকা! আজ থেকে তুমি চলে আমার সমস্ত নারী-বাচিনীর অধিনায়িকা।
বাও, শত্রুজয় করে ফিরে এস!"

চার

১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কোটোনো হচ্ছে ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত একটি দুর্গ-নগর। সেই নগরে থানা দিয়ে বসেছেন
ডাহোমির শাসনকর্তারূপে নির্বাচিত জিন বেয়ল।

ডাহোমির নূতন অধিপতি বেহান্জিন্ কুচ্ছবয়ে বললেন, "আমাদের বর্গীর রাজ্যকে—

● 'বীরাবনা, পরাক্রমে তীক্ষ্ণ-দমন'
প্রিবেথেন্দ্রকুমার রায়

আমার পূর্বপুরুষকে ফরাসী কুকুর বেরল কুহকমন্ত্রে বধ করেছে! প্রতিশোধ, প্রতিশোধ—আমি প্রতিশোধ চাই!”

রায়ের রায় দিয়ে নালিকা তীব্রস্বরে বললে, “আজ্ঞে হ্যাঁ। মহারাজ, প্রতিশোধ! প্রতিশোধ নিতে গেলে প্রথমেই করতে হবে বেরলের মৃত্যুপাত! তারপর আমাদের স্বদেশ থেকে দূর ক’রে থেগিয়ে দিতে হবে ফরাসী দস্যবদের।”

রাজা বললেন, “উত্তম! যা ভালো বোঝো তাই কর। তোমার হৃদয়ের উপরে আমার বিশ্বাস আছে।”

হাতজোড় ক’রে নালিকা বললে, “প্রভু, যদি আমার উপরে ভূতপূর্ব মহারাজের এই বিশ্বাস থাকত, তাহ’লে ব্যাপারটা আজ এতদূর পর্যন্ত গড়াত না।”

রাজা বললেন, “ও কথা এখন যেতে দাও নালিকা! অতীতের ভুল আর শোধরাবার উপায় নেই। বর্তমান সমস্যার সমাধান কর। তোমার অধীনে তো নারী-সেনাদল প্রস্তুত হয়ে আছে—‘মাতঙ্গিনীযুগ যথা মত্ত মধু-কালে’! সেই আহ্বাসিধের নিরে বেরিয়ে পড় গৌরবপূর্ণ অরবাত্রার।”

নালিকা বললে, “যথা আজ্ঞা মহারাজ! এই আমি আপনার আদেশ পালন করতে চললাম।”

সেই অলিকারুঁক্ষদারিণী বলিষ্ঠযৌবনা বীরাক্ষনা বীরদর্পে পৃথিবীর উপরে সজোরে পদক্ষেপ করতে করতে মনে মনে বললে, “কেবল দেশের অজ্ঞে নয় মহারাজ, কেবল আপনার অজ্ঞেও নয়—সেই লম্বে নিজের অজ্ঞেও আজ আমি প্রতিহিংসাত্রস্ত উদ্‌যাপন করতে যাব! সেদিনকার অপমান কি আমি জীবনে ভুলতে পারব? আমি ডাছোমির সেনানায়িকা নালিকা, সকলের সামনে আমার হাতে বেড়ি, পায়ে বেড়ি আর পিঠে কোড়ার বাড়ির পর কোড়ার বাড়ি! শরতান বেরল আর দেশের পক্ষ করাসী দস্যব, ওরাই দারী এর অজ্ঞে! ওদের সমালয়ে পাঠাতে না পারলে জীবন থাকতে আমার শাস্তি নেই!”

ডিমি-ডিমি-ডিমি-ডিমি বাজতে লাগল কাড়ানাকাড়া, আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে উড়তে লাগল বর্ণরঞ্জিত পতাকা আর পতাকা, দিকে দিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল নাগরিকদের হুঙ্কৃত কণ্ঠের বন বন করোলাস এবং নারী-সেনাদের ভালে ভালে ধপিত পাদপ্রহারে ধর-ধর-কম্পিত পৃথিবী বেন আর্তনাদ করতে লাগল সমস্ত!

কোন্‌র পুরোভাগে থেকে মাথার উপরে শূভ্রে শাপিত বিজ্ঞাংকিন তরবারি আঁফালন করতে করতে নালিকা উচ্চ, দৃঢ় স্বরে বার বার ব’লে চলল—“আগে চল, আগে চল, আগে চল!

● ‘বীরাক্ষনা, পরাক্রমে ভীম-সম’

শ্রীহেমনন্দ্রকুমার রায়

দেয় দেউল

২৪৩

শক্রসংহার করতে হবে, শত্রুসংহার! তোমার শত্রু, আমার শত্রু, রাজার শত্রু, দেশের শত্রু! হয় মারব, নয় মরব, হার স্বীকার করব না! আগে চল, শত্রুসংহার কব—মার আর মর।”

লামা জলাভূমি—হঠাৎ দেখলে মনে হয় দূরবিস্তৃত বিশাল হ্রদ, যুঁকে তার নীলিমা মাথিরে পড় আকাশের প্রতিচ্ছায়া!

তারই পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে নাসিকার রক্তলোচনা ‘বউমণি’ সজিনীর বন্দি করে আনলে একদল ফরাসীকে।

রাজা বেহানুজ্জিনের উৎসাহের সীমা রইল না। লামা হ্রদের তটে ঠাঁড়িয়েই তিন প্রজাপ্রভাবে পররাজ্যলোভী ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করলেন।

যুরোপে যখন এই খবর গিয়ে পৌঁছলো তখন সকলের গঠনের দুটে উঠল বাজক’সের রব। কোথায় কোটি কোটি মানুষের বৃত্ত বাসভূমি, সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় ও শক্তিশালীতার ভিত্তি স্থাপনক ফ্রান্স, আর কোথায় অসভ্য ক্রুরাণের জন্মভূমি আফ্রিকার অভ্যন্তর এক প্রান্তে অবস্থিত মার দল লক্ষ প্রায়নয় বর্ষের মহুঘোর বস্ত্র স্বদেশ কুদ্রারপি কুদ্র ডাচোমি! পদতের পদতলে নগণ্য গ্রুটি, মনুষ্যের চলনপথে তুচ্ছ উই, বনস্পতির চাণার তলায় কুদ্র তুল। অ্যা! হাউট বলে ‘কন’—‘তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি চাই!’ খেতাজ সেনাপতির একটিমাত্র উজ্জিত লক্ষ লক্ষ সৈনিক তড়ের বেগে ছুটে গিয়ে কেবল পারের বুটজুতোর চাপেই ডাচোমিকে এগনি সমতল পৃথিবীর সঙ্গে মিলিয়ে দিতে আসতে পারে!

সুতরাং ফ্রান্সের টনক নড়ল না।

কিন্তু নাসিকার যুক্তি হচ্ছে, ছোট্ট বিজাকে হাঁটলে সেও পাগল! হাতীকে কামড়ে দিতে ইতস্ততঃ করে না এবং হুমসো হাতী তখন বিবের আলার চটমটিরে দৌড় মারতে বাধ্য হয়! অতএব—আগে চল, আগে চল! হয় শত্রুবধ, নয় মৃত্যু! অতএব—খাল না ডিমি-ডিমি কামামা-ধনি, আনত হ’ল না দর্পিত ধ্বজপতাকা, শুক হ’ল না কুদ্র ডাচোমির কুদ্র জয়নাথ!

শুভ্রে ঝকঝকে তরবারি তুলে, নাথার উপরে শাণিত বরষ উঠিয়ে, পরাননে তীক্ষ্ণবাহু বাণ-বোজন করে সেই যুতিযতী চাহুগুবাছিনী বনে বনে খুঁজে বেড়াতে লাগল কোণার আত্মপোষন করে আঁচে ফরাসী দস্যবল!

বনে-মাঠে যখন-তখন বেখানে-সেখানে খণ্ডযুদ্ধের পর খণ্ডযুদ্ধ! ফরাসী পুরুষপুরুষরা অবলঃ নারীদের বেধে প্রাণে প্রাণের মধ্যেই আনতে চায় না, কিন্তু তারপরেই নারাত্মক অস্বাধাতে এক-হুহুর্জের অবহেলায় কলে চিরনিদ্রায় অভিভূত করে পড়ে!

তারপর ডেন্গাম হ্রদের ধারে নাথার-কালোয়—নাথ-চাষড়া পুরুষ এবং কালো-চাষড়া বেরের—

● ‘ধীরাবনা, পরাক্রমে তীবা-নমা’
শ্রীসেনেকুনার রায়

মধ্যে হাতাহাতি হানাহানি হ'ল বার বার! বন্দুকগর্জন, কোণ্ডটংকার, তরবারির ঝড়নানি, নরনারীর মিলিত কণ্ঠের ভৈরব তর্জন, আহতদের করুণ কাতরানি এবং মরণোন্মুখের অস্তিম চীৎকার কান্ডার-প্রান্তর ও আকাশ-বাতাসকে যেন সচকিত ক'রে তুললে!

ফরাসীদের সেনাধ্যক্ষরা স্তম্ভিত! গ্রীক পুরাণ-কাহিনীতে তাঁরা পড়েছেন কি শুনেছেন যে, অরণ্যভীত কাল পূর্বে কোন্ এক সময়ে নাকি রণরঞ্জিণী নারী-বাহিনীর সঙ্গে গ্রীক বীরপুরুষদের তুহল সংগ্রাম করতে হয়েছিল এবং গ্রীসের পার্থেনন দেবমন্দিরের শিলাপটের উপরে সেই পৌরাণিক যুদ্ধে নিখুঁত নর-নারীর উৎকীর্ণ মূর্তিটির অনেক স্রচকে দর্শনও করেছেন।

সে তো কবির কাব্যনিক কাহিনী মাত্র, আর সেই রণরঞ্জিণী নারীরাও খেতাবিনী!

কিছু এই আসন্ন বিংশ শতাব্দীর মুখে বর্বর আফ্রিকায়,—যেখানে কালো কালো ভূতের মত পুরুষগুলো খেতাবীদের দূরে দেখলেও ভেড়ার পালের মত ভয়ে ছুটে পালার কিংবা কাছে এলে গোলামের মত কুতোর তলার লুটিয়ে পড়ে, সেখানকার অর্ধোলঙ্ঘিত ককাদ্বিনীরা কিনা যেতপুরুষের মূত্বেষণ করবার জন্তে দূর থেকে হুকায় তুলে খাঁড়া নিয়ে ধেয়ে আসে!

এই কল্পনাভীত দৃষ্টির কথা ভেবে খেতাব খোঁকারা বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন, কিছু তৎক্ষণাত্ তাঁদের চাঞ্চা ক'রে তুলে অদূরে জাগে শত শত কামিনীকণ্ঠে থলথল অট্টহাস্যেরাল এবং তারও উপরে গলা তুলে উদ্দীপ্ত স্বরে সচীৎকারে কে বলে ওঠে—“আগে চল, আগে চল! শত্রু মার, শত্রু মার!” তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে জঞ্জলের অন্তরাল থেকে সহসা বেরিয়ে হসে হসে অস্ত্র আফালন করতে করতে ছুটে আসে সারি সারি বীরনারীর দল! পর মুহূর্তেই ধুন্ধুয়ার, চহংকার, থড়টংকার ও তরবারি ঝনংকার!

কুপ্তমকোমলা বলে কণ্ঠিত রমণীদের এমন সংহার-মূর্তি ফরাসীরা আর কখনো দেখেনি!

কিছু ফরাসীরা মার খেয়ে মার হত্যা করতে বাধ্য হ'ল তখনকার মত।

সেই চরমনারী-নারী-বাহিনী পিছু হটতে জানে না, বীরবিক্রমে এগিয়ে আসে আর এগিয়ে আসে!

বীরান্ধারা যায়তে যায়তে ছুটে চলে, মরতে মরতে মারণ-অস্ত্র চালায়! মৃত্যুভয় তুলে বারো রক্তদান করে এবং হাসতে হাসতে গ্রাণ-কাড়াকাড়ি খেলার মাতে, কে লড়াই করবে তাহের সঙ্গে?

এই অমৃত সংগ্রাম সাগর পার হয়ে পৌছলো গিরে ফ্রান্সের বড় কর্তার কাছে। তাঁরাও প্রথমটা হতভাক হয়ে গেলেন মহাবিস্ময়ে!

সকলে হাল্ফ বর্নপীড়ার কাহিল হয়ে পড়লেন। এককল অরণ্যচারিত্রী নগণ্য ককাদ্বী প্রতাপে

● ‘বীরান্ধা, পরাক্রমে ভীষ-সম’

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

দেব দেউল

২৪৫

কীতমান ফ্রান্সের খেত পুরুষত নস্তাৎ হয়ে যাচ্ছে, এ কথা শুনে যুরোপের অসংখ্য ১৮ টি কাকী ভিত্তে ও হাসাহাসি করতে বাকি রাখবে না!

অবিলম্বে এর একটা বিহিত করা চাই।

উপরওয়ালাদের হুকুমে তখন তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। তার কয়েক মাস পরে যশস্বরে ডাছোমির দিকে পাঠানো হ'ল দলে দলে নতুন সৈন্ত, বড় বড় কামান এবং তা'র তা'র বন্দ।

প্রধান সেনাপতি হয়ে গেলেন জেনারেল সিবা'স্টিয়ান টেরিলন। তিনি আ'লো চো'র বসলেন চর্গ-নগরী কোটোনোয়ের উপকণ্ঠে।

পাঁচ

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ। চর্গ-নগরী কোটোনো।

তার চতুর্দিকে ধূ-ধূ তেপান্তর। এবং তেপান্তরের পর চরসিগমা ক'সুর—বা'টার থেকে তার ভিতরে প্রবেশ করা এবং ভিতর থেকে তার বাইরে বেরিয়ে আসা দুইট সমান কঠোর।

কিন্তু বনচর জীবরা বনের গোপন পথ জানে। রণরঞ্জিত রমণীর হাড়ে বনরাজের অন্তঃপুরচারিণী—অবচেলার এড়িয়ে চলতে জানে যে কোন আ'রগা বাদবৎ।

চুর্গের আ'রেই মাঠের উপরে পড়েছে সৈনিকদের ছাউনি। সেখানে এক তাঁবুর মাঠের বসে ফরাসীদের ঘারা প্রেরিত শাসনকর্তা আমাদের পুত্রপরিচিত বেরল, জেনারেল টেরিলন ও আ'রে ছইজন পদস্থ সেনানী মতপান করতে করতে আলোচনার নিযুক্ত ছিলেন।

টেরিলনের চেয়ারা যেন তালপাতার সেপাই! মেজাজ তাঁর এমন কঠিন যে তাড়লেও মচকাতে চায় না। ফোজের সৈনিকদের কাছে তিনি ছিলেন চো'রের বাংলার মত ভয়ংকর। তিনি তাচ্ছিল্যভরা কর্ণে বলছিলেন, “আরে ছোঃ! অগ্নি ধরলে ক' হবে, ওর তে' টীলোক—চুচ্ছ খ্রীলোক ছাড়া আর কিছুই নয়!”

বেরল নারী-বোদ্ধাদের কোষাষত হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন,—বললেন, “কিন্তু তার হিচকিৎসা, সাংঘাতিক!”

—“তা'হ'লে আমার সঙ্গে আরো দ্বিগুণ সৈন্ত পাঠানো হ'ল না কেন?”

এইবারে আলোচনার যোগ হলেন ক্যাপ্টেন আউচার্ড, এতকাল তিনি একমনে বসে বসে চু'কের পর চু'কে খালি করছিলেন মদের গেলালের পর গেলাস। আধমিক ও কর্কট প্রভৃতির লোক। খুনোখুনির স্রবোণ পেলেই খুশি! লম্বাচওড়া রোমল বৈতোর মত চেগা। তিনি

● ‘বীরানন্দা, পরাক্রমে তীক্ষ্ণ-দম্য’
প্রিয়শেষকুমার রায়

বড়াই ক'রে বললেন, “জেনারেল, কি হবে আরো সৈন্তে ? দ্রালোকগুলোকে শিক্ষা দেবার জন্তে আমি প্রস্তুত ! আর বাইই হোক, পুরুষের মত তারাও তো মরতে বাধ্য ?”

চেরারের পিছনদিকে হেলে প'ড়ে বেরল বিরক্তিতে ঘোঁত-ঘোঁত ক'রে উঠলেন। বললেন, “আউডার্ড, তুমি সাহসী বটে। কিন্তু তুমি তো কখনো রায়বাঘিনীদের সঙ্গে লড়াই করনি। দেখো, কালই তুমি তাদের হাতে পঞ্চতলাত করবে। জেনারেল, তোমাকেও তারা মারবে। আর সুসেট, তুমিও বাঁচবে না !”

শেষোক্ত ব্যক্তি হচ্ছেন লেফটেন্যান্ট চার্লস সুসেট। তিনি হাঁ না, কিছুই না বলে ত্রাণের গেলানো চুপুক রিতে লাগলেন মৌনমুখে। বোধ হয় এসব কথা তাঁর মনে হচ্ছিল বাজে বকুবকানি !

নিজের শেষ গেলানটা খালি ক'রে উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল। তারপর টলতে টলতে তাঁর এককোণে গিয়ে বিছানার উপরে ধপাস্ ক'রে লম্বা হয়ে শুয়ে প'ড়ে বললেন, “এখন থো কর এ-সব কথা। রাত হয়েছে, আমি শ্রান্ত।”

কিন্তু বেরলের মুখে বন্ধ হ'ল না কথার তোড়। তিনি বললেন, “রুম্নো হচ্ছে বোকামি। আহোমির আক্রমণ করবে ছপুয় রাত থেকে সুখোদরের মধ্যেই।”

আউডার্ড বাজুভরে বললে, “কিন্তু তাদের আদর করার জন্তে আমরা তো তৈরী হয়েই আছি ! কি বল কে সুসেট, তাই কিনা ?” বলেই তাঁকে এক ঝুতো মারলেন।

কিন্তু ঝুতো খেয়েও সুসেটের মুখে রা কুটল না। নেশাটা বোধ করি বড়ই জমে উঠেছিল ! উত্তেজিত কণ্ঠে কিশোর মত বেরল বললেন, “শোনো, শোনো, তোমরা বুঝতে পারছ না কেন ? রায়বাঘিনীরা দিনের খটখটে আলোর লড়াই করে না। সুখোদরের পূর্ব-সুহৃৎই তারা করে আক্রমণ !”

কেবা শোনে তার কথা ! “নির্বোধ ! দুৰ্ধ !” বলে বেরল হতাশ হয়ে গজরাতে গজরাতে কিয়ে গেলেন নিজের তাঁবুতে।

কিন্তু তখনো পৰ্ব্বন্ত তিনিও জানতেন না যে, ডাহোমির রাজা বেহান্জিন সেই দিনই—অর্থাৎ মার্চ মাসের চার তারিখেই—করাসীঘের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধের পর কোটোনো দুর্গ-নগরী অবিকার বা অবরোধ করার আবেশ ঘিরেছেন !

ছয়

নিজের বস্ত্রাধায়ে প্রবেশ ক'রে বেরল ক্রুদ্ধভাবে আবার বললেন, “নির্বোধ দুৰ্ধের বল !”

খানিকক্ষণ বিছানার ওরে এগাশ ওগাশ ক'রেও ঘুম এল না। হাতভক্তির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত লাঞ্চার চারটা।

৩ “বীরাকনা, পরাক্রমে ভীষা-সবা”

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়


দেব দেউল

55

শয্যা উঠে বসে নিজের চোখে রিভলভারের কলকঙ্ক শিক আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখলেন। চোখ তুলে লক্ষ্য করলেন দেওয়ালে যথাস্থানেই কলকঙ্ক ঝুঁকানো পড়ছে—আট আটটা গোটার ভরা।

নিজের মনে-মনেই বললেন, “হয়তো! আউটারের মত দাঁত নয় -- প্রথম ৪ হতে ৭-৮।”

আহাঙ্গিদের কাছে আসতে দাঁড়, তারপর বন্দুক ছুঁড়ে ভূমিসাৎ কর। একমাত্র আশার কথা এই যে বেশীর ভাগ রায়বাঘিনীর হাতেই বন্দুক নেই! ধনুক, বর্শা, তরবারি,—বন্দুকের সামনে ও-সব তো থোকাথুকীর খেলনা। চাড়া আর কিছুই নয়! তবে মুশকিলের কথাও আছে! রায়বাঘিনীরা বলে ভারী!”



ধ্রু, ধ্রু, ধ্রু, ধ্রু! আচম্বিতে বন্ধুকের
 পর বন্ধুকের গর্জন!

একলাফে শব্দ ছেড়ে বেরল বলে উঠলেন,
“তারা আসছে, তারা আসছে, তারা আসছে!”

তাড়াতাড়ি পটমণ্ডপের বাইরে বেরিয়ে
প'ড়ে বেরল মুখ তুলে দেখলেন, পূর্ব-নাট্যশালায়
মহিমমন্ত্রী উবার বৈশ্যপদের মত শুভ্র আলোর
পাণ্ডি ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে।

বেয়ল বললেন, “জানি, আমি জানি!
এই তো আত্মহাসিদের আক্রমণের মাহেন্দ্রক্ষণ!”

বন্দুকের গুলুম-গুলুম শব্দে জেনারেল
টেরিলনেরও ঘুম ভেঙে গেল সচমকে। তিনি
তাহাতাহি উঠে একটা বাশিতে জোরে হুঁ দিয়ে
করলেন উচ্চ গংকতধ্বনি।

ভংকলাং কোথা থেকে বেছে টাইল রপতুর্ন। সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলোর মুখে মুখে ভাঙ্গল
আরক্ত আলোকচকর ও গুরু গুরু বাজের বনক। আউর্ড ও মুস্টে চুটে বগাঝানে গিরে ঠাড়াইলেন—
অস্বাভাবিক বৈকিরাও প্রেবীক হয়ে থল করলে নিজের নিজের আরগ।

● 'ବିବାହନା, ପରାଜୟେ ଶୀତା-ମହା'
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାରୀ ବାସ



মটির উপর পড়ে গেলেন জেনারেল টেরিলস, তাঁর বাগে বিদ্ধ হয়ে
তার ডরগে। [পৃষ্ঠা ৩০০]

দেব দেউল

থ্যাক্ থ্যাক্ করে ফুঙ্ক করে টেরিলন বলে উঠলেন, “পাজী জানোরারের দল ! আমাকে ভৃত্তো পরবারগু সময় দিলে না !”

অধিকাংশ রণরকিবীরই সখল বসম ও তীরগু বটে, তবে অনেকের হাতে বন্দুকও ছিল। ঝাঁকে ঝাঁকে বাণের সঙ্গে গরমাগরম বুলেটও ছুটোছুটি করতে লাগল গুণিত ঘুরোপীরদের খেত অল্প ভিত্রময় করবার জেতে।

কাটা গাছের ঝড়ি ও বালিভরা থলের আড়ালে আয়োগোপন ক’রে বেরলও বন্দুক তুলে বুলেট-গুটি করতে লাগলেন।

এক আয়গার শ্রোগো পেয়ে একদল রারবাখিনী ফরাসী ফোজের মাঝখানে ঢুকে পড়বার চেষ্টা করলে, ফরাসীদের প্রচণ্ড অগ্নিগুটিকে তারা একটুও আমলে আনিলে না।

বা্যাপার ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠল। বার্তাবচ উর্দুখালে ছুটে এসে নতুন বিপদের খবর আনিলে।

টেরিলন চাঁৎকার ক’রে বললেন, “ক! ভগবান ! আচোশিরা আমাদের একটা কামান কেড়ে নিরেছে ! আমাদের একজন সৈনিকেরও মাথা কাটা গিয়েছে !”

বেরল বললেন, “নিশ্চয় ঘুমোচ্ছিল। যেমন কর্ষ তেমন ফল !”

তেড়ে এল একঝাঁক চোখা চোখা বাণ, চটপট সেখান থেকে চম্পট দিলেন টেরিলন ! বেরল হুঙ্ককেত্রের বিকে দৃষ্টি প্রসারিত করলেন।

রারবাখিনীদের আর একটা দল খেয়ে এল—ফরাসীদের কামানগুলো করলে প্রচণ্ড অগ্নিগুটি।

হতাহত হয়ে একটা দল ভেঙে যায়—কিন্তু তুরন্ত তেড়ে আসে নতুন আর একটা দলের শত শত বীরঝনা ! তাদের মরণভর নেই—তারা মরতে মরতেও মারতে চাইবে !

ঘোড়োতে ঘোড়োতে হুসেট ডাকলেন, “গতর্নর বেরল ! গতর্নর—” কথা আর শেষ হ’ল না—শোনা গেল ধগুকের টংকার শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে তরুণ হুসেটের দেহ পপাত ধরনীতলে ! একটা বাণ তার কণ্ঠে এবং আর একটা বাণ বিক হয়েছে তার চক্ষে !

জন ছয় নারী-বোদ্ধা ধন্থনে গলার চ্যাচাতে চ্যাচাতে বসম উচিরে ফরাসী বাহুর ভিতরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মরিয়ার মত।

বেরল বন্দুকের ঝুঁঝোর চোটে একজনর মাথা চুরমার ক’রে দিলেন, গুলি ক’রে বেরে কেমনে আর একজনকে এবং তৃতীয় তরুণীকে ধরাশায়ী করলেন বেওনেটের ঘোঁচার। চতুর্থও পঞ্চম জন মারা পড়ল অজ্ঞাত সৈনিকের কবলে। বটজনও পাহিরে বেতে বেতে মরণাহত হ’য়ে মাটির উপরে আরড়ে পড়ল।

● ‘বীরঝনা, পরাক্রমে ভীমা-সনা’

ঐহবেজুনার দার

দেব দেউল

২৪৯

আপাতত এই পর্যন্ত।

বেহান্জিনের দ্বারা প্রেরিত প্রথম দলের আক্রমণ ব্যর্থ।

বেয়ল বললেন, “ত ভগবান, আবার যদি আক্রমণ হয় তাহলে আমাদের আর রক্ষা নেই।”
মাথার ঘাম মুছতে মুছতে তীক্ষ্ণ চোখ বুলাতে লাগলেন এদিকে ওদিকে। দিবারের উপরে বাকদের
ধাওয়া জমে আছে মেঘের মত।

একটা সিগারেট ধরিয়ে বেয়ল চারদিকে আর একবার চোখ বুজিয়ে নিলেন। মাঠে চেয়ে
আছে নারী-সৈনিকদের শতশত আড়ষ্ট মূর্তিদেহ।
ফরাসী সৈনিকদের দেহও দেখা যাচ্ছে এখানে
ওখানে। সেই মর্মস্থর রক্তরঞ্জিত দুল্লভের উপর
থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে তিনি মনে মনে
বললেন,—আহোসিরা! যে খেলাঘরের সপাই নয়,
অংশা করি টেরিলন এতক্ষণে তা দপ্তরমত সময়ে
নিয়ন্ত্রে!

ঠাঁ, সে লম্বা সন্দেশ নেই। যে কামানটা
আহোসিরা কেড়ে নিয়েছিল, সেটা আবার দখল
করবার জন্তে টেরিলন পাঠিয়েছিলেন চল্লিশজন
ফরাসী সৈনিক। কামানটা পুনরধিকার ক’বে
ভায়া ফিরে এসেছে বটে, কিন্তু পিচনে মাঠের
উপরে রেখে এসেছে আঠারো জন সঙ্গীর মৃতদেহ।
টেরিলন ও আউর্ডার্ড এতক্ষণ পরে বেয়লের
পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বেয়ল বললেন, “এইবারে সমগ্র নারী-
বাহিনী আমাদের আক্রমণ করতে আসবে। এট
দ্বিতীয় আক্রমণ ঠেকাতে না পারলেই সর্বনাশ!”

টেরিলন বললেন, “আমাদের কামানগুলো প্রস্তুত হয়েই আছে। দ্বিতীয় দলের লৈঙ্গসখা
কত হতে পারে?”

—“অন্তত তিন হাজার।”

—“কিন্তু কামানের বিরুদ্ধে ধত্বকের তীর কি করতে পারে?”



একটা অর্ধাধ বাণ এসে কাপ্তেন আউর্ডার্ড-এর মূখ ঘেঁষে ধরে গিলে।
[পৃষ্ঠা ২৪৯]

● ‘বীরামনা’, পরাক্রমে ভীমা-দম্বা
শ্রীযেবেন্দ্রকুমার রায়

দেব দেউল

বেয়ল বললেন, “ও প্রহের উত্তরে হুসেট কি বলে শোনো না !”

টেরিলন বললেন, “হুসেটের মৃত্যু নিয়ে কি তুমি কৌতুক করতে চাও ?”

বেয়ল অবাধ দেবার সময় পেলেন না। কারণ দূর থেকে রক্ষীর উচ্চকণ্ঠে ভয়াল ধ্বনি আগল—
“আহোসিরা আসছে ! আহোসিরা আসছে !”

সাত

বেয়ল বললেন, “এবারে ওরা সহজে ছাড়বে না, মরণ-কামড় দেবার চেষ্টা করবে !”

আবার শুরু হয়ে গেল কামান-বন্দ্যুকের বহু-চংকার ! কিন্তু নারী-ক্ষৌভের অগ্রগতি বন্ধ হ’ল না—
—সারির পর সারি বজ্র-তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত আঁচড়ে আঁচড়ে পড়তে লাগল ফরাসী-বাহের উপরে। করাসীদেব অগ্নিস্রষ্টর তোড়ে হতাহত শত্রুরা যেখানে যেখানে পড়তির মধ্যে কীক সৃষ্টি করে, সেইখানেই নূতন নূতন রণরঙ্গিণী আবির্ভূত হয়ে কীক ভরিয়ে তোলে। নিকিপ্ত বলম ও তীরের আঘাতেও করাসী সৈনিকরা রক্তাক্ত পৃথিবীর উপরে লুট্টরে পড়ে। শত শত সন্ধিনীর মৃত্যুও আহোসিদেবের সেই ভয়াল অগ্রগতি রুদ্ধ করতে পারলে না—তাদের কাছে মৃত্যু যেন ধর্তব্যের মতোই গণ্য নয় ! বত লোক মরে, তত যেন বাড়়ে বীরবাহাদেবের মরণানন্দ !

বেয়ল হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, “ওরা উন্মাদিনী, ওরা হার মানতে আনে না !”

আচম্বিতে জেনারেল টেরিলন মাটির উপরে আঁছাড় খেয়ে পড়লেন, তীক্ষ্ণ বাণে বিদ্ধ হয়েছে তাঁর উরুবেশ। একহাতে বাণটাকে কতদূর থেকে টেনে বার করতে করতে নিজের হৃদয়িত রক্তলতার তুলে তিনি সমানে শুঁকি চালাতে লাগলেন।

সামনেকার আগের খানিকটা বিচ্ছিন্ন করতে পেয়ে বীরস্বনারা বাহের গভীরতম অংশে ঢুকে পড়বার ভ্যেত আক্রমণের পর আক্রমণ চালাতে লাগল। বত আক্রমণ ব্যর্থ হয়, তত তাদের বেধ বেড়ে ওঠে—যেন হাজার জন গাণ দিলেও তারা আক্রমণ করতে ছাড়বে না ! কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হ’ল না, করাসী কামানগুলো অল্পশ্র অগ্নিময় গোলা নিক্ষেপ ক’রে তাদের চৈকিরে রাখলে শেষ পর্যন্ত। অসংখ্য নারী-সৈনিকের মৃত্যুবেহ স্পষ্টীকৃত হয়ে উঠল রণক্ষেত্রে।

তারপর আচম্বিতে ! দূর থেকে রাজা বেহান্জিনের রণশিঙা বেধে উঠে আক্রমণের মত বুদ্ধে লবাস্ত্রধোষণা করলে ! এক হুহুর্ভে, একসঙ্গে প্রত্যেক নারী-সৈনিক ক্রিয়ে দাঁড়িয়ে রণক্ষেত্র থেকে অব্যুত হয়ে সেনা হুহুধের মত !

রাজার আবেশ অবোধ !

বেয়ল বললেন, “রাজার হুকুম না পেলে ওরা এখনো আঘাতের ছাড়ত না !”

‘বীরস্বনারা, পরিক্রমে তাঁরা-সবার’

‘বীরস্বনারা, পরিক্রমে তাঁরা-সবার’

তীরটা উপড়ে ফেলে ক্ষতস্থানে 'ব্যাণ্ডেজ' বাঁধতে বাঁধতে টেরিলন বললেন, "তবু ওরা আমাদের কখনোই হারাতে পারত না!"

বেয়ল মুখে মত জাহির করলেন না, কিন্তু মনে মনে বললেন, উক্ত! নিষ্পৃহের ঢেঁকি!

রক্তগন্ধা বয়ে-বাওয়া মৃত্যুভীষণ রণক্ষেত্রের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করলেন। আত্মজী তিসাবে তাঁর মনে হ'ল, ওখানে প'ড়ে আছে অস্তুত একহাজার বীরাজনার শবদেহ।

তিনি পা চালাতে চালাতে বললেন, "টেরিলন, থানিকটা মদ না হলে আমার আর চলবে না। আমি নিজের তীব্রতৈ যাচ্ছি।"

টেরিলন বললেন, "আমিও শীঘ্রই তোমার কাছে গিয়ে বিজয়দ্বাংসবে যোগদান করব।"

আট

নিজের পটগৃহে বসে বেয়ল লোকমুখে ফরাসীপক্ষের হতাশের খবরাখবর নিলেন।

ফরাসীদের পরাস্তর জন সৈনিক মৃত্যুমুখে পড়েছে। আহতদের সংখ্যা আরো অনেক বেশী। মৃতদের মধ্যে ছিলেন বাক্যবাগীশ ক্যাপ্টেন আউডার্ডও। প্রত্যাবর্তনের সময়ে বীরাজনারদের একটা অব্যর্থ বাণ এজীবনের মত তাঁর মুখের মুখ মৌন ক'রে দিয়ে গেছে।

আচম্ভ্য তীব্র একটা ছায়াময় প্রাস্ত থেকে গঞ্জিত কণ্ঠস্বরে শোনা গেল—"ওরে ফরাসী শূকর, আজ আর আমার হাত থেকে তোর নিস্তার নেই।"

সবিস্ময়ে বেয়ল কয়েক পদ পিছিয়ে গেলেন। তাঁর দৃষ্টির সামনে এসে পাড়াল ক্রোধভীষণ, দীপ্তনয়না নালিকা স্বয়ং! ধনুকে বোজন করেছে সে এক শাপিত তীর! একান্ত অত্যাধিত দৃশ্য!

বেয়ল লাক ঘেরে একটা রিভলভার হস্তগত করলেন, কিন্তু সেটা ব্যবহার করবার আগেই নালিকার নিকশিত তীর এসে তাঁর স্বক্বেদে বিন্দীর্ণ করলে, মাটির উপরে প'ড়ে গেল রিভলভারটা।

হিংস্র অস্ত্রের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে নালিকা ক্ষিপ্ৰচক্রে চকচকে ছোঁরা তুলে তাঁকে আঘাত করতে গেল, কিন্তু বিদ্রাঘবেগে পাশ কাটিয়ে বেয়ল সে চোট সামলে নিরে একলাফে গিয়ে পড়লেন নালিকার উপরে—ধাক্কার চোটে তার হাত থেকে ছোঁরাখানা মাটির উপরে প'ড়ে গেল বন্-বন্ শব্দে! পরমুহূর্তে গৃহভলে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন ড'অনেই—নীচে বেয়ল, উপরে নালিকা।

হাঁটু দিয়ে নালিকা এত জোরে বেয়লের তলপেটে আঘাত করলে যে তিনি নুত্বিত হয়ে পড়তে পড়তে কোনরকমে নিষেকে সামলে নিলেন।

তারপর চোখের নিম্নে মাটির উপর থেকে একরাশ ধূলা তুলে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে মারলেন নালিকার চোখে। সুহৃৎকেইর অস্ত্র নালিকা অক্ষ!

সেই অবসরে শত্রুর হাত ছাড়িয়ে বেরল টপ্ ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের তরবারিখানা টেনে নিলেন, কিন্তু ততক্ষণে নালিকাও চকিতে আবার তাঁর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তরবারিসুদে হাত সজোরে চেপে ধরলে। এবং কি আশ্চর্য শক্তির অধিকারিণী এই বীরনারী, তার প্রবল হাতের চাপে বেরলের শিথিল হুষ্টি

থেকে খ'সে পড়ল তরবারিখানা!

নালিকা যেই হেঁট হয়ে তরবারি ফুড়িয়ে নিতে গেল, বেরল দিলেন তাকে এক প্রচণ্ড ঠেল'। পরসুহৃৎই নিজের কোমরবন্ধ থেকে বার ক'রে ফেললেন দ্বিতীয় একটা রিভলভার।

চরম আঘাত হানবার অস্ত্রে নালিকা তরবারি তুলে তেড়ে এল তাঁরবেগে।

বেরলের রিভলভার গর্জন করলে একবার, চ'বার!

নালিকার দেহ হ'ল ভূতলশায়ী।

বাহির থেকে ফরাসী সৈনিকরা তাঁর-বেগে তাঁর ভিতরে প্রবেশ করল—সকলের পিছনে পিছনে টেরিলেন।

হাঁপাতে হাঁপাতে জ্ঞান হালি হেসে বেরল বললেন, “আজ আমি হুঁতিমত্তী সুহৃৎর কবলে গিয়ে পড়েছিলাম!” তারপর বিবশ হয়ে বসে পড়লেন।



বেরলের রিভলভার খর্জন করে উঠল একবার, দু'বার!

অবশিষ্ট

রপাঙ্কনে বীরাজনারায়ের সেইই হচ্ছে শেষ রণরঙ্গ।

তার লাভ নষ্টাই পরে হাঝা। বেহান্জিন নারী-সেনাদের তাড়া হল আর পুরুষ সৈনিকদের নিয়ে

১ ‘বীরাজনা, পরাক্রমে ভীষা-সবা’

ক্রিবেকেন্দ্রকুমার দাস

আর একবার বাধা দিতে অগ্রসর হন, কিন্তু শোচনীয়রূপে হেরে যান। তারপর কিছুকাল বনে-বাগানে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়ে অবশেষে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলেন। এবং ফৌজ ও অসুস্থগণ ছেড়ে মেরোও আবার অন্তঃপুরে কিরে গিয়ে হেঁসেলে ঢুকে হাতা-পুস্তি নাড়তে লেগে গেল।

আজ কিন্তু চাক। আবার ঘুরে গিয়েছে।

আটান বৎসর আগে, ডাচোমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে গিয়ে দেশের শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছিল বীরবালিকা নালিকা।

কিন্তু আজ আর ডাচোমি পরাধীন নয়। যুগধর্মের গতি বুঝে ফরাসীরা আজ ক্রান্তর উচ্চালন ছেড়ে নেমে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। ডাচোমির বাসিন্দারা আজ স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী।

শান্তিলাভ করেছে নালিকার আত্মা।



জোনাথান কথা

এ ডল্‌স্‌ হাউস্‌ (ইব্‌সেন)

রাজনীতির ইতিহাসে যেমন দেখা যায়, ঠাণ্ডা একজন অভ্যুত্থানকারী বিপ্লবী এসে শতাব্দীর ব্যবস্থাকে উলটে পালটে সম্পূর্ণ নতুন ব্যবস্থা স্থাপন করে যান, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, ঠাণ্ডা একথাই বই এসে মানুষের শতাব্দীর চিন্তাধারাকে ছেঁকে চুরচুর করে একটা নতুন চিন্তাধারার প্রবর্তন করলো। নরওয়ের জনগণ্যাত সাহিত্যিক ইব্‌সেনের দেখা, এ ডল্‌স্‌ হাউস্‌ (পুতুল ঘর) নাটকখানি সেইরকম একখানি যুগান্তকারী বই। এই নাটক থেকে পৃথিবী আজকের আধুনিক নারী, যে নারী সকল ব্যাপারে পুরুষের সঙ্গে অতিযৌক্তিকতার দাবি করে পূর্ণ স্বাভাবিক। পৃথিবীর অগতিশীল প্রত্যেক সাহিত্যের চিন্তাধারার ইব্‌সেনের এই নাটক প্রত্যেকভাবে তীব্র প্রভাব বিস্তার করে এবং এই নাটকের প্রত্যেক পৃথিবীর প্রত্যেক সভ্যতায় মানুষ, পুরুষ ও নারীর সম্পর্কে নতুন করে দেখতে প্রেরণা পাঠ। এই নাটকের নারীকানোরা আজকের বাস্তবতা-কারী আধুনিক নারীর পথ-প্রদর্শিকা। বোরা শিক্ষিতা ঘেরা, তার বাবী হেল্‌মার সন্তান সবারের একজন। সারাজে ছোটগাটে। ঘটনা থেকে বাবী স্ত্রীর নতুন হতে থাকে এবং বাবী নিজের কর্তৃত্বের দাবিতে সব জিনিস চাপা দিতে চান। বোরা সাধারণ ঘরের মজন বাবীর সঙ্গে কুৎসিত কথকাঁ করেন না, তিনি বাবীকে বোরাতে ছোট করেন যে, স্ত্রী-হিসাবে তার একটা স্থান আছে, তাকে বাবী হিসাবে তাকে সম্মান করতে হবে। কিন্তু বাবীর ভুল বোঝার ফলে একদিন বোরার আত্ম-সম্মান-বোবে তীব্র আঘাত লাগে এবং তিনি বাবীর আগর থেকে চলে বাবার সংসার করেন। সেই নবর বাবী তার ভুল বুঝে পারেন কিন্তু বোরা আর করেন না। যে-সবক ভেতর থেকে ছেঁকে ফিঁদে, বাবীর বোকাভাড়া দিয়ে তার বোকা হয়ে চলা কীধরের এক ভুল, তাই সে-পুতুল-ঘর বোরা বোরার পরকন বিপুল বিবে।



—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী

ভোমাইয়ের মাথা যারা কিছুটা বড় হয়েছ, নিশ্চয়ই শরৎচন্দ্রের ‘অরক্ষণীয়া’ পড়েছ। মনে আছে নিশ্চয়, অতুল আশানবাট থেকে নিয়ে এল জ্ঞানদাকে এবং অতুলের-হেওরা অকিঞ্চিৎকর অথচ মহামূল্য ভাঙা কাচের চুড়ির টুকরোগুলোকেও। তার থেকে ভোমাইয়ের মনে এই ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, এর পরে অতুল রূপহীনা কিন্তু অশেষ গুণবতী জ্ঞানদাকে বিয়ে করলে।

চুপি চুপি বলি, জ্ঞানদাকে আমি জানতাম। সে আমাদের পাড়ারই মেয়ে। আমরা তাকে জ্ঞানোদিনি বলতাম। অতুলবাবুকে মনে পড়ে না। আমরা তখন ছোট। সেজন্তেও বটে, আবার অতুলবাবু আমাদের গ্রামে আসতেনও কম। কিন্তু এটা জানি, অতুলবাবু শেষ পর্যন্ত জ্ঞানোদিনিকে বিয়ে করেননি।

এখন ভাবতে পারি, অতুলবারু সেই জাতের লোক, উজ্জ্বলের মুখে যাঁহা মন্ত বড় প্রতিজ্ঞা করে বসেন, কিন্তু কাজের সময় পিছিয়ে যান। জ্ঞানোদিতের বাপের মৃত্যুকালেও তিনি আশা দিয়েছিলেন, রাখেননি। জ্ঞানোদিতের মায়ের চিতাভস্মের সামনেও কথা দিয়ে রাখেননি।

লজ্জায়, দুগায় জ্ঞানোদিত যখন মর-মর তখন কে তাকে বিয়ে করল জ্ঞানো? নগেন চাটুয্যে। তার নাম তোমাদের শোনবার কথা নয়। কিন্তু আমাদের অঞ্চলের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। চুরি-ডাকাতি থেকে আরম্ভ করে হেন দুর্কার নেই যা তার অসাধ্য ছিল।

সেকালে এরকম ব্যক্তিরও বিবাহে অন্তবিধা ছিল না। কত মেয়ের বাপ এই কুলীন-সন্তানকে মেয়ে দেবার জগ্গে উদ্গুধ ছিল। সেই লোক যখন সমস্ত লাভজনক বিবাহ-প্রস্তাব বাঁ হাত দিয়ে ঠেলে কেলে জ্ঞানোদিতকে বিবাহ করার সংকল্প ঘোষণা করল, তখন সবাই অবাক হয়ে গেল। জ্ঞানী লোকের মাথা বেড়ে বললেন, ওরকম বোম্বটে বদমাইশের অসাধ্য কোনো কাজ নেই।

এবং হিতৈষীদের হিতবাক্য, জ্ঞানী লোকের স্পরণামর্শ কিছুতেই জ্বলপ না করে সত্যি একদিন সে জ্ঞানোদিতকে বিবাহ করে ঘরে নিয়ে এল। এমন কি, ওরই মধ্যে সাধারণত ধুমধামের আয়োজনও করেছিল।

নিতান্ত শিশু তো ছিলাম না। হাঁহনাতলায় জ্ঞানোদিত



লক্ষী ঠানবি বললে, ওর কথা আর বলিনি তাই।..... [পৃষ্ঠা ২৫

বসটা বেশ মনে পড়ে। তখন তার বসবার ক্ষমতা নেই, এমন দুর্বল। রোগে-শোকে কালো রংটা সেন আরও কিয়কম হয়ে গিয়েছিল। মাথায় চুল নেই বললেই চলে। তার সেই 'পোড়া কাঠ' মামীই তাকে সম্প্রদান করে।

তা নগেন চাটুযো কখনও জ্ঞানোদিতিকে কষ্ট দেয়নি। মোটামুটি স্তব্ধ-দুঃখে জ্ঞানোদিতির দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু ভ্রমলোক বাঁচলো না বেশীদিন।

একমাত্র সন্তান পটল। যখন সে উচ্চ প্রাথমিক পড়ছে, তখন একদিন দুপুরে নগেন চাটুযো মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা হচ্ছে বলে বিছানা নিলে, সন্ধ্যায় সব শেষ হয়ে গেল।

জ্ঞানোদিতির আবার দুঃখের দিন আরম্ভ হল।

কিন্তু এ দুঃখ আর অরক্ষণীয় কষ্টাকালের দুঃখ এক নয়।

তখন এম. এন্সসি. পাস করে আমি রসায়নে গবেষণা করছিলাম। সেই সময় একটি কেমিকাল ওয়ার্কসে সহকারী রাসায়নিকের চাকরি পেয়ে গেলাম। এর কিছু পরে বাড়ি যেতে জ্ঞানোদিতি এসে উপস্থিত।

—কি ব্যাপার জ্ঞানোদিতি! কেমন আছ?

জ্ঞানোদিতি চিরদিনকার শাস্ত্র অথচ শাস্ত্র মেয়ে। আমার প্রশ্নের উত্তরে শুধু একটু হাসলে।

লক্ষ্মী ঠানদি বললেন, ওর কথা আর বলিসনি ভাই। চিরটা কাল ওর দুঃখেই গেল।

তিনিই জানালেন, ক'মাস হল পটলা নিরুদ্দেশ।

পটলা জ্ঞানোদিতির একমাত্র সন্তান। বয়স বছর দশেক। এই বয়সে সে নিরুদ্দেশ হল? কী হয়েছিল?

হয়নি কিছুই; নিরুদ্দেশও ঠিক নয়। মাস দুই থেকে দশটা করে টাকাও পাঠাচ্ছে মনিঅর্ডারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাতে ঠিকানা নেই?

—আছে। কিন্তু সেটা একটা বাজে ঠিকানা। সেখানে খোঁজ নিয়ে ওর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

জ্ঞানোদিতি মনিঅর্ডারের কুপনগুলো নিয়ে এসে বেঝালে। তাতে সে মাকে প্রণাম দিয়ে তার সম্বন্ধে ভাষতে নিবেদন করেছে। লিখেছে সামান্য একটা চাকরি করছে। কোথায়, কি বৃত্তান্ত, কোনো উল্লেখ নেই।

❊

ঐগরোজকুমার রায়চৌধুরী

দেব-দেউল

২৫৭

বললাম, তাহলে চিন্তার আর কি আছে। অপেক্ষা কর। একদিন এসে পড়বে।
লক্ষ্মী ঠানদি বললেন, হ্যাঁরে, মায়ের প্রাণ! ছেলে একদিন ফিরবে বলে
কি অপেক্ষা করতে পারে ?

বললাম, তা ছাড়া আর উপায় কি বল ?

এবারে জ্ঞানোদিদি কথা বললে : মনিঅর্ডার কলকাতা
থেকে আসে। সুতরাং কলকাতাতেই থাকে। তুই ভাই
একটু গৌজ নিবি ?

আমি মনে মনে হাসলাম। ওদের
ধারণা কলকাতা বৃষ্টি আনাদের এই
পায়ের মতো! ঘরের মধ্যে লুকিয়ে না
থাকলে পথে-ঘাটে একদিন দেখা হয়ে
যাবে।

কিন্তু সেকথা আর ওদের
জানালো না। মুখে বললাম,
নিশ্চয় খোঁজ করব। পেলেই
সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে আসব।

জ্ঞানোদিদি বরা বর ই
স্বল্পভাবিণী। আমার শৃঙ্গগর্ভ
আখ্যাসে তার চোখের কোণ যেন
একটু সজল হয়ে এল। কিন্তু
মুখে কিছুই বললে না। বললেন
লক্ষ্মী ঠানদি। নানারকম বড়
বড় আশীর্বাদ করতে করতে তিনি
জ্ঞানোদিদির পিছু পিছু চলে
গেলেন।

কলকাতায় ফিরে মনে
রইল পটলের কথা। কিন্তু খুঁজব
কোথায় ? চেনা-জানা অনেককে
তার চেহারার বর্ণনা দিয়ে সন্ধানে থাকতে বললাম। তার বেশি আর কী করতে পারি ?
ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।



.....ছেলেটা আমাকে দেখে মুহূর্ত্ত লম্বকে গাড়ালো। [পৃষ্ঠা ২৫৮

ট্রামে-বাসে কিংবা ফুটপাথে নয়।

একদিন বিকেলে অফিস থেকে ফেরবার পথে একটা চায়ের দোকানে চুকে চা-টোস্টের ফরমাশ করলাম।

অপেক্ষা করছি এমন সময় একটা মলিন গেম্ভি-পরা ছেলে ততোধিক ময়লা একটা তোয়ালে-কাঁধে চা নিয়ে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আমাকে দেখে মুহূর্ত খমকে দাঁড়াল তারপর চট করে ভেতরে সরে গেল।

মুহূর্তমাত্র তাকে দেখতে পেয়েছিলাম। মনে হল পটল। যদিচ ঠিক সুরনিশ্চিত হতে পারলাম না। সেইদিকে তাকিয়ে রইলাম। সে কিম্বা আর বাইরে এল না। আমার চা নিয়ে এল অল্প একটা ছোকরা।

কী ব্যাপার!

ছেলেটা হঠাৎ অমন করে গা-ঢাকা দিলে কেন? পটলই হবে নিশ্চয়। বামুনের ছেলে চায়ের দোকানে হরিশ জাতের এঁটো কাপ-প্লেট মাজছে, সেই লজ্জাতেই অমন করলে বোধ হয়।

চা-পান শেষ করে আমি রেস্টোরাঁর মালিককে পটলের ইতিহাস এবং আমার সন্দেহের কথা জানিয়ে ছেলেটিকে ডাকতে বললাম। সে আসবে না। তার সঙ্গীরা একরকম জোর করে তাকে নিয়ে এল।

ঠিক পটল!

রেস্টোরাঁর মালিককে অনুরোধ করতে ভুললোক সানন্দে পটলকে আমার সঙ্গে ষষ্ঠাখামেকের অল্প ছেড়ে দিলেন। তাকে নিয়ে একটা পার্কে এসে বসলাম।

—কি ব্যাপার পটল! হঠাৎ নিকুদ্দেশ হলি। অথচ বাড়িতে টাকা পাঠাচ্ছিস। কিন্তু চিঠিপত্র লিখ না।

পটল কঁদে ফেললে।

অমেকজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কঁদে তারপরে যা বললে তার ভাবার্থ হচ্ছে এই যে, মায়ের দুঃখ সে আর সইতে পারছিল না। দুঃখ-বাদা করে যেটুকু আহার মা সংগ্রহ করতে পারত তার সবটুকুই ছেলের দুখে ভুলে দিয়ে নিজে প্রায়ই উপবাস করত।

তাই দেখে পটল স্থির করে ফেললে, যেমন করেই হোক, মায়ের ষাওয়া-পদার দুঃখ হ্রাস করতেই হবে। কিন্তু কি করে? কতই বা তার বয়স, আর এই বয়সে কীই বা সে করতে পারে!

এমন সময় একদিন পাশের গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে তার পরিচয় হল।

। বা

ঈশ্বরোৎসবের রায়চৌধুরী

দেব দেউল

২৫৯

ছেলেটি কলকাতায় একটা চায়ের দোকানে কাজ করে। তারই সপ্ত খরে সে কলকাতায় আসে। এবং সেই ছেলেটাই তার এই দোকানে কাজ যোগাড় করে দেয়।

তার পরের কথা জানি। মাস মাস দশ টাকা করে মাকে পাঠিয়ে আসছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা মাকে চিঠি দিস না কেন?

পটল মুখ নামিয়ে বললে, লজ্জায়। বামুনের ছেলে, চায়ের দোকানে কাজ করি।

—তুঁ।

তাকে নিয়ে ফের ফিরে এলাম চায়ের দোকানে। মালিককে বলতে তিনি সেই দিন পর্যন্ত ওর মাইনে মিটিয়ে ওকে ছেড়ে দিলেন। ওকে নিয়ে এলাম আমার বাসায়। এবং কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের কোম্পানিতেই ওর একটা বেয়ারার চাকরি ব্যবস্থা করে দিলাম।

চাকরিটা বেয়ারার হলেও আসলে কিন্তু ওকে আমি কাজ শেখাতে লাগলাম। উচ্চ প্রাথমিক পাস করেছিল। রাত্রে আমি ওকে ইংরেজী পড়াই, আর দিনে কারখানায় কাজ শেখাই।

অসম্ভব বুদ্ধিমান ছেলে।

যেমন দ্রুতবেগে সে ওষুধ তৈরির কাজ শিখতে লাগল, তেমনি দ্রুতবেগে এগুতে লাগল তার পড়াশুনা। পড়াশুনাটা কিন্তু স্কুলের ধাঁচে নয়। বাংলাতে বিজ্ঞান আর ইংরেজী ভাষা। অল্প কিছু নয়। স্কুলের ধাঁচে পড়ালে সময় যত যেত, লাভ সে অনুপাতে অল্পই হত। কারখানায় ওষুধ তৈরির কাজে যে-বিজ্ঞান ওর কাজে লাগবে, তাই শুধু পড়াতে লাগলাম।

পটলের পড়ায় নিষ্ঠা আছে। পরিশ্রম করার শক্তি আছে। আর আছে মায়ের উপর ভক্তি। দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে মুখে হাসি ফোটাতেই হবে, এই তার পণ।

এবং এই বে-ছেলের পণ, তাকে সে রূপতে পারে? সমুদ্র দু'কাঁক হয়ে তার জন্তে পথ করে দেয়! পাহাড় মাথা নিচু করে।

অমানুষিক পরিশ্রম করে ছেলেটা। এক গ্রন্থ কারখানায়, আর এক গ্রন্থ বাসায়। কীকি মেবার চেঁকা নেই।

১ বা

ঔলরোজকুমার গায়চৌধুরী

কাজ, শুধু কাজ। কাজের পর্বতপ্রমাণ স্থূপ। আর সেই অভ্রভেদী স্থূপের উপর তার দুঃখিনী মায়ের মৃতি।

কয়েক বৎসরের মধ্যে দেখা গেল, তার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ-মারা উচ্চতর নেতনের কর্মীদের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান যত বেশীই হোক, যে বিশেষ কাজে তারা সবাই লিপ্ত সেই বিশেষ কাজে তার জ্ঞান এবং সজ্ঞনীযুক্তি তাদের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়।

অথচ বিনয়ী। অহংকারের ছায়ামাত্র নেই। সকল সময় সকলের সে শিষ্ট। জিজ্ঞাসু। জানতে চায়, শিখতে চায়। তাই সকলেই তাকে স্নেহ করে। তার উন্নতিতে কেউ হিংসা করে না। বরং সকলেই খুশী।

মাইনে যখন তার একশো হল, বললাম, পটল, এইবার তোর মাকে নিয়ে আয়।

পটলও যেন সেই কথাই ভাবছিল। যেন আমার মুখ থেকে প্রস্তাবটা না বার হওয়া পর্যন্ত সে সাহস করে বলতে পারছিল না।

দিন কয়েকের মধ্যে একটা ছোট বাসা দেখে মাকে গ্রাম থেকে নিয়ে এল। জ্ঞানোদিসি বাঁচল। ছেলেকে ছেড়ে সে থাকতে পারছিল না। মাকে মাঝে অবশ্য পটল বাড়ি যেত। কিন্তু সে কতটুকু ক্ষণের জ্ঞেহ! মায়ের প্রাণ তাইতে বাঁচে? শনিবার রাত্রে পায়, আবার রবিবার রাত্রে ছেড়ে দিতে হয়।

কোথায়?

কলকাতায়। কে জানে সে কেমন জায়গা! সেখানে অসংখ্য মানুষ নাকি পিঁপড়ের মতো গিলগিল করে ঘুরে বেড়ায়। আর কেউ কাউকে চেনে না! জ্ঞানোদিসি ভেবে পায় না, মানুষ সেখানে থাকে কি করে?

কলকাতায় এসে কিন্তু জ্ঞানোদিসি খুব খুশী হয়ে গেল। সেটা অবশ্য কলকাতার জ্ঞেহ নয়। তার কলকাতা তো! এককালি বারান্দার উপর একটাবানি রামাঘর, কলকাতা, আর শোবার-ঘর। এর বাইরে যদি কোথাও যায় তো আমার বাসায়। তাও কালে-ভদ্রে।

বললে হাসে। বলে, সময় কই রে!

আমি বলি, বল কি জ্ঞানোদিসি! তোমাদের মা-ব্যাটার তো রামা। এক বেলা রেখে দু'বেলা খাও। বিষবা মানুষ, তোমার কষ্ট হবে বলে পটল রাত্রে তোমাকে রামাঘরে যেতে দেয় না।

● যা

ঐনগোবিন্দনার রায়চৌধুরী

একগাল পরিতৃপ্তির হাসি হেসে জ্ঞানোদিসি বলে, তাও শুনেছিস্।

—শুনব না? তাহলে তোমার কাজটা কি শুনি।

জ্ঞানোদিসি উত্তর দিতে পারে না। বলে, কি জানি ভাই। ঋণিকটা রাত থাকতেই ঘুম ভাঙে। সেই থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি করে যে কখন কেটে যায়, টের পাই না।

আমি কিন্তু টের পাই। ওর চোখ থেকে, মুখের হাসি থেকে, ওর আনন্দ-চঞ্চল চলাফেরা থেকে। কিন্তু সেকথা আর বলি না।

জিজ্ঞাসা করি, সিনেমা দেখলে?

—না ভাই।

—কাল রবিবার আছে, চল না। তোমাদের বৌও বলছিল।

তাড়াতাড়ি জ্ঞানোদিসি বলে, না ভাই। আমার সময় হবে না। তুই বৌকে নিয়েই যা।

—ঠাকুর-দেবতার বই জ্ঞানোদিসি। ভালো বই।

—ঠাকুর-দেবতা মাথায় থাকুন ভাই, আমার স্ত্রীশা হবে না।

—কালীঘাট দেখেছ?

—না ভাই।

—তা কাল সকালে সেইখানেই চল। আদিগঙ্গায় চান করে মা-কালীকে দর্শন করে আসবে।

জ্ঞানোদিসি অস্থির হয়ে ওঠে : সে আর একদিন হবে ভাই। কাল সময় হবে না।

—কেন, কাল কী আছে?

—আছে অনেক কাজ। ঝাঁড়া তোর চা করে নিয়ে আসি।

বলে যেতে গিয়েই কিন্তু থমকে ঝাঁড়ায়।

—কি হল? আবার ঝাঁড়ালে কেন?

জ্ঞানোদিসি লজ্জিতভাবে হেসে ফেলে : চা, চিনি, গরম জল, দুধ নিয়ে এলে তুই করে নিতে পারবি?

—কেন, তোমার কি হল?

জ্ঞানোদিসি আবার তেমনি করে হাসে : চা'টা আমার ঠিক আসে না। সাতজন্মে করা তো অভ্যাস নেই।

—কেন, পটল তাই বলে বুঝি?

দেব দেউল

—মুখে বলে না বটে, কিন্তু ওর মুখ দেখে বোঝা যায়।

ঠাণ্ডা পুণ ঘনিষ্ঠভাবে আমার কাছে সরে এসে বলে, অনেক চেষ্টা করলাম, কিছুতেই চল না। শেষে কি করলাম জানিস ?

—কি ?

—পটল জানে না, ওঘরে আরেকটি বৌ আছে তাকে দিয়ে ক'দিন থেকে করিয়ে নিচ্ছি। তা সে গেছে বেড়াতে। নইলে তোর চা'ও তাকে দিয়েই করিয়ে নিতাম। তুই ভাবতিস,

বাসা দিয়ে বলি, আমি কিছুই ভাবতাম না। শোন, এইবার পটলের একটি বৌ নিয়ে এস। তাতলে আর চায়ের অন্ত্রবিদ্যা থাকবে না।

জ্ঞানোদিদি উজ্জ্বল হয়ে উঠল : সেই কথাই ক'দিন থেকে ভাবছি। একটি ভালো মেয়ে দেখে দে না ভাই।

—কি রকম ভালো ?

একটু কুস্তিও ভাবে জ্ঞানোদিদি বললে, আমার ছেলে কালো। বৌ কিন্তু আমি সোন্দর চাই। আর দেনা পাওনা,

—বল।

—ছেলে তো খারাপ নয়, দেবে নাট দা কেন ? বল।

আমার বলার কিছু ছিল না। ছেলে কালো, অবশ্য মায়ের মতো মিশ্কালা নয়, তবু কালোই। সুওরাং সুন্দরী পারী চাই। এবং ছেলে যখন ভালো মাইনে পায় তখন দেওয়া খোঁয়াও ভালো হতে বাধ্য।

কিন্তু আমি অগ্নি কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম, মা যখন মৃত্যু-শয্যা তখন ষাট বছরের এক বুড়ার পায়ে নিজেকে সঁপে দেবার জগে অন্ধকারে নিজে-নিজেই জ্ঞানোদিদি কী অশ্রু প্রস্রাধনই না করেছিল! সে সজ্জা চোখে না দেখলেও কল্পনা তো করতে পারি। একমাত্র সন্তানের দিকে চেয়ে না হয় জ্ঞানোদিদির পৃথিবী গেছে মুছে। পটলই তার পৃথিবী। কিন্তু সেই সঙ্গে তার নিজের অতীতও কি মুছে গেছে!

"মুরকাটা বাবা"

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

যে সময়ের কথা বলছি সে সময় দেশ বন-ভঙ্গলের আঁচ ছিল না—ঘটনা ক'রে খাড়া পুতে বন-মহোৎসব করতে হত না। ভঙ্গলের জ্বালায় মাদ্রাসা স্থগিত হয়ে উঠত।

একশ বছরেরও সামান্য একটা আগেব কথা। ১৮৭০ সালের প্রায়কাল। এখন যেটাকে উত্তর প্রদেশ বলা হয়—তাবই একাংশকে তখন বলা হত অযোধ্যা প্রদেশ, ঘটনাটা ঘটেছিল সেইখানকারই এক জমিদার।

ইতিহাসে নেই এ কাহিনী। এমন কত কাহিনীই তো ইতিহাসে নেই। জনশ্রুতিতে পেয়ে আছে এসব। হয়ত মুখে মুখে কত ঘটনার বিবরণ বদলে গেছে,—কত বড় চড়েছে হাত কিছু লম্বা আছে—হয়ত ভাঙ নেই। এ গল্পও লোকের মুখে শোনা। কাহিনীতে থাকতে মৃণুবোমশাইয়ের কাছে শুনেছিলুম। তাঁর সেজ ঠাকুরা, অর্থাৎ বাবার সেজকাক—বলেছিলেন এ গল্প। তিনিও তখনই প্রবেশই ছিলেন। লক্ষ্যেই আটকে পড়েছিলেন, পেয়ে ফিরবেন এ আশা ছিল না—বার বার গুলব রটেছিল তিনি মরেই গিয়েছেন। একবার নাকি তাঁর শাক্ষাৎস্বরূপ আয়োজন করা হয়েছিল।

বিচিত্র কাহিনী।

সীতাপুরের লোকও কেউ কেউ এ কাহিনী জানে। এখনও বুড়োতুড়ো লোকের মুখে শুনেও পাওয়া যায়, লেঙ্গী সাহেবের যেম আর তাঁর বাজাকে এক চাঁচুর দিগাহীর ভাত থেকে বাচিয়েছিল এক কঙ্ককাটা ভূত—ওদের ভাবার বার নাম 'মুরকাটা বাবা'।

কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু জানে না ওরা, ঘটনার পূর্ণ বিবরণও দিতে পারে না। সবটা বলেছিলেন আমাকে মৃণুবোমশাই। সেই গল্পই বলছি।

লেঙ্গী সাহেব থাকতেন সীতাপুরে কিন্তু এই ঘটনা ঘটবার কিছুদিন আগেই তাঁকে টানাও চলে

যেতে হয়। অরুণী কাজে যাওয়া—দ্বী-কড়া নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু অল্প সময়ের মত নিশ্চিন্ত হয়ে রোধে যেতেও পারলেন না, কারণ তখনই কিছু কিছু গোলমাল শুরু হয়ে গেছে—বাতাসে বড় রকম একটা ঠগোঁগের পূর্ণাভাস। অবশ্য এতটা যে হবে তা তখনও লেন্সী সাহেব স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। তবু সাবধানের বিনাশ নেই, এই হিসাবেই জমাদার গঙ্গানন্দন তেওয়ারীকে ডেকে পাঠালেন। তেওয়ারী এলে তাঁর চাত ধরে বললেন, ‘গঙ্গানন্দন, তোমাকে আমি কোনদিন তাঁবেদার বলে ডাবিনি—বন্ধুর মতই দেখেছি। আজ সেই দাবিতেই তোমার ওপর আমি আমার দ্বী আর মেয়ের ভার নিয়ে যাচ্ছি। যদি কোন গুণগোল বাধে ওদের তুমি বোঝো—’

‘বড় শক্ত কাজের ভার দিচ্ছেন সাহেব। যে রকম সুনতি যদি সে রকম এখানেও কিছু হয়—পারব কি বাঁচাতে!’

‘তোমার দগাশাখা চেষ্টা করবে বোলা—তাতেই আমি শুলী। তোমার ওপর সে বিশ্বাস আমার আছে।’

‘তবু গঙ্গানন্দন চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। খুব শুকিয়ে উঠছে তাঁর, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। লেন্সী সাহেব উঠে তাঁর চাতটা চেপে ধরলেন, তোমার কাছে ভিক্ষা চাইছি তেওয়ারী! নতজানু হয়ে ভিক্ষা চাইছি!’

‘ভিক্ষা সাহেব! আমাকে অপরাধী কববেন না। আমার যতটা সাধা ততটা করব—তবে সে সাধা কষ্টকূড়া বলতে পারি না!’

‘তুমি কথা দিচ্ছ—যা সাধা করবে?’

‘কথা দিচ্ছি—প্রাণপণে করব। আন করুল। প্রাণে আমি—প্রাণেরে কপার খেলাপ হয় না।’ লেন্সী সাহেব নিশ্চিন্ত মনে উনিও যাত্রা করলেন।

তার অল্প কয়েকদিন পরেই বলতে গেলে আগুন জ্বলে উঠল—চারিদিক বেড়ে, দাবানলের মত। গঙ্গানন্দন খুবলেন যে এখানে থাকলে যেমসাহেবের তিন বাঁচাতে পারবেন না—তাঁর সাহায্য বাইরে চলে যাবে অবশ্যই। কোনমতে ওদের সরিয়ে দেওয়া দরকার—নিরাপদ কোন জায়গায়।

কিন্তু সে জায়গা কোথায়? পাঠাবেনই বা কী করে?

সাহেব তো সাহেব—এদেশী লোকের কন্যা চাষড়া দেখলেই কেটে ফেলছে।

অনেক ভাবলেন গঙ্গানন্দন। শিশাহীঘের সামনে ‘আংরেজ’দের প্রাণভরে গালাগাল দিতে শুরু করলেন। তাতে তাঁর লবড়ে ডাবের লবধি ঢুল। তাঁর সামনেই খোলাখুলি সব কথা আলোচনা

● “দুয়কাটা বাবা”

গজেন্দ্রকুমার বসু

করতে লাগল। তার কলে অনেক খবরই সংগ্রহ করলেন গঙ্গানন্দন। ভাবলেন, কোনমতে মানুষদের সীমানা পেরিয়ে যদি উত্তর-পূর্ব দিকে যেতে পারে তো অতটা ভয় নেই—উত্তর দিকের কোনও ভয় নেই, আর বাংলার পড়লে তো কথাই নেই। বাঙালী মনে-প্রাণেই রক্তের পাত্ত।

কিন্তু মানুষবাদ পর্যন্ত রাস্তাও কম নয়। এদিকে সিপাহীদের হাটিও বিস্তর, তাড়াহুড়া এ অঞ্চলের বেশীর ভাগ আয়গীরদারই ইংরেজের ওপর চট। ডালচাউদীর কলুমে অনেকটাই কবিতাও হয়েছে, তাড়াহুড়া লোকের নবাবকে অমনভাবে গদিচ্যাত করাতে ভয়ও ধরে গেছে তাদের।

সুতরাং?

অনেক ভেবেচিন্তে গঙ্গানন্দন দেখলেন লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলের রাস্তা ধরাই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। জঙ্গলের অভাব নেই এ অঞ্চলে, বন্যবন বনের পথ দিয়ে যেতে পারলে হয়ত কোনও দস্যব গন্তব্য স্থানে পৌছনো একেবারে অসম্ভব হবে না।

তবু যতটা পারলেন সতর্ক হলেন গঙ্গানন্দন।

অনেক কষ্টে, অনেক টাকা নগদ দিয়ে, আরও অনেক টাকার লোভ নিয়ে এক মুসলমান গাড়িওয়াকে ঠিক করলেন। সে মেমসাহেবদের নিয়ে যেতে রাজী হল কিন্তু একটি শর্ত—ওদেরও বোরখা পরে যেতে হবে। মুসলমানের সঙ্গে বোরখা পরা মেয়েকে দেখলে তারই আত্মীয়া ভাববে—অত সন্দেহ করবে না। তাড়াহুড়া পূর্ণানন্দন মেয়েরাই বোরখা পরে, সুতরাং চুট ক'বে কেউ মুখ দেখতে চাইবে না। কথাও বলতে হবে না। পরা পড়বার ভয় কম। গঙ্গানন্দন তাইতেই রাজী হলেন।

বোরখাও দুটো যোগাড় হ'ল। তারপর একদিন সন্ধ্যাবেলায় অংশরের স্ত্রীযোগ নিয়ে গাড়ি ছাড়লে আল্লাবঙ্গ। গাড়ি অর্থাৎ 'বয়েল' গাড়ি, যাকে এদেশে গো-গাড়ি বলে। তার ওপর শুধুনা ঘাস বিছিয়ে মেমসাহেবদের বসবার আয়ত্তা করা হ'ল। চামড়ার মশক ক'রে তুল এবং হুন-লঙ্কা-মাগানো ঘোটা ঘোটা কুটি ক'খান দিয়ে বেড়া হ'ল—পরের সখল। জঙ্গলের পথ—পাড়া-খাবার নিয়ে কে বসে থাকবে? এই প্রচণ্ড গরমে জলও খুব শুকনো নয়। খাবার কিনতে বা জলের খোঁজ করতে লোকালয়ে বাওয়ায় কথা তো ভাবাই যার না।

আল্লাবঙ্গ গাড়ি ছাড়বার প্রচরথানেক পরে গঙ্গানন্দন আর তাঁর ভেলে শিউনারায়ণও বসনো হলেন দুটো ঘোড়ার চেপে। সঙ্গে দাওয়া কোন পক্ষেই নিরাপদ নয়—অথচ একেবারে আল্লাবঙ্গের ওপর তয়লা করে ছেড়ে বেড়াও দায় না এই বিপদের মধ্যে। গঙ্গানন্দন স্থির করলেন ইংরাজ খুব থেকে ওদের কিছু কিছু থাকবেন, যদি তেমন প্রয়োজন হয় তো লামনে এগিয়ে যাবেন—নয়ত দূর। ভালর ভালর কোন নিরাপদ এলাকার পৌঁছে গেলে দূর থেকেই বিশ্রাম নেবেন।

● “বুরকাই” বাবা”
গজেন্দ্রকুমার মিত্র

গঙ্গানন্দন কথা দিয়েছেন লেঙ্গী সাহেবকে—তঁার বগাখাধা করবেন তাঁদের বাঁচাবার জন্ত—
জান কবুল !

ভয় ছিল থররাবাদ পগন্ত। কারণ ঐ অবধি লোকালয়। তারপরই গাড়ি চুকবে ঘন জঙ্গলে।
নেচাত বয়েল গাড়ি বলেই তরত গেতে পারবে, তাও হয়ত ড একটা গাছপালা কেটে নিতে হবে
মধ্যে মধ্যে—সেজ্ঞে আল্লাবল্ল কুতুলও নিয়েছে একটা। এ জঙ্গলে জনবসতি নেই—পাকার মধ্যে
পাকত নাকি গোপদেশের ডাকাতরা—তবে তারা, এই চারদিকে এত লুণ্ঠরাজের চমোড়ে, বনে
লুকিয়ে বসে থাকবে না। নশ্বর—এতদিনে শহর-বাজারে গিয়ে উঠেছে সবাই।

তবু থররাবাদ পগন্ত নিরাপদেই কাটল। ওগানকার কাটিরায় পড়তে একদল সিপাহী গাড়ি
আটক করেছিল—জেরাও করেছিল বিস্তর—কিন্তু আল্লাবল্ল এমন বেমানুম সে জেরা কাটিয়ে
উঠল, এমন অনর্গল মিছে কথা বলে গেল যে কেউ সন্দেহ পগন্ত করতে পারলে না যে গাড়ি
মধ্যে বোরখা পরা মহিলারা ওর আত্মায়া নয়। বরং সে বিশ্বাস এমনই দৃঢ়তর হ'ল—আল্লাবল্লকে
সঙ্গে কথা করে এতই গুণী চল সিপাহীরা যে, ওদের মধ্যে একজন পথে খাবার জন্তে গোটাকতক
পাকা আমই উপহার দিয়ে বসল !

থররাবাদ ছাড়ার পর আল্লাবল্ল নিঃশ্বাস ফেলে ব'লল—গঙ্গানন্দনও থানিকটা নিশ্চিত
হলেন।

কিন্তু সেই নিশ্চিত হওয়াটাই কাল হ'ল।

যেমসাহেবের দিনরাত টানা-পাখার নিচে কাটানো অভ্যাস ছিল, দিনে রাতে পালা ক'রে
পাখা-বরখার পাখা টানত—তাঁদের পক্ষে এই ভ্রমের গরমে বোরখা পরে কাটানো যম-বরখারই
সামিল ! তাই বনেব মধ্যে দিয়ে যতে যেতে একটা আশঙ্কনে। তালাও-এর তলায় সামান্য
একটু জল বেধে আব 'হুয় পাকতে পারলেন না—আল্লাবল্লকে কাকুতিমিনতি ক'রে গাড়ি
খামালেন। কোনমতে ছুটে গিয়ে একটা ডুব দিয়ে এসেই আবার গাড়িতে চড়বেন। তিন
চার দিন মান করনি, তার ওপর এই গরমে বোরখা পরে পাকা—একটা ডুব না দিতে পারলে
পাগল হয়ে যাবেন যে !

আল্লাবল্ল বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ও যা দেখছেন ওতে জলের চেয়ে পাকই বেশী'—কিন্তু তাঁরা
বললেন, ওহু পাক হলোও আপত্তি নেই তাঁদের। অগত্যা সে বলল ভ্রুটোকে জল খাইয়ে নিয়ে নিজে
একটু আড়ালে গেল, যেমসাহেবরা মান করতে নামলেন।

অদৃষ্ট বিক্রম। ঠিক সেই সময়ই একটি ডোমের ঘের শজাক দারতে জঙ্গলে চুকেছিল।

● "হুয়কাটা বাবা"

পজেন্দ্ৰকুমার মিত্র

সন্ধ্যাকালে ফাঁদ পেতে রেখে যায় ওরা, দুপুরবেলা এসে খোলে। দু' থেকে এই পথে ধরল গাড়ি আসতে দেখেই তার কৌতূহল হয়—সে একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। তারপর ওরা জলে নামতেই ব্যাপারটা বুঝতে পারলে। লোভে ওর চোখ জলে উঠল। এই নির্জন বনে মাথা মুখ ঢেকে বান করার দরকার হবে—অতটা বুঝতে পারেননি মেমসাহেবরা। তা'র ফলে বৃদ্ধের মুখের লাল রঙ এবং মাথার সোনালী চুল দেখেই আর কিছু বুঝতে বাকি রইল না মেয়েটির।

নিশ্চয়ই কোন বড়সাহেবের ঘরওয়ালী মেম—সিপাহীদের হাত থেকে পালাচ্ছে। এদের ধরিয়ে দিতে পারলেই মোটা বকশিশ মিলবে। সাহেব-মেমদের ধরিয়ে দিয়ে লোকে মোটা মোটা টাকা কামাচ্ছে—একথা নানীর মুখে কদিন ধরেই শুনছে সে। সে আর দাঁড়াল না, গাছের আড়ালে আড়ালে নিজেকে গোপন করে পিছিয়ে গেল খানিকটা, তারপর উল্ল-খাসে ছুটল সিপাহীদের খবর দিতে। এই জঙ্গলটার ওধারে আজ কদিন হ'ল বড় একটা সিপাহীর দল ছাউনি কেলছে—তা নিজের চোখেই দেখেছে



গাছের পেছন থেকে বৃদ্ধের লাল মুখ আর সোনালী চুল দেখে ব্যাপারটা আর কিছু বাকি রইল না মেয়েটির।

সে, কোনমতে এখন সেইখানে গিয়ে খবরটা পৌছে দেওয়া। তারপর বাতালনরা যাবে কোথায় ?

আল্লাবল্ল বেচারী এসব কিছুই জানতে পারল না। সে কতকটা নিশ্চিন্ত—আর চট্টো দিন ভ'লয় ভালয় কাটলেই পীরের ধরগায় শিরি চড়িয়ে বাঁচে সে। এ পর্যন্ত নিরাপদে এসে তার সাহসও বেড়ে গেছে। বনে ভরসা এসেছে—নির্বিবাদেই পৌছতে পারবে।

কিন্তু সন্ধ্যার ঠিক আগে—বনের প্রান্তে পৌছবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন মাটি ঝুড়ে গজিয়ে উঠল তিনশ' সিপাহী—চোখের নিম্নেই চারিদিক থেকে ঘিরে ধরল—পালাবার কি পিছু চরঁবার কোথাও আর কোন উপায় রইল না।

পৈশাচিক উরাসে চিংকার করে উঠল সবাই—‘ইয়া! এবার যাবে কোথায়! জান না—যম আছে পিছে!’

● “বুরকাটা বাবা”
গবেশকুমার মিত্র

দেয় দেউল

এখমেই শান্তি হ'ল বিখ্যাসবাতকের। প্রথম চোট পড়ল বেচারী আল্লাবল্লের ওপর। 'দেশের ও জাতির চশমনকে যুব থেরে বাঁচাবায় চেষ্টা করছ !'

যশ বারোজন মিলে হৈ হৈ ক'রে টেনে নামাল ওকে গাড়ি থেকে, তারপর কোন বাধা দেবার কি কোন কৈফিয়ত দেবার চেষ্টামাত্রি করবার আগেই একজন কচ্ ক'রে ওর মাথাটা কেটে ফেলল। তারপর বসল মরণাসভা—মেমসাংহেবের নিয়ে কী করা হবে? মেয়ে ফেলা হবে—না বন্দী ক'রে নিয়ে গিয়ে নানাসাংহেবের দরবারে পোছে দেওয়া হবে? কোনটায় বেশী সুবিধা? নানাসাংহেবের কাছে নিয়ে গেলে কিছু নগদ বকশিশ মিলবে কি?

কিন্তু সে আলোচনা শেষ হবার কি রাত্রি পোহাবায় আগেই এক অঘটন ঘটল।



। বারোজন মিলে হৈ হৈ ক'রে টেনে নামাল আল্লাবল্লকে গাড়ি থেকে ।

প্রায় তিনশ লোকের সেই সোলাস চিংকার বহুদূর পিছনেও গম্ভানন্দনের কানে পৌঁছল।

তিনি শিউরে উঠলেন—নিজের অজ্ঞাতসারেই। এখানে এই জঙ্গলের ধারে এত লোকের হল্লা কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয়ই কোন বড় সিপাহীর দল। তবে কি—তবে কি আল্লাবল্লই ধরা পড়ল!

চোখের নিম্নে বোড়ার গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি—শব্দ লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললেন সেই দিকে। তারপর হঠাৎ শব্দটা স্পষ্টতর হয়ে উঠতে একটা গাছের ডালে ঘোড়া ছুটো বেঁধে রেখে পিতা-পুত্রের বহুদূর লক্ষ্যব নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন সেই দিকে।...

কাছে গিয়ে গাছের আড়াল থেকে বা দেখলেন তাতে আর কিছু

● "হুকুমি বাবা"
গবেষকুমার মিত্র

দেব দেউল

২৬৯

দুঃস্থে বাকী রইল না। যা ভর করেছিলেন তাই হয়েছে। অসংখ্য মশালের আলো চারিদিকে, অন্ধারবস্ত্রের শব্দেহুটা এইখান থেকেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার কাছেই নতমস্তকে বসে জ্বাছন লস্করী'র স্ত্রী ও কন্যা। আর এঁদের ঘিরে চলেছে এক বিরাট জটলা। প্রধান দাশ্য তার এক লক্ষ্যের গোল হয়ে বসেছে। এঁদেরই ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হচ্ছে।

থানিকটা দেবে এবং শুনে আবার নিঃশব্দে পিছুয়ে এলেন গঙ্গানন্দন। ড'জন মাঝ লোক হ'ল—তিনশ সশস্ত্র সিপাহীর সামনে কীই বা করতে পারেন? খড়ের খুপে পুতৌর মাতট উড়ে যাবেন।

অথচ এইমাত্র যা শুনলেন তাতে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মহিলা ডাঁটিকে মেরে দেলবারই মতলব হচ্ছে ওদের, মিচিমিছি এই বামেলা কানপুর কি লক্কে পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে বিশেষ কেউই বাজী নয়।

অনেকক্ষণ ভির হয়ে বসে রইলেন গঙ্গানন্দন। 'শিউনারায়ণ ভেলেমাতৃক'—সে অনেক অসম্ভব অসম্ভব প্রস্তাব করতে লাগল—একবার বললে, 'এখন চুটে গিয়ে খয়রাবাদ থেকে কতকগুলো লোক ডেকে আনা দা'—টাকার লোভ দেখালে কি আর আসবে না?' আবার বললে, 'আমরা চুটাই বোঁ। তা' ক'রে তলোয়ার ঘোরাতে ঘোরাতে যদি গিয়ে পড়ে ছোঁ মেরে ওরের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে সরে পড়ি তো কি হয়? বা'পারটা কী ঘটল বোম্বার আণেই কাম কতে ক'রে চলে যাব আমরা?'—কিন্তু গঙ্গানন্দন একটু ক'রে হেসে বা ইজিতে তর্জনি তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন প্রতিবারই। কমসে কম তিনশ সাড়ে তিনশ জঙ্গী লোক—পরসার লোভ দেখিয়ে ড'শ জন গাঁওরার দরে এনে কিংবা তলোয়ার ঘুরিয়ে কাবু করা যাবে না ওদের।

অগত্যা শিউনারায়ণকে চুপ ক'রে থাকতে হ'ল।

তার মনে হ'ল অসম্ভবই যখন, তখন আর চিন্তা ক'রে লাভ কি—বাঁড়ি ফিরে যাওয়াই তো ভাল।

কিন্তু গঙ্গানন্দন ভাবছেন অল্প কথা। তিনি গ্রাম্য, তিনি কথা বিবেচন—যথাসাধ্য করবেন তিনি—জান কবুল। সাধ্য কি সত্যিই শেষ হয়েছে তাঁর?

অনেক ভাবলেন, তারপর অকস্মাৎ উঠে পাড়ালেন একেবারে।

'শিউনারায়ণ, তোমার বাবা ফোঁজে লড়াই করে, তার আগে তোমার পিতামহ প্রণীতামহও এই কাজ করেছেন,—আশা করি প্রাণ দিতে বা নিতে তোমার বুক কাঁপবে না।'

গঙ্গানন্দনের গলার আগুয়াজে ও কথা বলার ভঙ্গিতে 'কিন্তু শিউনারায়ণের বুক কেঁপে উঠল। তবু সে প্রাণপণে চেষ্টা করে বললে, 'না বাবা। তা কাঁপবে না।'

'শোন। আমি তোমার বাবা। আমি লস্করী সাহেবের কাছে সত্যাবদ্ধ হয়েছি জান দিয়েও

● "বুককাটা বাবা"
গজেন্দ্রকুমার বসু

ওষের বাঁচাবার চেষ্টা করব। সে সত্যপালনে আমাকে সাহায্য করা তোমার কর্তব্য। বল—কথা দাও করবে? নিষিচারে? বিনা বিধায়?’

আরও দমে গেল শিউনারায়ণ। তবু ক্ষীণকণ্ঠে বললে, ‘করব।’

‘তবে যা বলি মন দিয়ে শোন। ঘোড়ায় ওঠো। ঘোড়া থুলে তৈরী হয়ে থাক ছুটে যাবার জন্তে। ...না ওখানে নয়, পথের ওপর নয়, পথের বা পাশে দাঁড়াও। ...তলোয়ারখানা থুলে নাও তোমার—হাত তুলে শক্ত করে ধরে দাঁড়াও তলোয়ার। পূব চ’শিয়ার কিঙ্ক, হাত এর চেয়ে একটুও না নামে কিংবা আলগা হয়ে না যায়। যত জোর আছে তোমার কব্জিতে তত জোরেই চেপে ধরো—হাঁ। এমনি—ইয়া! ঠিক এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে, যে-ই আহুক, যা-ই ছাতো না কেন—কোনমতে মড়বে না কি হাত নামাবে না—যতক্ষণ না আমি তোমাকে পেরিয়ে ওষের মধ্যে গিয়ে পড়ি। ইয়াদ থাকবে? কথা দাও আমাকে—যা বলছি তার এক চুলও এলিক ওদিক হবে না।’

‘কথা দিচ্ছি বাবা।’ বিশ্বলভাবে বলে শিউনারায়ণ। ব্যাপারটা কি তাই? কিছুই বুঝতে পারছে না—কেবল অজ্ঞাত একটা আশঙ্কায় বুক কাঁপছে তার।

কিন্তু গাশানন্দন পূব শুলী হয়ে উঠলেন। এতক্ষণে তিনি ঈদারে পথ দেখতে পেরেছেন।

তিনিও ঘোড়ায় উঠলেন। ঘোড়ায় চড়েই ঢেলের পাশে এসে দাঁড়ালেন। সম্মুখে ওর কাছে একটা হাত রেখে বললেন, ‘তুমি আমার ছেলে—আমার সত্যরক্ষা করতে পারলে যতদূর পূজ্য হবে তোমার—পিতৃপুত্র শোধ হবে। বাবা আমার! এাকগ, আমার ভদ্রপুত্র!—আমাদের জীবনের ঠিক না থাকলে পিতৃপুত্রের স্বর্গে বাসে লক্ষ্যায় মাগ। হেঁট করেন। ...যদি আর কখনও তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হয়—কথাগুলো স্মরণ কোব। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি—সংপথে চলে সত্যরক্ষা করে পিতৃপুত্রের মুখ যেন উজ্জল করতে পার তুমি।’

কঁপে উঠল শিউনারায়ণ, ‘কেন বাবা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? এ আমাকে কী আদেশে জড়চ্ছেন—’

‘চুপ! আমাকে জবাব দিচ্ছে—ইয়াদ রেখ। ...আরও শোন—মন দিয়ে শোন, আর মোটে লম্বয় নেই। আমি যখন ঘোড়া ছুটিয়ে ওষের মধ্যে গিয়ে পড়ব তখন তুমিও আর দাঁড়াবে না। এক থেকে তিনশ পর্বন্ত গুনতে যতটা সময় লাগে ততটাই তবু অপেক্ষা করবে, তারপর তুমিও ছুটে গিয়ে পড়বে ওখানে—কেউ তোমাকে বাধা দেবে না, বাধা দেবার কথা ভাবতেও পারবে না—তুমি ওষের হু’লনকে টেনে ঐ সিপাহীদেরই কারও একটা ঘোড়ায় তুলে নিয়ে বেরিয়ে যাবে। যাবে লোভা পূব-উত্তর মুখে। পূব ছুটে যদি যেতে পার—হুপুরের মধ্যেই বিসোর্বা পৌছে যাবে। ওখানটার হাঙ্গামা কম—ওখানে এখনও গুনেছি কিছু কিছু সাহেব আছে, তাদের কান

● “হুয়কাটা বাবা”

গজেন্দ্রকুমার দিত্ত

কাজে লেগলী মেমদের জিন্মা ক'রে দিলেই তোমার ছুটি। তারপর ওদের শ্রমের ওরোহা—
তুমি যেমনভাবে পারো বেশে ফিরে যেও। কেমন হ'?

‘আর আপনি হ’? বেন আর্টনাদের মত শোনায়ে শিউনারায়ণের প্রশ্নটা।

‘আমি!’ বিচিত্র হাসলেন গজানন্দন! বললেন, ‘পূর্ব হুঁশিয়ার—চাত্তর জোর দিয়ে তলোয়ার-
খানা ধরে রাখ, আমার হুকুম। একটু না হাত কাঁপে, আরও যা বললুম—মনে থাকে যেন!’

তিনি ঘোড়ার মুণ্ড উল্টো দিকে ঘুরিয়ে মিশে গেলেন অন্ধকারে...

তির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো শিউনারায়ণ। কী বাপার, কী ঘটছে কিছুই বুঝে পারছে না।
স্বাভাবিক মতিগতি তার বুদ্ধির অগম্য।

তবু তাঁর আদেশ পালন করতেই হবে তাকে।

একটু পরেই বনের নিক থেকে ঘোড়ার পায়েব শব্দ শোনা গেল। পাখা খুলে ঘোড়া ছুটিয়ে
আসছে কেউ!

কে আসছে—চলমন নয় তো?

আরও ভয় হল শিউনারায়ণের।

তবু—যাই হোক আর যাই আশ্রক না কেন—তাকে দাঁড়িয়ে থাকতেই হবে।

তবে এটা বোঝা গেল—যে আসছে সে একক। একজন ঘোড়সওয়ারই আসছে তীরের
দিকে। ঘোড়ার কুরের শব্দ কড়ের শব্দের মতই মনে হচ্ছে। বড়দূর পদস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগছে।

একটু পরেই দেখা গেল সওয়ারকে। একজনই আসছে সওয়ার। হাঁদার মাথুসটাকে
যেনা গেল না—শুধু এইটুকু দেখা গেল, যে আসছে সে সোজা। তির হয়ে বসে আছে ঘোড়ার
ওপর—ঐ প্রচণ্ড প্রতিবেগেও তাকে বচলিত করতে পারেনি। লক্ষিত ঘোড়া কোন পরিচিত
টুকুতেই বোধ করি অমন ভাবে ছুটেছে—কিন্তু তার ওপর সওয়ার তির নিশ্চল হয়ে বসে আছে,
মাথা উঁচু করে! আশ্চর্য লক্ষ্য!

সওয়ার পলক ফেলতে না ফেলতে ঘোড়া সামনে এসে পড়ল। আরে, লোকটা! সোজা যে তাঁর
সামনের রাস্তাতেই এসে পড়ছে। ওর খোলা তলোয়ারের ওপরই—

নামাবে নাকি হাত!

মনে পড়ল বাবার কথা—‘যে-ই আশ্রক, যাই জাখো না কেন—কোনমতে নড়বে না কি
হাত নামাবে না!’

যা বলেছেন তিনি ভেবেই বলেছেন নিশ্চয়!

কিন্তু এসব চিন্তাই চোখের পলকে খেলে গেল মনের মধ্য দিয়ে। তার চেয়ে বেশী সমা-
ছিল না। কারণ সে সওয়ার তারই মধ্যে—বলতে গেলে তীরবেগে এসে পড়ল—

আর—সত্যিই চোখের পলক ফেলবার আগেই নক্ষত্রবেগে সে বেরিয়ে চলে গেল
শিউনারায়ণকে অতিক্রম করে।

আর ঠিক সেট মুহূর্তেই চিনতে পারল শিউনারায়ণ সে অঝোরাকীকে। হুককাটা চীৎকার
করে উঠল সে—‘বাং!’

নিম্নলিঙ্গ হিসাব! ছেলের তলোয়ার ঠিক বাবার গলার মাঝখান দিয়েই চলে গেছে—

কিন্তু—এক থেকে হিশ গুনতে দেটুক সময় লাগে—তার চেয়ে বিলম্ব করার উপায় নেই
শিউনারায়ণের—অধিকার নেই! বাপের জগৎ লোক করবার কি পিচ্ছিত্যার জন্ত অত্যাচার কর-
তো নয়ই।

সে ঘোড়ার পুরের আগায় এই সিঁদাচীরাও দেয়েছিল বৈকি...

ঠিক হয়ে গিয়েছিল—মম গুটোকে এখানেই ফাঁসিতে লটকে রেখে চলে যাওয়া হবে।
তারই তোড়াকোড় চলছিল তখন।

ঘোড়ার আগায় গেয়ে সবাই হাতের কাঁজ ফেলে তাকাল বনের দিকে।

কে ছুটে আসছে অমন করে? দোস্ত না? দ্রুশমন?

যে ফাঁসির দাঁড় বাগছিল পাশের আমগাছটার, সে দড়িটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখেই চেয়ে রইল।

এমন কিছু তাড়া তো নেই—এ শিকার আর হাতের বাইরে যেতে পারবে না কোনমতেই—

কিন্তু ও কি? ওকে?

ঘোড়া পায়ে চলা সাক্ষীও বনদণ্ড দিয়ে শোঁঝা ছুটে এসে পড়ল ফাঁকা জায়গায়—ওদের মধ্যে।
তা আরুক—কিন্তু ওর ওপর সওয়ার—ওটা কী?

শোঁঝা হির হয়ে বসে আছে একটা দেহ। কিন্তু ও যে কবক। ওর হুণ্টা কোথায়?
হুণ্টার জায়গায় শুধু ফিন্কে দিয়ে ফোরারার মত রক্ত ছুটছে—সেই রক্তে ওর সমস্ত বেহা-
র ঘোড়াটা ব্রহ্ম লাগ হয়ে উঠছে। মশালের কাঁপন-লাগা আলোর সেই কিছুতকিমাকার হুঁটিটা বেখে
ভয়ানক সিঁদাচীনের মনে হ’ল এক রক্তবর্ণ পিঁচি কি কোন দানোই ছুটে আসছে—প্রতিহিংসা নিতে।
কারণ সে কবকের হাতে তখনও থোলা তলোয়ার বজ্রহুঁটিতে থরা আছে, বা হাতের হুঁটের তখনও
ঘোড়ার রাশ হুঁটিবন্ধ!

গকানকন এ বিজানটা জানতেন। বহু হুঁকে যাওয়ার ফলে এ অভিজ্ঞতা ওর প্রত্যক্ষ! হঠাৎ

৩ “হুককাটা বাবা”

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

দেব দেউল

২৭৩

মাথা কাটা গেলে দেহটা শিথিল হতে কিছু সময় লাগে। সেই বয়স সময়ের ভিসাব নিজেই এই চরম ভংগাফসের খেলায় নেমেছিলেন তিনি। ঘোড়ার ওপর সব পেষ্ট টান ক'বে গির হতে বসে থাকার অভ্যাসও তাঁর বহুদিনের।...

এরা আর ভাববারও সময় পেল না, ভাল করে দেখবারও না।

তার আগেই আর একটা অশ্বপন্থক আগল বনের মধ্যে। আরও কেউ আসছে—তিনি তাঁর বেগেই।

‘কিন্তু কে আসছে বা কী আসছে তা দেখবার জ্ঞান আর অপেক্ষা করতে সাহসে কুলোয় না: কার—

বিকট চিৎকার করতে করতে দৌড় দিল সবাই—দে বেদিকে পারল, পরস্পরকে ফেলে মাড়িয়ে ডিঙিয়ে—প্রাণভরে পাগলের মত ছুটতে লাগল চারিদিকে। দেখতে দেখতে কাঁকা হয়ে গেল মাঠ। রইল শুধু কটা ছাতিয়ার, কয়েকটা ঘোড়া, মশালগুলো গাছের ডালে ডালে ঝাঁপা—এবং অসহায় রীলোক ছাট।

তারিও ভয়ে ঠকঠক ক’রে কাপড়ে।

শিউনারায়ণ ছাঁকনকে টেনে তঠে: ঘোড়ার চাপিয়ে তাদের ভয়-মিছিল ছাড়ে একটা ক’রে বন্ধু শ্রুতি দিয়ে—ঘোড়ার রাশ ধরে টেনে নিয়ে চলল বাপের নিবেশমত উত্তর-পূর্ব দিকে।

বাবার দেহটা কী হ’ল, সে ঘোড়া কাটার গিরে ধামল—সে দিকে তাকাবার অবকাশ হ’ল না: ওর। তাঁর চেয়ে তাঁর আবেশ বড়, তাঁর সত্য বড়।



হুঁতটাকে ভেদে প্রাণভরে দৌড় দিল সবাই: দে বেদিকে পারল



রাধারানী দেবী

পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত এরা দু'টি সহোদর ভাই। এদের নাম পণ্ডিত হলেও এরা কিন্তু সত্যি কেউ পণ্ডিত নয়। আর ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তো নয়ই। কারণ জাতে এরা বৈশ্য। পেশা বাণিজ্য। এদের বণিক বাবা শখ করে দুই ছেলের নাম রেখেছিলেন 'পণ্ডিত' আর 'অতিপণ্ডিত'।

পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত দু'টি ভাইয়ের মধ্যে খুব ভাব ছিল। বিদ্যালয়ে শিক্ষা শেষ হবার পর পিতার আদেশে তারা নিজেদের জাতের বণিকের ব্যবসা শুরু করলে। দু'ভাইয়েরই তখন বিয়ে হয়ে গেছে।

পাঁচশো গরুর গাড়ি ভরতি করে হরেকরকম প্রয়োজনীয় আর শখের জিনিসপত্র নিয়ে তারা দেশবিদেশে বিক্রি করতে চলে গেল। পাঁচশো গরুর গাড়িভরা তাদের রকমারি মাল যখন সব বিক্রি হয়ে গেল, তাদের অনেক টাকা লাভ হয়েছে দেখে তারা দু'ভাই খুশী হয়ে বাড়ি ফিরলো।

মাল বিক্রি করে তাদের যে টাকা লাভ হয়েছিল সবই অতিপণ্ডিতের কাছে ছিল। তারা বাড়ি ফিরে এসে দেখে তাদের বাপের

দেব দেউল

২৭৫

বাবসা করে ঘুরে বেড়াচ্ছিল বলে তারা এখনর পায়নি। বাবা বেঁচে নেই দেখে তখন দু'ভাই তাদের মাল বিক্রির টাকাটা ভাগাভাগি করে নিতে বসলো।

অতিপণ্ডিত টাকা দেবার সময় পণ্ডিতকে বললে, আমাদের অনেক টাকা লাভ হয়েছে। আমি সে টাকাটা তিনটি সমান ভাগে ভাগ করে রেখেছি। সেই তিন-ভাগের এক ভাগ তুমি নাও আর বাকি দু'ভাগ আমার কাছে থাক। অতিপণ্ডিত ভাইয়ের কথা শুনে পণ্ডিত ভাই আশ্চর্য হয়ে বললে, লাভের টাকাটা তিন ভাগ করলে কেন, আমি তো বুঝতে পারছিনি।

ভাইয়ের কথা শুনে অতিপণ্ডিত বললে, আরে! এই সহজ কথাটা বুঝতে পারলিনি? আমরা দুই ভাইই তো 'পণ্ডিত'? কেমন? সুতরাং আমাদের দুই পণ্ডিতের দুটি ভাগ। আর তৃতীয় ভাগটি হল আমাদের দুই পণ্ডিতের মধ্যে যে একটি 'অতি' রয়েছে তার। আমার নাম যখন 'অতিপণ্ডিত' তখন ঐ অতিরিক্ত তৃতীয় ভাগটা আমারই প্রাপ্য। এইবার বুঝতে পারলে তো ভাই। অতএব তুমি এক ভাগই নাও। বাকি দু'ভাগ আমারই থাক।

পণ্ডিত শুনে বিস্মিত হয়ে বললে, সে কি কথা? আমি 'পণ্ডিত', আর তুমি 'অতিপণ্ডিত'। আমার দুই ভাই মিলে বাণিজ্য করতে যাবার আগে যে টাকা দিয়ে মালপত্র কিনেছিলুম তার অর্ধেক বাবা আমাকে দিয়েছিলেন, অর্ধেক তোমাকে দিয়েছিলেন। তিনি তো তোমাকে 'অতি' বলে অতিরিক্ত টাকা কিছু দেননি? আমাদের পাঁচশো গরুর গাড়ির আড়াইশো ছিল তোমার, আড়াইশো আমার! আর যদি বিক্রির কথা বলো; অর্ধেক মালপত্র আমি বেচেছি, অর্ধেক তুমি বেচেছো। অতএব আমাদের এই কারবারে যা লাভ হয়েছে তার অর্ধেক তুমি পাবে, অর্ধেক আমি পাবো। কিন্তু, তুমি লাভের টাকাটাকে তিন ভাগ করে দু'ভাগ নিজে রেখে একভাগ আমাকে দিতে চাইছো কেন—কিছুতেই বুঝতে পারছিনি!

অতিপণ্ডিত তখন অতি মিষ্টি হেসে বললে, এই সহজ কথাটা তুমি এখনও বুঝতে পারছো না ভাই? তুমি হলে যে শুধু 'পণ্ডিত' তাই তোমার একভাগ। আর, আমি হলুম 'অতিপণ্ডিত' তাই আমার পাওনা দু'ভাগ। তুমি ভাল করে ভেবে দেখ ভাই এটা স্থায্য কিনা? আমি যখন অতিপণ্ডিত তখন আমি একটা অতিরিক্ত অংশ পাবার অধিকারী বুঝলে?

পণ্ডিত ভাই কিন্তু একথা কিছুতেই মেনে নিতে চায় না। শেষপর্যন্ত লাভের টাকার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে দুই ভাইয়ের মধ্যে তুমুল কগড়া বেধে গেল। কিছুতেই পণ্ডিত ভাইকে বোঝাতে না পেরে শেষে অতিপণ্ডিত প্রস্তাব করলে, আচ্ছা বেশ!

● পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত
বাথারানী বেবী

তুমি তো ঠাকুর দেবতা মানো। দেবতা তো আর মিথ্যে বলেন না। চলো কালই গিয়ে আমরা অরণ্যের বনদেবীকে জিজ্ঞাসা করিগে—এভাবে ভাগ করা ঠিক হচ্ছে কিনা। তিনি যা বলবেন আমি তাই মেনে নেবো।

পণ্ডিত ভাই এ প্রস্তাবে রাজী হ'ল। কারণ, সে ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্মভীরু লোক। দেব দ্বিজের তার অপরিমিত ভক্তি। স্থির হ'য়ে গেল যে, কালই শনিবার অমাবস্তার রাতে অরণ্যে গিয়ে বনদেবীর পূজা দিয়ে এ বিষয়ে তাঁর অভিমত জানতে চাওয়া হবে। তিনি যা আদেশ করবেন পণ্ডিত ভাই সেইটেই মেনে নেবে।

তখন অতিপণ্ডিত করলে কি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনেক সাধা-সাধনা করে বুঝিয়ে বললে যে কাল শনিবার অমাবস্তার রাতে সে যদি বনে গিয়ে বনদেবীর ভূমিকা অভিনয় করে তাহলে তাদের অনেক টাকা লাভ হবে। বনের মধ্যে সবচেয়ে বড় মোটা একটা গাছের গুড়ির কোটরের মধ্যে অতিপণ্ডিত তাকে আগে নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে রেখে আসবে। তারপর পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে সে যখন বনদেবীর পূজা করতে এসে বনদেবীকে লাভের টাকা কিভাবে ভাগ করা হবে জিজ্ঞাসা করবে তখন সে যেন বনদেবীর কণ্ঠ শুকরুণ করে বলে যে—‘তুমি যখন শুধু পণ্ডিত তখন তুমি লাভের অংশ একভাগ মাত্র পাবে, আর অতিপণ্ডিত যিনি তিনি দু'ভাগ পাবেন।’

অতিপণ্ডিতের স্ত্রী স্বামীর পরামর্শনতো এই মিথ্যাচরণে রাজী হলেন না। বললেন যে দেবতার নাম করে কাউকে প্রবঞ্চনা করলে সেই পাপে আমাদের বিপদ আর অকল্যাণ হতে পারে। সুতরাং, অর্থলোভে আমাদের এত বড় অগ্নায় কখনই করা উচিত নয়।

কিন্তু, অতিপণ্ডিত স্ত্রীর একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, কী! তোমার এত বড় স্পৃহা! জানো পতিই মেয়েদের পরম গুরু। পতিবাক্য অবহেলা করা মানে গুরুবাক্য লঙ্ঘন করা। আর গুরুর আদেশ অবহেলা করা মানেই মহাপাতকের ভাগী হওয়া। সতী সাক্ষী স্ত্রীর উচিত সর্বদা স্বামীর আদেশ মেনে চলা। পতি পরম গুরুর আদেশ অমাত্য করলে তোমাকে অনন্তকাল নরকবাস করতে হবে।

স্বামীর কথা শুনে অতিপণ্ডিতের স্ত্রী ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। অত্যন্ত অনিচ্ছা-সবেও সে স্বামীর আদেশ পালন করতে রাজী হল। শনিবার সন্ধ্যার আগে অতিপণ্ডিত তার স্ত্রীকে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে একটি বড় গাছের কোটরে লুকিয়ে রেখে এল।

পরে অমাবস্তার রাতে পণ্ডিতকে নিয়ে অতিপণ্ডিত বনের মধ্যে সেই গাছটির তলায় গেল এবং ধূপ ধূনা ঝেলে মহাসমারোহে বনদেবীর পূজা করে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে

● পণ্ডিত আর অতিপণ্ডিত
রাখারানী বেবী

পণ্ডিতকে বললে এইবার তুমি বনদেবীকে জিজ্ঞাসা করো আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কার কত লভ্যাংশ পাওয়া উচিত ?

পণ্ডিত তখন বনদেবীর উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে প্রশ্ন করলে, দেবী অরণ্যলক্ষ্মী ! বনভুবনেশ্বরী ! আপনি অন্তর্গামী। ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানে যা কিছু ঘটেছে বা ঘটছে সবই আপনার জানা। আমরা যে আজ কেন আপনার আরাধনা করতে এসেছি এও আপনার অবদিত নয়। স্তূতরাং করুণাপরবশ হ'য়ে আপনার এই শরণাগতদের বলে দিন আমাদের কারবারের লভ্যাংশ দুই ভাইয়ের মধ্যে কে কত পাবে ? চ্যায়তঃ ধর্মতঃ কার কত পাওয়া উচিত ?

গাছের গুঁড়ির কোটর থেকে অতিপণ্ডিতের স্ত্রী স্বামীর আদেশ ও শিক্ষা মতো নিজের গলার সর পরিবর্তন করে বনদেবীর মতো বললে, তোমাদের দু'ভাইয়ের মধ্যে যেহেতু একজন 'অতিপণ্ডিত' আর একজন শুধু 'পণ্ডিত'; তখন পণ্ডিতের প্রাপ্য লভ্যাংশের দ্বিগুণ পাওয়া উচিত 'অতিপণ্ডিতের'।

পণ্ডিত বনদেবীর এ বিচার শুনে অত্যন্ত বিস্মিত ও দুঃখিত হল। কাতরভাবে ভগবানকে ডেকে বললে, জগদীশ্বর ; একি শুনলুম ? তবে কি তোমার রাজ্যে এখন দেবতারও সত্য ও চ্যায় বিচার ভুলে মিথ্যাবাদের পক্ষপাতী হ'য়ে উঠেছেন ?

পণ্ডিত কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলে না যে ভগবানের রাজ্যে দেবতার এমন অবিচার করতে পারেন। তার মনে একটা প্রবল সন্দেহ হল যে এই মহাবৃক্ষের কোটরে কি সত্যই বনদেবী আছেন ? না আর কেউ ? আমাকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

এই ভেবে সে করলে কি, কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে এনে সেই গাছের গোড়ায় জড়ো করে আগুন ধরিয়ে দিলে। অতিপণ্ডিত তাকে একাজ করতে অনেক নিবেদন করেছিল। দেবতার কোপে পড়বে বলে ভয় দেখিয়েছিল। কিন্তু পণ্ডিত তার কথা গ্রাহ্য করেনি।

শুকনো ডালপালা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেই অগ্নিশিখার উদ্ভাপে অতিপণ্ডিত গাছের তলা থেকে সরে এসে দাঁড়ালো। আগুন নিভিয়ে ফেলবার চেষ্টা করেও সে কিছু করতে পারলে না। এমন সময় অতিপণ্ডিতের স্ত্রী সেই গাছের কোটর থেকে, বাপরে ! মারে ! গেছিরে ! বলে চিৎকার করে কীদতে কীদতে ছুটে বেরিয়ে পড়লো। তার শাড়িতে তখন আগুন ধরে গেছে। সর্বদল বলসে পুড়ে গেছে।

পণ্ডিত তার ভাইয়ের স্ত্রীর এই অবস্থা দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারলে এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তাকে বাঁচাবার জন্ত এগিয়ে গেল। নিজের

গাত্রবস্ত্র খুলে ভাইয়ের বোকে দিয়ে বললে, আপনি শীঘ্র জ্বলন্ত শাড়িখানি খুলে ফেলে আমার উত্তরীয়খানি পরে লজ্জা নিবারণ করুন। কোনো ভয় নেই। আমি এখন আপনাকে বহুলতা থেকে তৈরি করে একটি প্রলেপ দিচ্ছি যাতে আপনার জ্বালা-যন্ত্রণা সব জুড়িয়ে যাবে।



অতিপণ্ডিতের স্ত্রী কঁদতে কঁদতে বলতে লাগলো, আপনি ঈশ্বরবিশ্বাসী, ধর্মিক ও সত্যবাদী মানুষ। আমার স্বামীর আদেশে বাধ্য হয়ে আপনাকে প্রবঞ্চনা করতে এসে আমি হাতে হাতে আমার মহাপাপের শাস্তি পেলাম। পতি দেবতা হ'লেও তার অগ্নায় আদেশ পালন করলে সে স্ত্রীকেও সে পাপের ভাগী হ'তে হয় একথা আমি ভাবিনি। আমার আজ উপযুক্ত শিক্ষা হল। পাপের শাস্তি আমি পেলাম। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

পণ্ডিত লজ্জিত হয়ে বললে, জননী! আমি ভাবতেও পারিনি যে আমার সহোদর ভাই এমন অগ্নায়ভাবে আপনাকে বনদেবী সাজিয়ে আমাকে প্রতারণা করবেন। আমি এই বৃক্ষ-মূলে অগ্নিসংযোগ করে আপনার অশেষ দুঃখকষ্টের কারণ হলুম। আপনি বরং আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন।

অতিপণ্ডিত এই দুর্ঘটনায় বিচলিত

হয়ে কোন্‌ লজ্জায় অপরাধীর মতো অপ্রতিভ হয়ে পণ্ডিত ভাইকে তার প্রাপ্য অংশ অর্ধেক ভাগ দিয়ে দিলে।

পণ্ডিত ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে বললে, সংপথে থাকলে তোমার কোনোদিনই অর্থের অভাব হবে না। অতিপণ্ডিত—এই কথাটি আমার মনে রেখো। অতি লোভে মানুষের কতিই হয় শেষপর্ষন্ত।



শ্রীমৎসূরন মজুমদার

দীর্ঘকাল পুলিশ-বিভাগে কাজ করে যে সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি তা যেমন চমকপ্রদ তেমনি অবিখ্যাত। সত্যি বলতে সময় সময় এর সড়াবাত সপক্ষে আমার নিজের খটকা লেগে যায়। বাস্তবিক সেগুলো রূপকথা, উপকথা বা অলৌকিক কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর আর রচয়ত্বপূর্ণ।

এমনি একটি কাহিনীর কথা আজ বলব।

বিলেতের ঘটনা ও ইয়ার্ড থেকে কিছুদিন টেনি নেওয়ার পর, সরকার আমাকে পাঠালেন বাংলা দেশের একটা জেলার পুলিশের বড়কর্তা করে। কাজকর্ম মন্দ চলছিল না। 'মাটি' বলে বড়কর্তাদের কাছে আমার একটা খ্যাতিও ছিল।

বয়সকালে একদিন সকাল থেকেই ঝিমঝিম করে বুটী হতে শুরু করেছে। 'বচনা! ছেড়ে উঠি উঠি করছি কিন্তু তবুও উঠতে ইচ্ছে করছে না। এমনি সময় আমার বেরলিক চাকর তত্ত্বার চিংকারে চোখ চাইতে হল। জিজ্ঞাসা করলাম—কি ব্যাপার?

ভজুয়া বলল—ঘরিকবাধু দেখা করতে এসেছেন।

ঘরিকবাধু আমারই অধীনস্থ কর্মচারী। আমার কোয়ার্টার দেখানে তার থেকে প্রায় পনেরো মাইল দূরে রায়পুর গানার তিনি দারোগা।

অগত্যা অনিচ্ছাসহেও বিছানা ছেড়ে উঠতে হল। আমাকে দেখেই ঘরিকবাধু সসন্ত্রমে চেয়ার ছেড়ে পাড়ালেন। নমস্কার বিনিময়ের পর তিনি দথারীতি আসনগ্রহণ করলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—কি খবর ঘরিকবাধু? আজ যে এতো সকালেই?

ঘরিকবাধু একটু চিন্তিত হয়ে বললেন—একটা জরুরী ব্যাপারের জন্তে আসতে বাধ্য হলাম স্যার। আপনাকে এখনি একবার রায়পুরে যেতে হবে।

—রায়পুরে কেন? কি হয়েছে সেখানে?—একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করি।—ব্যাপার কি, ডাক্তারদল খরা পড়েছে, না ছেলেরা মিচিল করে গ্রামের শান্তি ভঙ্গ করছে?

একটু চিন্তিত হয়েই ঘরিকবাধু উত্তর দিলেন—ঠিক তা নয় স্যার। সম্প্রতি সেখানে গঙ্গার তীরে একটা কড়াল পাওয়া গেছে গাছে টাঙানো অবস্থায়। লোকে ভূতের কাণ্ড বলে সন্দেহ করার বহু আগেই গঙ্গার তীর থেকে চলে আসছে। সারা গ্রামটা ভয়ে জড়োসড়ো।

হাসি পেলো আমার, বললাম—আমি তো আর ভূতের ওকা নই যে ভূত তাড়াতে পারব? আপনি বরং কোনও ওকার বাড়িতে যান!

এমনি সময় ভজুয়া টেবিলের ওপর আমাদের দু'জনের জন্তে ডিম, টোস্ট আর চা রেখে গেল। একটা টোস্টে কামড় বসিয়ে ঘরিকবাধু বললেন—ব্যাপারটা ঠিক তা নয় স্যার। আমার যেন মনে হচ্ছে এর সঙ্গে এক বছর আগের রতন রায়ের মৃত্যুর ঘটনার যোগাযোগ আছে।

—কোন রতন রায়? কি ব্যাপারটা খুলে বলুন তো?

ঘরিকবাধু বললেন—গত বছর এই শ্রাবণ মাসেই রায়পুরের জমিদার হরিহর রায় আর তাঁর ছোট ভাই রতন রায় গিয়েছিলেন পাশের বনে শিকার করতে। রতন রায় ছিলেন অবিবাহিত। হরিহর রায়ের আজ তিন বছর হ'ল বিয়ে হয়েছে।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলায় হরিহর রায় বন থেকে এসে কাঁধে কাঁধে থানার এলাহার ঘেন—দুপুর বেলায় তাঁরা যখন শ্রান্ত হয়ে গঙ্গায় বান করতে নামেন তখন হঠাৎ জোয়ার আসার রতন রায় গঙ্গার জলে ভেসে যায়। দুই ভাই-ই তাঁরা গ্রামের ছেলে। সীতারও কাঁটে পারতেন নিশ্চয়ই। হুতরাং জলে নেমে সীতার কাঁটা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। তাই আমি সেই বিখ্যাসে গঙ্গার লোক নামিয়ে অনেক খোঁজাখুঁজি করি রতন রায়ের বেহের জন্ত। কিন্তু মৃতদেহ বা রতন রায়ের কাপড়ের কোনও হদিস তখন পাওয়া যায় নি।

● কবাল

ঐক্যবন্ধন মজুমদার

দেব দেউল

২৮১

এর দশ দিন পরে শ্রীরামপুরের কাছে রতন রায়ের কাপড় ও আঁটি পরিচ্ছন্ন একটা গোলত মুতদেহ পাওয়া যায়। পোর্টপুলিশ এবং গঙ্গার ধারের সব থানাতাই আমায় খবর দেওয়া ছিল। বাঁহোক, খবরটা পাওয়ামাত্রই আমি হরিহর রায়কে সঙ্গে করে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হই।

হরিহর রায়, রতন রায়ের কাপড় ও আঁটি বেগে মুতদেহকে রতন হায়ে খানক করেন।

যথানিয়মে আমি শবাবাজেদাগারে মুতদেহ পাঠিয়ে দিই। ‘কম্বু’ দৈনিক হয়ে যাই পনেরো দিন পরে ডাক্তারের রিপোর্ট পেয়ে।

ডাক্তার লিখেছেন—মৃতদেহটি এতদূর পড়ে গিয়েছিল যে তার মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবুও যতদূর মনে হয়, এই লোকটির জলে ডুবে যা কোনরকম আশ্বাসে মৃত্যু হয় নাই, মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক কোনও রোগে।

এরপর আমি তদন্ত চালানো একরকম বন্ধই রাখলাম। হরিহর রায়কেও সন্দেহ করিনি, কারণ একদোয়ারী থেকেই জানতে পেরেছিলাম তিনি তাঁর ভাইকে ভালবাসতেন প্রাণের চেয়েও বেশি। তাছাড়া তাঁকে তখন প্রায় সাঁসারত্যাগী বললেই চলে। তাঁই জরদেহের সঙ্গে ‘দৈনিক’ সম্পন্ন ঘটন নিয়েই থাকেন। এবকম সাঁসার-নিগিণ্ড লোককে সন্দেহ করা যায় কেমন করে!

আমি প্রশ্ন করি—তাহলে তার সঙ্গে এই কঙ্কালের সম্বন্ধ কোথায় দেখলেন?

আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এঁটো বাসনগুলো টেবিলের ওপর থেকে সরিয়ে নিয়ে ভজুরা সেখানে রেখে গেল মসলার কোঁটো আর সিগারেটের কেস।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে কেসটা এগিয়ে দিলাম রায়ের কাপড়ের দিকে। পদমর্গানায় আমি বড় হলেও বয়সে ছিলাম তাঁর চেয়েও অনেক ছোট। তাঁর উত্তরত্ত করতে দেখে আমি বলি—নিম্ন না একটা সিগারেট, ক্ষতি কি?

আমার মৌলিক অসুস্থতি পেয়ে চারিকবাবু একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করেন তাঁর কণা।—

সেই কথাই বলছি তার,—কঙ্কালটা গঙ্গার ধারের বনের মধ্যে টাঙানো অবস্থায় পাওয়া গেছে ঠিক আগের বছর যে তারিখে রতন রায় জলে ডুবে মারা যান, সেট তারিখে। খবর পেয়ে আমিও তদন্তে গিয়েছিলাম। দেখলাম একটি মানুষের কঙ্কাল। কে কাকে চহতো পুন করে রেখে গেছে এমন ধরনের একটা কিছু ভাবছি এমন সময় কঙ্কালটা হাওয়ার ভলে উঠলো। দড়িটা বুকে বেঁটেই কঙ্কালটার পিছন বিক আবার সামনে এলো।

সুস্থিত হয়ে আমি তখন লক্ষ্য করলাম পিঠের দিকে ছাড়ের গারে রয়েছে স্পষ্ট ছোট্ট গুলির দাগ। কী সন্দেহ হল, কঙ্কালটাকে বিশেষ পরীক্ষার জন্যে কলকাতার পাঠালো। সেখান থেকে কাল

● কঙ্কাল

প্রিয়বৃন্দন বসুস্বায়

সন্ধ্যার রিপোর্ট পেরেছি মানুষটির মৃত্যু হয়েছিল বন্দুকের গুলিতে। এবং সে গুলি করা হয় একরকম বিশেষ ধরনের পিস্তলের সাহায্যে। মৃতের বয়স চব্বিশের বেশী হবে না। রতন রায়েরও বয়স ছিল তাই। নানারকম রিপোর্ট থেকে আমার যেন কেমন সন্দেহ হয়, কফালটির সঙ্গে রতন রায়ের মৃত্যুর কোনও সংন্ধ আছে। 'তাঁই কাল গভীর রাত্রে আমি জমিদার হরিহর রায়ের বাড়িতে থানাতল্লাশি চালাই। সেখানে গিয়েই সুনলাম হরিহর রায় আজ এক মাস ধরে অপ্রকৃতিস্থ আছেন। তাঁর সাধন-ফরনও আজকাল বন্ধ এবং উনি আঁব গাঠিরে আসেন না। আর আকাশে কালো মেঘ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তিনি চোঁচয়ে উঠছেন—আমি নয়, আমি নয়।

অথচ মেঘ কেটে আলো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হচ্ছেন প্রকৃতিস্থ। তখন এলোমেলো কথা বলার কারণ তাঁকে জিজ্ঞেস কবলে তিনি তা মনেও করতে পারেন না। আর একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। জমিদার বাড়ির বাগানের কোণে মাটির তলায় আমি একটা পিস্তল পেয়েছি। যা আমেরিকান 'সালজাবন' যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত করতো। এ ছাড়া হরিহর রায়কে গ্রেপ্তার করার অস্ত্র কোনও যুক্তিসংগত কারণ আমি পাইনি। এখন আপনি যদি একবার দয়া করে ওখানে গিয়ে নিজের হাতে তদন্তের চেষ্টা করেন, তা হলে বড় ভাল হয়। তবে হরিহর রায় যে একজন বিশেষ মানী লোক তাও আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

আমি প্রশ্ন করি—হরিহর রায়কে কোনও প্রশ্ন করার সুযোগ কি আপনি পেয়েছেন?

হারিকবাবু বলেন—আজ্ঞে না, কারণ কাল রাত্তির থেকেই আকাশে রয়েছে কালো মেঘ। এখনও তা কাটেনি। আর হরিহর রায়ও হাজতে বসে নিজের পেয়ালেই বলে চলেছেন—“আমি নয়, আমি নয়।”

বাপারটা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। রটলাও ইয়ার্ডে থাকতে এ ধরনের দু-একটা হত্যাকাণ্ড দেখিনি যে তা নয়। তাই হারিকবাবুকে বলি—চলুন, দেখি যদি কিছু করতে পারি। তবে আমার বেকতে ছরতে একটু দেরি হবে। আমার বন্ধ মানসিক বাধির চিকিৎসক ডঃ সিংহকে কলকাতার একবার ফোন করব। তাঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করা দরকার।

একটু বিম্বৃত হয়েই হারিকবাবু বলেন—মানসিক বাধির চিকিৎসক এখানে কি সাহায্য করতে পারেন স্যার?

আমি বলি—আচ্ছা, হারিকবাবু, আপনার মনে আছে কি সেতু বাঁধবার সময় রামচন্দ্র একটা কাঠবিড়ালীর কাছ থেকেও সাহায্য নিয়েছিলেন? সুতরাং কার কাছ থেকে কিভাবে কোন সাহায্য আসতে পারে তা তো আমরা জানি না। হারিকবাবু, চলুন না একবার দেখে আসতে যাব কি?

৩ কফাল

শ্রীমন্তন বন্ধুস্বামী

আমি যখন রাত্রি পূর্ব খানার পৌছুলাম ঘড়িতে তখন ১১টা বেজে গেছে। অকারণে কালো মেঘের বদলে উঠছে তখন প্রথর হৃৎ। হরিহর রাত্রি থেকে পাঠলাম আমার কাছে। দেবদেবী শৌখিন মানুষ। অপ্রকৃতিস্থতার কোন চিহ্নই তাঁর চোখে বা মুখে নেই। একটু বিবস্ত্র সঙ্গ আমাকে প্রশ্ন করলেন—আমাকে এখানে আটকে রাখার মানে? কি ভেবেছেন আপনাবা?

আমি শান্তভাবে জবাব দিলাম—দেখুন হরিহরবাবু, আপনাবা মত সংশ্লিষ্ট লোককে এখানে আনা হয়েছে শুধু আমি নিজে শহর ছেড়ে চুটে এসেছি।

একটু ব্যঙ্গের সবেই তিনি বললেন—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কাল রাতে নাকি আমাকে এখানে ধরে আনা হয়েছিল। কিন্তু কাবণটা জানতে পারি কি?

বেশ খানিকটা হেসে নিয়ে বলি—আমিবা খবর পেয়েছিলুম কলকাতার ‘দিল্লী’ নামক আপনার নামে কলকাতার আমেরিকান মিলিটারিদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল। শুনে গো আমি অবাক। কটিলে দেখছি আপনার নিজের নামে দুটা ‘বিল্ডার’ আর একটা ‘পেলি’ বন্দুক রয়েছে। ভেবেই পেলুম ন আপনার আবার পিস্তলের কি দরকার হতে পারে। ‘পেলি’ নামক আপনার মত ভাই রতন রায়, সে হঠাৎ কোন কারণে কিনতে পারে। হঠাৎ আপনার বিক্রয় করার অকোশ ছিল। কাবণ, কটিল থেকেই পেলি—রতন রায়ের নামে কিনেও বন্দুক ছিল না। ‘কল’ একটা বললে বদকর্তাবা তো ছাড়বেন না। হতে পারে রতন বাবু অসুস্থ, ‘কল’ বাংলা গেল কোথায়? তাই দারিকবাবুকে বলেছিলুম আপনার বাগানটা একবার ভাল করে সচ করুন। এখানে গুলি গুলি দারিকবাবু গিয়েছিলেন আপনার বাগান দেখবার জন্যে। হঠাৎগের সময় আপনার বাড়ির বাগানের মাটির তলা থেকে এই পিস্তলটা পাওয়া গেছে। তাই অনিচ্ছাসহে দারিকবাবু আপনাকে এখানে আনতে বাধ্য হয়েছেন। দেখুন তো সেনেন ‘কল’ এটাকে? বলে পকেট থেকে দারিকবাবুর কাছ থেকে পাওয়া পিস্তলটা হরিহরবাবুর হাতে দিলাম।

মুহূর্তের মধ্যে হরিহরবাবুর মুখে একটা কালো ছায়া পড়লো। ‘কল’ তাই কণ্ঠস্বরই উঠল। আমার হাত থেকে পিস্তলটা নিয়ে নেড়ে চড়ে বললেন—না, এটাকে কখনও দেখিনি তো!

এই ধরনেরই যে একটা উত্তর পাবো তা আমি আগেই জানতুম। তাই সোজাভাবে বললাম—আমার হাতের গোষ্ঠিকতক কাজ শেষে সন্ধ্যা নাগাদ আমি যখন শহর ফিরে যাব তখন আপনিও আমার সঙ্গে যাবেন। কারণ ইচ্ছে থাকলেও অত সহজে মুক্তি দেবার ক্ষমতা আমার নেই। এর জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার হবে ম্যাজিস্ট্রেটের অধমতি। আজকে আমার সঙ্গে গিয়ে যদি কোনও কারণে দেরি হয়ে যায়, তা হলে ফিরবেন কাল ভোরের বেলায়। রাতের মতন আপনারই বাড়িতে অতিথি হবেন আজ। আপত্তি আছে নাকি রায়শাহার?

● কল

প্রিয়মুহুরন বহুমহার

দেব দেউল

হরিহরবাবু বললেন—না, আপত্তির বিশেষ কিছুই ছিল না, তবে আপনি একটু চেষ্টা করবেন যাতে আমি আজই রাত্রিতে ফিরে আসতে পারি।

আমরা যখন ফিরে এলাম শহরে তখন ঘড়িতে সাতটা বেজে গেছে। ডাক্তার সিংহ কলকাতা থেকে বিকেল পাঁচটার এসে আমার জন্মে কোয়ার্টারে অপেক্ষা করছিলেন। গোপনে তাঁকে



ডেকে নিয়ে গিয়ে সমস্ত কথা বললাম। ডাঃ সিংহ সব শুনে বললেন—তুমি যা বলছ মিঃ মিত্র তা হওয়া সম্ভব। মাদ্রাসের মনের আর একটা দিক আছে। যাকে আমরা বলি অবচেতনতা বা সাবকনসাসেন্স। অনেক সময় দেখা যায় নিজের মন থেকে চম্পতকারী তার পাপের দাগ মুছে ফেললেও মুচতে পারে না তার এই অবচেতন মন থেকে। আমার যতদূর বিশ্বাস ঘটনার সময় আকাশে বেধা দিয়েছিল কালো মেঘ এবং বজ্রপাত হওয়াও অসম্ভব নয়। এই সময় হরিহর রায় তার ভাই রতন রায়কে হত্যা করেছিল। যা হোক, যে করে পার আকাশে মেঘ ওঠা অবধি হরিহর রায়কে তোমার আটকে রাখতে হবে। তাহলেই তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

আপনার বাড়ির বাগান থেকে এই লিওলটা পাওয়া গেছে—সেখনি তো ডেনেব কি না এটাকে! [পৃষ্ঠা ২৮০]

ম্যাঝিক্লেট যে তখন শহরে ছিলেন না, লকরে বেরিয়েছিলেন তা আমি জানতুম। স্ত্রীসং অনিবার্য কারণেই এখন

সে রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পারা গেল না তখন বামা হারাই হরিহর রায় সে রাত্রে মত আমান অতিথি হলেন।

রাত্রে খাওয়ার টেবিলে বসে ডাঃ সিংহ গল্প শুরু করলেন। আমাকে উদ্বেগ করে তিনি বললেন—তুমি কৃত বিশ্বাস কর শুভেন্দু?

● কড়াল

ঐনুদ্দীন বকুবাবার

আমি বলি—পাড়াগাঁয়ের ছেলে আমি, করি বৈকি।

একটু হেসে তিনি বললেন—আমি কিন্তু করতাম না, এখন করি।

আমি প্রশ্ন করি—কারণ ?

—তুমি বোধ হয় জানো, বিলেতে আমি গিয়েছিলাম, এক. আর 'স. এস. ১৮৯০' চম্পাতালে একটা রোগীকে অপারেশন করতে গিয়ে সামান্য তুলের জন্য আমি তাকে মেরে ফেলি। লোকটার কেউ কোথাও ছিল না, তাই কোনও মামলাও হল না। ডাক্তার বলে আমি রেহাই পেলাম। কিন্তু রেহাই পেলাম না শুধু মৃত আত্মার কাছ থেকে। দেশে ফেরার পর প্রতিবারে আমার কাছে এসে 'স. তার মৃত্যুর জন্য কৈফিয়ত চাটতো।' কিন্তু কী কৈফিয়ত দোব! দাত্যক এটো ভাবে পাড়ি পছন্দ করত। সত্য করার পব একজন তান্ত্রিক সাধু সম্প্রতি আমায় তার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

আড়াচোখে একবার হরিহরবাবুর মুখেব দিকে চাই। দেখি সেখানে জমেছে কালো রক্ত। সন্দেহটা আমার তখন বেশ ঘনিয়ে আসছে। ডাঃ সিংহ আপন মনে তাঁর চুতুর গয় করে চললেন। এদিকে আমাদের অলক্ষ্যে আকাশে জমে উঠছে বর্ষার মেঘ।

থাওয়া পাওয়ার পর আমরা তিনজনে তিনটে কামরার স্তরে পড়লাম। ডাক্তার সিন্ধের নির্দেশে বাড়ির সমস্ত বিজলী আলো নিবিয়ে দেওয়া হল। ঠিক সেই সময় হরিহরবাবুর ঘর থেকে শোনা গেল একটা তাঁর আর্থনাদ। আলো, আলো করে তিনি চেষ্টায়ে উঠলেন। আর ভজুড়া তড়াতাড়ি তাঁর ঘরে ছেলে দিয়ে আসে একটা হারিকেনের আলো। ঠিক এমনি সময় মূলধারে স্তব্ধ হয় বৃষ্টি। আর হরিহরবাবু অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বলতে থাকেন—আমি নয়, আমি নয়।

হঠাৎ হরিহরবাবুর ঘরের খাটের নিচে থেকে কে যেন বলে ওঠে—নিশ্চয়ই তুমি!

প্রথমে খাটের তলার, পরে ঘরের চতুর্দিক থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে থাকে—তুমি—তুমি—আমাকে খুন করেছ!

বাইরে ঠিক সেই সময়ে বাজ পড়লো। হরিহরবাবু আর্থনাদ করে উঠলেন। অদৃশ্য কণ্ঠ কিন্তু না পেয়ে ঠিক আগের মতই বলে যেতে থাকে—সেদিন বনের মধ্যে তুমি ছিলে পেছনে, আর আমি ছিলাম তোমার সামনে। কারণ তুমি ভালভাবেই জানতে বন্দুকের টিপ তোমার চেয়ে অনেক ভাল আমার। তাই সামনে থেকে আমাকে আক্রমণ করতে তুমি পারোনি। বিভ্রাতের আলোর শ্বেতন থেকে তুমি আমার চোরের মত গুলি করেছিলে। কেন, কেন তুমি তা করলে? সমস্ত জমিদারীটা পাবার জন্য? আমাকে বললেই তো তা আমি তোমাকে দিয়ে দিতে পারতাম। তারপর আমার মৃতদেহটাকে গাছের ওপর টাঙিয়ে রেখে তুমি কিরে এলে বাড়িতে। তুমি আর তোমার সেই তান্ত্রিক গুরু মাত্র গিয়ে নিয়ে এলে মৃতদেহটাকে। হত্যার কথা ঢাকবার জন্যে বলকাতা থেকে অল্প একটু

● কতাল

ঐশ্বর্যবন মদুমদার

মৃতদেহ কিনে আমারই জামা কাপড় পরিয়ে ভাসিয়ে দিলে গঙ্গার জলে। আর ভাসালে হগলীতে গঙ্গার ধারের তোমারই নতুন বাগানবাড়ি থেকে।

চরিত্রবানু চমকে উঠে বলেন—এ সব কথা তুমি কি করে জানলি?

—তুমি কি জানো না, অপদ্রোহে মৃত্যুর জন্মে আমি ভূত হয়েছি। তাওয়ায় ভেসে ভেসে আমি সবই যেতে পারি। তা ছাড়া যে মৃতদেহটাকে কলকাতা থেকে তুমি কিনে এনে আমার জামা কাপড় পরিয়ে শুণ্ড শুণ্ড পচালে তারও সন্দেহ হয়নি! সেও আমার মতন তোমার ওপরে প্রতিশোধ নেবার জন্মে প্রস্তুত হয়েছে।

অপর একটা কণ্ঠ বলে ওঠে—চরিত্রবানু, এট এক বছর ধরে আমি তাওয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমার মৃতদেহের সন্দেহ হল না বলে আমিও তোমায় শাস্তি দেব।

ভয়ে অধিকৃত হয়ে চরিত্রবানু বলেন—আমাকে তোমারা ক্ষমা কর। তারিক সাধু আমাকে ঐরকম বুকিয়েছিল বলে আমি অমন কাজ করেছিলাম।

এইবারে মৃত রতন বায়ের কণ্ঠস্বর বলে উঠল—তুমি কি আমার মৃত্যুর আগে ঐ তারিক সাধুর সঙ্গে মেশানি? কি পরামশ সে দিয়েছিল তোমাকে?

একটু চোক গিলে চরিত্রবানু বলেন—আগে বল তোমরা আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে, তা হলে আমি সব কথা তোমাদের বলব।

মৃত রতন বায়ের কণ্ঠস্বর বলেন—তাঁজার চোক তুমি আমায় বড় তাই। অমন করে যখন প্রার্থনা করছ তখন আমি কথা দিচ্ছি তোমাদের বলব।

চরিত্রবানু বলেন—ঐ সাধু আমাকে বোকায়ে যে সে আমাকে প্রচুর ধনরত্ন দেবে। তাই আমি তাকে বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। তাতে আমাতে যেদিন শিকারে গিয়েছিলাম সেদিন সেও লুকিয়ে আমাদের সঙ্গে ঐ বনের মধ্যে যায়। চরিত্রটাকে গুলি করতে তুমি যখন ব্যস্ত ছিলি তখন হঠাৎ সেই সাধু পেছন থেকে তোকে গুলি করে। আমি চমকে উঠে পেছনের দিকে চাইতেই তাকে দেখতে পলাম। তখন সে আমাকে বলে—জগন্নাথার আদেশেই সে তোকে হত্যা করেছে। তোর মৃতদেহটার ওপর বসে তাকে আর আমাকে এখন সাধনা করবার নির্দেশ এসেছে।

আমি হত্যার কথা বলে দেব বলতে সে আমাকে বলে—পুলিস তাকে সন্দেহ করবে না, করবে আমাকে। বাগানে চোরকুঠুরীর মধ্যে তোর বেহকে রাখা হল। সাধনাও চললো। মৃত-দেহের পা চূর্ণক লহু করতে না পারার দরুন সে আমাকে নিরমিতভাবে মর খাওয়ানো অভ্যাস করালে। যদু খেরে আমি মাতিল হয়ে পড়লে আমার কাছ থেকে সে রোজ অনেক টাকা বায় করে নিত।

● কতাল

ক্রিয়হীন বহুবায়

দেব দেউল

২৮৭

গঙ্গায় মৃতদেহ ভাসানোর মধ্যে আমি ছিলাম না। সেইই কান্দে দিয়ে কিনিয়ে এই কাজ করেছিল আমার জানা নেই। আমার বলেছিল, তোর ভালর জগই করেছে। ইদানীং আমি পায় সর্বস্বান্ত হবার দরুন তাকে আর টাকা যোগাতে পারতাম না। আমাকে পুলিশের ডায়েরী দ্বারা দেবার জন্তেই সে তোর কদালটা বজাবে গঙ্গায় ধায়ে টাঙিয়ে বেগে এসেছিল। আমাকে সে বলেও ছিল— তুই নাকি আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্তে কেপে উঠেছিস। এইবার বল ভাই আমার দেয় কোথায়? সেই ভণ্ড সাধু আমার বাড়িতে বসে কী যে অত্যাচার করে চলেছে তা ভগবানই জানেন!—হরিহরবাবু শিক্ত মতন কঁদে উঠলেন

তিন এমনি সময় হারিকবাবু দরজায় ঘা দিয়ে ডাকলেন—হরিহরবাবু, হরিহরবাবু! দরজা গুলুন মশাই।

রাত চারটের সময় হারিকবাবুকে সেখানে দেখে আমি বিম্মিত হয়ে প্রশ্ন করি—কি হয়েছে হারিকবাবু?

হাঁফাতে হাঁফাতে হারিকবাবু বলেন—সর্বনাশ হয়ে গেছে স্থার। আপনার আদেশে সারারাত আমি হরিহরবাবুর বাড়ি পাচার্য্যে বসে জেগেছিলাম। রাত আড়াইটের সময় এই লোকটাকে চঠাং হরিহরবাবুর বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে দেখে গ্রেপ্তার করেছি। বাড়িতে ঢুকে দেখি হরিহরবাবুর স্ত্রী আর তাঁর ছেলেটি গুলি হয়েছেন, গয়নাগাটি টাকাকড়ি সব কিছুই চুরি গেছে। লোকটার চুল বাড়ি পোক



সেই সাধু টলি করে - পৃষ্ঠা ২৮৬

● কহাল
শ্রীমদ্বন্দন বহুবর্ষ

দেয় দেউল

ধরে টানতেই দেখি সব কটাই পরচুল! এর আসল মুখটা দেখে মনে হচ্ছে যেন এ একজন বহুদিনের দাণী ফেরারী। তাই আশনার কাছে ধরে নিয়ে এলাম। ব্যাটা সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে পালিয়ে যাচ্ছিল। অংগের দিন হরিহরবাবুর বাড়িতে তল্লাশি চালাবার সময় আমি একে দেখেছিলাম বটে। তখন স্নেহে ডিলাম ইনি হরিহরবাবুর গুরু—তাই সন্দেহ করতে পারিনি। লোকটির কাছে একটা রক্তমাখা ছোরা আর একটা আমেরিকান পিস্তলও পাওয়া গেছে।



লোকটার চুল, বাড়ি, নৌক, সব কটাই পরচুল।

তারই হুঁকিকোশে এত বড় একটা পুনের কিনারা হল।

সারিকবাবু প্রপন্ন করেন—কোথায় সে এজাহার স্মারক?

আমি বলি—ঐ টেপ-রেকর্ডিং মেশিনের ভেতর! এখন আপনি নিশ্চিন্তে অবিহার হরিহর স্মারকে কাটকে পুতে পারেন।

● কথাল

ঐশ্বর্যবান বক্তব্য

আমি তীর চোখে লোকটার দিকে চেয়ে বললাম—ওর লাল চেলীটা ছাড়িয়ে অন্য কাপড় পরিয়ে দিন। কারণ রক্তের দাগগুলো এখন হাওয়াতে জমাট বেঁধে বেশ কালো হয়ে উঠেছে। কনস্টেবলদের বলুন ওকে “লক-আপ”-এ পুরতে।

তারপর সারিকবাবু আমাকে প্রপন্ন করলেন—রতন রায়ের মৃত্যুর কোনও কিনারা হল স্মারক?

আমি বলি—হরিহরবাবুকে ও “লক-আপ”-এ পুরতে হবে। তবে খুন্সী সে নয়। সমস্ত নাটের গুরু হচ্ছে এই লোকটা।

আনন্দে সারিকবাবুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তিনি বললেন—তাহলে হরিহর রায় এজাহার দিয়েছে?

আমি বলি—সে এজাহার, আপনি বা আমি কেউই বার করতে পারতাম না। তা বার করেছেন ডাঃ সিংহ



—এসব কথা কুই কি করে জানলি ?

স্বাক্ষরবাবুর বিষয় তখনো কাটেনি। তিনি প্রশ্ন করলেন—কি করে রেকর্ড করা হল তার ?

আমি বললাম—আমার যুগ থেকে সমস্ত কথা শুনে নিয়ে চরিত্রবাহুব্ব ঘরে করেছিল লাইড-স্ক্রীণ আর একটা মাইক্রোফোন ডাক্তার স্ক্রীণে লুকিয়ে রাখেন। এটা আমার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রবাহুব্ব তন অপ্রকৃতিত, তখন সেট লাইড স্ক্রীণের গুলিব সাহায্যে আমি আর ডাক্তার সি হ ডুভ সেজে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি। আর তিনি যা উত্তর দেন তা মাইক্রোফোনের সাহায্যে ও ঘরে বসেই টিপ-এ রেকর্ড করতে থাকেন ডাক্তার সি হ। প্রথমটা আপনাব মঃ আমবাণ্ড চরিত্রবাহুব্বকে সন্দেহ করেছিল। অন্তরালের ভিত্তিতেই প্রথমে আমাবের তাঁব সঙ্গে কথা বলতে হয়েছিল। কিন্তু দেখা যেন প্রকৃত অপরাধী তিনি নন। তাঁর অপরাধ—সত্য স বাণ্ড পুলিশের কাছে গোপন করা।

ডাক্তার সি হ বলেন—আপনি নিশ্চিত থাকুন স্বাক্ষরবাবু, চরিত্রবাহুব্ব ভবিষ্যতে আকাশে মশা হয়ে আঁব অপ্রকৃতিত হবেন না। কারণ তাঁকে বাঁকানো হয়েছিল ‘মাই পুরঃ অপরাধী’ এমন সত্য পক্ষা পেয়েছে—তিনিও বিবেকের আলো থেকে মুক্তি পাবেন।



জোহালা কথা

লীভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌ (ওয়াশ্‌ল্‌ টাইটম্যান)

লীভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌ বর্তমান ভগতের সাহিত্যে একদান অবিভেদ বই। এই বই থেকেই ভগতের ‘বিশ্ব জাহাজ নতুন কবিরা দীতর প্রচলন হয়, যাকে আমরা বলি সত্য-কবিতা। ভগতের বই কবিতা ওয়াশ্‌ল্‌ টাইটম্যানকে অঙ্গুলণ করে এই নতুন পদ্ধতিতে কবিতা

লিখেছেন, কিন্তু আজও পণ্ডিত টাইটম্যানের লীভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌ের মতন কাব্য-গ্রন্থ ভগতের আর কোন ভাব্যেই নাই। কিন্তু লীভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌ের এটা হলো: বাইরের পরিচয়, তার আসল পরিচয় দেখানো সেখানে নিঃসন্দেহে আর বলা যায়, লীভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌ কাব্যের দিক থেকে ভগতের সবচেয়ে কবিতা-গ্রন্থের একটি এবং এই বইতে টাইটম্যান যে কবি মনের পরিচয় দিয়েছেন, যে ভাব ও যে গুর নাই করেছেন ভগতের সাহিত্যে তা আজও তার কোণে দেখা যায় না। একশো বছর আগে এমন প্রথম এই বই আমেরিকাতে ভগতের চিত্র তখন তা: আচরনের পূর্ব ভেটি ছিল, এবং তাতে লেখক হিসেবে কবির নামই ছিল না। ভগতের ‘বিশ্ব সংস্করণের ভেতর দিয়ে এই বই-এর আচরন বাড়তে থাকে এবং ভগতের সমালোচকের নৃষ্ট আক্রমণ করে। তখন আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্র নতুন উত্থমে ভগতে তাঁর স্বাধীন অধিকার করণের ক্ষেত্রে ভাগ্যে। টাইটম্যান সেই নবীন জাতির প্রাণ স্পন্দনকে, প্রেরণাকে, কবিতার পর কবিতা লিখেতে আরম্ভ করেন। তাঁর বাসনা ছিল, আমি আধুনিক ভগতের আধুনিক মর-বাণীর কাব্য লিখবো, যে আধুনিক বাসন যুগ আকাশের চ্যাপাণ থেকে দূরতম মেরু অঞ্চলের রহস্য সম্বন্ধ করতে পারে, যে আধুনিক মনুষ্যের মনের কাছে রেল-ট্রেনের বলাই থেকে আশ্রয় পায় তবু পণ্ডিত কিছুই পরিচয়ালো নাই। তাই লীভ্‌স্‌ অফ্‌ গ্রাস্‌ের কবি অঙ্গুলণ বলি ও ন্যূনতম কবিতা থেকেই আধুনিক বাসনের সর্বপ্রাণী মনের গান, তাঁর কবিতার তিনি ভগতের চেয়ে কয়েকটি এই নতুন ভগতের বিশাল বিশালতাকে। সে-বিশালতার মধ্যে তার ভগতও বাস পড়েন।



৪ বুকের বিধান ৪

—শ্রীকৃষ্ণদেবজ্ঞান মল্লিক

এক

এক পাড়াতে আখড়া গৃহ—অন্য পাড়ায় টোল,—
সেথায় স্মৃতির বিধান ঢলে—হেথায় বাজে খোল।
অকর্মাদেব কত! যিনি নামটি ‘ঘনশ্যাম’—
বলেন ‘মোরা ভাগ্যহত, বিধি মোদের বাম,—
নই মধুকর, প্রজাপতি, চাইনে মধুর ভাগ,
জোর করিয়া আমরা লব গরল দুখের আগ।
ধনীজনের নিমন্ত্রণে দক্ষিণা টোল পাক—
আপদ বিপদ সংকটেতে পড়ুক মোদের ডাক!’

দুই

অর্ধোদয়ের যোগের সময় বিপ্র জনেক হয়—
মা বাপ মরা একটি বালক কুড়িয়ে হঠাৎ পায়।
পাদরী সাহেব চাইল তাকে রাখতে কত স্নেহ—
নড়লো না সে, জড়িয়ে যেন রইলো তাহার বুকে।

দেব দেউল

২১১

টোল্ বলেছে নাইক জানা গোত্র কিম্বা গাঁই—
হিন্দু কিম্বা মুসলমান তার ঠাঁই ঠিকানা নাই।
'বামুন আমি' ছোট্ট ছেলে বলেছে ওই কবে—
সেই কথাতে প্রত্যয়ই বা কেমন করে হবে?

তিন

অনেক ঘুরে ব্রাহ্মণ শেষে বিপদ ভেবে ভারি
অকস্মাদের কর্তা যিনি এলো তাহার বাড়ি।
চক্ষু রাঙা বসে আছে—চাইলে নয়ন মেলে
কাঁপায় তার উঠলো কোলে অচেনা সেই ছেলে।
কর্তা শুনে সকল কথা বলেন মৃদু হেসে—
'বিধির দেওয়া পুত্র তোমার চিন্তে আমায় এসে।
সন্তানহীন তুমি—বুকে আনন্দ মোর ভারি—
করবে এরে, করবে একেই উত্তরাধিকারী।

চার

বামুন যখন বলেছে সে, ওই সে কচিমুখে—
সত্য তাহাই—স্মৃতির বিধান ভাসাও নদীবুকে।
অধ্যাপককে বলুক গিয়ে রয় যদি হুমুখ
জ্ঞানের আলোয় হয়নি আজও দড়কচে এ বুক।
অকূল থেকে লক্ষ্মী এলেন তিনি কাহার কি?
সাগর থেকে উঠলো ও চাঁদ গোত্র তাহার কি?
টোলের মতে এটি ষতই 'আর্থ' প্রয়োগ হোক,
চিন্তে আমি পেরেছি এ বাল্যীকিরই জোক।'

—

অশ্বখামার পা

—শ্রীকীৰ্ত্তননায়াগ ভট্টাচার্য

অলপাইগুড়ি আর শিলিগুড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটি স্টেশন ভেলাকোবা। নেচাতই ছোট, নাম মনে রাখবার মত কিছুই নয়। কিন্তু একবার, বছর কুড়ি-বাইশ আগে, কয়েকদিন ধবে এই ভেলাকোবার নাম খবরের কাগজের প্রথম পাতার বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছিল। শুধু ছাপা হওয়া নয়—সমস্ত দেশের উন্নত কৌতুহল যেন অমনি বেধে ছিটকে এসেছিল এই ছোট্ট আয়গাটিতে। কারণটাও হয়তো কারো কারো মনে আছে। ঐ স্টেশনেরই কাছাকাছি এক আয়গায় পাওয়া গিয়েছিল অদ্ভুত এক পায়ের ছাপ। অমিকল মানুষের পায়ের ছাপ, কিন্তু এক-একটি পা শ্রীর বাইশ ইঞ্চি লম্বা। সাধারণ মানুষের এক-একটি পা সাধারণতঃ ১০।১২ ইঞ্চি হয়, কাজেই এই বাইশ ইঞ্চি বিরাট পায়ের মালিক যে কত বড় অতিকার মানব তা কল্পনা করাও কষ্টকর। ওটি আশপেই মানুষের পা কিনা তা নিয়েও কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। স্থানীয় লোকের কিছু সন্দেহ ছিল না ও পায়ের মালিক কে। কে আবার? অশ্বখামা! ত্রোতা যুগের হুম্মান আর ষাণের যুগের অশ্বখামা—এঁরা যে কৰ্ম্মগুণে অমর হবার বর পেয়েছিলেন একথা কে না জানে? সেই অশ্বখামারই পাদম্পর্শে ভেলাকোবার মাটি পবিত্র হয়েছিল। কিন্তু তাঁর দেখে কেউ পায়নি। ঐ রহস্যময় বিরাট পায়ের চিন্তুকু মাত্র রেখে আবার তিনি অস্বস্তিত হয়েছিলেন।

বাইশ বছর আগেকার এই ঘটনার কথাটা লোকে শ্রায় ভুলেই বসেছিল, আমারও তা। উল্লেখ করবার কোন কারণ ছিল না; কিন্তু ছনিয়ার কত ব্যাপারেরই তো পুনরাবর্তন ঘটে! অশ্বখামাও যে আবার কিরে আসবেন তাতে আর বিচিহ্ন কি? তবে বারে বারে একই আগোয় ওঁকে দেখবার আশা করা অস্বাভাবিক। ভেলাকোবা ছেড়ে তাই এক নতুন আয়গায় তাঁর দেখা মিলল।

ব্যাপারটা তবে খুলেই বলি,—এব্য, একটু আগের থেকেই ভের টেনে নিয়ে আসা বাক্।

ঘেরাঘেনের করেন্ট ইনস্টিটিউটে বেশ কয়েক বছর হাতে কলমে কাজ নিয়ে শুধু চাকরি নিয়ে চলে এল আসামের জঙ্গলে। শুধু যে চাকরিব পাতিয়েই এল তাই নয়। আসামের অব্যাসম্পদ সম্বন্ধে তার বরাবরই কেমন একটা মোহ ছিল—তার টানও বড় কম নয়। বেশ দেখল ভুল করেনি সে। প্রকৃতি তাঁর সমস্ত ঠোঁট দেন উজাড় করে দিয়েছেন এখানে। চাবলিকে পাছাড়ের প্রাচীর ঘেরা জায়গাটি। এখানে ওখানে ছোট ছোট পাখি নড়ে, কখনো একেইকে ছুঁড়ির বৃক কলধনি ভুলে চুটে চলেছে। মাঝখানে রয়েছে পাকা একটা কিল—ছোটখাট হুদ বললেও ভুল হয় না। হাতাব রকমের নাম-নামানি পাখির ভিড় করে আসে সেখানে সন্টার দিকে। তাদের কলধবে মুগরিত হয়ে ওঠে বনানী। শুধু কি পাখি? কত রকমের বুনো জানোয়ার আসে জলের লোভে। দল বেঁধে আসে বুনো হাতীর পাল—পায়ের ভায়ে মাটি কাঁপিয়ে। আসে লম্বা-শিঁ চর্বিলের দল—বথমলের মত গায়ে চামড়া, তাতে মেহ-চন্দনের সূঁচিক। কখনও আসে ডোরা-কাটা বাঘ,—চি সার মুঠ প্রতীক, কিন্তু কি স্ত্রীম দেহ! আসে আরো কত ছোটবড় জানা-অজানা জানোয়ার। এত অল্প জায়গার এত রকম জাতির সমাবেশ পৃথিবীর অল্প জায়গারই দেখা যায়।

কিন্তু এসবের ওপর শুধুমাত্র মোহ নেই ততটা, যতটা আছে বনের যুদ্ধসম্পদের ওপর। বিরাট বিরাট বনস্পতি যেন যুগ-যুগান্তরের শক্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কুর-নামা বট, অম্বল, পাঁকড়, শাল, সেগুন, পিয়াল, তমাল, মার মেহগনি—কী নেই সেখানে? কাঁটাকাপ থেকে শুরু করে নানারকম ওষুধি গাছের ভিড়। উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও শুধু তাদের অনেকগুলির নামই জানে না—মন-ধারণ তো ঘুরের কথা। এ যেন একটা বিরাট বোটানিক্যাল গার্ডেন! কিন্তু মানুষের হাতে গড়া নয়—স্বভাবের হাতে গড়া।

মোটাই মাইনের চাকরি। সরকারী বনবিভাগের একরকম কর্তা বললেই চলে। অধীনস্থ কর্মচারীরা বলে—সাহেব। আগে আগে শাল চামড়ার সাহেবরাই ছিল এট সব পড়ে, এখন একটি ছুঁটি করে ভারতীয় এসে তাদের জায়গা দখল করছে। শুধুমাত্র গায় জায়গার এল তিনেও ইংরেজ—মিঃ টমাস্। বয়স লোক, অ'র বেশ অমায়িক। প্রথম দিনটা তাঁরই এখানে আতিথ্য নিয়েছিল শুধুমাত্র। মিসেস্ টমাস্ মারের মতই বড় করে এটা-ওটা খাইয়েছিলেন। টমাস্ সাহেবও গর করেছিলেন অরণ্যজীবনের নানা অভিজ্ঞতার। সামাজিক লোক—দানের বলা হয় সোশাইটি ম্যান—তাঁদের জন্ত এ জায়গা নয়। বনকে বারা ভালবাসতে পারে তাদেরই জন্ত এ জঙ্গল। কথা বলবার লোকেরও খুবই অভাব এখানে। তবু অর্থাৎ দিক্‌নিত লোক বলতে ওঁ-চারজন সরকারী ছাড়া বেশী কেউ নেই। তবে মজুরের দল আছে। কতক বাইরে থেকে আসা,

কতক গ্রহানকার স্থানীয় পাড়াড়ী জাত। এই বনের সঙ্গে অদ্বৃত্ত মানানসই তারা। চাকচল্যে বগা পুরুষের সঙ্গে সচর সলল জীবনের একটা আশ্চর্য রকম সমন্বয় রয়েছে। টমাস্ বললেন, “এখনই মধো আপনার দিন কাটাতে হবে। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতে পারে, কিন্তু মানিয়ে নিতে পারলে হয়তো ভালই লাগবে এ জীবন।”

তা স্মৃতি বকেডিলেন টমাস্। কাজের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে প্রথম প্রথম একটু বিবত



হয়েছিল শুধু, কিন্তু কিছুদিন পাবেই এ জীবন বেশ সয়ে এল তার। এক মাসব্যয়, আপিসের কাজ খুব একটা বেশী নয়; অবসর তার চেয়ে প্রচুর। সেই অবসর কাটাবার শ্রুতর খোরাকও রয়েছে এখানে। আশ্রয়দায়ক জায়গা সঙ্গে একটা বন্ধক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেই হ'ল। কত কি দেখবার, বত কি জানবার রয়েছে প্রকৃতির এই অদ্ববস্ত প্রাচুর্যের মধ্যে।

বেশ কাটিছিল দিনগুলি, এবট মধো হঠাৎ একদিন ছেদ পড়ল। কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ সেই জম্বলে দেখা গেল এক পায়ের ছাপ। সেই বাইশ ইঞ্চি লম্বা অস্থখামার পা! প্রথম চোখে পড়ে বমক কুলির বোঁ বাসমতিয়ার। বরনার ধারে জল আনতে গিয়েছিল সে খটখটে

বাটটাকে কে উপড়ে কেলে দিয়েছে আর তারই পাশে
—টাটকা মালুয়ের পায়ের ছাপ।

বেশার। হঠাৎ দেখে একটা বিরাট গাছ কে উপড়ে কেলে দিয়েছে, আর তারই পাশে—টাটকা মালুয়ের পায়ের ছাপ। দেখতে হুবহু মালুয়েরই মত, কিন্তু আকারে মালুয়ের পায়ের দ্বিগুণ হবে। তাই দেখে বাসমতিয়ার আর জল নেওয়া হয়নি। মাটির কলসী বরনার পাশেই কেলে রেখে সে উজ্জ্বলপালে এসেছে স্বাক্ষকে খবর দিতে। শুনে বমক ২৩ জন সঙ্গী নিয়ে, তলার-সড়ক-বসানো বাশের লাঠিটা বগলে করে বচকে গিয়ে দেখে এসেছে সেই অভাবনীয় দৃশ্য।

- অবখামার পা
ত্রিভীজ্ঞনারায়ণ তট্টাচার্য

অর্থখামা কি আবার এলেন? কিন্তু এ তো ভেলাকোবা নয়, এ যে আসামের গুরুত্বজন! এখানে, এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, তাঁর কি প্রয়োজন থাকতে পারে আসবার? নাকি এ অর্থখামা-টামা নয়,—কোনও অজানা, অশরীরী পদচিহ্ন?

দু'-তিন দিন বেশ একটা উত্তেজনার কাটল। তারপর, ভয়টো যখন একটা 'স্থিতি' হয়ে এসেছে তখন, খবর পাওয়া গেল আবার দেখা গেছে সেই রহস্যময় পায়ের চাপ। এত একটা করণার ধারে, তবে আগের ঘটনাস্থল থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে। এখানেও ঐ রকম 'বেরা' গাছ উপড়ে ফেলা হয়েছে;—একটি নয়, দু'টি নয়—পর পর তিনটি। শুধু গাছ ফেলাই হয়নি, পায়ের শিকড়গুলোও কে যেন খুবলে খুবলে নিয়েছে, আর তার পাশের মাটি আঁচড়ে আঁচড়ে কবল হয়েছে কতবিকত।

তবেলু এবার আর ব্যাপারটাকে সহজে উড়িয়ে দিতে পারেন না।

আরও একটা কারণ ছিল। যে গাছগুলো উপড়ে ফেলা হয়েছে সেগুলো 'বিশেষ' এক জাতের তৃণপাতা গাছ এবং খুব মূল্যবান গাছ। মূল্য শুধু এর কাঠের জন্য নয়—এ গাছের পাতায় এবং কুঁড়িতে এমন কয়েকটা রাসায়নিক গুণ আছে যার জন্য হেথল-ব্লক চিকিৎসার এর দাম বড় কম নয়। হেথল-ব্লক মানে যে গাছ থেকে হেথল পাওয়া যায়। কিন্তু মজা হচ্ছে এই, যে ভাবে গাছগুলিকে উপড়ে ফেলা হয়েছে তাতে মনে হয় না যে এর ঐ সব গুণের জ্ঞান কেউ ওর ওপর হস্তক্ষেপ করেছে। গাছের একটি পাতা কেউ কেঁচেনি, একটি কুঁড়িতে কেউ হাত দেয়নি। গাছের গুঁড়ির দিকে তাকালেও স্পষ্ট বোঝা যায় কোনও দারাল অঙ্গও প্রয়োগ করা হয়নি গাছ কেটে ফেলতে। কাঠের লোভে গাছ ফেলা হয়ে থাকলে কখনও তত্বে ওপড়ানো হ'ত না। তাছাড়া আশেপাশে শাল, সেগুন প্রভৃতি আরও বহু গাছ অক্ষত শরীরে দাঁড়িয়ে,—যেগুলি কাঠসম্পদের দিক দিয়ে আরও মূল্যবান।

“স্তর, এ তো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভৌতিক ব্যাপার। নটলে রাতারাতি, নিঃশব্দে এ কাজ কি কোন পৃথিবীর মানুষের পক্ষে করা সম্ভব?”—বড়বাবু বললেন। তারপর রামবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কি বল রামবাহাদুর?”

রামবাহাদুর আতে নেপালী। ওর পূর্বপুরুষরা নাকি হুড়ু চাড়া আর কিছু করেনি। লড়াইয়ের কথা শুনেলে ওরও রক্ত নাকি টগবগ করে ওঠে। কিন্তু—এ যে ভৌতিক ব্যাপার! এখানে তার কিছুই করার নেই। সে শুধু বাড়ি নেড়ে সার দিল—“বী ওদুর!”

“আবার কিছু মনে হয়, স্তর, ও তুত-তুত কিছু নয়,—এ নিশ্চয় কোন অতিকাশ মানবাক্রান্তি বা নারজাতীর জীবের কাজ। সেই যে সেবার কলকাতার ‘কিং কং’ চবি দেখে-

চিলাম—সেই রকম কোনও জীব। পায়ের ছাপটা দেখেছেন একবার?”—বললে একজন ছোকরা সহকারী, শিবতোষ।

কথাটা হয়তো একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়। বাইশ ইঞ্চি লম্বা পায়ের ছাপ যার সে যে আকারে কিং ক এর মতই কেউ হবে এতে আর আশ্চর্য কি? অশরীরী প্রাণীর পক্ষে পায়ের ছাপ থাকা একটু সম্ভবজনক। তবে ওদের সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য সবই তো দোয়া: দোয়া। কিছুই বলা যায় না। তা যাই হোক, জীবট য়ে অদৃশ্য শারীরিক শক্তির অধিকারী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঠা অত বড় গাছ, কুড়ুল ছাড়া শুধু মুচড়ে—হ্যাঁ, রকম দেখে মনে



হয় মুচড়েই, গোড়া স্বচ্ছ উপড়ে ফেলা চারটিপানি কথা নয়। শিকড়গুলি যে ভাবে নথ দিয়ে—হ্যাঁ, মনে হয় নথ দিয়েই খুবলে ছেঁড়া হয়েচে তাতে কোনও ভয়ংকর প্রাণীর কথাই মনে হবে হয়তো। শুধু শিকড় খুবলে নেওয়া হয়নি, তার পাশে খানিকটা মাটিও তুলে ফেলা হয়েছে।

সুধেন্দু হঠাৎ কোম অব্যব দিতে পারল না। শিবতোষের কথাটা নেতাত উড়িয়ে দেবার নয়। যদি সত্যি তাই হয়—কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরই আদিভাব হয়ে থাকে এখানে তা

রাববাহারের শুধু বাড় বেড়ে যায় বিন—“জী হুজুর!” [পৃষ্ঠা ২৯৬]

হলে বাণারটার গুরুত্ব বড় কম নয়। হয়তো রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে বাবে এ অরণ্য, সেই সঙ্গে এখানকার বাসিন্দা সমেত তারাও। কিন্তু তার আগে দেখতে হবে নিজেদের নিরাপত্তা। বয়সের দিক দিয়ে না হলেও পদমর্যাদার দিক দিয়ে সেই এখানকার কর্তা। কাছেই দারিফটা তারই বেশী।

সবাইকে সাবধানে থাকার উপদেশ দিয়ে চিত্তিত মনে বাংলোর ফিরে এল সুধেন্দু।

করেকদিন চুপচাপ কাটল। চারদিনের দিন আবার শোনা গেল সেই একই কাহিনী। আর, ঠিক সেই দিনই বিকেলে এসে হাজির হ'ল সুধেন্দুর অন্তরঙ্গ বন্ধু কৌশিক।

কৌশিক সুধেন্দুর সহপাঠী। এম্. এন্-সি. পাল করে এখন রিসার্চ করছে। অর্থাৎ

● অখখামার পা

ত্রিফিত্তিঅনামার পা তত্তাচার

কৌশিক বিজ্ঞানী। কিন্তু শুধু বিজ্ঞানী বললে ওর ঠিক পরিচয় দেওয়া হবে না। কৌশিক বিজ্ঞানী, কৌশিক কবি, কৌশিক রসিক, কৌশিক ডানপিটে। একই লোকের মধ্যে এত বিভিন্ন রকম গুণের সামঞ্জস্য বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু কৌশিকের কথা আলাদা। ও যেন একটা সুতিমান্ “এক্সেপশন”।

এখানে আসবার পর থেকেই সুধেন্দু তাকে একবার এখানে বেড়িয়ে যাবার জন্ত আহ্বান জানিয়ে আসছিল। সময় নেই—এই অজুতাত্রে এতদিন কাটিয়েছে কৌশিক। আজ, চঠাং আচমকা, বলা নেই কওয়া নেই, সুতিমান্ নিজের মত সে যে এই জহুলে রাজো এসে হাজির হবে সুধেন্দু তা ভাবতেও পারেনি।

“ইচ্ছে হ’ল, চলে এলাম।” বাস্, এক কথায় আসবার কারণ জানাল কৌশিক।

কিন্তু যত সহজে এসেছিল তত সহজে ফেরা হ’ল না তার। কারণটা আর কিছু না—সেই অশখামার পা। এত বড় একটা রহস্যের সমাধান না হওয়া পল্লভ এ অঞ্চল ছেড়ে যাবে সে রকম ভেলে নয় কৌশিক। ফলে, বেড়াতে এলেও, এমন থেকে বেশীর ভাগ সময়ই তার কাঁটে লাগল ঐ রহস্যজনক ঘটনাগুলোর আলোপাশে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে পারের ভাপ থেকে শুরু করে আলোপাশের যাবতীয় কিছু পরীক্ষা করে যেতে লাগল সে। শুধু গিরে পরীক্ষা করা নয়—ইট-পাটকেল, পাথরের টুকরো, মাটি, কাঠা-জল—কত কী যে বখান থেকে কুড়িয়ে এনে সে সুধেন্দুর ঘর ভরিয়ে তুলল তার ঠিক নেই। সুধেন্দু ঠা’ড়া করে বলল, “সবই তো করলি এ জীবনে। গোয়েন্দাগিরিটা বাকি ছিল, এবারে সেটাও হয়ে যাবে বেশ চড়ে।”

কৌশিক গম্ভীরভাবে শুধু বলল, “হঁ।”

দু-তিন দিন এইভাবে কাটবার পর চঠাং একদিন কৌশিক গিরে ঢুকল স্থানীয় লাইব্রেরীতে। এই পাণ্ডববজ্রিত জায়গায় লাইব্রেরী! স্নানতে আশ্চর্য লাগে বৈকি! কিন্তু এটি টমাস্ সাহেবের কীর্তি। সময় কাটাবার জন্য বইয়ের মত লজী নেই—মনের পোষাক মেটাবার জন্তও নেই ওর মত সাধী। টমাস্ সাহেব এটা বুকেছিলেন এখা ওপর ওয়ালোয়ের লিখে এখানে একটি ছোটখাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিতও করেছিলেন। তবে সাধারণ নাটক নভেলের লাইব্রেরী নয়, তাঁর সংগৃহীত বেশীর ভাগ বই-ই ছিল গাঢ়পালা—উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে। নানারকম বনজ সম্পদ, বনজ খনি—ইত্যাদি সবকিছু কিছু ভাল ভাল বই ছিল। বোট কথা, তখন লিখে বাখের কারবার তাদের উপযোগী বইয়ের অভাব ছিল না এখানে। কৌশিক চ’লিন ঘুরেই এটি আবিষ্কার করল, তারপর ঢুকল গিরে ওর মধ্যে। ভূ’বেলা পাওয়াগাওয়া আর রাস্তে ঘুরবার সময়টা ভাড়া সাহায্যই সে লাইব্রেরীতে। সুধেন্দু বিরক্ত হ’ল। কিন্তু বড়কে সে চিন্তিত, তাই বাধা দিল না।

● অশখামার পা

শ্রীকীর্তীপ্রসাদনাথ তট্টাচার্য

ইতিমধ্যে আরও বার দুই দেখা গেছে সেই রহস্যজনক পায়ের ছাপ। কখনও বনের এ-প্রান্তে, কখনও ও-প্রান্তে। সেই রকম করনার ধারে, ঐ একই জাতের গাছ উপড়ে ফেলা। তেমনিভাবে নথ দিয়ে শিকড় খুঁজলানো, পাশে অদ্ভুত সেই পায়ের ছাপ।

হানীর লোকেরা আতঙ্কিত হয়ে উঠল। সন্ধ্যার দিকে তো নরই, দিনের বেলাও কেউ দল না বেঁধে এবং লাঠিসোঁটার সুরক্ষিত না হয়ে এদিক-ওদিক্ চলাফেরা করে না। কুলিদের ব্যারাকে তো কপাই নেই। অথথামার পুজো দিয়ে তাঁকে শান্ত করার প্রস্তাব উঠেছে সেখানে। কিছু কিছু চাঁদাও উঠে গেছে এরই মধ্যে।

“আজ্ঞা হুয়া, তোদের এখানে তো বেশ ভালো ভালো মাইক্রোস্কোপ আছে। নিকল্ প্রিজম্ দেওয়া জিওলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ্ আছে কি?”—চঠাৎ প্রশ্ন করে কৌশিক।

“আছে বোধ হয়। কেন বল্ তো? এখানে গোরেন্সাগিরি ছেড়ে ফের রিসার্চ করবি মুঝি?”

“ঠাট্টা নয়। এই দেখ্ আজ কি পেলাম সেই করনার ধারে।” বলে কৌশিক পকেট থেকে একটা চক্কে চোকো কালো পাথর বার করল। পাথরটার গায়ে কতকগুলি তামাটে আঁচড় কাটা, দু’একটা আঁচড় বেশ জল্ জল্ করছে।

সুখেন্দু কিছু বুঝতে না পেয়ে বোকাম মত ক্যান্ ফ্যান্ করে তাকিয়ে রইল।

“রহস্যের দল আনা বার করেছি। বাকিটা—আজ্ঞা, তুই না বলেছিলি করেকজন মহুয়াল সরকার থেকে পারমিট নিয়ে এই জঙ্গলে এসেছে মধু সংগ্রহের জন্য? আলাপ করেছিল তোদের সঙ্গে? কোপার থাকে ওরা? চল্, একদিন আলাপ করে আসি।”

“ওঃ! এই তোয় রহস্য উদ্ধার? আমি ভাবি না জানি কি! হ্যাঁ, এসেছে বাটে। সে তো অনেকদিন হয়ে গেল। পিরালকুটির বাকি একটা ঠাঁবুতে আছে ওরা। দু’তিন জনের বেশী নয়। প্রতি বছরই আসে। একেবারে নিরীহ গোবেচারী লোক। কোন্ গাছে মোমাছি চাক বাধল বুয়ে বুয়ে বেঁধে আর, সন্ধান পেলে, ধোঁয়া দিয়ে মোমাছি তাড়িয়ে মধু সংগ্রহ করে ভলা খেকে। এরকম, একটা কি নিয়ে বাইরের লোককে মধু নেবার পারমিট দেওয়া,—অন্ত কোথাও আছে কিনা জানি না, কিন্তু এ অঞ্চলে ও প্রণা বহুদিন থেকে আছে।”

“চল্, তাহ’লে আজই হাই আলাপ করে আসি। আশাও তো? বিদেশী। বিদেশীতে বিদেশীতে আলাপ ভালই জমবে। তোয়ও একটু ‘পরিবর্শনের’ কাজ হয়ে বাবে।”

সারাবিন কৌশিক বহুপাতি নিয়ে মাইক্রোস্কোপের সামনে বসে কি কাজ করল, হুপুরের পরে চলল মহুয়ালদের ডেরায়। সেখানে গিয়ে দেখা গেল ঠাঁবুতে কেউ নেই। বোধ হয়

৩ অথথামার পা

ত্রিভীজ্ঞনারাণে তট্টাচার্য

মহুর সন্ধানেই বেরিয়েছে। একটা কাঁটাতার বেওয়া আলুগা বেড়া বসিয়ে তাঁবুতে ঢুকবার যত্ন বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কৌশিক সন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে আলোপালো কি যেন খুঁজতে লাগল।

তাঁবুর পাশেই কতকগুলো বড় বড় আলার মত পাত্র পড়ে রয়েছে। বেথলেই বোকা যায় এগুলো মধু রাখার পাত্র। কিন্তু বোধ হয় ভাড়া, বা পরিভ্রাঙ্ক, কেননা মধুর কোনও গন্ধ নেই ওতে। কৌশিক সাবধানে এগিয়ে গিয়ে একটা লাঠি দিয়ে উঠেছিল একটা ভাল। হাতের থেকে বেরিয়ে পড়ল কয়েকটা মাটি বোঁড়ার সরঞ্জাম আর ফর্ক—কাঁটা-চামচের মত কাঁটা-চামচ। অস্ত্র যা দিয়ে মাটি খুবলে খুবলে আলুগা করে নেওয়া যায়। আর পাওয়া গেল কয়েক জোড়া গাম্বুট। কিন্তু রবারের তৈরী সেগুলোর তলা সাধারণ বুটের মত নয়—ঠিক যেন এক-একটা বিরাট মানুষের পা—পাঁচটা আঙুল সমেত।

কৌশিক এবার আর কোনও যিগা না করে কাঁটাতারের বেড়া সরিয়ে তাঁবুর ভেতরে ঢুক পড়ল। হুথেন্দুকে ইশারার ডেকে বলল—
“আর।”

একটু ইতস্ততঃ করে হুথেন্দু বলল, “ট্রেসপাস্?”

“হঁ। ভীক কোথাকার! চলে আর।”—আবেশের স্বরে বলল কৌশিক।

তাঁবুর ভিতরে যা বেধা গেল তাতে আর বিষয়ের লীলা রইল না হুথেন্দুর। বড় বড় বোতল তত্তি মানারকম এলিড, আরক আর রাসায়নিক মসলা। এককোণে পড়ে রয়েছে কয়েকটা ভাঙা পাথরের চাঁই—বেথলেই বোকা যায় মাটির অনেক তলা থেকে টেনে বার করা হয়েছে সেগুলোকে। পাথরের গায়ে আকাবাকা হাতের মত কতকগুলো ধাপও বেধা বাজে স্পষ্ট।



কৌশিক সাবধানে একটা লাঠি দিয়ে উঠেছিল একটা ভাল।

কৌশিক এটা দেখল, সেটা দেখল, এটা ঠিকল, ওটা ঠিকল। তারপর স্বভাবসিদ্ধ মোক্ষম শব্দটি উচ্চারণ করল—“ওঁ” অর্থাৎ স্বাক্ষর। স্বাক্ষরকে ভেঙে বলল, “এখনই কোন্‌দাঁড়ি গিয়ে করেকজন আন্ড্‌ গার্ডকে পাঠিয়ে দে। জারগাটা পাহারা দিতে হবে। আমি অপেক্ষা করছি। এর মধ্যে যদি মধুসূদন আসে আলাপ জমিয়ে নিতে পারব। তোর ভয় নেই, যা বলি কব।”

গল্প বড় হয়ে যাচ্ছে, কাজেই এর পরের সংক্ষিপ্ত ঘটনাগুলিও একটু বারিছাদ দিয়েই বলছি। মধুসূদন আসবার আগেই সরকারী প্রহরীর দল জারগাটা ঘেঁরাও করে ফেলেছিল। খেচারারা প্রথমটা বুঝতে পারেনি, যখন বুঝতে পারল তখন আর পালাবার উপায় ছিল না। তার পর সরকারী সম্পত্তি ভীততা দিয়ে অপহরণের অপরাধে কি ভাবে তাদের নামে মামলা করু করা হ’ল ইত্যাদি ইত্যাদি সে অনেক ব্যাপার। তা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। আপাততঃ চলে আসা যাক সুধেন্দ্র বসবার ঘরে।

সন্ধ্যার দিকে বেশ একটি আসর বসেছে সেখানে। গুরুচরণ, শিবতোষ, রামনাথর প্রভৃতি সুধেন্দ্র অধীনস্থ বনবিভাগের কর্মচারীরাও এসে জুটেছে। কিছু খাওয়া-পাওয়ারও আয়োজন হয়েছে। আসরের মাঝখানে বসেছে কৌশিক। সে-ই হচ্ছে বক্তা। অস্বখামার পদ-রহস্য কি করে ধরা পড়ল তারই গল্প বলছে সে।

“কয়েকটা জিনিস প্রথমেই লক্ষ্য করবার মত।”—বলতে লাগল কৌশিক। “প্রথমতঃ, এত রকমের গাছ থাকতে একটা বিশেষ ধরনের গাছের ওপরই হয়েছে বত হামলা। অথচ গাছগুলোকে কেউ ক্ষুদ্রল দিয়ে কাটেনি, গাছের একটি পাত বা একটি কুঁড়ি—যার জন্ত এ গাছের দাম—তাতেও হাত দেয়নি কেউ। শুধু গোটা গাছটা উপড়ে ফেলেছে শিকড় সমেত, বতটা নষ্টব নিঃশেষে। কাজেই বোঝা যাচ্ছে—হামলাধারকের নজর আর ঘারই ওপর থাক, গাছের ওপর নয়, অস্ত্র কিছুর ওপর। দ্বিতীয়তঃ, যা লক্ষ্য করবার মত, তা হচ্ছে এর সবগুলো গাছই কোন-না-কোন বরনার পাশ ঘেঁষে উঠেছে। শুকনো জারগার কোন গাছের ওপর হামলা হয়নি।

“পায়ের ছাপগুলো সত্যি রহস্যময়। অত বড় ছাপ মানুষের পায়ের হতে পারে না। যদি কারও হয় সে কোনও অতিকার জীব—অর্থাৎ যার সন্ধানে স্বভাবতঃই একটা আতঙ্ক হয়। ঐ পায়ের ছাপ যেথায় লোক বাতে ভরে ওয় কাছে না বার তারই অস্ত্র ঐ ছাপের ব্যবস্থা হয়েছিল—এই আমার ধারণা। ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখছি, প্রত্যেকটি ছাপে বুড়ো আঙুলগুলো বতটা চেপে বসেছে, গোড়ালির দিকটা সে ভাবে চেপে বসেনি। ওভাবে পায়ের নামনের দিকে

● অস্বখামার পা

ঐকিতীমনারায়ণ ভট্টাচার্য

ভর দিয়ে আমরা কখন ইটি? না, এখন পা টিপে টিপে চল। হয়—চল। শব্দ শোনা কঠোর
তক, তখনই ঐ রকম করা হয়। অর্থাৎ চাপড়লোকে যে ঐভাবে যেনা হয়েছে ও বকেবান
ইচ্ছাকৃত। কোন জখী অতিকার জীব—প্রাগৈতিহাসিক যুগেরই হোক বা আজ যে যুগেরই হোক,
—ও'লে ওভাবে পা টিপে টিপে চলবার তার কোনও কারণ থাকতে পারে না। অশবীর
তো নয়ই। ঐ বেখেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়—বাগারটা কোনও ভুল লোকের কারসাজি।
যতটা সম্ভব গোপনে কাজ হাসিল করার উদ্দেশ্যে ঐ রকম করা হয়েছিল—যদিও বনের মধ্যে
এব প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না।

“এর পরই একদিন ওখানে পরিত্যক্ত একটা জিনিস কুড়িয়ে পেয়ে আমি আশ্চর্য্য একটা
মন্তব্য পেরে গেলাম। জিনিসটা আমি হোকে দেখিয়েছিলাম যখন, তোর বোধ হয় খেয়াল
নেই। আর কিছু নয়, এক টুকরো কটিপাথর। এখানে কটিপাথর এল কোথেকে? এখানে
তো ও জিনিস হয় না! আর হলেও এমন নিখুঁত চৌকো মাথের পাথর আসবে কোথেকে?
নিশ্চয়ই কেউ এনে ফেলে গেছে। কিন্তু কেন? আপনারা সবাই জানেন, কটিপাথরের একটা বড়
ব্যবহার হচ্ছে সোনা যাচাই করার কাজে। সেকারণ, সোনা খাঁটি কিনা কটিপাথরে ঘষে দেখে। কোনও
সোনার জিনিস দিয়ে কটিপাথরে আঁচড় কাটলে তাহাতে রংয়ের একটা দাগ পড়ে—বেশ স্পষ্টমতো
দাগ। অভিজ্ঞ লোকেরা ঐ দাগ দেখে বলে দিতে পারে জিনিসটা সোনা কিনা, সোনা হলে
খাঁটি সোনা কিনা, কতটা খাদ হয়েছে ওর মধ্যে, ইত্যাদি। অবশ্য রাসায়নিক পরীক্ষা করেও
এ তথ্য বার করা যায় কিন্তু সেটা ব্যয়সাধ্য এবং এটোর মত চট করেও হয় না। কটিপাথর
দেখেই চন্দ্র করে আমার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা এল, আর বাগারটা খোলসা করে নেয়ার অস্ত্র প্রস্তুতি
আমি ছুটলাম এখানকার লাইব্রেরিতে। এটো জব্বলের রাজ্যে এরকম লাইব্রেরী পাওয়া—এও
একটা যোগাযোগ। বেঁচে থাকুন মিস্টার টমাস্”

চারের পেরালার পর পর কয়েকটা দীর্ঘ চুক দিল কোঁশক। তার পর ফের শুরু করল—

“এখানকার লাইব্রেরিতে গল্পের বই থাকুক না থাকুক, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান অর্থাৎ বোটানি, ভূ-বিজ্ঞান
অর্থাৎ জিওলজী, মিনারেলজী প্রভৃতি বিষয়ের অনেক আধুনিকতম বই আছে এ আমি
আগেই দেখে গিয়েছিলাম। বিশেষ করে ‘ভূ-বোটানির কয়েকখানা বইও আমার চোখে
পড়েছিল। জিওলজী আর বোটানি মিশ্রের এই শাস্ত্রটি তৈরী হয়েছে। এইবার সেটুকলোকে
কাজে লাগাবার চেষ্টা করলাম আমি। যার এই খাদ বা বিজ্ঞান নিয়ে একটু-আধটু চর্চা করেছে
তারা অনেকেই জানে যে কোন কোন জাতের গাছ আছে যারা তাদের দেখের চরিত্র তত্ত্ব সাধারণ
ধাতব পদার্থ ছাড়া কোন কোন মূল্যবান ধাতুও মাটি থেকে টেনে নেয়—ক্রোমিয়াম, মলিবডিনাম,

● অবশ্যম্ভাব্য পা
শ্রীকীৰ্ত্তীজনায়াগ ভট্টাচার্য

ভান্ডারিয়ার প্রকৃতি ধাতু। একরকম গাছ আছে বাঘের নজর সোনার ওপর। সাধারণ ধাতুতে তাদের যেন মন ওঠে না,—তারা টেনে নেয় সোনা। হর্সটেল্ এই জাতের গাছ। তবে, বলা বাহুল্য, অধিকাংশ গাছেই যে সোনা টেনে নেয় তার পরিমাণ খুব হ্রস্ব। কিন্তু কোন কোন জাতের গাছ আছে যারা অল্প সোনায়ে খুণী নয়—মাটির রসের সঙ্গে বেশ খানিকটা সোনা তার টেনে নিতে পারে। লাইবেরীতে বলে বই ঘেঁটে এই ধরনের কয়েকটা গাছের নাম আর হালচাল দায় করলাম। দেখলাম, যে গাছগুলো ওপড়ানো হয়েছে সেগুলো ঐ জাতেরই গাছ।

“গাছ সোনা টেনে নিচ্ছে, কিন্তু সাধারণ মাটিতে তো সোনা থাকে না—নিশ্চয়ই এই সব গাছ এমন অরগান অথবা যার কাছাকাছি মাটির নীচে পাথরের গায়ে সোনার আকর আছে—তা বস্তুকু সোনারই হোক না কেন। সোনা, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, অনেক সময়ই অজ্ঞাত ধাতুর মত অল্প মৌলিক পদার্থের সঙ্গে মিলে মিশে,—অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা বাকে বলেন যৌগিক পদার্থ—সেই ভাবে, থাকে না। একেবারে খাঁটি মৌলিক পদার্থরূপেই পাওয়া যায় ওকে। দল-ছাড়া এই অবস্থাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে “নেটিভ ডিপোজিট”। আবার এও দেখা গেছে—পাহাড়ী নদী, বরনা ইত্যাদির নীচেই এই রকম সোনা বেশী পাওয়া যায়। কখনও হ্রস্ব রেণুর আকারে, কখনও বা পাথরের ফাটলে সোনার স্তরের আকারে। খুব দূর থেকে রস টেনে নেওয়া গাছের পক্ষে অসুবিধাজনক, তাই খাত্তাওয়ারের মত কাছাকাছি থাকা যায় সেই চেষ্টা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। এই গাছগুলোও তাই বরনার কাছাকাছিই গজায় বেশী। আবার, এই গাছগুলো যখন রয়েছে তখন তাদের কাছাকাছি সোনা থাকার সম্ভাবনাও খুব বেশী।

“ব্যাপারটা তা হলে খতিয়ে দেখা বাকি। এখানকার সরকারী সংরক্ষিত বনে রয়েছে ঐসব ‘সোনা-থেকো’ গাছ। কাজেই তাদের কাছাকাছি সোনাও রয়েছে। কিন্তু সে হচ্ছে সরকারী সম্পত্তি—সাধারণের পক্ষে তা উদ্ধার করা বে-আইনী। কাজেই ঐসব সোনা নিয়ে রাতারাতি বড়লোক হতে হলে একটু-আধটু কারসাজি করতে হবে বৈকি! এখানেও তাই করা হয়েছে।

“যারা যত্নরাল সেবে এসেছে তারাই হচ্ছে এই স্বর্ণসন্ধানী। ওরা ছাড়া কোন বাইরের লোক এ অঞ্চলে নেই। স্থানীয় লোকদের চালচলন কারও অজ্ঞাত নয়—কাজেই সম্ভবতঃ ওদের ওপরই পড়া বিচিত্র নয়। সত্যি কিন্তু ওরা যত্নরাল নয়, যত্নসংগ্রহী লোক-বেখানো ব্যক্তি; আসল উদ্দেশ্য বে-আইনী ভাবে সোনা সংগ্রহ। যত্ন পায়নিট পাওয়া এ অঞ্চলে বেশী কঠিন নয়। যত্নরাল সাধারণে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এদের অনেক বেশী—এবং আশি জানি না, হয়তো সামান্য সময় জানা যাবে, এদের পেছনে কোন উচ্চশিক্ষিত বড় বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানীর দলও রয়েছে। বাই হোক, বা বলছিলাম।

৯ অবখাবার পা

ক্রীড়ানারায়ণ ভট্টাচার্য

“লোকের চোখে বুলা দিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে, তাই ঐ অমানুষিক পারের ভাণ্ড তৈরি করা হয়েছিল,—করমাশ দিয়ে গাম্ বুট তৈরি করে, বার তলাটা ঠিক মাপের পারের মত কিছু আকারে অনেক—অনেক বড়। পৰশ্ব বন্ধ করার জন্য ঐ ভারী বুট, হোক না তা রবারের, প’রে টপে টপে চলা ওদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। পারের ছাপে তা আগেই ধরা গেছে। কিছু ও আর কতটুকু শব্দ? আসল শব্দ তো হবে গাছ কাটতে গেলে। এর উপায়ও বার করতে কষ্ট হয়নি ওদের। তাবুতে বোতলের মধ্যে এমন কতকগুলি ওষুধের সন্ধান পেয়েছি বা গাছের গোড়ায় ছড়িয়ে দিলে বিবের কাজ করে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই গোড়া সমেত গাছ আলগা হয়ে আসে। তখন তাকে ঠেলে ফেলতে খুব একটা জোর লাগে না, এবং, চেষ্টা করলে, তখন শব্দ না করেও আস্তে আস্তে তাকে শুইয়ে ফেলা যায়। গাছ না কাটার আর একটা কারণ ছিল। এই সব গাছের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত লম্বা হয় আর ঐ শিকড়ই তো সন্ধান দেয় কোথায় সোনা আছে। তাই শিকড়গুলো বাতে না নষ্ট হয়, আলগা ভাবে তুলে তুলে দেখা যায়,—তার চেষ্টা করা হয়েছে সাধ্যমত। যেটা নধ দিয়ে শিকড় খুবলানো মনে হয়েছে সেটা আর কিছু নয়, দক্ষ দিয়ে শিকড় আলগা করার চেষ্টা। শিকড় কতদূর গেছে বেখে বেখে সোনার সন্ধান করা হয়েছে এবং যে মাটি বা পাথর পাওয়া গেছে তাতে সোনা আছে কিনা পরখ করবার জন্য কটিপায় ব্যবহার করা হয়েছে। পাথরকে খুব পাতলা করে, বন্ধ করে ঘেঁ নিয়ে জিওলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপের নীচে ফেললে তার ভিতরকার উপাদান আরও সহজে ধরা পড়ে,—বিশেষ করে সেটা কোন্ পাথর বা কোন্ মিনারেল তা চিনতে পারা যায় সহজেই। যে সব পাথরে সোনা থাকে তাও চিনতে পারা যায় এতে। আর ওখানকার পাথর কুড়িয়ে এনে মাইক্রোস্কোপে পরীক্ষা করে দেখেছি যে ধরনের পাথরে সোনা থাকে সত্য এ সেই জাতের পাথর। কাজেই আমার ধারণা হয় অভ্রান্ত। তার পর শুধুমাত্র ‘কিন্তু-কিন্তু’ ভাব উপেক্ষা করে ওদের ডেরার চান’ দিয়ে বাকী সমস্ত সন্দেহের নিরসন হয়েছে।”

“কিন্তু—” গুরুচরণ কি বলতে যাচ্ছিলেন, শিবতোষ বাধা দিয়ে বলল, “আর কিন্ত-টিও নয়। শুধু এত থাকারের আয়োজন করেছেন, সেগুলোর সন্ধানকার করা যাক আগে।”

“কিন্তু কুলি-ব্যারাকের পুজোটা—?”

“পুজো হোক না যেমন হচ্ছে। প্রসার—বিশেষ করে মহাপ্রসাদ অধিবাসীদের কাছেও পরম মোহনীয়।”—হাসতে হাসতে বললে কৌশিক।

ইন্দ্রজাল

—জাহ্নসজ্জাটি পি. সি. সরকার

আবার পূজাবার্ষিকীর জন্ম সহজ সুন্দর অথচ চমকপ্রদ জাদুর খেলা নিয়ে হাজির হচ্ছি। আগেকার দিনে খেলা দেখেছি জাদুকর একটা কাঁচের গ্লাসের মধ্যে কিছুটা কাঠের গুঁড়ো বা ভূষি ভতি করে পরস্পরে তার মধ্যে থেকে মিঠাই বের করে দেখান। আমার লেখা “ম্যাজিকের খেলা” বইতে এই খেলার দুইটি পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করেছি। “তুমি হইতে রসগোলা” খেলাতে পাতলা পেস্টবোর্ড দিয়ে ‘ফেক’ অর্থাৎ নকল গ্লাস তৈরি করার কথা বলা হয়েছিল। সেই ‘ফেক’ গ্লাসের চারদিকে আঠা দিয়ে ভূষি লাগাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ঐ খেলাতে ভূষির থেকে রসগোলা, সন্দেশ, মুড়ি, লজেন্স, টফি প্রভৃতি শুকনো জিনিস বের করা যায়—চা, দুধ, কফি প্রভৃতি তরল পদার্থ বের করে দেখানো যায় না কারণ সেক্ষেত্রে পেস্টবোর্ডের ‘ফেক’টি ভিজে ওটা একদম নষ্ট এবং অকেজো হয়ে যাবে। চা, দুধ অথবা কফির মধ্যে ‘ফেক’ ভূষিয়ে রাখলে তা’ দিয়ে খেলাই করা যাবে না। ঐ বইতে ‘অমৃত রূপাসুর’-নামক খেলার পদ্ধতি অনুসরণ করলে অবশ্য শুকনো, তরল সবরকম পদার্থই বের করা সম্ভবপর। কারণ মধ্যখানে আয়নার ‘পার্টিসন’ করা থাকে বলে দূর থেকে ঐ অর্ধেক গ্লাসই পূর্ণগ্লাস বলে ভ্রম হয়। ওখানে ঐ গ্লাস দর্শকদের হাতে দেওয়া যায় না এবং দূর থেকে দেখাতে হয় বলে দর্শকদের মনে গভীর রেখাপাত করতে সক্ষম হয় না।

বর্তমানে আমরা এই খেলাটিকে খুবই উন্নত করে ফেলেছি। স্টেজের উপর একটা চৌকো কাঁচের বাস্ক রয়েছে। কাঁচের বাস্কটা দেখতে ঠিক রঙিন মাছের একুরিয়ামের মত। একুরিয়ামের মধ্যে জল থাকে—এর মধ্যে তার পরিবর্তে থাকবে লাল-নীল-হলুদ-সবুজ-সাদা-গোলাপী নানা রঙের কাগজের কুঁচি। বিলাতে এই ধরনের কাগজের কুঁচিকে বলে ‘কনফেটি’ (confette)—ওদেশে বিবাহ প্রভৃতি উৎসবে ঐগুলি মাথার উপর ছিটিয়ে দেওয়া হয়। আমাদের দেশে ঐ ছড়াবার প্রথা আছে—তার নাম ‘লাজবর্ণ’। বলা বাহুল্য এই খেলা রঙিন কাগজে কুঁচি বা কনফেটির পরিবর্তে ঐ দিয়েও দেখানো

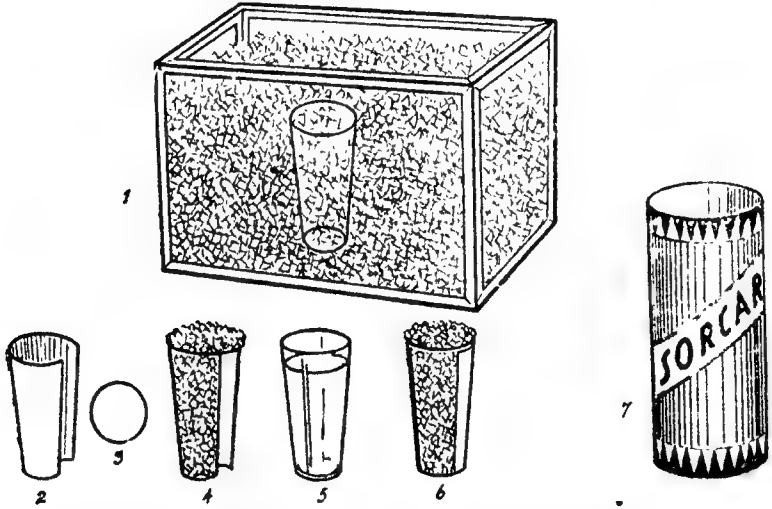
চলে। তবে রঙিন কাগজের কুচি হলে খেলাটি খুবই বাহারী হয় এবং সবাই দেখেও পুশী হন।

জাদুকর একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাস নিয়ে এলেন, তারপর টেবিলের উপরে রক্ষিত ঐ কাঁচের বাগ্গের মধ্য থেকে রঙিন কাগজের কুচি নিয়ে ঐ গ্লাস ভর্তি করলেন। সবার সামনে কাগজের কুচি ভর্তি গ্লাসটা ঐ কাঁচের বাগ্গের উপর কাত করে ধরলেন, তখন আন্তে আন্তে (ঝুর ঝুর করে) কাগজের কুচিগুলি উড়ে উড়ে আবার ঐ কাঁচের বাগ্গে পড়তে লাগল। সাধারণ কাঁচের গ্লাসে সাধারণ রঙিন কাগজের কুচি ভর্তি করা হয়েছে মাত্র। জাদুকর দ্বিতীয়বার গ্লাসটাকে বাগ্গের মধ্যে ঢুকিয়ে আবার কাগজের কুচি ভর্তি করে ওপরে তুলে আনলেন আর সবাইর কাছে রেখে দিলেন। তারপর আনা হল একটা সাধারণ পেস্টবোর্ডের চোঙ (cylinder)। এই চোঙের দুই মুখই খোলা—ভিতর দিয়ে তাকালে এদিক থেকে ওদিক স্পষ্ট দেখা যায়। আমি আবার চোঙটিকে খুব বাহারী রং দিয়ে বাইরে 'SORCAR' কথাটা বড় বড় করে লিখিয়ে নিয়েছিলাম। দর্শকদের সামনে ফাঁকা খালি চোঙ দেখিয়ে সেটি দিয়ে ঐ কাগজের কুচি ভর্তি কাঁচের গ্লাসটা সর্বসমক্ষে চাপা দেওয়া হল—পরক্ষণে চোঙটা তুলে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল—ওর আর কোনও দরকার নেই। কারণ গ্লাস ভর্তি কাগজের কুচি তখন কফি হয়ে গেছে বা দুধ হয়ে গেছে। জাদুকর ইচ্ছা করলে সেই তরল পদার্থপূর্ণ গ্লাস সবাইকে ভাল করে দেখিয়ে নিয়ে নিজে সর্বসমক্ষে ঐ দুধ বা কফি পান করে ওর যথার্থতা বা খাটিহ প্রমাণ করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ দুধ, কফি এবং গ্লাস সবগুলিই খাঁচি, কোনও প্রকার কৃত্রিমতা করা নেই কাজেই অনায়াসে দর্শকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

এবারে খেলাটির মূল কৌশল বলে দিচ্ছি। এই সঙ্গে দেওয়া চিত্রগুলি পর পর ভাল করে লক্ষ্য করলে সব ঠিকমত বুঝতে পারবে। এখানে এক নম্বর চিত্র হচ্ছে চোকা একুরিয়ামের মত চারিদিকে কাঁচ দেওয়া বাগ্গ। ওর মধ্যে রয়েছে কুচি কুচি করে কাটা বিভিন্ন রঙের কাগজের টুকরা 'কনফেটি'। ঐ সমস্ত কাগজের কুচির তলায় লুকানো রয়েছে কফি বা দুধভর্তি কৌশলযুক্ত কেক-সম্বলিত গ্লাস, ৬ নম্বর চিত্রে ঐ গ্লাসটি বিন্দু বিন্দু চিরু দিয়ে দেখানো হয়েছে। প্রথমে দুইটি একই নাপের সাধারণ কাঁচের গ্লাস লও। একটা গ্লাস খেলা দেখাবার জন্য রাখা হল। দ্বিতীয় গ্লাসটির (চিত্রে প্রদর্শিত ৫ নম্বর গ্লাস) বাইরের মাপে অর্ধেক গ্লাস মত ২ নম্বর চিত্রের স্থায় একটা স্বচ্ছ সেলুলয়েডের খোলা তৈরি কর আর তার উপরে ঐ সেলুলয়েডের গোল ঢাকি কেটে নিয়ে ৩ নম্বর চিত্রের মত ঐটাকে দিয়ে ঐ অর্ধেক

দেব দেউল

গ্লাস বা ফেকের ছাদ তৈরি করে নাও। বাজারে ফিল্ম জুড়বার জন্ত যে আঠা বিক্রি হয় ঐ আঠা ব্যবহার করবে—খুব সহজে দুই এক মিনিটেই জোড়া লেগে যাবে। এবার ৪ নম্বর চিত্রের মত আধা-গ্লাস 'ফেক' তৈরি হ'ল। এর ভিতরের পিঠে ঐ একই আঠা দিয়ে কিছু কাগজের রঙিন কুচি জুড়ে দাও। আমি সেলুলয়েডের ভিতর পিঠে আঠা খুব করে মাখিয়ে দিয়ে তারপর কাগজের কুচি ওর মধ্যে ঢেলে দেই আর কয়েক মিনিট পরে সেগুলি উপড় করে ঢেলে নেই, তখন ভিতরের পিঠে অনেক কাগজ জুড়ে



- (১) রঙিন কাগজের কুচি-ভরা কাঁচের বাক্স। ভেতরে বিশেষভাবে তৈরী গেলস লুকানো রয়েছে
 (২) সেলুলয়েড থাপ (৩) ছাষ (৪) সম্পূর্ণ তৈরী 'ফেক' (৫) সাধারণ গ্লাস
 (৬) ফেকের মধ্যে গ্লাস (৭) পেক্টবোর্ডের তৈরী চোঙ

থাকে। উপরের চাকিটার ভিতর পিঠে বা নীচের দিকে আঠা না দিয়ে উপর দিকে আঠা দিয়ে কাগজের কুচি লাগাতে হয়। এবার ৫ নম্বর চিত্রের মত গ্লাসে কফি অথবা দুধ ঢেলে প্রায় ভর্তি করে নাও, তারপর ঐ ৪ নম্বর চিত্রের 'ফেক' গ্লাসটি তার উপরে কভারের মত ঢাপিয়ে দাও। তখন ফেকের মধ্যে কফিভর্তি গ্লাসটি চুকে দিয়ে ৬ নম্বর চিত্রের মত হয়ে গেল। এইটিই হচ্ছে কফি বা দুধভর্তি কোশলবৃক্ষ ফেকসম্বলিত গ্লাস বা ঐ কাঁচের একুরিয়াম বাল্লে কাগজের কুচির ডলায় লুকানো রয়েছে।

● ইন্ডিয়ান

আইনস্টাইট পি. সি. দরকার

কাগজের চোঙটিতে কোনও কৌশল নেই। পেস্টবোর্ড দিয়ে সাত নম্বর চিত্রের স্থায় একটা চোঙ তৈরি করে নাও যেটি দিয়ে সহজেই ঐ ফেকসম্মিলিত কৌশলযুক্ত গ্লাস (৬ নম্বর চিত্র) চাপা দেওয়া যায় আর বাইরে থেকেই অনায়াসে ফেকটা খুলে নিয়ে—শুধুমাত্র গ্লাসটা তলা দিয়ে বের করে নেওয়া যায়। নরম পেস্টবোর্ডে চোঙের বাইরে থেকে চেপে ধরে অনায়াসে ঐ ফেক থেকে গ্লাস বের করে নেওয়া যায়—সামান্য একটু অভ্যাসের প্রয়োজন হয় মাত্র। তখন ফেকসহ ঐ চোঙটি গ্রীনক্রমের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিসেইট হ'ল। চোঙের সাত ফেকটি চলে গেল। চোঙটি পূর্ব বাহ্যিক রঙ করে নিতে হয় আর বাইরে নাম লিখে নিলেও বেশ সুন্দর হয়। আমি আমার এই রকম গুঁটিনাটি যত্নপাতির উপর আর্টিস্ট দিয়ে সুন্দর করে “SORCAR” কথাটা লিখিয়ে নেই। বাকী অংশ অত্যন্ত সহজ। প্রথমে কৌশলযুক্ত ফেকসম্মিলিত ৬ নম্বর চিত্রের মত গ্লাসটি কাঁচের চৌকো বাজের মধ্যে কাগজের কুচির উল্লম্ব লুকানো থাকবে। জাহ্নকর প্রথমে একটি সাধারণ কাঁচের গ্লাসে কাগজের কুচি ভরে ঢেলে ঢেলে দেখালেন, সাধারণ কাগজের কুচি আর সাধারণ গ্লাস। তারপর দ্বিতীয়বার বাজের মধ্যে কাগজের কুচির মধ্যে ডুবিয়ে গ্লাস ভর্তি করার সময় ঐ গ্লাস ওখানে ফেলে রেখে জাহ্নকর প্রথম থেকে লুকানো ছয় নম্বর চিত্রের মত গ্লাসটি তুলে আনলেন। দর্শকগণ ভাবলেন যে একটা সাধারণ কাঁচের গ্লাস ভর্তি করে কাগজের কুচি তোলা হ'ল মাত্র—আসলে কিন্তু দুধ বা কফি ভর্তি গ্লাসটা উঠে এলো যার বাইরের দিকে কাগজ লাগানো সেলুলয়েডের ফেক লাগানো রয়েছে। জাহ্নকর এবার এই গ্লাসটা টেবিলের উপর রেখে—রঙিন ফাঁকা চোঙ (৭ নম্বর চিত্র) দিয়ে চাপা দিলেন আর হাতে তুলে নিয়ে আস্তে একটু ঝাঁকানি দিয়েই বাইরের চোঙটা খুলে তুলে নিয়ে গ্রীনক্রমের দিকে ফেলে দিলেন। তখন তাঁর হাতে রয়েছে একটা ঝালি গ্লাস যার মধ্যে পাঁচ নম্বর চিত্রের মত ভর্তি রয়েছে গরম দুধ বা কফি। দর্শকগণ বা জাহ্নকর নিজে অনায়াসে এই দুধ বা কফি খেয়ে নিতে পারেন। জয় জয় হবে বেলা শেষ হ'ল।

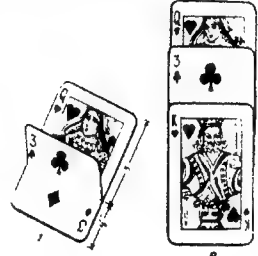
এরপর একটা সুন্দর তাসের বেলা লিখিয়ে দিচ্ছি। এবার বিবিল ভারত জাহ্নকর সম্মেলনের সভাপতি হিসাবে বেলা দেখাবার সময় আমি এই বছরের একটা বেলা দেখিয়েছিলাম। তিনটা তাস আনা হ'ল—নব্যধানের তাসটা সরিয়ে রাখা হ'ল, তখন দেখা গেল সেটি অল্প তাস হয়ে রয়েছে—আমার কটোতে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। এবার ঐ জাতীয় একটা বেলা দেখানো হচ্ছে। জাহ্নকর ২ নম্বর চিত্রের মত ধরে দেখালেন তাঁর হাতে তিনটা তাস আছে—ব্যাক্রমে হরতনের বিবি,

● ইন্দ্রকান

আত্মসম্মতি সি. সি. সরকার

দেব দেউল

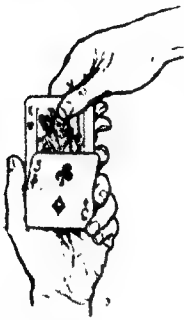
চিড়াতনের তিন এবং হরতনের সাহেব। সাহেব-বিবি-তিন এই তাস তিনটা সবাই মনে রাখতে পারেন। সবগুলিই হরতন (লাল) না দিয়ে মধ্যখানে একটা (কাল) চিড়াতন দেওয়াতে খেলাটা দেখতে ভাল হয়। জাদুকর চিড়াতনের তিন মধ্যখানে থেকে তুলে নিয়ে টেবিলের উপর চাপা দিয়ে রাখলেন—তখন তাঁর হাতে রইল মাত্র দু'টি তাস হরতনের সাহেব ও বিবি। জাদুকর প্রকাশ্যে ঘুরিয়ে ঐ সাহেব ও বিবি তাস দু'টি সবাইকে দেখিয়ে নিজের পকেটে রেখে দিলেন। তা'হলে চিড়াতনের তিন গেল কোথায়? টেবিলের উপর রক্ষিত তাসটা উলটিয়ে দেখা গেল সেটা একটা অণু তাস, যেমন 'জোকার' অথবা জাদুকরের ফটো হয়ে গিয়েছে। এই খেলা দেখে সবাই নিশ্চয়ই অবাক হবেন।



১নং চিত্র

২নং চিত্র

খেলাটা দেখতে খুবই আশ্চর্যজনক কিন্তু কৌশল খুবই সহজ। এই খেলার জঘ প্যাকেট থেকে একটা জোকার, একটা হরতনের সাহেব, একটা হরতনের বিবি, একটা চিড়াতনের তিন এবং একটা গা কোনও তাস, যেমন কুইতনের তিন লও। এর মধ্যে জোকার এবং সাহেব এই দুইটি তাস ভাল—কোনও কৌশল করা নেই। চিড়াতনের তিন এবং হরতনের বিবি এই তাস দু'টিকে পুরা একদিন জলে ভিজিয়ে রেখে পরদিন ওর উপরকার পাতলা ছবিটি তুলে নাও। তারপর চিড়াতনের তিন তাসের এক মাথা থেকে দেড় ইঞ্চি টুকরা ভাঁজ করে নিয়ে ঐ হরতনের বিবির পেছন দিকে এক মাথা ভাল করে আঠা দিয়ে জুড়ে দাও। হরতনের বিবির বাকী তিন ইঞ্চি জায়গাতে আঠা মাখিয়ে চিড়াতনের তিনের ওপর সমানভাবে জুড়ে দাও—তখন ১ নম্বর চিত্রের মত কৌশলযুক্ত তাস তৈরি হ'ল যার তিন ইঞ্চি নীচের দিকে একটা কজার মত “ফ্লাপ” তৈরি হ'ল। ঐ দেড় ইঞ্চি ফ্লাপটা নীচের দিকে নামিয়ে



৩নং চিত্র

দিলে তাসটা সম্পূর্ণ হরতনের বিবি হয়ে গেল আবার উপরের দিকে তুলে দিয়ে ডানার অংশটা হরতনের সাহেব দিয়ে চাপা দিয়ে ধরলে (২ নম্বর চিত্রের মত) তিনটা আলাদা আলাদা তাস বলে ভ্রম হবে। তাসগুলি নাড়াচাড়া করবার

৩ ইক্সপাল

আইসক্রাউ পি. সি. লরকার

দেয় দেউল

৩০৯

সময় তিন নম্বর চিত্রের মত হরতনের সাহেব তাসটা ফ্রাপের উপর ধরে নীচের দিকে একটু চাপ দিলেই ফ্রাপ আপনাআপনি ঘুরে নীচে নেমে আসবে আর তাসের রঙ পরিবর্তন হয়ে যাবে। এই হচ্ছে পেলার মূল কৌশল।

এবার খেলাটা ঠিকমত দেখাবার কৌশল বলে দিচ্ছি। হরতনের বিবির নীচ দিককার ফ্রাপটা উপরদিকে তুলে তার উপর হরতনের সাতজন চাপ দিয়ে ধরে দুই নম্বর চিত্রের মত করে দেখাও যে হাতে তিনটা তাস আছে—সবাক্ষরমে হরতনের বিবি, চিড়াতনের তিন ও হরতনের সাহেব। হরতনের সাহেবের পেছনে সমান সমান করে একটা জোকার তাসও রেখে দিতে হবে। তাস তিনটার সম্মুখদিক দর্শকদের দেখিয়ে ঘুরিয়ে নাও, তারপর তাস তিনটা নাড়াচাড়া করার সময় জোকারসহ সাহেব উপরদিকে তুলে তিন নম্বর চিত্রের মত নীচের দিকে নামাবার ছলে ফ্রাপটি ঘুরিয়ে দিয়ে প্রথম তাসটি সম্পূর্ণটা বিবিতে পরিণত করে নাও। দর্শকদের বল যে চিড়াতনের তিন আমি টেবিলের উপর রেখে দিচ্ছি—আমলে কিন্তু জোকারটিকে রেখে দিলে। এখন হাতে রইল হরতনের সাহেব ও বিবি। জাদুকর এই তাস দু'টি দর্শকদের দিকে ঘুরিয়ে আলাদা আলাদা করে দেখালেন যে ঐ দু'টি সাহেব এবং বিবি, তাঁর হাতে অল্প কোনও তাস নেই। এক্ষণে এই তাস দু'টি পকেটে রেখে দিয়ে দর্শকদিগকে টেবিলের তাসটা দেখতে বললেন, তখন দেখা গেল যে টেবিলের তাসটা জোকারে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। সবাই এই খেলা দেখে অবাক হয়ে যাবেন। ইচ্ছা করলে জাদুকর ঐ জোকারের পরিবর্তে নিজের ফটো তাসের উপর আঁটা দিয়ে আটকিয়ে—নিজের ফটো দেখাতে পারেন। নিম্নলিখিত জাদুকর সঞ্জিলনীর বার্ষিক অধিবেশনে আমি তাই করে দেখিয়েছিলাম, এতে সবাই অবাক হয়েছিলেন।

বেদা বিহিতঃ স্মৃত্যো বিহিতঃ।
নাসৌ সুনির্ধৃত মতঃ ন তিহস্।
ধর্মস্ত তস্যঃ নিহিতঃ গুহ্যায়াম্।
মহাত্মনো বেন গতঃ স পদঃ।

—মহাত্মারত

মণি ও মুক্তা



বেদ বিহিত, স্মৃতি বিহিত, এমন ব্রহ্ম
নেই বার আলাদা কোন মত নেই। ধর্মের
তব পটীর গুহার অজানা। সেক্ষেত্রে মহা-
পুরুষরা যে পথ ধরে চলেন, সেই একমাত্র পথ।



—প্রভাবতী বৈবী সরস্বতী

বোহনপুর খুলে আসছেন নতুন হেডমাস্টার।

ছেলেদের আর উৎকর্ষার শেষ নাই। এর মধ্যে ছেলেদের মাঝে একটি কথা ছড়িয়ে পড়েছে—
ইনি নাকি বিশেষ সুবিধাজনক লোক নন।

মুগ্ধটা আগে মাইনর ছিল, বংসর দুই তিন হল হাইস্কুলে পরিণত হয়েছে; কিন্তু হলেও
উন্নতি কিছুই দেখা যাচ্ছে না, সে অল্প কর্তৃপক্ষ চিন্তিত হয়েছেন এবং পুরাতন হেডমাস্টারকে
সরিয়ে দিয়ে নতুন লোক নিয়ে আসছেন।

ক্লাস টেনএর ললিত বলছিল—“ওনেছি এ স্তার তারি কড়া দ্বাভাবের লোক। আমার
বাধা বলছিলেন—এবার যদি বোহনপুর হাইস্কুল ঠাঁড়িতে পারে—বে জাঁবরেল হেডমাস্টার আসছেন,
ইনি নাকি অনেক মূল্যে ঠাঁড় করিয়েছেন, বব ছেলেদের চিট করেছেন।”

বলের নেতা বহিষ কক্ষকর্তা বললে, “তোমার বাধা ভা হলে বলতে চান, আমরা সবাই
বব ছেলে, সে অল্পে নতুন হেডমাস্টারকে আনা হচ্ছে বাতে আমরা সবাই চিট হয়—”

ললিত বাবড়ে গিয়ে বললে, “কিন্তু বাবা তো সে কথা বলেন নি, তিনি বলেছেন—”

সুধীর এতক্ষণ আধখানা আধ নিয়ে দাঁত দিয়ে চাড়িয়ে খাচ্ছিল আর মনোযোগ দিয়ে এদের কথা শুনছিল। এতক্ষণে সেটা শেষ করে কথা বলবার অবকাশ পেলে, চিৎকারে চিৎকারে বললে, “কি দরকার ছিল নতুন হেডমাষ্টার আনবার? বেশ তো ছিলেন আমাদের পুরোনো হেডমাষ্টার তারণবাবু, বেশ পড়াভেন—বুঝিয়ে দিতেন; হাজার ত্রুটি করলেও একটি কথা বলতেন না। আমরা তাঁকে ভালোবাসতাম শুধু তাঁর ওই গুণের অস্তিত্ব তো—”

তোতলা ভূতো এতক্ষণ কথা বলবার অস্ত্র প্রস্তুত হচ্ছিল। প্রথম কথা উচ্চারণ করবার অস্ত্র তাকে অনেকক্ষণ কসরত করতে হয়, তারপর ধম দেওয়া মেশিনের মত সে গড় গড় করে পানিকটা কথা বলে যায়।

চোখ পাকিয়ে সে পানিকটা তো তো করে বললে, —“এ স অ অ ব ক ক কস্তাদের মরজি—তা তা তা—”

প্রচণ্ড ধমক দেয় মহিম—“গাম্ তুই তোতলা কোপাকার, তাকে কথা বলতে কেউ বলতে না। বলতে গেলেই খালি তো তো—”

অন্ত ছেলেদের দিকে ফিরে বললে, “বাবুড়াও মাং, উনি আগে আস্তন, আমাদের সঙ্গে পরিচয় হোক, তারপর ব্যবস্থা তো আমাদের হাতে।”

মহিমের কথায় ভরসা পায় সবাই।

যেখনি অঙ্কুর তার ক্ষমতা যেমনই তার বুদ্ধি। কুলের সকল ছেলে তার বশতা স্বীকার করেছে। কেবল তাই নয়—বাড়ি হতে তার মাসে মাসে যে টাকা আসে, বাড়ি আর কুলের খরচ বাড়ে বা টাকা বাড়ে, সে ছেলেদের খাওয়ায়।

এসে পৌঁছেছেন নতুন হেডমাষ্টার সুশীল মিত্র।

লম্বা চওড়া, সুন্দর স্বাস্থ্য। গায়ের রং চকচকে কালো হলও তাঁর দীর্ঘ চোয়াল সে ফুটি মানিয়ে যায়। বয়স যথেষ্ট হয়েছে, মাপার বিরাট টাক। তাঁর চোখ তইটি চোট হলও অতি উজ্জল, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

হেডপণ্ডিত নিধারণ চক্রবর্তী নবাগত হেডমাষ্টারকে সঙ্গে করে ক্লাসগুলি ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

ঘরের অনটনবাহু এখন মস্তবড় হলর মধ্যে পাটশান করে একধিকে নাইন, অস্ত্রধিকে টেনএর ক্লাস করা হয়। নাইনএ তখন ছিলেন খুলী সেন, টেনএ ছিলেন বৃদ্ধ চন্দ্রনাথবাবু।

● অদৃষ্ট

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্লাসে এসে ছেলেদের পড়তে দিয়ে চন্দ্রনাথবাবু নিরমিতভাবে বিরুছেন। টেবিলের উপর কতই রেখে চই হাতের উপর মুখ রেখে তিনি চুলছেন। চশমাটা টেবিলের উপর পড়ে আছে, দরকার পড়লেই চোখে বেধেন।

মহিম পাশের কামরার হেডমাস্টারের আগমনবার্তা পায়; আন্তে আন্তে উঠে এসে চশমা নিয়ে টেবিলের তলার রেপে ভালোমাস্তার মত নিজের সিটে গিয়ে বসে।

ক্লাস নাইন দেখে হেডমাস্টার মুগ্ধ মিত্র টেনএ প্রবেশ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে। গুলী হন নতুন স্যার।

তিনি এগিয়ে বান টেবিলের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে সচকিত হয়ে উঠলেন চন্দ্রনাথবাবু, এক কথায় তাঁর প্রাত্যহিক তত্ত্বা দূর হয়ে যায়, উঠে দাঁড়িয়ে চশমাটা খুঁজতে থাকেন, চশমা না চলে তিনি কিছুই দেখতে পান না।

কিন্তু কোণার চশমা—

একবার মাত্র চাপা গর্জন করে ওঠেন—“মহিম—”

আন্তে আন্তে এগিয়ে এলো মহিম, টেবিলের তলা হতে চশমাটা তুলে চন্দ্রনাথবাবুর হাতে দিয়ে একান্ত ভালোমাস্তার মত বললে, “যুমের ঘোরে টেবিল মনে করে তলার রেখেছিলেন স্যার—”

কথাটা বিশ্বাস করতে পারেন না তিনি—এতই ঘুম তাঁর এসেছিল যার জন্য তিনি টেবিল টিক করতে না পেরে টেবিলের তলার চশমা রেখেছিলেন। এ যে মহিমেরই কাজ তা তিনি বেশ দৃষ্টলেও একটি কথা বলতে পারলেন না কারণ সামনে নতুন হেডমাস্টার দাঁড়িয়ে।

হেডমাস্টার একবার তাঁর পানে তাকালেন তারপর চোখ ফিরিয়ে মহিমের পানে তাকালেন, তারপর ক্লাসঘর ত্যাগ করে চলে গেলেন।

এবারে টেবিলের উপর থেকে স্বেলখানা হাতে তুলে নিয়ে গর্জন করেন চন্দ্রনাথবাবু, “তুই এদিকে আর মহিম, তোকে আমি একবার বেধে নি। চশমা খুলে রাখলুম টেবিলের ওপর, সে চশমা লাফিয়ে নামলো টেবিলের নিচে।”

আরো কি বলতে চেয়েছিলেন চন্দ্রনাথবাবু, কিন্তু বলতে পারলেন না। ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে গেল। স্বেলটা নামিয়ে রেখে বললেন, “বা, এ যাত্রা খুব বেঁচে গেলি, কিন্তু এর পরের ভর্তে সাবধান থাকিস বলে রাখছি।”

মহিম নিজের সিটে গিয়ে বসলো।

৩ অল্পতপ

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

হেডমাস্টার সুশীলবাবু অত্যন্ত রাগভারী লোক। ছেলেদের তিনি খেপেট ভালোবাসেন ও শুধুমাত্র প্রভ্রমিত রিতে চান না। ছেলেরা প্রকৃত মানুষ হোক তাই তিনি চান।

স্কুলসংলগ্ন ছাত্রাবাস—

এখানে প্রায় চল্লিশটি ছেলে থাকে—তারি দূর দূর স্থান হতে এখানে পড়তে এসেছে। আশপাশ গ্রামে হাইস্কুল নাই, এখানে থেকে তারা পড়াশুনা করবার সুযোগ-সুবিধা পেয়েছে।

সুশীলবাবু প্রত্যেক ছেলের উপর দৃষ্টি রাখেন, পড়াশুনায় এতটুকু ক্রটি ‘হমি পইতে’ পারেন না, তাঁর হুকুমেরে ছেলেবা ভয়ে কাঁপে।

সুশীলবাবু মোহনপুরের কার্ণাভাব নিয়ে এসে প্রথম কিছুদিন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা লাহাবাবুদের বাড়িতে ছিলেন, সেখানে অত্র বিদ্যা হওয়ার তিনি বোঝিয়েই এসে উঠেছেন তাঁর স্বতন্ত্র একখানি ঘর—নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সেই ঘরে তিনি থাকেন। এই ঘরটির তিন দিকে ঘর, ছেলেরা প্রতি ঘরে চারজন আটজন করে থাকে।

চিরাচরিত বোর্ডিংয়ের পাওয়ার ব্যবস্থা বহলে যায়। সুস্বাদু ভিটামিন বেশী থাকার প্রতিদিন সুস্বাদু ভাত, প্রচুর কাঁচকলা ও পেঁপে সমস্ত ভরিতরকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান গ্রহণ করে।

মহিম এই তিনটিই খায় না।

একটা নিঃশাস ফেলে সহপাঠী সুকুমারকে বলে, “আর তো এই হাইশাশ গিলতে পারি না তাই,—



তুই এদিকে আর মহিম, তোকে একবার দেখে নি। [পৃষ্ঠা ৩১২]

● অসুস্থতা

প্রভাবিত দেবী সরস্বতী

না খেয়ে খেয়ে যে শুকিয়ে গেলাম। এ কথা একবার হেডমাস্টারকে জানানো দরকার, কিন্তু বলবে কে?”

চিঁ চিঁ করে স্নুসুমার বলে, “না হয় আমিই বলব, কিন্তু তোমাদের আমার পেছনে থাকতে হবে। একা গুর সামনে যাওয়ার সাহস আমার নেই—যে রকম করে তাকান—উঃ—”

মহিম শ্রুতি আন্দোলন করে বলে—“নাঃ, বলে কোন ফল হবে না, নিজেদেরই উপায় ঠিক করতে হবে। ওই মুন্সীর ডাল, কাঁচকলা আর পেঁপে খেয়ে আমার আমাশা হয়ে গেল। দোকানের খাবারই যদি রোজ একটাকা দেড়টাকা করে খাব, তবে এখানে এক আঁজলা করে টাকা দিচ্ছি কেন? এর বিহিত আমরাই করব, জোর করে, কৈদে ককিয়ে নয়—”

বোষ্টম একাধারে স্কুলের চাপরাসী, বোড়িংয়ের বাজার সরকার এবং হেড স্ট্রারের অমুগত ভৃত্য।

তার সর্গারীতে মহিমের আপাদমস্তক অলে যায়। চাকর চাকরের মত থাকবে, তার। বোর্ডার, পরসা খরচ করে থাকে,—তাঁদের উপর সর্গারী করতে আসবে—মহিম সেটা আদৌ পছন্দ করে না। শক্তভাবে সে বলেছে, “তুমি নিজের চরকার তেল দাঁও গিয়ে বোষ্টম, আমরা ছেলেরা কি করি না করি, তুমি উপদেশ দিতে এসো না।”

এরপর বোষ্টম আর একটিও কথা বলেনি।

মহিমকে সে এড়িয়ে চলে। স্পষ্টই মহিমের অজ্ঞাতে বলে, “বাপ, এমন বিচ্ছু ছেলে আর একটি দেখি নি, ঠাডুমাশ ভাঙ্গা ভাঙ্গা করে দিলে।”

কিন্তু সেবার আমের সময় তাকে নাকাল হতে হল বড় কম নয়। স্কুলের মাঠের একপাশে ছিল একটি আম গাছ এবং এটি ছিল বোষ্টমের তত্তাবধানে রক্ষিত।

এবার আম হয়েছিল প্রচুর এবং কচি শুটি হতে আরম্ভ করে ফল পাকবার অনেক আগে অর্ধেক দেব হয়ে গেল।

সেদিন হেডমাস্টারের দৃষ্টি পড়ল আমের উপর এবং তিনি তত্তাবধায়ক বোষ্টমকে তলব করলেন। বোষ্টম ছেলেরদের বিশেষ করে মহিমের উপর সব ঘোব চাপিয়ে দিলে—স্পষ্টই জানালে—বোড়িংয়ের ছেলেরা ভালো হতে পারতো, মহিম ওদের পরামর্শ দিয়ে এইসব কাজ করছে।

অলে উঠলেন মুন্সীলবাসী, মহিমের সামনে তিনি বেশ আশ্বাসন করলেন, জানানলেন—“এবার মহিমের বিকড়ে কোন অভিযোগ যেন তাঁকে ওনতে না হয়।”

মহিম নতমুখ তুলে, হির কণ্ঠে বললে, “ঘোব আমার তা আমি স্বীকার করছি স্তার।

১ অসুস্থ

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

বোড়িয়ে যে সব ছেলেরা থাকে ওদের সত্টি কোন দোখ নেই, আমি আমি এনে তাদের দিচ্ছি, তারা খেয়েছে। কিন্তু স্তার, বোষ্টমও কি গাছের বাড়া বাড়া আমি নিয়ে কাল 'বকেলে বর দিহিকে দিবে আসেনি—দোখ কি আমি একাই কবেছি—জিজ্ঞাসা করেন একে?"

বোষ্টম আকাশ হতে পড়ে,
—“না বাবু, নন্দবাবু আমাকে আমি
দিচ্ছেছিল—তাদের বাড়ির আমি, সেট
আমি আমি দিহিকে দিবে এসেছি
জিজ্ঞাসা করুন নন্দবাবুকে।”

কিন্তু নন্দকে কোথাও খুঁজে
পাওয়া গেল না।

হেডমাস্টার অদব দর্শন করেন।

মতিমের নির্দেশে রমন ছুটে
বাবু বোষ্টমের ঘরে, তার ঘরের কোণ
হতে চাবটা আমি এনে স্ত্রীলবাবুর
পাশে রাখি। কঙ্ককণ্ঠে মতিম বললে,
“দেখুন স্তার, এই গাছের আমি এখনও
চারটে আছে।”

কঠিন বিচার করেন স্ত্রীলবাবু,
বোষ্টমের হল তিন টাকা অরিমানা, এ
মালের মাইনে হতে কাটা যাবে।

গরীব বোষ্টমের চোখ দিয়ে
জলের ধারা নামে।

স্ত্রীলবাবুর ঘরখানা একেবারে
মাকখানো—একটা দিকে পড়ে রাত্তা,
দেহিকে দুইট আনালা।

ছেলেমা লক্ষ্য করে—শীত গ্রীষ্ম সব সময়ে তিনি পনের খারের আনালা সহজে বহ
করে যেন। সারা রাত তাঁর ঘরের এক কোণে লুটন জলে। একদিন রাতে কি করে



দেখুন স্তার, আমি এখনও চারটে আছে।

● অসুস্থ

প্রভাষটী দেবী সরস্বতী

আলো নিভে গিয়েছিল, তিনি চিংকার করে পাশের ঘরের শীতলকে ডেকেছেন, সে উঠে আলো জ্বলে দিয়েছে।

ছেলেরা আরও লক্ষ্য করেছে—রায়ে পপ দিয়ে বল হরি হরিবোল শব্দ করে শবযাত্রীরা শেখিন যায়, শেখিন তাঁর চোখে ঘুম আসে না, ছেলেদেরও ঘুমাতে দেন না।

সে একটা রাইয়ের কথা—

পাশের ঘরের শীতলের ঘুম ভেঙে যায় ভয়াবহ চিংকারে—অজ্ঞাত হিন্দি ছেলেও জেগে উঠে বলে। পাশের ঘর থেকে শব্দ আসছে—আঁ! আঁ! আঁ!

সর্বনাশ, এ যে ঘরের কণ্ঠস্বর!

লঠন নিয়ে ছুটে আসে ডঃসাহসী শীতল, তার পিছনে কাঁপতে কাঁপতে আসে সঙ্গীরা—

“স্মার—স্মার—”

ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে শঙ্কিত শীতল মশারি তুলে তাঁকে ধাক্কা দেয়—“কি হয়েছে স্মার, অমন করছেন কেন?”

দোঁড়িও প্রতাপ হেডমাষ্টার ঘেমে উঠেছেন, তখনও তাঁর বুকটা ধড়ধড় করছে, হাত পা কাঁপছে।

আগ্রে আগ্রে তিনি উঠে বসলেন, একটু হেসে বললেন, “ও, বড্ড বেশী টেচিয়েছি বৃদ্ধি,—তোমাদের ঘুম ভেঙে গেছে। না না, তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, স্বপ্নে আমার ও রকম হয়, তোমরা যাও—শোও গিয়ে।”

একটু পোমে বললেন, “আচ্ছা, এক কাজ কর শীতল, তুমি বরং এদের কাউকে নিয়ে এ ঘরে শোও—তাতে কোন দোষ নেই। ওরা পাশের ঘরে ছ’জন শুয়ে থাক—ভয়ের কারণ নেই—আমি আছি।”

ছেলেরা পরস্পর হুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বাধা হয়ে শীতল ও পরানকে বিছানা এনে লেঘরে ততে হয়। নিশ্চিতভাবে বিছানার শোন হুশীলবাহু, বললেন, “ভয় করো না ছেলেরা, আমি সজাগ রইলাম, ভয় পেলে আমার ডেকে।”

হুহুত্বযো তাঁর নাক ডাকার শব্দ শোনা যায়।

পুলার ছুটি আসে—ছেলেরা সবাই বাড়ি যেতে আরম্ভ করে, হুশীলবাহুও কলকাতার যাওয়ার অল্প প্রস্তুত হন।

যাবে না কেবল মহির।

আশ্চর্য হয়ে বান হুশীলবাহু, জিজ্ঞাসা করলেন, “তুমি বাড়ি যাবে না কেন মহির?”

● অন্তঃস্থ

প্রভাবতী বেবী সন্ন্যাসী

করণ দৃষ্টিতে তাকায় মহিম, বললে, “গতবার পরীক্ষায় ফেল করেছি স্তার, বাবা বলেছেন পাস না করলে মুখ দেখবেন না। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি—পাস করে তবে বাড়ি যাব, তাই এ ছুটিতে যাব না স্তার।”

অত্যন্ত খুশী হন সুশীলবাঈ; এমন একটি ছেলে যে পড়ার ভগ্ন বাড়ি যায় না, তাকেই তিনি কত ভোট ভেবেছিলেন। মনে মনে তিনি অশ্রুতপ্ত হন কম নয়।

বললেন, “থুব ভালো কথা, তোমার প্রতিজ্ঞা যেন সফল হয়—তুমি মাছুষ হও। বোষ্টম আর সময় রইলো, তা ছাড়া যখন যে পড়া বুঝতে পারবে না—এখানেই তারাবাদু আছেন—তোমাদের ইংলিশের শিক্ষক—তুমি তাঁর কাছে গিয়ে জেনে এসো। আমি তাঁকে তোমার কথা বলে যাব।”

অত্যন্ত ভক্তির স্তারকে প্রণাম করে মহিম।

মোটের খুশী হয় না বোষ্টম—

সে বুকেছে মহিম একটা কান মতলব হাসিল করবার জুই এখানে থেকে গেল। সংসদ তার মাথায় ঢটামি বুঝি খেলছে—সব কিছুই করতে পারে এ ছেলে।

সম্বন্ধিত হয়ে ওঠে ভালোমাছুষ বোষ্টম, সুশীলবাবুকে কিছু বলবার সাহস হয় না,—অ’বার যদি তার উপর নূতন কোন আক্রমণ হয়।

মহিমের প্রিয় বন্ধু সুরুমারও বাড়ি গেল, একা রইলো মহিম।

হেডমাস্টার বোষ্টমকে বলে গেলেন—মহিমের যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। এ ছেলেকে তিনি য’ ভেবেছিলেন, সে তা নয়; এত শাস্ত এবং পড়ার মনোযোগ ছেলে যে ছুটিতে বাড়ি গেল না, পুজার আনন্দে যোগ দিলে না। এ ছেলে যে মোহনপুর স্কুলের নাম রাখবে তাতে তাঁর এতটুকু সন্দেহ নেই।

ছুটি ফুরাবার সাত আট দিন আগেই ফিরলো মহিমের পরম বন্ধু সুরুমার—তার পর ক্রমে ক্রমে ফিরলো বোড়িংয়ের অস্ত ছেলেরা। স্কুল খোলার দিন সকালে ফিরলেন সুশীল মিত্র।

মহিমের দিকে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে বান।

তার মুখে খোঁচা খোঁচা বাড়ি গোক, মাথার চুলগুলো বেশ বড় ও কক্ক—পরনে একখানা দুটি—অথচ হাক প্যাট ছাড়া সে কোনদিন হুতি পরেনি। গারে তার জামা নাই, একখানা সাধা বিছানার চাষর তার গারে, পা পাছকালীন।

● অশ্রুতপ্ত

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

ক্রাসে সে গেল না। আরের সঙ্গে দেখা হতে সে ফাল ফাল করে শুধু চেয়ে রইল, প্রণাম করা ঘরের কথা, একটা কথাও বলল না।

কম মেট শুকুমার চুপি চুপি তারকে বললে, “জানেন আর, সাগরাত মহিম ঘুমায় না, ঘরের পাঁকে না, ওঠে আমতলার সে খোঁগাসনে বসে সাধনা করে।”

“সাধনা করে—বলছে ‘ও শুকুমার!’” শুশীল মিস্ট্রেব চোখ ভাটি বিস্ময়িত হয়।

শুকুমার ভীতকণ্ঠে বললে, “হ্যাঁ আর, ওর বাবাও কালীসাধনা করেন,—তিনি আবাব প্রাণে সাধনা করেন।” মহিম মিস্ট্রেই ওর বাবার কাছ থেকে এসব শিখেছে আর।

শুশীল মিস্ট্রে রীতিমত চিন্তায় পড়েন।

সেদিন সন্ধ্যায় তিনি মহিমকে নিজের ঘরে ডাকলেন, গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করলেন—
“এসব কি শুনতে পাচ্ছি মহিম? তুমি ছেলেমানুষ—পড়তে এসেছো, এখন পড়াশুনা বন্ধ করে এসব সাধনা-টাননা কি করছো বলো? এ বকম কবলে আমার বোড়িংয়ে তোমার রাখা চলবে না, তোমায় বাড়ি যেতে হবে।”

নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে মহিম, তারপর আন্তে আন্তে বার হওয়ার সময় বলে যায়—“আর একম হবে না আর, আপনি বাবাকে কিছু লিখবেন না।”

শুশীল হন শুশীলবাবু।

সে রাতে বিচানায় শুয়ে তিনি মহিমের কথাই ভাবছিলেন। তাঁর ঘরের ভালো ছেলেকে তিনি নষ্ট হতে দেখেন না।

শুশীল তিন দিন পরে আসবে জানিয়েছে। পাশের ঘরে যে তিনটি ছেলে শুয়েছে, তিনি তাদের এ ঘরে শোওয়ার কথা বলতে পারেন নি।

কোন রকমে পাশ ফিরে তিনি ঘুমানোর চেষ্টা করেন।

ঘরের একপাশে একটা বড় অলচৌকির উপরে রানীকৃত কাগজ খাতপত্র জমে আছে। সামনের রথিয়ার শুশীলবাবু এগুলো দেখেও নন বিক্রয় করে দেবেন, অনর্থক অজ্ঞানগুলো ঘরে রাখবেন না।

ঘুমের ঘোরটা অকস্মাৎ ভেঙে যায়,—গভীর রাতে হুড়হুড় করে বহ কাগজপত্র পড়ে যায় ঘরের উপর,—

পাশের ঘরের ছেলেরাও জেগে ওঠে—ভয়ে তারা শব্দ বাত করে না।

রাখার কাছে লটনের ঘোর বাড়িরে দিলেন শুশীল মিস্ট্রে, দেখতে পান—দুশীকৃত কাগজপত্র ঘরের ছড়িয়ে পড়েছে।

৩. অন্তর্য

এতাবতী বেবী সরস্বতী

“নারায়ণ, পাঁচু, তিনকড়ি—”

গাঁর আঙ্গানে ছুটে আসে পাশের ঘরের ছেলেরা—

সুশীলবাবু বললেন, “কাগজগুলো সরিয়ে রাখ তো বাপু। যা বড় বড় ইঁটর তোমাদের এখানে—দেখলে ভয়ই করে। দেখ তো নিশ্চয়ই কাগজের মধ্যে ঢুকে আছে ও’ একটা।”

টর্চ আলিয়ে কাগজ সরাতে গিয়ে
ছেলে দু’টি সভয়ে চিংকার করে সুশীল-
বাবুর পাশে ছুটে আসে, ভয়ে তারা
তখন কাঁপছে।

“কি কি—কি হল—?”

শঙ্কিত সুশীলবাবু খাট হতে
নেমে দাঁড়ান—“কি দেখলে ওর মধ্যে,
ভয় পেলে কেন? আমি রয়েছি ঘরে
—ভয় কি তোমাদের—”

বলতে বলতে টর্চ হাতে তিনি
নিজে এগিয়ে যান।

কাগজপত্রের ধাঁকে দেখা যায়
শ্বেতশুভ্র একটি মড়ার মাথা।

“অ্যা, অ্যা, এ সব কি, এ সব
কি ব্যাপার—”

রীতিমত কাঁপতে থাকেন
সুশীলবাবু, সরে যাওয়া বা ছুটে
পালানোর চেষ্টাও তিনি করতে
পারেন না। তিনি নিজে চিংকার
করতে পারছেন না, তাঁকে জড়িয়ে
থরেছে তিনটি বালক—চিংকার
করছে তারা।

“ভার, ভার—ওই আর একটা—”

সুশীলবাবুর খাটের তলার আর একটা মড়ার মাথা।



ছেলে দু’টি সভয়ে চিংকার করে সুশীলবাবুর কাছে ছুটে আসে।

কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যান স্থলাকৃতি স্থানীল মিত্র।

ততক্ষণে এসে পড়েছে অজ্ঞা ছেলেরা—বোষ্টম এবং অজ্ঞা বারোয়ান চাকরেরাও এসে পৌঁচেছে—কলরবপূর্ণ হয়ে উঠেছে সমস্ত বোডিংটা।

সম্পূর্ণ চক্ৰিশ ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরেছে স্থানীলবাবু। ডাক্তার সর্পক্ষণ কাছে আছেন, লোক পাঠিয়ে তাঁর ভাইকে আনা হয়েছে কলকাতা থেকে।

কীদৃশ্যে স্থানীলবাবু আনিরেছেন—তিনি এখানে আর একটা দিনও থাকবেন না, একটু সুস্থ হয়ে সন্ধ্যার ট্রেনে চলে যাবেন, আর এটো মোহনপুরে স্থলে তিনি আসবেন না।

এটা স্থল এবং বোডিংয়ের কলঙ্কের কথা।

রক্ত চন্দ্রনাথবাবু বললেন, “আমার মনে হয় এ কাণ্ড আমাদের হোস্টেলের কোন ছেলে ছেলের—হয়তো সে আপনাকে পছন্দ করে না। তাই ভয় দেখিয়ে সরতে চায়। বাই হোক, এর অন্যকোয়ারি করা দরকার—”

ছেডপণ্ডিত বললেন, “ঘরের মধ্যে ছ’ ছোটো মড়ার মাথা এনে রাখা তো বড় সোজা কথা নয়! তারপর সে মাথা ছোটো গেলই বা কোথায়, এত খুঁজেও তো পাওয়া গেল না।”

বোডিংয়ের ছেলে সুপ্রকাশ চুপি চুপি ছেডপণ্ডিতের কানে কানে বললে, “এ হচ্ছে মহিমের সাধনার ফল স্থার। সে আগে গল্প করেছে—তার বাবা মড়াকে উঠিয়েছেন মদের জোরে, কত কাজ করিয়েছেন। মহিমও সাধনা করে স্থার—তাই মড়ার মাথা এসেছিল আবার মিলিয়েও গেছে।”

ছেডপণ্ডিত বললেন, “এখন থাক, পরে ওসব বিচার হবে, আগে স্থানীলবাবু ভালো হয়ে উঠুন, তারপর—”

চূপচাপ নিজের বিছানার ওয়ে ছিলেন স্থানীলবাবু, পাশে তাঁর ভাই বসে ছিলেন। কথা হয়েছে কাল সকালের ট্রেনে স্থানীলবাবু চলে যাবেন।

দরজার কাছে নিঃশব্দে এসে দাঁড়ালো মহিম।

চমকে উঠলেন স্থানীলবাবু—“কে, কে ওখানে?”

অপরান্বী মহিম নতমস্তকে ঘরে প্রবেশ করলে, আঙ্গকঠে বললে, “আমি স্থার,—আমি বহির—”

স্থানীলবাবু শঙ্ককণ্ঠে বললেন, “এখানে এখন কি দরকার তোমার,—বাও, আমি এখন সুস্থ।”

স্বাক্ষর

স্বাক্ষরিতা দেবী স্বরস্বতী

তার পায়ের কাছে বসে পড়ে মহিম রুদ্ধকণ্ঠে বললে, “আমার কণ্ঠা কণ্ঠা আছে স্মার,—
আমি সব কথা আপনাকে বলতে চাই, সব কথা শুনলে আপনি আমার কন্যা করবেন, চলে
যাবেন না।”

সে সুশীলবাবুর পা ছুঁখানার উপর মাথা রাখে, তার চোখের তলে তাঁর পা ভিজে ওঠে।
শব্দান্তভাবে তিনি উঠতে যান, বলেন, “পা ছেড়ে দাও মহিম—”

তিনি ভাইকে বাইরে যেতে বললেন, তারপর মহিমের দিকে ফিরে বললেন, “যা বলবার
এইবেলা বল, এর পর অল্প শিকেরা এসে পড়বেন।”

তু হ কবে কঁদে উঠলো মহিম—“আমায় মাপ করুন স্মার, এ সব আমার কাছ।
আমি পিচবোর্ড ও সাধা রং দিয়ে মড়ার মাথা তৈরি করেছিলুম আপনাকে ভয় দেখানোর
জন্তে। এই কারণে আমি ছুটিতে বাড়ি গাইনি—একল: ঘরে বসে মড়ার মাথা তৈরি
করেছি। আপনি আমার শাসন করেন, আমাকে সবদা সন্দেহ করেন—তাঁই আপনাপ ভয়ের
দুর্জনতার সন্ধান নিয়ে এ কাজ করেছি স্মার, তাবতে পারিনি বাপাটা: এতদূর গড়াব।
আমায় মাপ করুন স্মার—কিন্তু আপনার পা টুয়ে প্রতিজ্ঞা করছি এবার থেকে সত্যি আমি পূব
ভালো হব।”

সে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।

সুশীলবাবু তাকে টেনে তুললেন, ক্রমশে তার মুখ মুছিয়ে দিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, “আমি
তা বুকেছি। ছটামিছুটির জন্তে তুমি শান্তি পেয়েছো—তোমার প্রাণ হতে বের করে দিয়েছি—
মেরেছি—কিন্তু সে তোমারই ভালোর জন্তে তা তো তুমি জানতে মর্চম। গুরুজনেরা
শাসন করেন তোমাদের মঙ্গলের জন্তে—সে কথাটা বুঝবার বয়স তোমার নিশ্চয় হয়েছে।”

সুশীলবাবু তই হাতে মুখ ঢেকে থাকে, একটি কথাও বলে না।

সুশীলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—“তারপর সেই নকল মড়ার মাথা ছটো গেল কোথায়
মহিম?”

রুদ্ধকণ্ঠে মহিম বললে, “আপনি শুয়ে পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে লোকজন আমার আগেই আমি
সে ছটোফি সরিয়ে ফেলেছি স্মার। বধন পূব গোলমাল চলছিল, সবাই এখানে ছিল—আমি
বাগানে গিয়ে দেশলাই জালিয়ে ছটোকেই পুড়িয়ে ফেলেছি।”

বলতে বলতে সে আবার সুশীলবাবুর পা ছুঁখানা জড়িয়ে ধরে—“এবারকার মত আমার
মাণ করুন স্মার, আপনাকে আমি কণা দিচ্ছি—আমি ভালো ছেলে হব। সুকুমার ভয়ে
আপনার কাছে—সেও আমার সখী ছিল—বারাশ্বার দাঁড়িয়ে সে শু

দেব দেউল

কাঁদছে। ওকেও মাপ করুন স্যার, ওর কোন দোষ নেই। ওর মা লোকের বাড়ি কাজ করে ওকে পড়াচ্ছেন, এখন যদি পড়া বন্ধ হয়, ওদের চর্গতির সীমা থাকবে না। আপনি এখান থেকে যাবেন না স্যার।”

সুশীলবাবু একটু হাসলেন, মতিমের মাথায় হাত রেখে শাস্তকণ্ঠে বললেন, “বেশ, আমি যাব না আর এসব কথা কাউকেই বলব না। তবে মনে রেখো, তোমাকে খুব ভালো হতে হবে—সুকুমারকেও তোমায় মানুষ করতে হবে।”

তাই হাতে চোপ মোড়ে মতিম।

...

...

সে বৎসর মাঠে যখন মাটির ফের রেজাল্ট প্রকাশ হল—দেখা গেল সকলের প্রথম হয়েছে মোহনপুর হাইস্কুলের ছাত্র মতিম চৌধুরী; বাকি নয়জনের মধ্যে আছে সুকুমার বোসের নাম।

সুশীলবাবুর মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রথমেই তাঁকে প্রণাম করতে এলো মতিম এবং সুকুমার; ছেলেরা এবং শিক্ষকেরা তাদের ঘিরে দাঁড়ালেন।

ত’ হাতে ত’জনকে বৃকের মধ্যে টেনে নিয়ে আনন্দকণ্ঠে সুশীলবাবু বললেন, “আমি আশীর্বাদ করছি তোমাদের—আমাদের স্কুলের খুশ উজ্জ্বল করেছে। তোমরা ত’জন—তোমরা এগিয়ে যাও। আরও উন্নতি করা চাই।”

ছেলেরা আনন্দে কলরব করে ওঠে।

স্বাক্ষরিতঃ হেঁটব্রদেবজ্যোত্সবঃ

—স্বাক্ষর

মনি ও মুক্তা



শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির বা আচরণ করেন, সাধারণ
লোকেরা তাই-ই অনুসরণ করে।



— বিমলচন্দ্র ঘোষ

১

হস্তা শেষে সিন্ধু খুড়ো
গোমড়ামুখে জোয়ান বুড়ো
খোশমেজাজে জোরসে হাঁকায়
যুদ্ধ ফেরত জীপ ।
সঙ্গে ঝড়ী আহ্নাদেতে
স্বাথায় বেঁধে সবুজ ফিতে
যাচ্ছে মজায় পিকনিকেতে
বিপ্ বিপ্ ! বিপ্ বিপ্ ॥

২

আওয়াজ ছেড়ে ছুটেছে গাড়ি
কাঁপছে শহর কাঁপছে বাড়ি
পুলিস হাঁকে, থামাও ! থামাও !
কে দেয় তা'তে কান ?
ভিড় জমে যায় পথের পাশে
ফাজিলগুলো মুচকি হাসে
ঝড়ের দেখে পিণ্ডি জ্বলে
সয় না অপমান ॥

৩

বাড়ায় গতি রাগের চোটে
জঙ্গী গাড়ি উল্কা ছোটে
তাকায় খুড়ী ঢাকার দিকে
বুক করে টিপ্ টিপ্ ।
নতি বাবুল ভণি পুটে
পথ ছেড়ে সব পালায় ছুটে
বাপরে কী জোর ছুটেছে বেগে
সিন্মু খুড়োর জীপ ॥

৪

লড়াই-ফেরত লোহার মোটর
ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ ঘটর ঘটর
শব্দ ওঠে পাথর ছোটে
ধাক্কা লেগে ঢাকায় ।
সিন্মু ঢলে শহর ছেড়ে
রেসের ঘোড়া আসলো তেড়ে
পাল্লা দিয়ে হারলো শেষে
লেজ ফুলিয়ে তাকায় ॥

৫

ঘুরছে রোদে খুড়ীর মাথা
বন্ধ থাকে শখের ছাতা
জোর বাতাসে খুলতে রুড়ীর
ভীষণ জাগে ভয় ।
প্যারাচুটের মতন পাছে
উড়িয়ে নিয়ে ঝোলায় গাছে
'খুড়োর সঙ্গে জীপ চড়া আর
এ জন্মেতে নয়' ॥

৬

পণ করে সে দারুণ রোগে !
চারটি ঢাকার ঘূর্ণি বেগে
উধাও খুড়ো ধুলির মেঘে
তেপান্তরের পার ।
খট্ খট্ খটাস্ খটাস্
টায়ার রুমি ফাটলো ফটাস্
পিছন ফিরে তাকায় খুড়ী
হ'চোখ অন্ধকার ॥

৭

গাড়ির ঢাকা ছিটকে পালায়
উল্টে রুমি পড়বে নালায়
টেঁটায় খুড়ী, 'শিগ্রি থামাও
একগুঁয়ে মর্কট ।'
মারলো মাথায় ছাতার বাড়ি
ঘাবড়ে গেল বোকার ধাড়ী
তেপান্তরে অচল গাড়ি
থামলো ঘটাংঘট ॥







ভোট ফর অমরেশ মামা!

—ঐবিধায়ক কট্টাচার্য

অমরেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছে। বিরক্ত হয়েছে নিজের ওপর, পরিবারের ওপর। গ্রান্টি আর একপেচেমি কট্টাচার্য মস্ত সে টেলিফোন নিয়েছে। ফাঁক পেলেই গাউড খুলে সে কথা বলে। চেনার সঙ্গেও বলে, অচেনার সঙ্গেও বলে।

পুজো আসতে খুব দেরি নেই। মাঝে একটা রবিবারে অমির আর ভুবন এসেছিল। তাদের স্ত্রীও (আমরা তাদের চিনি—অমির স্ত্রীর নাম গোখরো আর ভুবনের স্ত্রীর নাম হচ্ছে শকুন্তলা। দুজনেই যিহের সময় অমরেশকে খুব বেকারদার ফেলে'ছিল) নাকি খুব ধরেছে যে "তোমাদের গিরেটার খুব যুগান্তকারী হয় নাকি, তা আশাঘের একবার দেখাও।"

কিছু মায়া ছাড়া এ করবে কে? কাজেই মাঝাকে রাজী করতে ওরা দুজনে এসেছিল। কিন্তু অমরেশ এমনি বেমকা মুড়ে ছিল যে—রাজী করানো দূরে থাক, ভাল করে প্রস্তাবও তারা করতে পারেনি। সেও আজ হুঁ সপ্তাহ হ'য়ে গেল। অমরেশ অমিরকে বলে বিয়েছিল—মাঝার বাড়ি আসতে ঢাস—আসিন্। কিন্তু মাচার কেছোর আর দাসনি।

সেনি বিকেলে অমরেশ বসে টেলিফোন ক'রে সময় কাটাচ্ছে। অমরেশ বা পুনহু সেই কথাগুলি এমসিকারার মারকন্ত মর্পকের কানে আসবে।

অমরেশ :—আরে মশায়, কথা বললে
বাকেন না কেন ?

এমপি :—(নারীকর্ষ) মশায় কাকে বলছেন ?
আমি তো মেরেছেলে !

অমরেশ :—কেন ? মেরেছেলেকে মশায়
বললে কে আমাকে আতিচ্যুত করবে তুনি ?

এমপি :—আমি করবো।

অমরেশ :—ইস ! থায়না !

এমপি :—থায়না যানে ? থায়না বললেন
কেন ?

অমরেশ :—থায়না এই জন্তে বললাম যে—
আমি নিষিদ্ধ বাংস খেলে তব তো আতিচ্যুত

করবেন। কিন্তু যে টেলিফোন করছে, সে কি
নিষিদ্ধ মাংস খায়না?

এমপি :—(একটু গেম) কে আপনি?

অমরেশ :—আগে বলুন—আপনি কে?

এমপি :—আমি অমৃতজীবাবুর স্ত্রী!

অমরেশ :—(খুশি হ'য়ে) ও! নমস্কার!
নমস্কার! অমৃতজীব আছেন বাড়িতে?

এমপি :—অমৃতজীব?

অমরেশ :—হ্যাঁ। দেখুন—সে আমার বিশেষ
বন্ধ। পরশুদিনও তার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলায় অনেকক্ষণ
কাটিয়েছি। একবার ডেকে দিন না দয়া করে!

অমরেশের স্ত্রী দীপা একটা ডিলে পান চারেক
গুটি, একটু তরকারি ও দুটো মিষ্ট নিয়ে ঘরে
চুকে গেছেন হাঁড়ির স্বামীর টেলিফোন ভাষণ
শুনছিল।

এমপি :—অমৃতজীবকে ডেকে দেব?

অমরেশ :—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলুন তার প্রিয়
বন্ধ অমরেশ মজুমদার তাকে ডাকছে। তাতেও
যদি চিনতে না পারে, তাহ'লে বলবেন যে
পরশুদিন রাতে হোটেল তু ছোট্টেলে যার
সঙ্গে সে ঝাওরা-ঝাওরা করেছে—

এমপি :—ছোট্টেলে মানে?

অমরেশ :—বাবা! এত মানে বোঝাতে
গেলে তো টার্ড হ'য়ে বাব মনে হচ্ছে। হোটেল
তু ছোট্টেলে মানে—ছোট্টেলার হোটেল।
ইংলিশের সঙ্গে মিল রাখবার জন্তে ছোট্টেলার
প্রথম 'ল'য়ের আকারটা নিরাকার করা হয়েছে।
যাকগে। এখন অমৃতজীব একবার ডেকে দিন।

এমপি :—আপনি অমৃতজীবের বন্ধ?

অমরেশ :—বন্ধ মানে? 'চাম্' বলুন।

এমপি :—চাম্!

অমরেশ :—হ্যাঁ চাম্! যাকগে। সে সব
কথা আপনার স্ত্রীকে দরকার নেই। আপনি
অমৃতজীবকে একবার ডেকে দিন।

এমপি :—দেখুন, তাঁকে ডাকা একটু খুশকিল
হবে।

অমরেশ :—বেরিয়েছে খুশি?

এমপি :—হ্যাঁ।

অমরেশ :—কখন ফিরবে বলে গেছে কিছু?

এমপি :—না।

অমরেশ :—কী আশ্চর্য! অথচ পরশুদিন
আমায় বললে যে সন্দের দিকে আমি বাড়িই
পাকি। তুই টেলিফোন করিস।

এমপি :—আ—জ্ঞা! পরশুদিন আপনাকে
তিনি এই কথা বললেন!

অমরেশ :—হ্যাঁ।

এমপি :—ও! তাহ'লে আপনি দয়া ক'রে
আর একটা টেলিফোন করুন।

অমরেশ :—তার মানে এখন যেখানে
আছে সে?

এমপি :—হ্যাঁ।

অমরেশ :—বাঃ! বেশ খুশি, সুন্দর খুশি।
বলুন তো নমস্কার।

এমপি :—নমস্কার জানিনে। তবে zoneটা
বলতে পারি!

অমরেশ :—বলুন!

এমপি :—বর্গমাস!

● তোঁটু ক'র অমরেশ বাবা!

ঐতিহাসিক ভট্টাচার্য

অমরেশ :—এ্যা!

এমপ্লি :—ওই কোনো তাঁকে নিশ্চয় পাবেন।
কারণ আজ বছর চারেক হ'ল তিনি মারা
গেছেন।

অমরেশ :—কে মারা গেছে? অম্বুজ!

এমপ্লি :—হ্যাঁ, তোমার প্রাণের বন্ধু। যার
সঙ্গে তুমি পরশু রাত্রে হোটেল ছাড়া
দিনার খেয়েছো! ইভিরট.....ননসেন্স.....
রাসকেল.....!

এতোকবার গালাগালিতে চমকে চমকে উঠিল
অমরেশ। তাড়াহাড়ি রিসভার রোপে গিল।
নিভের মনে বললো—

অমরেশ :—ছি ছি ছি! কী কেলেকারী!
লোকটা মারা গেছে, অথচ—! আর মেয়েটাও
ভারী তেএঁটে। আরে বাবা, একবারে পরিষ্কার
ক'রে বলে যে না যে—যাকে খুঁজছেন তিনি—
(জীকে বেধে) কী চাই?

দীপা :—টেলিফোনে বকে বকে আধুক্ষর
হয়েছে তো? এবার কিছু খেয়ে নাও!

অমরেশ :—হিউমার না ক'রে বুঝি কথা
বলা যায় না?.....আমি তোমার গুরু,
না গুরু?

দীপা :—(জিভ কেটে) ছি-ইঃ! গুরু হ'ল
মা ভগবতী, তার নামে ঠাঠা করতে নেই।
খেয়ে নাও।

অমরেশ :—বাও, আমি খাব না। হাম নেহি
খায়েংগে।

দীপা :—তা'লে রইল এখানে। যেজাজ
হ'লে খেও।

দীপা চলে গেল। অমরেশ কটমট করে চেয়ে
রইল তার গাওরার পথের দিকে। তারপর
একটানে খাবারের খালটিকে কোলের কাছে
টেনে নিয়ে গল্প গল্প করে খেতে আরম্ভ করলো।
নেপথ্যে আঙুরাচ শোনা গেল—

নেপথ্যে :—মামা!

অমরেশ :—কে?

নেপথ্যে :—আমি মামা!

অমরেশ :—তুমি মামা! তো আমি কে?

ভেতরে এস।

অমিয় আর ভুবনের প্রবেশ। মনে হয় তারা যেন
চঞ্চল হয়ে ছুটে এসেছে।

অমরেশ :—কী আপদ! তোরা! আর,
আর! আপিস নেই?

অমিয় :—আপিস আছে। কিন্তু আমরা
চুষনেই ছুটি নিয়ে এসেছি।

ভুবন :—পুষ জ—জ—জরুরী দরকার, তো
—তোমার সঙ্গে।

অমরেশ :—বলে ফেল!...শোন! তার আগে
চোঁচিয়ে আর চা খালা দিতে বল!

ভুবন :—অমিয়! তুই মা—মামাকে বল!
আমি গিয়ে মাম্—মাম্—ইকে বলে আসি!

ভুবন বরজা এলে ভেতরে গেল।

অমিয় :—আমাদের বেশের বনোৎসব মোক্ষ
মারা গেছে শুনেছ?

অমরেশ :—বনোৎসব মোক্ষ? কে বল!

● ভোটক অমরেশ মামা!
শ্রীবিহারক ভট্টাচার্য

দিকি ? সেই মোড়ের মাথার বার খুঁড়ি-খুঁড়কির দোকান ছিল ?

অমির :—আরে দূর ! তা কেন ? এম-এল-এ !

অমরেশ :—ও ! ভেরি স্তাড !

অমির :—এখন কথা হচ্ছে—তোমাকে এবার দাঁড়াতে হবে যে !

অমরেশ :—তা' না হয় দাঁড়াছি । কিন্তু—
বলতে বলতে দে উঠে দাঁড়াল ।

অমির :—এই দেখ ! উঠে দাঁড়ানোর কথা বলিনি ! তোমাকে এম-এল-এ দাঁড়াতে হবে ।
আমরা whole team খাটবো তোমার অজ্ঞে ।
এমন কি একপা শুনে গোথরো শকুন্তলা অবধি
তোমার অজ্ঞে ক্যানভাস করবে বলেছে ।



দীপা :—তাহ'লে দাঁড়িয়ে না—বসে থাক ।

❶ ডোই কন্ অমরেশ মায়া !
ত্রিবিধারক ভট্টাচার্য

অমরেশ :—না—না, সে আমার ভারী লজ্জা
করবে ! ওরে অমির, আমি শিল্পী । দুর্গাদা
বলতেন—যদি তুমি সত্যিকারের শিল্পী হও, তবে
ভায়েবোদের কখনো কষ্ট দিও না । শিল্পীদের
কখনো ওই সব ঝামেলা পোয়ায় ?...শুধু তাই
নয়—চর্নিয়ার লোকের হাতে পায়ে ধরা—ভোট
দাও ভোট দাও ক'রে । কোন মানে হয় না !

অমির :—মানে তো অনেক কিছুই হয় না
মায়া । সে মানে হোক, বা না হোক, তোমাকে
এবার দাঁড়াতেই হবে ।

ভুবন ও দীপার প্রবেশ । অমির উঠে গিয়ে
মামাকে প্রণাম করলো ।

দীপা :—বাড়ির চিঠি পেয়েছে ?

অমির :—হ্যাঁ, মামী ।

দীপা :—ভাল আছে তো সবাই ?

অমির :—হ্যাঁ ।

অমরেশ :—আরে, অমির কী বলছে জানো ?

দীপা :—কী বলছে ?

অমরেশ :—বলছে,—আমাকে নাকি দেশ
থেকে এবার এম-এল-এ দাঁড়াতে হবে ।

দীপা :—দাঁড়াও !

অমরেশ :—দাঁড়াও ! একি বেকির ওপর
দাঁড়ানো ? যে দাঁড়াও বললেই দাঁড়িয়ে বাব ?

দীপা :—তাহ'লে দাঁড়িয়ে না—বসে থাক ।

আমি চললাম ।

অমির :—এটা বহি হয়, তাহ'লে মামী
তোমার কিছ'বেশে নিয়ে বাব । মামার হ'য়ে
ক্যানভাস করতে হবে ।

দীপা :—তা' পতি পরম গুরু ! করতে হবে বৈকি ! আরো কত করতে হবে এখন ।

দীপা চল গেল ।

অমরেশ :—আ গেল যা ! ভাবতে ভাবতে এদিকে আমাদের মাথার চুল সাধা হ'রে গেল—এদিকে উনি হিউমার করছেন ।

ভুবন :—তাহ'লে কী হ'ল মামা ? তুমি কি তাহ'লে দী—দী—দী—

অমরেশ :—হ্যাঁ । দাঁড়া ছাড়বো না ।

অমির :—(চুপিচুপি) আর একটি কাজ করতে হবে যে মামা ?

অমরেশ :—কী বল ?

অমির :—কিছু টাকা বার করতে হবে যে এবার !

অমরেশ :—ক—তো ?

অমির :—তা' ছাজার দ্রয়ক ।

অমরেশ :—সে দেখা যাবে । কত বললি ! হ'হাজার ? ওরে হ'হাজার ঘেঁক কুড়িতে হয়, আমি যে তাই জানিনে রে । কোথায় পাবা ? বাবা !

অমির :—পেতে হবে মামা ! এই চান্দ গেলে আর আসবে না ! দেশের সেবা আর

কবে করবে ? আর কোন ভাল ক্যাণ্ডিডেটও নেই । শুধু এক পরিতোষমামা আর তুমি !

অমরেশ :—পরিতোষমামা মানে ?

ভুবন :—সেই যে পত্—পত্—পত্—

অমরেশ :—পত পত ক'রে ওড়ে ? কিন্তু বাবা

ভুবন, পত পত ক'রে জয়পতাকা ! ওড়ে,—মাফক উড়তে পারে কি ?

ভুবন :—না গো মামা । তা বলিনি ।

অমির :—ও বলছে পত্রিতর মামা পরিতোষ । সেও দাঁড়াচ্ছে কিনা !

অমরেশ :—সেও দাঁড়াচ্ছে ? হেল করলে লাইক । এটবার ঢালালে । শেখকালে পত্রিতর

—হাঁরে অমির ! ওকে কেউ বলে দিশনি দু'খি যে এটো সেজে দাঁড়িয়ে গুশপিন করা নয়,—

রীতিমত এসেদলীতে দাঁড়িয়ে বকুতা করতে হবে । দেশের ভালমন্দ বলে কথা । অজ্ঞা

তাহ'লে—চল—রাত্রির গাড়িতেই যাওয়া দাঁক ।

অমির :—বেশ, তাই চল—স-মামা । 'থু চিয়াস' ফর অমরেশ মামা—তিপ্ তিপ্ তিপ্—

ভুবন :—চ—হ—চ—

অমরেশ :—মোলো বাটাচ্ছেলে—

তিনরনে বেঁচিয়ে গেল ।

—বিরতি—

● ভোট কর অমরেশ মামা !
ত্রিবিধারক তট্যচার্য

দ্বিতীয় দৃশ্য

পোলি* থেকে একটু তফাতে ক্যাম্পের দরজা। তাঁর মধ্যে একটু স্টাক করা
ভাঙা। পেট্টে দরজা। বাইরে থেকে ছেলেদের চিংকার শোনা যাচ্ছে।

ভোট্ট ফর—অমরেশ মায়া!

ভোট্ট ফর—অমরেশ মায়া!

ভোট্ট ফর—অমরেশ মায়া!

সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে লোক শোনা
গেল—

ভোট্ট ফর—পরিতোষ মায়া!

ভোট্ট ফর—পরিতোষ মায়া!

ভোট্ট ফর—পরিতোষ মায়া!

ভিনভন লোকের সঙ্গে পতিত চুকলো কথা
বলতে বলতে।

পতিত :—কানভাস করছি না। কিন্তু
তেবে দেখবেন যে, গ্রাম থেকে কাকে পাঠাচ্ছেন।
আপনার আশা আনন্দ সুখ-ভঃখের খবর নিয়ে
যে আশেপাশে ঘুরে ঘুরে পারবে—তাকেই
আপনার পাঠাবেন।

১ম লোক :—কিছু বলতে হবে না ভাই।
বাক্যে যেবার আমরা ঠিক দিয়ে দেব।

পতিত :—না দাদা। তা বললে চলবে না।
পরিতোষ মামার মত মানুষ হয় না। বিড়ি
সিগারেট পর্যন্ত খান না। খন্দর পরেন—

অমির চুকলো—

অমির :—মিথ্যে কথা। পরিতোষবাবু খন্দর
পরেন না, খন্দর পরেন অমরেশ মায়া। ধরাভালে
হঠাৎ আবার এসেছেন অমরেশের মূর্তি ধরে।

● ভোট্ট ফর অমরেশ মায়া!

প্রতিদ্বন্দ্বিতা তটুচার্য

ধীর, স্থির, জ্ঞানী, গভীর। আমি তাঁকে ডকছি,
আপনারা চুপ মারুন তাঁকে, দেখবেন তিনি
হাসছেন। তিনি রাগ করতে আনেন না।

বাট্রে থেকে গদাই আর অমরেশের গলা শোনা
গেল। অমরেশ চিংকার করতে করতে আসছে।

অমরেশ :—ঠা। আমি জানি না। তুই
আনিস!

গদাই :—আঃ! তুমি রাগ করছো কেন
মায়া?

অমরেশ :—না, রাগ করবে না! ভাঙ
ভাঙ দিয়ে ভোট্ট নামিয়ে এখন বলে আরো
চ'হাজার টাকা চাই! টাকার গাছ আমি? ওই
সাবের এম-এল-এর জন্তে আমি বতি বাঁধা
দেব কি?

অমির :—আঃ! মায়া!

অমরেশ :—Shut up. বন্ধ করে দাও
ভোট্ট। আমি withdraw করলাম। যা হয়েছে
খুব হয়েছে। আমি আর এক পরসাগ দিতে
পারবো না। হি হি হি!

৩য় লোক :—আপনিই হুঁরি অমরেশ মায়া?

অমরেশ :—হ্যাঁ। কেন?

২য় লোক :—কই, আপনার পরনে খন্দর কই?

অমরেশ :—খন্দর মানুষের পরে? ও বিরে
শীতে লেপ ভেরী হয়। খন্দর!

পতিত :—দেখলেন তো দাঁধারা! এখনও বলছি, যদি ভাল চান, তবে পরিতোষ মামাকে ভোট দিন।

অমরেশ :—পতে! থবরদার বলছি, আমার সামনে তুই আমার জন্তে ভোট ক্যানভাস করবিনে? ইডিরট কোথাকার!

পতিত :—এখন যে বুদ্ধ চলছে মামা! তুমি যে এখন শত্রুপক্ষ?

অমরেশ :—কী, আমি শত্রুপক্ষ? Get out, Nonsense, Get out.

২য় লোক :—ও বাবা, এই বদমেজাজী লোককে আমরা পাঠাবো না।

পতিত :—ভোট্ ফর—

গদাই :—পরিতোষ মামা!

অমির :—গদাই!

গদাই :—এই রে! মনে ছিল না। ভোট্ ফর! (কেউ সাড়া দিলো না।)

গদাই :—ভোট্ ফর—(সবাই চুপ)

কেউ কোন কথা বললো না। অমির টানতে টানতে অমরেশকে ক্যাম্পে নিয়ে গেল। দূর থেকে জনতার কোলাহল ও জয়ধ্বনি ভেসে আসছে। মদনবাবু নামে একটি বোটা লোক ও তার পেছনে অমিরের স্ত্রী গোখরো ঢুকলো।

গোখরো :—আপনি বলুন তো! কী মার্ক। বাক্সে ভোট দেবেন?

মদন :—কেন? গরুর গাড়ি!

গোখরো :—এইরে! সর্বনাশ! না না!

তাহ'লে তো ভুল লোককে পাঠাবেন। দেবতাকে পাঠাতে দানবকে পাঠাবেন।

মদন :—কেন? কেন? দানবকে পাঠাতে দেবতাকে পাঠাবো কেন?

গোখরো :—না। হাঁড় মার্ক। বাক্সে ভোট দেবেন। হাঁড় কপাটি মনে রাখবেন। হাঁড়। যা আমাদের গাড়ি টানে, আমি চেষ্টা—আমি প্রাচীর হ'লে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

মদন :—আচ্ছা। মনে থাকবে।

গোখরো :—থবরদার যেন ভুল ক'রে গাড়ির বাক্সে ফেলবেন না।

মদন :—(ভয়ে ভয়ে) না।

গোখরো :—ঘনি!

দীপার প্রবেশ।

গোখরো :—মামো! একে তুমি সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ভোটটা দিইয়ে দাও!

দীপা :—আমুন!

মদন চলে গেল। গোখরো সেটিকে চেয়ে আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুচলো। তারপর ক্যাম্পে ঢুকে গেল।

পতিত আর পরিতোষ ঢুকলো।

পতিত :—তুমি পারবে না অমরেশ মামার সঙ্গে!

পরি :—কেন?

পতিত :—আমাদের দলে তো ফেরার শেক্স নেই!

পরি :—তাতে কী হয়েছে?

পতিত :—তাতে কী হয়েছে মানে?

● ভোট্ কর অমরেশ মামা!
ত্রিবিধারক তত্ত্বাচার্য

ওরাই তো লোকগুলোকে যা বোঝাচ্ছে, ওরা বোকার মতো তাই মেনে নিয়ে ভোট দিয়ে আসছে।

পরি:—কিন্তু পতিত! আমরাও তো ভোট পাচ্ছি!

পতিত:—তা পাচ্ছি। কিন্তু ওদের মতো নয়। ওই দেখ!

কান্তিকবাবু নামে একজন শ্রোট, সঙ্গে শকুন্তলা—ভুবনের বো।

শকু:—দেখুন, কথা তা নিয়ে নয়। যাকে আমরা কাছে পাব, আত্মীয়ের মতো, বন্ধুর মতো, —স্বপ্ন হুঃপের কথা বলতে পারবো,—যিনি আমাদের বাথা বুঝবেন,—আমাদের কুল দেখবেন, স্বাস্থ্য দেখবেন, দরকার হ'লে নর্দমা অবধি দেখবেন, তাঁকেই আমাদের পাঠানো উচিত। কী বলুন?



শকু:—অমরেশবাবুকে। হাঁড় মার্কী বাসে।

● তোটু কন অমরেশ বাবা!
ঐকিয়ারক ভট্টাচার্য

কান্তিক:—ঠিক কথা মা। তা' তুমি বলো—কাকে ভোট দেব।

শকু:—অমরেশবাবুকে। হাঁড় মার্কী বাসে।

কান্তিক:—বেশ। হাঁড় মার্কী বাসেই ভোট দিয়ে আসছি আমি।

কান্তিক চলে গেল। পতিত পরিতোষের দিকে চাইলো। পরিতোষ মাথা নাড়লো। শকুন্তলা পতিতের দিকে চেয়ে হাসলো।

শকু:—কেন আর চেঁচা করছো পতিত ঠাকুরপো? এখন সময় আছে—উইথডু করো, নইলে দাঁড়িয়ে হারবে।

পতিত:—একটা কথা বলবো বৌঠান্?

শকু:—বলো!

পতিত:—তোমার ওই ক্যানভাসের মাঝে মাঝে আমার মামার কথাও এক আদবার বোলো। ধরো, দশটা তুমি হাঁড় পাঠালে, একটা অন্ততঃ গাড়ির দিকে দাও।

শকু:—দূর! তাই কখনো হয়?

পরি:—খুব হয় বোমা! তুমি মন করলেই হয়। হারবো তো ঠিকই। কিন্তু কম মারজিনে হারলে মানটা পাকতো।

শকু:—না না, এ আপনি কী বলছেন?

শকুন্তলা ক্যাম্পে ঢুকলো। দুইজন লোক তোটু দিগে কিরছে, সঙ্গে ভুবন। পতিত আর পরিতোষ চল গেল।

ভুবন:—তো—ভোট দিয়ে এলেন?

১ম লোক:—হ্যাঁ তাই।

ভুবন:—কাকে ভোট—ভোট দিলেন দাদা—

দাদা—জানতে পারি!

দেব দেউল

৩৩৩

২য় লোক :—হ্যাঁ, দুটাই আমরা গাড়িতেই দিয়েছি।

ভুবন :—স—সকোনামাশ করেছেন আপনারা।
ও গাড়ির যে চা—চা—চা—চাকা ভাঙা!

১ম লোক :—চাকা ভাঙা?

ভুবন :—ঠ্যা। ও—গু—গু—গু—গাড়ি চলবে না। পরের মাঝেই আপনারদের ডো—ডো—বাঁবে।

২য় লোক :—কিন্তু দিয়ে ফেলেছি যে!

লোক দুজন চলে গেল। অমিরর বাবা নরেশবাবু ঢুকলেন।

নরেশ :—কী ভুবন? কেমন হচ্ছে তোমাদের?

ভুবন :—ভালই হচ্ছে কা—কাকাবাবু! মেয়েরা অদ্—অদ্—অদ্ভুত কাজ করছে।

নরেশ :—হ্যাঁ। ওরা শিক্ষিতা মেয়ে। ওদের নিয়ে তো কোন ভাবনা নেই। ঠিক চালিয়ে নেবে। অমরেশ কোথায়?

ভুবন :—মাঝা কা—ক্যাম্পে আছে।

নরেশ :—আরে! ওকে বেরিয়ে একটু দেখতে শুনতে বসো। চুপচাপ শুয়ে থাকলে চলবে না। পরের ওপর ভার দিয়ে একাজ হয় না। আমি এগোচ্ছি—ওকে পাঠিয়ে দাও।

ভুবন :—আচ্ছা।

নরেশবাবু চলে গেলেন। ভুবন ক্যাম্পে ঢুকতে বাঁবে—এমন সময় লক্শ্মণা বেরিয়ে এল।

ভুবন :—তু—তুমি কোথায় যাচ্ছে?

লক্শ্মণা :—বুধে যাই একবার। মাঝা তো

বলছেন শরীর পাড়াপ করছে। কী আনি বাবু আমি বুঝতে পারছি না।

ভুবন :—আমিও না! তুমি যেন বেশী ভিড়ে যেও না!

লক্শ্মণা :—কেন? চা'বিয়ে যাব?

ভুবন :—কে—কে বলতে পারে?

ভুবন ক্যাম্পে ঢুকলো। পরাণে ছুটিতে ছুটিতে ঢুকলো।

পরাণে :—মাঝাবাবু—মা—মা—বাবু গো!

লক্শ্মণা :—কী? কী হয়েছে পরাণ?

পরাণে :—বৌদিদি! পাতোপ্পেল্লম। উদিকে যে সব নয়ডার চায়ে গেল বৌদিদি?

লক্শ্মণা :—কেন? কী হ'ল?

পরাণে :—উদিকে যে ময়দা ফুরিয়েছে, ভাল ফুরিয়েছে, তরকারি মিষ্টি নষ্ট সব ফুরিয়েছে।

লক্শ্মণা :—সব ফুরিয়েছে?

পরাণে :—সব ফুরিয়েছে গো বৌদিদি! পিলু পিলু করে লোক ঢুকছে আর বলছে খেতে দাও!

লক্শ্মণা :—খেতে দিচ্ছে তো?

পরাণে :—দিচ্ছি না মানে? চরম দিচ্ছি। তেলে তেলে দিচ্ছি। শুধু দুই পা'ওয়ার আ'ওয়াই শুনলে ভিন্নমি যাবে তুমি! কিন্তু লোকও যে কমছে না গো বৌদিদি!

লক্শ্মণা :—সেকি! লোক কমলে আমরা ভাতাটে ছেঁয়ে যাব যে!

অমিরর প্রবেশ।

অমির :—কী হয়েছে? পরাণে!

● ভোট কর অমরেশ বাবা!
দ্বি বিধায়ক তত্ত্বাচার্য

পর্যাণে :—লোকই যে শেষ হোচ্ছে না অমিয়
তাই ! ইদিকে খাবার শেষ হ'য়ে গেল ।

অমিয় :—খাবার শেষ হ'ল—মানে ?

পর্যাণে :—হ্যাঁগো ! ময়দা নাই, লুচি নাই,
তরকারি নাই, দই নাই, মিষ্টি নাই—

অমিয় :—সর্বনাশ ! আমরা যে হাজার
লোকের যোগাড় করেছিলাম পর্যাণে !

অমরের পের প্রবেশ ।

অমরেশ :—কী হয়েছে ?

অমিয় :—মামা ! আরো কিছু টাকা
লাগবে যে !

অমরেশ :—কেন ?

অমিয় :—খাবার সব ফুরিয়ে গেছে ।

অমরেশ :—একহাজার লোকের পেট ভরে
খাবার যোগাড় ছিল অমিয়,—পর্যাণে !

পর্যাণে :—তা ছিল । তেমনি তিনহাজার
লোক খেয়ে গেল যে !

অমিয় :—আঃ ! থামনা পর্যাণে ।

অমরেশ :—না । থামবে না পর্যাণে । তিন-
হাজার লোক কেন খেয়ে গেল পর্যাণে ?

পর্যাণে :—বারে ! উদিককার লোক,
ইদিককার লোক—সবাই খেল তো !

অমরেশ :—ওদিককার খেল মানে ?

পর্যাণে :—খেলোনা ?

অমরেশ :—কেন ?

পর্যাণে :—বারে ! উরার তো কোন খাবার
যোগাড় করে নাই ! উ কথা বলতে পারবা না ।
হুন্ডা ? আমি লকাইকে ডেকে ডেকে খাইয়েছি ।

● ভোটু কর অমরেশ মামা !

শ্রীবিহারক ভট্টাচার্য



অমরেশ :—ওরে, ভোটু কর অমরেশ, মামা ! । পৃষ্ঠা ৩৩৫

অমরেশ :—ওদের লোককেও ?

পর্যাণে :—হ্যাঁ । আমাদের দল, আর
পতিত ভারের দল,—এ দুটাই তো একদল !
শেষকালে বদনাম হবে ক্যানে ? টাকা ভাঙগো
মামা ! আটা, ময়দা, ঘি, তেল, ছন, দই, মিষ্টি
সবই কিনতে হবে ।

অমরেশ :—(চিংকার করে) না !

পর্যাণে :—ল্যাও দজা ! না বলছো
ক্যানে গো ?

অমরেশ :—অমিয় !

অমিয় :—('চি' 'চি' করে) কী মামা ?

অমরেশ :—এখনো আক্কেল হয়নি? বন্ধ
ক'রে দে,—এখুনি বন্ধ ক'রে দে!

ভুবন :—মাম্ম-আ!

অমরেশ :—Shut up.

শকু :—মাম্মাবাবু!

অমরেশ :—চোপারও! নেই মাংস! এম-এল-
এ,—চ ছাওয়ার টাকা জলে গিয়া তো গিয়া!

আর এক পরসে নেই দেগা! বন্ধ কবো!

অ'মর :—মা—মা!

অমরেশ :—চু—পু! আমার বাপের শ্রাক
আটকেছে—না? ছেলের বিয়ের বোভাত?
না? চলো! হটাৎ! বন্ধ করো!

নেপথ্য :—ভোট ফর—অমরেশ মাম্ম!

অমরেশ :—(চোঁচিয়ে) ওরে থাম!

নেপথ্য :—ভোট ফর—অমরেশ মাম্ম!

অমরেশ :—একদম থাম!

নেপথ্য :—ভোট ফর—অমরেশ মাম্ম!

অমরেশ :—ওরে! ভোট ফর অমরেশ,
থাম!

বলতে বলতে ছুটে বে'রে গেল। অমর, ভুবন,
পরশে হস্তাঙ্গি সব দুখ চাওয়ারচা'র করলো।
নেপথ্যে শোনা যাচ্ছে অমরেশের গলা।

ভোট ফর অমরেশ, থাম! চাই না ভোট!
গেট্ আউট! গেট্ আউট!

আমালী কথা

ওয়াল্ডেন (হেনরী ডেভিড থোরো)

মহাত্মা পাকী জীবনে বিব সাহিত্যের বিশেষ কোন বই পড়েন
নি। তিনি পড়ুয়া ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মৌবনে দুজন লেখক
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন, যে প্রভাবের ফলে তাঁর জীবন-নীতি ও
কর্মের আদর্শ তিনি গড়ে তোলেন। একজন হলেন রাশিয়ার টলস্টয়,
তার দ্বিতীয় জন হলেন আমেরিকার হেনরী ডেভিড থোরো। এট দুজনের কাছ থেকেই
তিনি সিম্ভল ডিস্‌গুবিভিডিয়েল আন্দোলনের প্রেরণা পান, অনেকটাই জানেন না যে থোরো
হলেন এই আন্দোলনের প্রথম প্রবর্তক এবং শাস্ত্রভাবে অসঙ্গত্যাগ করে তিনি কারাবরণ
করেন। তাঁর একটি প্রবন্ধের নামই হলো, 'সিম্ভল ডিস্‌গুবিভিডিয়েল'। আর একটা দিক
থেকে থোরো মহাত্মা পাকীর চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করেন, সেটা হলো সম্ভাব্যতার
বাহুল্যকে পরিভাষণ করে প্রকৃতির মধ্যে সঙ্গত প্রাকৃতিক জীবন বাপন করা। সেই আদর্শট
অদ্বৈত সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে বিরে থোরো তাঁর অমর গ্রন্থ 'ওয়াল্ডেন' বৃষ্টিতে তোলেন।
ওয়াল্ডেন নভেল নয়, এর মধ্যে কোন কাল্পনিক ঘটনা নেই। এ বই হলো থোরোর নিজের
জীবনের কাহিনী এবং বড় বিচিত্র মঙ্গল সে-কাহিনী। এট বই-এর আরম্ভেই থোরো
লিখছেন, "যখন আমি এই বই লিখি, তখন আমি একা গভীর অরণ্যের মধ্যে ওয়াল্ডেন তলাপরের
ধারে নিজের হাতে একটা ছোট কাঠের ঘর তৈরি করে বাস করতাম—সেই ঘরে আমি
দুবছর দুবাস বাস করেছি।" সেই ওয়াল্ডেন তলাপরের নাম থেকেই বই-এর নাম ওয়াল্ডেন
রাখা হয়েছে। এই বইতে থোরো তাঁর একক অরণ্য-বাসের কথা লিখেছেন। সেইখানে
তিনি আদ্যিন বাসুদেব বসন্ত নিজের শাখা বরকারের বা জিনিস, যেমন পাখের
কুতো, ভা নিজের হাতেই তৈরি করে নিতেন। এই অরণ্য-বাসের মধ্যে, পাতে লম্বার ফলে
ফুলে, অরণ্যাবাদী পশু-পাখির মধ্যে, যে সব অকৃত্রিম অপূরণ জিনিস তাঁর চোখে পড়েছে,
তাঁর অন্তরকে দোলা দিয়েছে, কবির বৃষ্টি নিয়ে তিনি এই বইতে লিখে রেখে গিয়েছেন।

ন্যাংচানার 'হাছাকার'



ক্যাবলা বললে,
বড়দার বন্ধু গোবরবাবু
ফিল্মে একটা পাট
পেয়েছে।

টে নি দা চার
পয়সার চীনেবাদাম শেষ
করে এখন তার খোলা-
গুলোর ভেতর খোজা-
খুঁজি করছিল। আশা
ছিল দু-একটা শাস
এখনো লুকিয়ে থাকতে
পারে। যখন কিছু
পেলে না, তখন খুব

বিরক্ত হয়ে একটা খোলাই তুলে নিলে, কড়মড় করে চিবুতে চিবুতে বললে, বারণ
কর ক্যাবলা—এক্ষুনি বারণ করে দে!

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে বারণ করব? গোবরবাবুকে?

—আলবাত। নইলে দেখবি তোর গোবরবাবু স্রেফ ঘুঁটে হয়ে গেছে।

—ঘুঁটে হবে কেন? সেই যে কী বলে—মানে স্টার হবে।—আমি বলতে
চেষ্টা করলুম।

—স্টার হবে? আমার গ্যাংচাদাও স্টার হতে গিয়েছিল, বুঝলি? এখন
নেংচে নেংচে হাঁটে আর সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে ঘাবার সময় কানে আঙুল
দিয়ে, চোখ বুজে, খুব মিহি সুরে 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতরো'—এই গানটা
গাইতে গাইতে পেরিয়ে যায়।

—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

—বুঝতে পারছি।—হাবুল সেন মাথা নাড়ল : তোমার খ্যাংচাদা-রে ফিলিমের লোকেরা মাইর্যা লাংড়া কইরা দিছে।

—হং, মাইর্যা লাংড়া করছে!—টেনিদা ভেংচে বললে, খামোক! বকবক করিসনি হাবুল! যেন এক নম্বরের কুরুবক!

ক্যাবলা বললে, কুরুবক তো ভালোই। একরকমের ফুল।

—থাম, তুই আর সবজাতাগিরি করিসনি। কুরুবক যদি ফুল হয়, তা হলে কানি বকও একরকমের গোলাপফুল! তা হলে পাতি হাঁসও একরকমের ফজলী আম! তা হলে কাকগুলোও একরকমের বনলতা!

ক্যাবলা বললে, বা-রে, তুমি ডিক্শনারী খুলে ছাশো না!

—শাট্ আপ! ডিক্শনারী! আমিই আমার ডিক্শনারী। আমি বলছি কুরুবক একধরনের বক—খুব খারাপ, খুব বিচ্ছিরি বক। যদি বেশি চালিয়াতি করনি তো এক চাঁটিতে তোর দাঁত—

—দাঁতনে পাঠিয়ে দেব।—আমি জুড়ে দিলুম : কিন্তু বকের বকবকানি এখন বন্ধ করো না বাপু। কী খ্যাংচাদার গল্প যেন বলছিলে, তাই বলো।

—অং, ফাঁকি দিয়ে গল্প শোনবার ফন্দি? টেনি শর্মাকে অমন ‘অনরাইপু চাইল্ড’ মানে কাঁচা ছেলে পাওনি—বুঝেছ পালারাম চন্দর? খ্যাংচাদার রোনহসক কাহিনী যদি শুনতে চাও তা হলে একুনি পকেট থেকে কাল-সুনের শিশিটি বের করো। একটু আগেই লুকিয়ে লুকিয়ে চাটা হচ্ছিল, আমি বুঝি দেখতে পাইনি?

কী ভেজারাস চোখ—দেখেছে? কত ভঁশিয়ার হয়ে একটু একটু খাচ্ছি—ঠিক দেখে ফেলেছে! সাথে কি ইকুলের পণ্ডিতমশাই টেনিদাকে বলতেন, বাবা ভজ্জহরি—তুমি হচ্ছে পয়লা নম্বরের ‘শিরিগাল’—মানে ফক্স!

দেখেছে যখন, কেড়েই নেবে। কী আর করি—মানে মানে দিতেই হল শিশিটা।

প্রায় আশ্বেকটা কাল-সুন একবারে চেটে নিয়ে টেনিদা বললে, খ্যাংচাদা—মানে আমার বাগবাঝারের মাসতুতো ভাই—

হাবুল বললে, চোরে চোরে।

—অ্যা? কী বললি?

—না—না, আমি কিছু কই নাই। কইতাহিলাম একটু জোরে জোরে কও!

—জোরে?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে নাকটাকে আলুসেকর মতো করে বললে, আমাকে কি অল্প ইণ্ডিয়া রেডিয়ে পেলি যে ঝামোকা হাউমাউ করে চাঁচাবো? মিথো বাধা দিবি তো এক গাঁটায় তোর চাঁদি—

আমি বললুম, চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেব!

—যা বলেছিস!—বলেই টেনিদা আমার মাথায় টকাস্ করে গাঁটা মারতে যাচ্ছিল, আমি চট্ করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালুম।

আমাকে গাঁটা মারতে না পেরে ব্যাঙ্গার হয়ে টেনিদা বললে, ধোং, দরকারের সময় হাতের কাছে কিছু পাওয়া যায় না—বোগাস্! মরুক গে—খ্যাংচাদার কথাই বলি। শব্দার, মাঝখানে ডিস্টার্ব করবি না কেউ।

হ্যাঁ—কী বলছিলুম? আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই খ্যাংচাদার ছিল ভীষণ ফিলিমে নামবার শখ! বায়োস্কোপ দেখে দেখে রাতদিন ওর ভাব লেগেই থাকত। বললে বিশ্বাস করবিনে, বাজারে কাঁচকলা কিনতে গেছে—হঠাৎ ওর ভাব এসে গেল। বললে, ওগো তরুণ কদলী! এই নির্ভুর সংসার তোমাকে কোলের মধ্যে রামা করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে! এই বলে, খুব কায়দা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ‘ওফ্’ বলতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঁচকলাওলা বললে, কোথাকার এঁচোড়ে পাকা ছেলে রে! দিতে হয় কান ধরে এক খান্নড়! খ্যাংচাদা আমার কানে কানে বললে—অহো—কী নৃশংস মনুষ্য—দেখেছিস?

এমন ভাবের মাথায় থাকলে কেউ কি আই-এ পাস করতে পারে? খ্যাংচাদা সব সার্ভজেক্টে ফেল করে গেল। আর মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে এসে যা যা বললেন, সে আর তাদের শুনে কাজ নেই। মোদ্দা, অপমানে খ্যাংচাদার সারারাত কান কটকট করতে লাগল। প্রতিজ্ঞা করল, হয় ফিলিমে নেমে প্রতিভায় চারদিক অন্ধকার করে দেবে—মইলে এ পোড়া প্রাণ আর রাখবে না।

খুব ইচ্ছাশক্তি থাকলে, মানে মনে খুব ভেজ এসে গেলে—বুঝলি, অষ্টন একটা ঘটেই যায়। খ্যাংচাদা তো মনের দুঃখে সকালবেলা ‘দি গ্র্যাণ্ড্’ আবার খাবো রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক পেয়লা চা আর ডবল ডিমের মামলেট নিয়ে বসেছে। এমন সময় খুব হুটুটাই হাঁকড়ে এক ছোকরা এসে বসল খ্যাংচাদার টেবিলে। খ্যাংচাদা দেখলে তার কাছে একটা নালরঙের ফাইল আর তার উপরে খুব বড় বড় করে লেখা ‘ইউরেকা ফিলিম কো’। নবতম অবদান—‘হাহাকার’।

খ্যাংচাদার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস। উত্তেজনায় তার কানের ভেতর ঘেন ভিমটে করে উচ্চিড়ে লাকাতে লাগল, নাকের মধ্যে ঘেন আরেশালায়া

❶ খ্যাংচাদার ‘হাহাকার’

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সুড়সুড়ি দিতে লাগল। তার সামনেই জলজ্যাস্ত ফিলিমের লোক বসে—তাতে আবার নবতম অবদান! একেই বলে মেঘ না চাইতে জল! কে বলে কলিযুগে ভগবান নেই!

শ্রাংচাদা বাগবাজারের ছেলে—তুখোড় চীজ! তিন মিনিটে আলাপ জমিয়ে নিলে। লোকটার নাম চন্দ্রবদন চম্পটা—সে হল ‘হাহাকার’ ফিলিমের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট। মানে, ছবির ডিরেক্টরকে সাহায্য করে আর কি!

হাবুল বললে, সহকারী পরিচালক।

—চোপরাও!—টেনিদা হাবুলকে এক বাঘা ধমক লাগিয়ে বলে চলল, চন্দ্রবদনকে শ্রাংচাদা ভজিয়ে ফেললে। তার বদনে দুটো ডবল ডিমের মামলেট, চারটে টোক্‌ আর তিন কাপ চা ঘুষ দিয়ে—শেষে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল শ্রাংচাদা। ওঠবার সময় চন্দ্রবদন বললে, এত করে বলছেন যখন—বেশ, আপনাকে আমি ফিলিমে চান্স দেব। কাল বেলা দশটার সময় যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেব জনতার দৃশ্যে।

হাত কচলাতে কচলাতে শ্রাংচাদা বললে, স্কুডিয়োটো কোথায় স্থার?

চন্দ্রবদন জায়গাটা বাহুলে দিলে। বললে, দেখলেই চিনতে পারবেন। উঁচু পাঁচিল—বাইরে লেখা রয়েছে ইউরেকা ফিলিম কোং। আচ্ছা আসি এখন, ভেরি বিজি, টা—টা—

হাত নেড়ে চন্দ্রবদন তড়াক করে একটা চলতি বাসে উঠে চলে গেল।

সেদিন রাত্তিরে তো শ্রাংচাদার আর ঘুম হয় না। বার বার বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্যে পার্ট করছে। মানে কখনো স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে—কখনো জয়ধ্বনি করছে, কখনো অটুহাসি হাসছে। অবিশি হাসি আর জয়ধ্বনিটা নিঃশব্দেই হচ্ছে—পাশের ঘরেই আবার মেসোমশাই ঘুমোন কিনা!

সারা রাত ধরে জনতার দৃশ্য সড়গড় করে নিয়ে শ্রাংচাদা সকাল ন’টার আগেই সোজা ব্যারাকপুর ট্রাক রোডের বাসে চেপে বসল। তারপর জায়গাটা আঁচ করে নেমে পড়ল বাস থেকে।

ধানিকটা হাঁটতেই—আরে, ওই তো উঁচু পাঁচিল। ওইটেই নিশ্চয় ইউরেকা ফিলিম।

গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল শ্রাংচাদা। বাইরে একটা মস্ত লোহার গেট—চেতুর থেকে বন্ধ। তার ওপরে বোর্ডে কী একটা নাম লেখা আছে—কিন্তু লতার ঝাড়ে নামটা পড়া যাচ্ছে না—দেখা যাচ্ছে কেবল তিনটে হরফ—এল, ইউ, এম।

● শ্রাংচাদার ‘হাহাকার’
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

দেব দেউল

এল-ইউ-এম! লাম! মানে ফিলাম। তার মানেই ফিলিম।

কাবলা আপত্তি করলে, লাম! লাম কেন হবে? এফ-আই-এল্-এম—ফিল্ম।

টেনিদা বেগে বেগে চিৎকার করে উঠল: সায়লেন্স! আবার কুরুবকের মতো বক্ বক্ করছিল? এই রইল গল্প—আমি চললুম।

প্রায় চলেই যাচ্ছিল, আমরা টেনে টেনে টেনিদাকে বসালুম। হাবুল বললে, ছাইড্যা ছাও কাবলার কথা—চ্যাংড়া!

—চ্যাংড়া! ফের ডিস্টার্ব করলে টাংরা মাছ বানিয়ে দেব বলে রাখছি। হুঁঃ!

লোহার গেট বন্ধ দেখে ছাংচাদা গোড়াতে তো খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, চন্দ্রবদন নির্ধাত গুলপটি দিয়ে দিবা পরশ্রমপদী খেয়ে দেয়ে সটকান দিয়েছে। তারপর ভাবলে, অস্থানিকেও তো দরজা থাকতে পারে। দেখা যাক।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুর ঘুর করছে—গেট-ফেট তো দেখা যাচ্ছে না। খুব দমে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ বোটা গলায় কে বললে, হু আর ইউ?

ছাংচাদা তাকিয়ে দেখলে পাঁচিলের ভেতর একটা ছোট কুটো। তার মধ্যে কার দুটো স্বলস্বলে চোখ আর একজোড়া ধুমসো গোঁফ দেখা যাচ্ছে। সেই গোঁফের তলা থেকে আবার আওয়াজ এল: হু আর ইউ?

ছাংচাদা বললে, আমি—মানে আমাকে চন্দ্রবদনবাবু ফিলিমে পার্ট করতে ডেকেছিলেন। এইটেতে তো ইউরেকা ফিলিম?

—ইউরেকা ফিলিম?—গোঁফের তলা থেকে বিচ্ছিরি ঝাঁত বের করে কেমন খাঁকখাঁকিয়ে হাসল লোকটা। তারপর বললে, আলবত ইউরেকা ফিলিম। পার্ট করবে? ভেতরে চলে এসো।

—গেট যে বন্ধ। ঢুকব কী করে?

—পাঁচিল টপকে এসো। ফিলিমে নামবে আর পাঁচিল টপকাতো পারবে না?

ছাংচাদা ভেবে দেখলে কথাটা ঠিক। ফিলিমের কারবারই আলাদা। ছাখ্‌না—বোঁ করে লোকে নল বেয়ে চারতলায় উঠে পড়ছে, কপাং করে পাঁচতলার থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে—একটা চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে আর একটা ট্রেনে চলে যাচ্ছে। এসব না করতে পারলে ফিলিমে নামাবেই বা কেন? ছাংচাদা বুঝতে পারল, এখানে পাঁচিল টপকে ভেতরে যাওয়াই নিয়ম, ওইটেই প্রথম পরীক্ষা।

ছাংচাদা কী আর করে? দেওয়ালের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। হুঁ পা ওঠে—আর সড়াক করে পিছলে পড়ে যায়। শব্দের সিল্কের পাঞ্জাবী ছিঁড়ল, গায়ের নুনহাল উঠে গেল, ঠিক নাকের ডগায় আবার কুটুস

● ছাংচাদার 'হাংকার'
নায়ায়ণ গছোপাখ্যায়

করে একটা কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিলে। ভেতরে বোধ হয় আরো কিছু লোক জড়ো হয়েছে—তারা সমানে বলছে—হেঁইয়ে জোয়ান—আর একটু—আর একটু—

প্রাণ যায় যায়—কিন্তু গ্রাংচাদা হার মানবার পাত্তর নয়। একে বাগবাজারের ছেলে, তায় জনতার দৃশ্যে পাট করতে এসেছে। আশ্বিন্টা ধস্তাধস্তি করে ঠিক উঠে গেল পাঁচিলের ওপর। বসে একটু দম নিতে যাচ্ছে, অমনি তলা থেকে কারা বললে, আয় রে আয়—চলে আয় দাদা—আয় রে আমার কুমড়োপটাশ—

আর বলেই গ্রাংচাদার পা ধরে হাঁচকা টান। গ্রাংচাদা একেবারে ধপাস করে নিচে পড়ল। কুমড়োপটাশের মতোই।

কোমরের বেজায় চোট লেগেছিল, বাপ-রে মা-রে বলতে বলতে গ্রাংচাদা উঠে দাঁড়াল। দেখলে পাঁচিলে ঘেরা মস্ত জায়গাটা—সামনে খানিক মাঠের মতো—একটু দূরে একটা বড় বাড়ি, পাশেই একটা ছোট ডোবা—তাতে জল নেই, খানিক কাদা। আর তার সামনে পাঁচ সাত জন লোক দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।

একজন একটা হুকো টানছে—তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছুট নেই। আর একজনের ছেঁড়া সাহেবী পোশাক—কিন্তু টুপির বদলে মাথায় একটা ভাঙা বালতি বসানো। একজনের গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা। আর একজন—মুখে লম্বা লম্বা গৌন্দাডি—সমানে চোঁচিয়ে বলছে : ‘কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়।’ বলেই সে এমন ভাবে দ্যাক করে দোড়ে এলো যে গ্রাংচাদাকে কামড়ে দেয় আর কি !

সেই সাহেবী পোশাক পরা লোকটা ধাঁ করে রদা মেরে ‘কুকুর আসিয়া এমন কামড়’কে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে, বন্ধুগণ, আমাদের নতুন অভিনেতা এসে গেছেন। বেশ চেহারাটি। এঁকেই হিরো করা যাক—কেমন ?

সকলে চোঁচিয়ে বললে, হিরো—আলবত হিরো।

গ্রাংচাদা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো শুনেই চান্স হয়ে উঠল। বুঝল, সিনেমায় তো নানারকম পাট করতে হয়—তাই ওরা সব ওইরকম সেজেছে, যাকে বলে ‘মেক আপ’। তারপর তাকেই হিরো করতে চায়! গ্রাংচাদা নাক আর কোমরের বাধা ভুলে একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসল। বললে, তা আঞ্জে হিরোর পাটও আমি করতে পারব—পাড়ার থিয়েটারে দু’বার আমি হুমুস্নন সেজেছিলুম। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কোথায় ?

সেই জুতোর মালাপরা লোকটা বললে, চন্দ্রবদন শশুরবাড়ি গেছে—জানাইঘড়ীর নেমস্তর খেতে। আমি হচ্ছি সূর্যবদন—ডিরেকটর !

দেব দেউল

বালতি মাথায় লোকটা তাকে ধাঁই করে এক টাটি দিলে : ইউ ব্লাডি নিগার !
তুই ডিরেকটার কিরে ? তুই তো একটা হুকোবদার। আমি হচ্ছি ডিরেকটার—
আমার নাম হচ্ছে তারাবদন।

সূর্যবদন টাটি খেয়ে বিড়বিড় করতে লাগল। আর যে-লোকটা কামড়াতে
এসেছিল, সে সমানে বলতে লাগল :

“সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি
আজি কি সুন্দর নিশি পূর্ণিমা উদয়
একা ননী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে
মহৎ মে হয় তার সাধু ব্যবহার—”

তারাবদন ধমক দিয়ে বললে, চুপ ! এখন রিহার্সেল হবে। তারপর হিরো বাবু
—তোমার নাম কি ?

গ্যাংচাদা বললে, আমার ভালো নাম বিষ্ণুচরণ—ডাক নাম গ্যাংচা।

—গ্যাংচা ! আহা—ধাসা নাম ! শুনলেই খিদে পায়।—তারপর ফিস্ফিসিয়ে
বললে, আনো—আমার ডাক নাম চমচম !

গ্যাংচাদা বলতে যাচ্ছে, তাই নাকি—হঠাৎ তারাবদন—মানে চমচম চৈচিয়ে
উঠল : কোয়ায়েট ! সব চুপ ! রিহার্সেল হবে। মিস্টার গ্যাংচা—

গ্যাংচাদা বললে, আজ্ঞে ?

—এক পা তুলে দাঁড়াও।

গ্যাংচাদা তাই করলে।

—এবার দু’ পা তুলে দাঁড়াও।

গ্যাংচাদা ভেবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে দু’ পা তুলে কি—

বলতেই তারাবদন চটাস্ করে একটা টাটি বসিয়ে দিলে গ্যাংচাদার গালে। বললে,
রে বর্বর, স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ ! যা বলছি তাই করো। ফিল্মে পার্ট করতে
এসেছে—দু’ পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না ! এয়ার্কী নাকি ?

টাটি খেয়ে গ্যাংচাদার তো মাথা ঘুরে গেছে। কাঁউমাউ করে দু’ পা তুলে দাঁড়াতে
শেল। আর যেই দু’ পা তুলতে গেল, অমনি ধপাত করে পড়ে গেল মাটিতে।

সবাই চৈচিয়ে উঠল : শেম—শেম—পড়ে গেলি ! ফাই—ফাই !

গ্যাংচাদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ফিল্মে নামতে গেলে নিশ্চয় দু’ পা তুলে
দাঁড়াতে হয়—কিন্তু কী করে যে সেটা পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেলো না।

● গ্যাংচাদার ‘হাহাকার’
নারায়ণ গণেশাখ্যার

তারাবদন গ্যাংচাদার কুল্পি ধরে এমন হাঁচকা মারল যে তড়বড়িয়ে লাফিয়ে উঠতে হল বেচারীকে। তারপর তারাবদন বললে, এবার গান করো।

—কী গান গাইব ?

—যে গান খুশি। বেশ উপদেশপূর্ণ গান।

গ্যাংচাদা একেবারে গাইতে পারে না—বুঝলি ? মানে আমাদের প্যালায় চাইতেও যাচ্ছেতাই গান গায়—একবার রাস্তায় যেতে যেতে এমন তান ছেড়েছিল যে শুনে একটা কাবলীওলা অচম্কা অঁতকে উঠে ভ্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তিরো হওয়ার আনন্দে সেই গ্যাংচাদাই ভীমসেনী গলায় গান ধরল :

‘ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক
তার ছিল এক মাসী—
ভুবনের দোষ দেশে দেখিত না
সে মাসী সর্বনাশী—’

এইটুকু কেবল গেয়েছে—হঠাৎ সবাই চৈচিয়ে উঠল : ঝপ—ঝপ—আর গান না।

তারাবদন বললে, না—আর গান না। এবার নাচো—

—নাচব ?

—নিশ্চয় নাচবে।

—আমি তো নাচতে জানিনে।

—নাচতে জানো না—হিরো হতে এসেছ ? নামাবাড়ির আবদার পেয়েছো—না ?—বলেই কড়াং করে গ্যাংচাদার কুল্পিতে আর এক টান।

গেলুম গেলুম—বলে গ্যাংচাদা নাচতে লাগল। মানে ঠিক নাচ নয়—লাফাতে লাগল বাধার চোটে।

সকলে বললে, এনকোর—এনকোর !

যেই এনকোর বলা—অর্থাৎ তারাবদন আর একটা পেলায় টান দিয়েছে গ্যাংচাদার কুল্পিতে। ‘পিসিমা গো গেছি’—বলে গ্যাংচাদা এবার এমন নাচতে লাগল যে তার কাছে কোঁথায় লাগে তাদের উদয়শংকর !

তারাবদন বললে, রাইট। ও-কে। কাট্ !

কাট্ ! কাকে কাটবে ? গ্যাংচাদা ভয় পেয়ে যেই থমকে গেছে অমনি তারাবদন বললে, এবার তা হলে সম্ভরণের দৃশ্য। কী বলো বন্ধুগণ ?

সঙ্গে সঙ্গে সকলে চৈচিয়ে বললে, ঠিক—এবারে সম্ভরণের দৃশ্য !

আংচাদা ‘আরে আরে—করছ কি—’ বলতে বলতে সবাই ওকে চাংদোলা করে তুলে ফেলল। তারপর চক্ষের পলকে নিয়ে ছুড়ে ফেললে সেই ডোবাটার ভেতরে!

কাদা মধ্যে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে—সবাই আবার ঠেলে ডোবার মধ্যে ফেলে দিলে। বলতে লাগল : সম্ভরণ—সম্ভরণ!

আর সম্ভরণ! আংচাদার তখন শ্রাণ যাওয়ার জো। সারা গা—জামাকাপড় কাদায় একাকার—নাকে মুখে দুর্গন্ধ পচা পাক ঢুকে গেছে, আর বিছুটির মতো সে কি জ্বল্‌নি! আংচাদা যেমনি উঠতে চায় অমনি সবাই তুকুনি তাকে ডোবায় ফেলে দেয়। আর চাঁচাতে থাকে : সম্ভরণ—সম্ভরণ—



গেলুম গেলুম—বলে আংচাদা নাচতে লাগল। [পৃষ্ঠা ৩৪৩

শেষে আংচাদা আকাশ কাটিয়ে হাহাকার করতে লাগল—মানে ‘হাহাকার’ ফিলিমে পাট করতে এসেছিল কিনা : বাঁচাও—বাঁচাও—আমাকে মেরে ফেললে—আমি আর ফিলিমে পাট করব না—ককনো না—

শ্রাণ যখন যাবার দাখিল তখন কোথেকে তিন চারজন খাকী শার্ট প্যান্ট পরা লোক লাঠি হাতে দৌড়ে এল সেদিকে। আর তুকুনি তারাবদনের দল একেবারে হাওয়া!

● আংচাদার ‘হাহাকার’
নান্দারন গদোপাখ্যার

হাংচাদার তখন প্রায় নাভিখাস। খাকীপরা লোকগুলো তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে বললে, কা! তাহ্জব! ই নোতুন পাগলা ফের কাঁহাসে আসলো?

ব্যাপার বুলি? আরে—
ওটা মোটেই ফিলিম স্টুডিও নয়—
লাম—মানে লুনাটিক অ্যাসাইলাম—
অর্থাৎ কিনা পাগলা গারদ। উঁচু
পাঁচিল আর ‘লাম’ দেখেই হাংচাদার
বুন্ধি তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল।
সাধে কি আর আই-এতে সব
সাবজেক্টে ফেল হয়! ফিলিম
স্টুডিওটা কাছাকাছি আর কোথাও
ছিল হয়তো।

হাংচাদা কী করে বাড়ি ফিরল
সে আর শুনে কাজ নেই। কিন্তু
সেই থেকে আজো হাংচাদা নেংচে
নেংচে হাঁটে—আর সিনেমা হাউসের
সামনে এলেই চোখ বুজে করুণ
গলায় গাইতে থাকে: ‘দীনবন্ধু,
রূপাসিন্দু—’



টেনিদা থামল। আমার খাল-
মুনের শিশি তত্তক্ষণে সাফ।

কা! তাহ্জব! ই নোতুন পাগলা ফের কাঁহাসে আসলো?

হাত চাটতে চাটতে বললে, তাই বলছিলুম, তোরা গোবরবাবুকে একুনি বার
করে দে। আরে—আসলে ফিলিম স্টুডিওগুলোও এমনি পাগলা গারদ—গোবর-
বাবুকে শ্রেফ, ঘুঁটেচন্দর বানিয়ে ছেড়ে দেবে!



—ঐবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভট্ট—

অনেকদিন আগেকার কথা, বক্তেশ্বরপুর গ্রামে ভোজনের ভট্টাচার্য বলে এক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। পাড়াপ্রতিবাসীরা তাঁকে ডাকতো ভট্ট ভট্টাচার্য বলে।

তাঁর এই নাম হওয়ার একটা ইতিহাস আছে। তিনি ভোজন করতে পারতেন অসম্ভব। বিচ্ছেদ্বি তেমন ছিল না বলে তাঁকে ঘিরে কোন কাজ চলতো না—তুই ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় তাঁর ডাক পড়তো। শ্রাদ্ধশাস্তি, বিবাহ, উপনয়ন হলেই লোকের বাড়ি তাঁর নেমন্তন্ন ছিল ধীমা, আর তিনি সেখানে এসে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ক্রমাস্ত নুখ চালিয়ে যেতেন।

বিশ পণ্ডা লুচি, আদিটা পান্ডুরা, দু' ইঞ্চি দুই তাঁর নুখের মধ্যে সঁহুলে নিমেষে যে কেমন করে উপে যেত তার ঠিক পাওয়া অসম্ভব ছিল। বে-বাহুব এত তার ভগবানও বোধ হয়

তার অত খাবার যোগাড় করে দিতে পারেন না। তবু এক সন্ধ্যার দাতা ভট্টাচার্য্য মশায়ের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রত্যাহ আধমণ লিখে পাঠিয়ে দিতেন তাঁর বাড়ি, কিন্তু তাতেও তাঁর কুলোতো না।

অনেকগুলি ছেলেপুলে থাকায় ভট্টাচার্য্য মশাইকে আধপেটা থাকতে হ'ত বর্চদিন—কলে ছেলেপুলেকে তিনি ছ'চকে দেখতে পারতেন না। সংসারে তাই নিয়ে তাঁর দ্বার মধ্যে নিত্য অশান্তি লেগে থাকতো।

ছেলেও একটি আধটি নয়—সাত-সাতটি। কাবুলেশ্বর, গাবুলেশ্বর, তাবুলেশ্বর, হাবুলেশ্বর, টাবুলেশ্বর, ভাবুলেশ্বর ও বাটুলেশ্বর। ছেলেদের লেখাপড়ার বন্দোবস্ত করা কিংবা তাদের শাইয়ে শাইয়ে মানুষ করার ক্ষমতা বাপের ছিল না—তার ফলে ওরা পাড়া চষে বেড়াতো।

কানুন গাছে আঁধ, ডাঁধ, কিছু থাকবার জো নেই। কখন রাতের অন্ধকারে, কিংবা নির্জন ভূপরে সপ্তরশী গিয়ে কার বাগানের ফল-পাকুড় যে আয়সাং করে আসবে তার ঠিক নেই।

বাড়িতে তাদের বাবার কাছে নাশিশ আর নাশিশ। ভট্টাচার্য্যমশাই মাঝে মাঝে কেপে গিয়ে প্রত্যেককে বেদম পিটতেন। ছেলেগুলো মিচকে মেয়ে তখনকার মত চুপচাপ মার হজম করতো, তারপর বাবার বরাদ্দ আধমণি রসদ পণের মাঝ থেকে অর্ধেকের ওপর বেমালাসু হয়ে যেত।

লুটের কেরামতি ছিল। যখন খুঁড়ি করে তাঁর ক্ষেত্রে খাবার আসতো, তখন ছেলেগুলো এক একটা গাছে কায়দা করে এমন বসে পাকতো যে যাবা জ্বিনিস হয়ে আনতো তারা টেরও পেত না কি করে পুরো মাল লিকিতে দাঁড়িয়ে গেল।

কিছুদিন পরে অবশ্য আসল বাপারটা টের পাওয়া গেল—ভট্টাচার্য্যমশাই তখন একটা চেলা কাঠ এনে তাদের পিটুতে লাগলেন। অবশেষে তাঁর গিন্নী ছুটে এসে থিঁচিয়ে বললেন, ওদের দোষ কি? বাপ হয়ে ওদের খেতে বিতে পার না, ওরা লুকিয়ে চুরিয়ে খাবে না তো কি করবে?

ভট্টাচার্য্যমশাই চিংকার করে বলে উঠলেন, তা বলে চুরি করবে?

তাঁর গিন্নী সমান টেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, নিশ্চয় করবে! পাওয়াবার হুরোঁদ নেই, লেখাপড়া শেখাবার হুরোঁদ নেই, শুণু নিজের ভুঁড়ি ছাড়া আর বুড়িতে এতটুকু ঘি নেই—তার ছেলেরা চোর-ডাকাত হবে না তো কি হবে? বেশ করেছে খেয়েছে! খবরদার ওদের গারে হাত তুলবে না বলে দিচ্ছি!

ভট্টাচার্য্যমশাই রাগে গজগজ করতে করতে তখনকার মত বেরিয়ে গেলেন—তারপর রাত্তিরে আধপেটা খেয়ে রাগ আরও বাড়লো—ভাবলেন, ছেলেগুলোকে কোশলে বাড়ি থেকে তাগাতে হবে। কি কোশল করবেন সেটাও ঠিক করে কেললেন।

পরের দিন সকালে উঠে ছেলের বাইরে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব মিষ্টি করে বললেন, ওয়েশো, তোদের খাওয়ারাওয়ার অল্পে খুব ভাল ব্যবস্থা করেছে। দশ-বার ক্রোশ দূরে “খাইখাইপুর” বলে একটা জায়গা আছে—সেখানে যদি তোরা মাস্ তাহলে খুব উত্তম-মধ্যম খেতে পারবি—যাস্ তো বল্, আমি তোদের নিয়ে যাই। কিন্তু খবরদার মাকে এসব কথা বলিসনি যেন—তাহলেই আর যেতে দেবে না।

সকলে তপুনি সেখানে যাবার জন্তে নেচে উঠল, কিন্তু সবচেয়ে ছোট বাঁটুল কোনো কথা বললে না। সে ভাবলে,—নিশ্চয়ই তার বাবার অল্প কিছু মতলব আছে। বাঁটুল সব্বার ছোট, তার ওপর দাঁটে—মাএ হাতখানেকের বেশী দে বার বছর বয়েস পর্যন্ত বাড়িনি, কিন্তু বুদ্ধি অসাধারণ। তাছাড়া ষাটল গোপনে পাঠশালার চিথির নীচে বসে গুরুমশাইদের পড়া শেখানো শুনে শুনে অনেক কিছু শিখে নিয়েছিল। তাই উত্তম-মধ্যম ব্যাপারটা যে ঠেঙানি সেটা সে বুঝতে পারলে। ইচ্ছে করলে সে না যেতে পারতো, কিন্তু ভাইগুলোর ওপর তার টান থাকায় সেও যেতে রাজী হয়ে গেল।

বাপ চলছে এগিয়ে, পেছনে সাত ছেলে যাচ্ছে। গায়ের বাইরে এর আগে কখনও ওরা যাচনি—নতুন নতুন পথঘাট গাছপালা দেখতে দেখতে চলেছে, মন ভারী খুলী। একেবেঁকে গায়ের যেঠো পথ পার হয়ে, বনবাগাড় ঝোপঝাড় পেরিয়ে তারা এক তেপান্তরের মাঠে এসে পড়ল। তখন ঠিক জুপুর—রীতিমত ক্রিধে পেরেছে সবারের কিন্তু ভট্টাচার্য্যমশাই কেবল বলছেন, আর একটু পা চালিয়ে চল্ না, তারপর খাইখাইপুরে গেলে খেতে খেতে পেট কেটে যাবে। এই রকম নানা কথা বলতে বলতে বিকেল নাগাদ একটা নিবিড় বনের মধ্যে ছেলেগুলোকে নিয়ে এলেন।

* বাঁটুল আর হাঁটতে পারে না—মায়ের জন্তে তার মন যেন খুব কেমন কেমন করতে লাগলো, তার ওপর বাবার এই জুলুম সে বরদাস্ত করতে পারলে না, বললে—বাবা, আর নয় এইবার বাড়ি করে চল, আর খাইখাইপুরে গিয়ে দরকার নেই—ক্রিধের চোটে এখুনি মাথা বাঁইবাঁই করে খুঁজছে।

বাবা বিঁচিয়ে উঠে বললেন, চুপ্ কর বাবর, চালাকি করলে এখনি বেধিয়ে ঘোব মজা।

সকলে কিন্তু বাপের ধমকানিতে ভয় পেলে না—তারা আর এগোবে না বলে বিরোহ করে বসে পড়লো। তখন এই তত্ত্ব ভট্টাচার্য্যমশাইও রাগ বেধিয়ে কোথায় যে সরে পড়লেন তার হদিস পেলে না তারা।

ওদিকে লক্ষ্যে হয়ে আসছে, পথঘাট কাকরই জানা নেই, সেখানে ঠাঁড়িয়ে কেঁদেই বা কি

● বেটে বাঁটুলের বুদ্ধি
ঐশ্ব্যেরক্ষক ভয়

হবে? সকলে তো ভয়েই অস্থির! তখন বাটুল ভায়েদের আশাস দিয়ে বললে, তোরা ভয় পাস্নি, দাঁড়া, আমি এই উঁচু গাছেই একদম মগডালে উঠে দেখি, কাথাও কাকর বাড়িঘর আছে কিনা।

এই বলে সে তরতর করে কাঠবেড়ালীর মত একটা গাছে উঠে গেল। সেখানে উঠে দেখলে চারিদিকে শুষ্ক ঘন বন কিন্তু তারই ভেতরে এক আয়গায় একটা মস্ত সাদা বাড়ির চূড়া যেন দেখা যাচ্ছে—সম্ভবতঃ কাকর বাড়ি হবে এবং আশ ফ্রোশ হাঁটলেই সেখানে পৌঁছানো যাবে।

তাড়াতাড়ি সে কৌনদিক বরাবর এগিয়ে যাবে তাই ঠিক করে নিয়ে গাছ থেকে নেমে ভায়েদের বললে, চল, একটা আন্তানার সন্ধান পেয়েছি, আমার তোরা কাঁধে নিয়ে চল—ওখানেই রাতটা কাটাযো।

বাটুলের কথা শেষ হতে না হতে গাভুল তাকে কাঁধে চাপিয়ে নিলে এবং তার নির্দেশমত সবাই পরস্পরের কাঁধ ধরে, সেই বাড়ির সামনে ঠিক সন্ধ্যা হবার মুখেই এসে পড়ল।

প্রকাণ্ড বাড়ি—মার্বেল পাথর দিয়ে তৈরী কিন্তু সামনে কোন লোকজন নেই। বাড়ির মধ্যে তখন সন্ধ্যা হয়ে যেতে বড় বড় বাড়লঠন জ্বলে উঠেছে। সামনে উঠানের পাশ দিয়ে প্রকাণ্ড একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে—কিন্তু লোকজন কেউ কোথাও নেই।

বাটুল বললে, আমার কাঁধ থেকে নামা, আমি আগে আগে যাই তোরা আমার পেছনে পেছনে আর। বাটুলের নির্দেশমতই কাজ চললো। বাটুল ওপরে গিয়ে দেখলে একটা ঘর থেকে নানা রঙিন আলো বেরুচ্ছে। হীরে, অহরত, মণি, হুক্তো দিয়ে ঘরটা মোড়া—আর সেইখানে একটা সোনার খাটে শুয়ে আছে এক সুন্দরী রাজকন্যা।

চঠাং বাটুল আর তার ভায়েদের বেধে সে বিছানার ওপর গুঠে বসলো, চোপ চটে। বড় বড় করে বললে, কী সর্বনাশ! তোমরা কারা? এখানে এসেছ কেন?

বাটুল খাটের একটা পুরের কাছে দাঁড়িয়ে বলে উঠল—আমরা বাইখাইপুরে বাব বলে এখানে এসেছি—এখানে নাকি খুব খাওয়াদাওয়া পাওয়া যায়।

অতটুকু একহাত ছেলেকে দেখে আর তার কথা শুনে রাজকুমারীর চোখের মধ্যেও হাসি এল—কারণ এত বেঁটে সে আগে আর কোথাও দেখেনি। তাকে চট করে হুঁহাত দিয়ে খাটের ওপর তুলে নিয়ে সে হাসি হাসি মুখে তাকে খানিকটা দেখে তারপর গম্ভীরভাবে বললে, তোমরা বাইখাইপুরেই এসেছ ঠিক, কিন্তু এখানে যে সবাই মানুষ খার। এটা একটা প্রকাণ্ড রাক্ষস রাজার বাড়ি—

● বেঁটে বাটুলের হুঁহাত
ঐশীয়েস্বরূপ ওর

এর কাছাকাছি কোন মানুষ এলে সে টপু ক'রে তাকে বুথে পুরে ফেলে—তাই এ আয়গাটার নাম খাইখাইপুর।

বাটুল গভীর হয়ে বললে, তাই নাকি ?

রাজকুমারী বললে, হ্যাঁ।

ওদিকে রাজকুমারীর কথা শুনে বাটুলের ছয় ভাই কাঁদতে শুরু করে দিলে। রাজকুমারী তাড়াতাড়ি বললে, চুপ চুপ কৈশো না। তোমরা বরং পালাও এখুনি—না হলে আর খানিকটা বাঁধেই রাক্ষস এসে পড়বে।

বাটুল বললে, পালাব কোথায় ? এই রাস্তিরে তো বাইরে গেলে বাঁধে থাকে—তার চেয়ে এখানেই বা হবার লোক।

রাজকুমারী সে কথা শুনে চুপ করে রইল। তারপর বাটুল বললে, আচ্ছা, তুমি তো মানুষ, তুমি এখানে এলে কি করে আর তোমাকে রাক্ষস পাচ্ছে নাই বা কেন ?

রাজকুমারী মানবুথে বললে যে, সে এক রাজার মেয়ে, তারা ছয় বোন। এই রাক্ষস তার ছয় ছেলের সঙ্গে তাদের ছয় বোনের বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তাতে রাজা রাজী হননি বলে রাক্ষস খুব চটে গিয়েছিল। তারপর একদিন রাজকুমারী যখন বাগানে একা ফুল তুলছিল সেই সময় ও তাকে ছুরি করে নিয়ে আসে।

বাটুল জিজ্ঞাসা করলে, তোমার সঙ্গে রাক্ষসের ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে ?

রাজকুমারী বললে, না। রাক্ষস বলেছে সে আমার আরও পাঁচটি বোনকে নিয়ে আসবে, তারপর একসঙ্গে ছয় ছেলের বিয়ে দেবে।

বাটুল প্রশ্ন করলে, ছেলেগুলো সব কোথায় ?

রাজকুমারী বললে, ছেলেগুলো সন্ধ্যা হতে না হতেই খেয়ে দেবে ঘুমিয়ে পড়ে—তারা এখন ঘুচ্ছে। ভীষণ ঘুম তাদের—তা না হলে একরূপ বাড়ি মাথায় ক'রে স্তরা চিংকার করতো। সারাদিনে আচ্ছা তারা দুটো গণ্ডার আর চারটে বাঘ মেয়ে তাদের মাংসের ঝোল খেয়ে এখন নাক ডাকাচ্ছে—কালকে আবার ভোরে উঠবে।

ওঃ বাবা!—কিন্তু আমাদেরও যে কিবে পেরেছে বেজার। তবে গণ্ডারের চচ্চড়ি বাঘের ঝোল তো খেতে পারবো না।

রাজকুমারী বললে, না না, সে-সব খেতে হবে না তোমাদের। আমার ভাতে রাক্ষসরা হোচ্ছা মিষ্টি নিয়ে আসে—তা কি তোমরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে পারবে ? আবার বাটের তলার পাঁচ খালা বড় সন্দেশ, তিন পামলা রাখতোগ আর চার পামলা পাঁহুরা আছে—খাও তো নাও।

৩ বটে বাটুলের হুঁচি
শ্রীমদেবপ্রকাশক ভব

রাজকুমারীর সুখের কথা সরতে না সরতে অর্ধেক জিনিস ততকণে ওদের পেটে চলে গেল।
রাক্ষসের খাওয়ার চেয়ে সে কিছু কম নয়! রাজকুমারী তো হাঁ। এরাও তেঁা দেখছি কুদে রাক্ষস,
মনে মনে ভাবতে লাগল রাজকুমারী।

বাই হোক, তাড়াতাড়ি খেয়ে হাত ধুয়ে তার কোথায় লুকোবে ভাবতে ইতিমধ্যে রাক্ষসের তার
হাঁকডাক শোনা গেল। সে আওয়াজ শুনলে মনে হয় যেন কেউ কানের কাছে কামান দাগছে।

রাজকুমারী মহাবিপদ দেখে তাড়াতাড়ি তাদের পাটের তলায় লুকিয়ে থাকতে বললে। 'তার'
লুকোবার জন্তে সবাই সড়াক করে সেখানে যেই ঢুকেছে সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর রাক্ষস এসে
হাজির।

রাজকুমারীকে দেখেই সে একগাল হেসে বলে উঠল, কিরে এখনও তুই জেগে আছিস দেবদেউ -
খোকারা কোথায়?

তারা এখন উত্তরের ঘরে ঘুমচ্ছে বাবা, রাজকুমারী বলে উঠল।

হম!—তুটো মরা জলহন্তী হাতে খুলিয়ে রাক্ষস ঘরে ঢুকেছিল, পেতলোকে দেখিয়ে বললে,
এইগুলো আমি ছোট ছোট করে কেটে দিচ্ছি, তুই একটু আগুনে সের্কে দে। এই বলেই সে
একটা পাথরের উঁচু আসনে বসে খাপ থেকে তরোয়াল বার করে কচ্ কচ্ করে কাটতে শুরু
ক'রে দিলে।

রাজকুমারী কোনমতে সেই এক একটা দশসেরি মাংশের টুকরো নিয়ে গিয়ে রান্নাঘর থেকে
বলসে নিয়ে আসে আর রাক্ষস তার হাড়গোড় সমেত কড়মড় করে চিবিয়ে খেতে থাকে। তার দশ
কী!—মনে হয় যেন খোয়ার ওপর দিয়ে লোহার চাকা ওয়ালা ওশো গাড়ি চলছে।

পাটের তলায় ছেলেগুলো ভয়ে অস্থির। হঠাৎ রাক্ষসের মনে হ'ল রাজকুমারীর পাটের তলায়
খন্ ক'রে কে যেন নড়ে উঠল।

—ওখানে কে নড়ে রে? বলেই রাক্ষস চট করে এগিয়ে গিয়ে দেখে গাংলেশ্বর পা গুটিয়ে
নিচ্ছে। আর বার কোথা? হিড়্ হিড়্ ক'রে রাক্ষস সব ক'টাকে পাটের তলা থেকে টেনে বার
করলে, কেবল বাঁটুলকে দেখতে পেল না। বাঁটুলেশ্বর পাটের পারা পাশে দেওয়ার দিকে দৌঁটে
রইল। একহাত বেঁটে হওয়ায় তার লুকোবার সুবিধেও ছিল খুব। সে বেঁচে গেল।

এরা ছটা ভাই ঠ্যাং ঘরে চানিতেই জ্ঞান হারিয়েছে। রাক্ষস কটমট করে রাজকুমারীর দিকে
চেরে বললে, এরা কোথেকে এল রে?

রাজকুমারী হেসে বললে, ওরা পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছিল বাবা, আমি আপনার
খোকারের জন্তে ওদের লুকিয়ে রেখেছিলাম।

● বেঁটে বাঁটুলের মুক্তি
প্রবীরেন্দ্র কল

দেব দেউল

জিহ্বাটা ঠোঁট দিয়ে চেটে রাক্ষসরা বললে উঠল, খোকাদের খাবারের জন্তে রেখে দিয়েছি, ভাল। তার আগে আমি তু'একটাকে চেখে দেখি—অনেকদিন কচি মানুষের মাংস খাইনি, ভারী লোভ হচ্ছে রে!

রাজকুমারী সে কথা শুনে তাকাতাড়ি বলে উঠল, না বাবা, দেখছেন না ওরা কি রকম রোগ', তু'চারদিন খাইয়ে দাইরে মোটা-সোটা করে খেলে ভাল হয় না?

রাক্ষস একটু ভেবে ভুরু কঁচকে বলে উঠল, তা মন্দ বলিস্নি, তবে পেটগুলো তো বেশ মোটা দেখছি।

পেটগুলি যে সস্তা সন্দেশ রসগোলা ঠাসা হয়ে ফুটিয়েছে সে কথা তো অংক রাক্ষসকে বলা যায়

না। রাজকুমারী নানারকমে বুদ্ধিরে তখনকার মত রাক্ষসকে ঠাণ্ডা করলে। অবশ্য দুটো জলহন্তী খেয়ে রাক্ষসেরও পেটটা ভতি ছিল এই ব্যাপক।

রাক্ষস শেষে বললে, আচ্ছা তাহলে ওদের নড়া ধরে ধরে এখন দক্ষিণের ঘরে টেনে নিয়ে যা—কালকে ছেলেদের সঙ্গে মতলব ঠিক করে যা হোক করা যাবে।

বলামাত্র রাজকুমারী একরকম হিড় হিড় করে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে ছেলে-গুলিকে টেনে নিয়ে গেল। উত্তরের ঘরে একটা পালঙ্কের ওপর শুইয়ে কয়ল ঢাকা দিয়ে ফিরে এল।

রাক্ষস জিজ্ঞেস করলে, কোন্ ঘরে ওদের শোয়ালি?

রাজকুমারী বললে, দক্ষিণের ঘরে বাবা।

রাক্ষস বললে, ঠিক আছে—আমি এবার পাশের ঘরে শুতে বাজি—তুইও শুয়ে পড়।



অনেকদিন কচি মানুষের মাংস খাইনি, ভারী লোভ হচ্ছে রে।

● বেঁটে ঝট্টাদের বুদ্ধি
ঐশ্বর্যের দৃষ্টি

THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA





ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ : — ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ — ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ
 ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ ଶ୍ରୀମଦ୍ରାମାୟଣ ଶତକ

রাজকুমারী শুয়ে পড়ার ভান করলে, রাক্ষসও চম্ চম্ করে পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। বাটুল সেই ঠাঁকে খাটের পায়া বেয়ে রাজকুমারীর বিছানার ওপর উঠে কিস্ কিস্ করে বলে উঠল, কি গো, রাক্ষস তো ঘুমতে গেল, আমরা তাহলে এবার পালাব ?

রাজকুমারী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, না না, শিগগির লুকোও—এখনও সে ঘুমোয়নি। যখন ঝড়ের মত নাক ডাকবে তখন জানবে সে নিশ্চিন্তে ঘুচ্ছে। সে ঘুম কুড়ুকর্ণের মত—কাল রুপরে ভাঙবে। এখন লুকোও।

বাটুল চট করে আবার স্ব-স্থানে নেমে পড়ল।

ওদিকে রাক্ষস ঠিক নিশ্চিন্তে ঘুমতে পারছিল না, কত ভাবনাই না! মাপার মতো ঘুমতে লাগলো। তার—হাজার হোক, ওরা মানুষ তো বটে, রাজকুমারীকে নিয়ে যদি পালায়! অতএব ওদের আর বাঁচয়ে রাখা ঠিক হবে না—সাবড়েই দিয়ে আসি, নইলে ঘুম হবে না। এই ভেবে তরোয়াল নিয়ে সে রাজকুমারীর কণামত দক্ষিণ ঘরের দিকে চলে গেল।

অন্ধকারে ঘরে ঢুকে ঠিক ঠাণ্ডা করতে না পেয়ে সে নিজের ছেলেগুলোর গলাতেই কোপ দিয়ে চলে এল—তারা একটা কৌকু করে শব্দও করতে পারলে না। দূর থেকে রাজকুমারী শুশু গোটা ছ'য়েক তরোয়ালের বা পড়লো শুনতে পেলে।

শব্দদের সাবাড় করে দিয়েছে ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত মনে বিছানার পাশে তরোয়াল আর ভোজালি রেখে রাক্ষস শুয়ে পড়লো। রাজকুমারী বুঝলে সে রাক্ষস যখন চম্ চম্ করে দক্ষিণের ঘরের দিকে গেছে, তখনই সে একটা কাণ্ড করে বলে আছে। সে চুপ করে পড়ে রইল।

থানিক পরেই গুরু হল ঝড়—নাকের ডাক শুনে মনে হল যেন কেউ শিঙে ঝুকছে। বাটুল বুঝলে রাক্ষস ঘুমিয়েছে। সে তাড়াতাড়ি আবার রাজকুমারীর কাছে এসে বললে, এইবার পালাবো ?

রাজকুমারী ভয়ে ভয়ে বললে, হ্যাঁ, পালাও! তবে আমাকে রাক্ষস কাল কেটে ফেলবে। কারণ, আমার মনে হয় সে অন্ধকারে তার নিজের ছেলেদেরই কেটে রেখে এসেছে।

এঁয়া!—তুমি ঠিক জান ?—বাটুল জিজ্ঞেস করলে।

রাজকুমারী বললে, হ্যাঁ, আমি তরোয়ালের বা পড়তে শুনেছি।

বাটুল বললে, তাহলে তো পালানো হবে না। তোমায় এভাবে ছেড়েই বা বাই কি করে ?

রাজকুমারী বললে, এ ছাড়া উপায় কি বল। তুমি তো এইটুকু ছেলে, ওকে তো কিছু করতে পারবে না।

বাটুল বললে, বটে। আমি রাক্ষসকে ঠিক মারবো! এই বলেই সে পাইপাই করে পাশের ঘরে চুকে পড়লো। কিন্তু সে-ঘরে চুকে ঠাঁড়ানে কার সাধ্য!

● বেঁটে বাটুলের হৃদয়
খ্রীষ্টীয়েরকক ভয়

দেব দেউল

প্রকাণ্ড আর উঁচু এক খাটির উপর রাকস নাক ডাকিয়ে ঘুচ্ছে, তার আঁগাঝ কত রকম। আর নিঃশেষ ছাড়ছে বুথ দিয়ে। ফর্-ব-বু—ফুথ—কব্ব করে ঝড়ের হাওয়া বেরিয়ে আসছে। সেখানে দাঁড়াতে কার সাধি।

মনে হচ্ছে 'শ' তরেক ঘোষ ঘোঁত ঘোঁত করতে করতে চুঁ ঘেরে নাকের মধ্যে তেড়ে ঢুকে গেল, তারপরই একসঙ্গে আবার দল বেধে বাইরে এসে বেওয়ারে চুঁ মারলে। ঘরের আসবাবগুলো

নিঃশেষ টানার সঙ্গে সঙ্গে একবার কাত হয়ে পড়ি পড়ি করছে, আবার ঠেলা খেয়ে ঠিক দাঁড়িয়ে যাচ্ছে।

বাঁটল পায়। বেয়ে উঠে কোন-মতে রাকসের মাথা রাখছে উঠলো। কিন্তু মাথা কি তার কম উঁচু?—গোটা দশেক বাঁটল কাঁধে কাঁধে চড়লে তবে তার চাঁদিটা দেখতে পেত হয়তো।

তবু হুঁদাত সাহসের সঙ্গে সে এগিয়ে গেল কাছে। দেখলে বিছানার পাশে একটা ভোজালি পড়ে আছে। হুঁহাতের হুঁঠোর সেটাকে সে চেপে ধরলে, কিন্তু নিজের গায়ের জোরে রাকসের হুকে ভোজালি চালিয়েও তো সে কিছু করতে পারবে না। অথচ একে না মারলে সর্বনাশ! যেন তেন প্রকারে এর বধা নিকেশ করা চাইই।

হঠাৎ তার মাথার একটা হুঁড়ি এল, তাবলে কোনমতে যদি ওর নাকের মধ্যে এই ভোজালি চালিয়ে

দিতে পারি তাহলেই কন্ন কতে। এই ভেবে সে বেরন নাকের ধারে গেছে, অবনি রাকস নিঃশেষ ছাড়লে আর বাঁটল তার খাটার বিশ হাত দুই এক বেওয়ারে ছিটকে পড়ে মাথার আঁব গলিয়ে ফেললে।

● বেটে বাঁটলের হুঁড়ি
ঐশীয়েতরক্ক ভর



ভোজালির বাঁটল আপন পড়িতে হুঁহাতে চেপে করে রইল বাঁটল।

মাথা ঝন্ঝন্ করতে লাগলো তার। তকুনি সে মেয়ের পড়ে যেত কিন্তু তার আগেই নিঃশ্বাসের টানে সে আবার সিঁথে চলে গেল নাকের কাছে।

সেখানে গিয়ে আর কথা নেই, একেবারে ভোজালি গেঁথে সে তার কাঠের বাঁটটি প্রাণপণ শক্তিতে চেপে ধরে রইল। রাক্ষস ছ' একবার মাথা ঝাঁকুনি দিয়েই কিন্তু শেষ হয়ে গেল ওখুনি। নদীর স্রোতের মত রক্তের স্রোত বেরিয়ে এল রাক্ষসের নাক থেকে।

এরপর হৈ হৈ কাণ্ড! বাঁটল আর তার ভারেরা রাজকন্তাকে নিয়ে তার বাপের বাড়ি দৌড়ে দিতে রাজা খুব খুশী।

বাঁটলকে তিনি কোলে উঠিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই বল,—আমি তোমার সব দেব।

বাঁটল বললে, দেখুন, আমি আপনার কাছ থেকে কিছু চাই না, আমার কতকগুলি দুটে দিন—রাক্ষসের বাড়ি থেকে হীয়ে জ্বরত লোনা নিয়ে আসি। এতেই আমাদের সাত ভাইয়ের সাতপুরুষ চলে যাবে। আর আমার বাবা ঐ টাকার কত খেতে পারেন এইবার আমি দেখবো।

রাজা বললেন, খুব ভাল কথা, আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

বাঁটলের হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে রাজা খুশী হয়ে তার ইচ্ছামত সব ব্যবস্থা করে দিলেন, আর বাঁটলকে করে নিলেন তাঁর মন্ত্রী।

বাঁটল বাবা মাকে এনে খুব সুখেসুখেই রেখেছিল বটে কিন্তু ভোজনোদ্বারের আর খাবার শক্তি ছিল না—শেষের দিকে কিছুই আর তাঁর হজম হত না। দিনরাত শুণু বেড়সের আড়াইসের সাবু খেয়ে বিছানার চিত হয়ে গুয়ে থাকতেন।

বুলি বোলু অহুলা হার বো জানে বোলু
বুলি এয়ারলা বোলিয়ে কাটা আন্দার ভোল।

—প্রাচীন হিন্দী দোহা

মণি ও মুক্তা



কথা যে বলতে জানে, তার কাছে কথা
অহুলা দ্বিগুন। নিজের ওলনের মতন কথা
হওয়া চাই বাপ-করা।



—ঐশ্বরী অপরূপা রায়

ভ্রাভিমির শহরে আইভ্যান্ অ্যাক্সিওন্ড নামে এক বেনে বাস করতো। বেনে ছিল বেশ অবস্থাপন্ন। তার নিজের বাড়ি ছিল আর ছিল দুটো দোকান। সেই দোকান থেকে তার বেশ ভাল আয় হ'ত। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে সে বেশ সুখেই ছিল।

একদিন আইভ্যান্ তার মালপত্র নিজের শহরের এক হাটে বেচতে যাবে বলে প্রস্তুত হ'ল, এমন সময় ওর স্ত্রী এসে বলল, “তোমাকে আজ কিছুতেই যেতে দেব না।”

আইভ্যান্ বলল, “সে কি? এই মালগুলো বেচতে হবে না? না গেলে চলবে কি করে?”

তখন ওর স্ত্রী বলল, “কাল রাতে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।”

আইভ্যান্ হেসে জিজ্ঞাসা করল, “এমন কি স্বপ্ন দেখেছ, যার জগা আমার বাণ্ডা হবে না?”

স্ত্রী উত্তর দিল, “আমি দেখলাম তুমি শহর থেকে ফিরে এসেছ। আর তোমার সমস্ত চুল দুধের মত সাদা হয়ে গেছে।”

এই কথা শুনে আইভ্যান্ হাসতে হাসতে বলল, “তুমি স্বপ্ন দেখেছ আমার সব

চুল একেবারে সাদা হয়ে গেছে ? এ তো ভাল স্বপ্ন। দেখো এবার সব মাল বেশ ভাল দামে বিক্রি হয়ে যাবে। তোমার জন্ম অনেক উপহারও আমবা।”

এই বলে আইভ্যান্ যাত্রা করল। সঙ্গে নিল তার মালপত্র আর তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস গীটার।

পথে যেতে যেতে আর একজন বেনের সঙ্গে আইভ্যানের দেখা হ’ল। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দুই জনে এক সরাইখানায় গিয়ে সেরাতের মত আশ্রয় নিল।

তার পরদিন অন্ধকার থাকতে থাকতে আইভ্যান্ একটা ঘোড়ার গাড়ি করে শহরের দিকে রওনা হ’ল। ভাবল খুব তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌঁছতে পারবে।

অনেকদূর যাবার পর গাড়িচালক ঘোড়াকে ষাওয়াবার জন্ম গাড়ি থেকে নামল, আর আইভ্যানও চা খাবার জন্ম সামনের এক সরাইখানায় প্রবেশ করল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন তার গীটারটা বাজাতে বাজাতে বারান্দায় বেরিয়ে এলো তখন দেখতে পেল যে দু’জন পুলিশ ও একজন দারোগা তার দিকেই এগিয়ে আসছে।

কাছে এসে দারোগা জিজ্ঞাসা করল, “আপনার নাম কি ? এত সকালে আপনি আগের সরাইখানা থেকে বেরিয়ে এসেছেন কেন ? আপনার সঙ্গে যে আর একজন বেনে ছিল তার সঙ্গে দেখা করে এসেছিলেন কি ?”

আইভ্যান্ অবাক হয়ে দারোগার দিকে তাকিয়ে রইলো। তারপর বিস্ময়ের ষোর কাটলে জিজ্ঞাসা করল, “এসব আমাকে জিজ্ঞাসা করবার মানে কি ?”

দারোগা বলল, “আপনার সঙ্গে যে লোকটি ছিল তাকে আপনি হত্যা করেছেন।”

আইভ্যান্ তো অবাক। “আমি—আমি হত্যা করেছি ? কে একথা বলেছে আপনাকে ?” চৈতন্যে ওঠে আইভ্যান্।

“বেশ, আপনার জিনিসপত্র আমি তল্লাশ করব।” এই বলে দারোগা সাহেব পুলিশ দু’জনকে ইঙ্গিত করতেই তারা আইভ্যানের জিনিসপত্র খুঁজে দেখতে লাগলো। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একটা ব্যাগ পাওয়া গেল। আর সেই ব্যাগের ভিতর থেকে বেরোল একটা রক্তমাখা ছোরা।

দারোগা হাসতে হাসতে বলল, “কি ? এর পরও আপনি বলবেন যে আপনি হত্যা করেন নি ?”

আইভ্যান্ শুধু পাথরের মূর্তির মত ঝাঁড়িয়ে হইল। কোন কথাই বলতে পারল না। তারপর পুলিশ দু’জন দারোগার হুকুমে আইভ্যানকে বেঁধে হাজতে নিয়ে চলল।

দেব দেউল

যথাসময়ে আইভ্যানের জী এই ঘটনা শুনতে পেল। কিন্তু সে একথা বিশ্বাস করতে পারল না। সে বুঝতে পারল যে কোন দুই লোক এই হীন কাজ করে তার স্বামীর ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দিয়েছে।

শেষপর্যন্ত বিচারে আইভ্যানকে অগ্ন্যাশ্রু থুনি আসামীদের সঙ্গে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠান হ'ল।

সাইবেরিয়ায় ক্রমে ক্রমে ছাব্বিশ বছর কেটে গেল। আইভ্যানের মাথার



সমস্ত চুল পেকে গেল। পাকা দাড়িতে গুর সমস্ত মুখ ভরে গেল। আগের মত আর তার হাসিখুশি ভাব নেই। কারো সঙ্গে সে কথা বলত না। খালি রাতদিন ভগবানের নাম করত। আইভ্যানের ব্যবহারে জেলের সকলেই তাকে বেশ ভালবাসত। কেউ কেউ আবার তাকে দাড়া বলেও ডাকত।

মাঝে মাঝে তার বাড়ির কথা মনে হ'ত। জী, ছেলে মেয়ে কে কেমন আছে, বেঁচেই বা আছে কিনা কে জানাবে তাকে? ভীষণ মন খারাপ লাগত তখন তার। চোখের জল নামত দুই গাল বেয়ে। কে জানে তার ছেলেমেয়েদের সে আর দেখতে পাবে কিনা। মনটা তার হু-হু করে উঠত।

কিছুদিন পরে সেই জেলে আবার একদল নতুন কয়েদী এলো। ক্রমে পুরানো কয়েদীদের সঙ্গে তাদের পরিচয় হ'ল। নতুন দল পুরানো কয়েদীদের কাছে জড় হয়ে পরস্পরের খোজখবর নিতে লাগল। আইভ্যান

গানের ভেতর থেকে বেরোল একটা রক্তমাখা ছোরা। [পৃষ্ঠা ৩৫৭

● চরিত্রগত বৃত্তি
ঐক্যী অপরী যার

ছিল ওদের মাঝখানে বসে। নবাগতদের ভেতর থেকে এক ষাট বছরের বুড়ো তখন তার নিজের গল্প বলছিল।

সে বলল, “আমি একটা গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নিয়েছিলাম। সেইজগৎ আমাকে এখানকার জেলে পাঠিয়েছে। আমি এত করে বললাম যে আমি ঘোড়াটা চুরি করিনি, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবার জগৎ ঘোড়াটা নিয়েছিল। তা ছাড়া গাড়ি চালক আমার বন্ধু। কিন্তু ওরা কেউ আমার কথা কানেই তুলল না। কিন্তু একবার সত্যি সত্যি একটা পাপ আমি করেছিলাম। তায়খর্য অশুভায়া তখনই আমার এখানে আসা উচিত ছিল। কিন্তু সেবার আমি ধরা পড়িনি। আর এবার আমি মিথ্যা সাক্ষ্য পেলাম।”

একজন কয়েদী জিজ্ঞাসা করল, “তোমার বাড়ি ছিল কোথায়?”

“আমাদের গায়ের নাম ভ্লাডিমির।” উত্তর দেয় বৃদ্ধ লোকটি।

আইভ্যান্ হঠাৎ চমকে ওঠে ওর কথা শুনে। বলে, “তুমি ভ্লাডিমির গ্রামের আইভ্যান্ বেনের বংশের কাউকে চেন?”

বৃদ্ধ একবার তাকায় আইভ্যানের দিকে। তারপর বলে, “হ্যাঁ চিনি। তার ছেলেরা এখন বেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে। তাদের বাপ তো সাইবেরিয়াতেই রয়েছে। সেও আমার মত একজন কয়েদী। তা তুমি এখানে কি করে এলে?”

আইভ্যান্ তার অতীত জীবনের কথা কারও কাছে বলতে চায় না, সে ঝালি বলে, “পূর্বজন্মে নিশ্চয়ই কোন পাপ করেছিলাম। তার জগৎই আমার আজ এই অবস্থা!”

কিন্তু অগ্ন কয়েদীদের মধ্যে একজন আইভ্যানের সব ইতিহাস নূতন কয়েদীদের বলে।

সব শুনে এক নূতন কয়েদী ঝানিকরণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আইভ্যানের দিকে। তারপর বলে, “আরে এ তো ভারী আশ্চর্য! কিন্তু দাদ, তুমি এর মধ্যে এত বুড়ো হয়ে গেলে কি করে?”

তার কথা শুনে অগ্ন কয়েদীরা জিজ্ঞাসা করে, “কি—তোমার সঙ্গে আগে পরিচয় ছিল না কি হে?”

আইভ্যান্ ভাবে লোকটা নিশ্চয়ই খুনের ব্যাপারটার কিছু জানে। ও হয়তো বলতে পারবে কে খুনী। তাই জিজ্ঞাসা করে, “আচ্ছা তুমি কি আগে আমাকে কোথাও দেখেছ? আর তুমি বোধহয় খুনের ব্যাপারটা আগেই শুনেছিলে, তাই না?”

দেব দেউল

মৃতন কয়েদী বলে, “গল্পটা শুনে থাকলেও আমার এখন তো সবটা মনে নেই।”

আইভ্যান্ জিজ্ঞাসা করে, “কে আসল খুনী তাও হয়ত তুমি জান।”



বি বলে হাও তবে জেনে রেখো মরবার আগে তোমাকে খুন করেই মরব।

লোকটা হেসে ওঠে হো-হো করে। বলে, “যার কাছে ছোরা পাওয়া গিয়েছিল সে-ই খুনী। অত্ন লোক খুন করলে তুমি যে ধলিতে মাথা দিয়ে শুয়েছিলে তার মধ্যে ছোরা যাবে কি করে?”

তখন আইভ্যানের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে এই লোকটাই খুনী। নইলে সে এত কথা জানবে কি করে? সে ভাবল, যে করেই হোক এর প্রতিশোধ নিতে হবে। ওর জন্মই তো তার সারা জীবন নষ্ট হয়ে গেল।

একদিন রাত্রিবেলা আইভ্যান তার ঘরে পায়চারি করছে। এমন সময় এক কয়েদীর বিছানার তলা থেকে কিছু মাটি তার পায়ের উপর এসে পড়ল। ও তো অবাক। কিন্তু একটু পরেই ও দেখতে পেল যে মৃতন কয়েদী তার সামনে এসে

ঝাঁড়ালো। ভয়ে তার মুখ শুকিয়ে গেছে।

আইভ্যানের হাত চেপে ধরে লোকটি বলল, “আমি প্রাচীরের নীচে একটা গর্ত খুঁড়ছি। রোজ জুতোর মধ্যে করে সেখান থেকে মাটি এনে বাইরে কেলো আসি। তুমি একথা কাউকে বলো না। কিছুদিন পরে আমরা দু'জনেই পালিয়ে যেতে পারব। আর যদি বলে লাও তবে ওরা বেত মেরে আমাদের খেঁচবে।

কিন্তু তার আগে জেনে রেখো আমি তোমাকে খুন করে যাব।”

● চর্যাকার হুজি

শ্রীমতী অপরী হার

আইভ্যান তার শত্রুর দিকে তাকিয়ে রাগে কীপতে লাগল। বলল, “আর আমাকে খুন করবার কোন দরকার হবে না। তোমার মাটি খোঁড়ার কথা বলে দেব কিনা সেটা ভেবে দেখব। তবে তুমি হত্যা করার আগেই আমার মৃত্যু হবে।”

পরদিন কিন্তু এই মাটি খোঁড়ার ব্যাপার পাহারা-ওয়ালারা টের পেয়ে গেল। তারা তখন জেলারের কাছে গিয়ে নালিশ করল। জেলার এসে সব কয়েদীদের জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারল না। অবশেষে আইভিয়ানকে যখন জিজ্ঞাসা করা হ’ল তখন সে ডাবল—যার জন্ত আমার সারা জীবন নষ্ট হয়েছে তাকেই বা আমি বাঁচাব কেন? কিন্তু ওর নাম বলে দিলে ওকে ওরা বেত মেরে শেষ করবে। তাতে আমার কি লাভ হবে? আইভিয়ান নতুন কয়েদীর দিকে একবার তাকাল। তারপর করুণভাবে বলল, “ভ্রূর, আমি বলতে পারব না।”

জেলার অনেক চেষ্টা করে শেষে বিফল হয়ে ফিরে গেলেন।

সেদিন রাতে আইভিয়ান বিহানায় চোখ বুজে শুয়ে আছে। এমন সময় একটা ছায়া ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এসে তার খাটে বসল। আইভিয়ান পায়ের শব্দে চোখ খুলে তাকিয়েই নতুন কয়েদীকে চিনতে পারল। সে টেঁচিয়ে উঠল, “আবার—আবার তুমি আমার কাছে এসেছ? কি দরকার তোমার? আমার কাছ থেকে তুমি আর কি চাও?”

নতুন কয়েদী আস্তে আস্তে বলে, “আইভিয়ান, তুমি আমাকে দাঁপ কর।”



নতুন কয়েদী আস্তে আস্তে বলল—“আইভিয়ান, তুমি আমাকে দাঁপ কর।”

“কিসের জন্ত মাংস চাইছ তুমি?” জিজ্ঞাসা করে আইভ্যান।

কয়েদী বলে, “হ্যাঁ, সেই বেনেকে আমিই খুন করেছি। তারপর ছোরাটা তোমার খলেতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তোমাকে খুন করবার ইচ্ছাও আমার ছিল। কিন্তু হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে আমি তাড়াতাড়ি জানলা টপকে পালিয়ে যাই।”

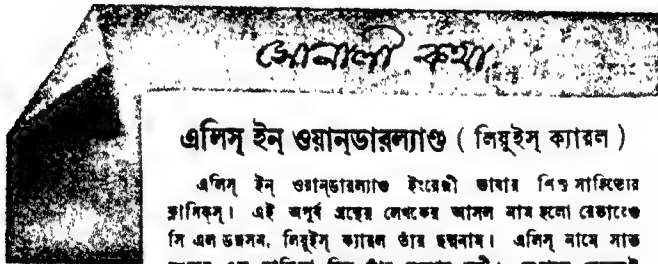
নতুন কয়েদীর কথা শুনে আইভ্যান কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে বসে থাকে।

নতুন কয়েদী আবার বলে, “আমি আমার সমস্ত দোষ স্বীকার করব। তবেই তুমি মুক্তি পাবে। তখন তুমি বাড়ি ফিরে যেতে পারবে।”

আইভ্যান বলে, “এখন দেখছি খুব দরদ। কি লাভ হবে বলতে পার, এখন আমার মুক্তি পেয়ে? আর এখন আমার যাবার জায়গাই বা কোথায়? স্ত্রী হয়তো বেঁচে নাই। ছেলে-মেয়েরা আমাকে এখন আর চিনতে পারবে না। না—না আমাকে এখন মুক্তি দিয়ে তোমাকে আর বাহাহুরি দেখাতে হবে না।”

কিন্তু নতুন কয়েদী আইভ্যানের কথা শুনল না। সে তার সমস্ত দোষ স্বীকার করল। আইভ্যানের খালাসের চকুমণ্ড দেওয়া হ'ল। কিন্তু তার আগেই আইভ্যানের মৃত্যু হয়েছে।*

* টলস্টয়ের অত্মশব্দ



এলিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড (লিউইস্ ক্যারল)

এলিস্ ইন্ ওয়ান্ডারল্যান্ড ইংরেজী ভাষার শিশু সাহিত্যের ক্লাসিক্। এই অশ্রু গ্রন্থের লেখকের আসল নাম হলো চেরচাউথ সি এল ডরসন, লিউইস্ ক্যারল তাঁর ছদ্মনাম। এলিস্ নামে সাত বছরের এক বালিকা ছিল তাঁর অবশেষের সঙ্গী। বেড়াতে বেরলেই এলিস্ বাঘবা ঘরভা, ঘর বলে। এলিস্কে ভোলাবার জেতে তিনি ভুবুনি ভুবুনি গল্প রচনা করে বলতেন। এই ভাবেই এই অপকল্প গল্পের সৃষ্টি হয়। তাঁর গল্পের বারিকাত শিশু এলিস্। শিশু এলিস্ একদিন বেড়াতে বেড়াতে দেখলো অদ্ভুত কাঠ কে ভাকে ভাকছে। ফিরে গেলে, হাঁড়িবড় ছাঁট কোট-পরা এক ঘরগোশ। সেই ঘরগোশের সঙ্গে এলিসের মিলতালি হয়। বে পর্তের ডেবর দিয়ে ঘরগোশ অদ্ভুত হয়ে বেড়া, এলিস্কে সেই পর্তের ডেবর দিয়ে ঘরগোশটি নিয়ে ঘর এক আশ্রয় বেলে। সেখানে ভাসের বিবিরা সব সরীষ, সেবারকার জীবজন্তরা বাহুবের বড়মই চলেকের কথাবার্তা বলে, ঘোংগা হাতে ইছুরা নকলকে ঈজিতোলে আশ্রয় করে। এই পরে আরে সেই বিভিন্ন লেখ এলিসের বিভিন্ন সব অভিজ্ঞতার কাহিনী।



• দুই ভাই •

—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কত অলৌকিক ঘটনা ঘটে মানুষের জীবনে—কেই-বা তার হিসেব রাখে! কেউ-বা গাছাপুরি গল্প বলে উড়িয়ে দেয়, আবার কেউ-বা বিশ্বাস করে।

এমনি একটা গল্পের কথা আমি জানি।

গল্পটি যে আরগার, সেটাকে বলে করলাকুটির দেশ। চারদিকে ছোট বড় নানারকমের করলায় কুঠি। কোনোটা খুলেছে, কোনোটা বন্ধ হয়েছে। আশ-পাশের গ্রামের অধিকাংশ লোক এইসব করলাকুঠিতে চাকরি করে।

এমনি একটা করলার কুঠিতে চাকরি করে হু' ভাই। কার্তিক আর গণেশ।

হু' ভাই হু'রকমের। কার্তিক যেন একেবারে সত্যিকারের কার্তিক। যেমন স্তম্ভরূপ, তেমনি বিদ্বান। অনেক টাকা রোজগার করে। কলিরায়ীর ক্যানিয়ার। সাহেবী পোশাক পরে আপিসে যখন আসে, যেন হয় সত্যিকার সাহেব। বাব্বালী বলে চেনা যায় না।

কোম্পানির কোয়ার্টারে থাকে। দিবে করেছে কলকাতায়। লেখাপড়া-জানা বো। হাইহিল জুতো পরে হাতে ত্যানিটি ব্যাগ জুলিয়ে কোথাও যখন যায়, হু'রও তাকিয়ে বেঁচেতে হয়।

দেব দেউল

বাড়ির আদব-কারদাও তেমন। বাহুড়ি রান্না করে, টেবিলে বসে খায়। বাড়িতে হুয়গী পুবেছে।

ওদিকে গণেশ ঠিক তার উলটো। নামেও গণেশ, কাজেও গণেশ। চেঁহারা—পাঁচপাঁচি আরও দশটা মাছবের যেমন হয় তেমন। দেহে বিশেষত্ব কিছু না থাকলেও বিশেষত্ব আছে তার দেহের অপরিমিত শক্তিতে। যেমন জোরান, তেমন বলবান।

লেখাপড়া কিছু শেখেনি। নিত্যন্ত সাধারণ একটা চাকরি। তাইতেই কোনোরকমে তার দিন চলে। বাড়িতে স্ত্রী আর একটি তেরো চৌদ্দ বছরের মেয়ে।

স্ত্রী তার সাধারণ গরীব গৃহস্থের মেয়ে। টানটানির সংসার, তবু তার মুখে হাসি যেন লেগেই আছে।

মেয়েটি কিন্তু পরমা সুন্দরী। নাম রেখেছে নারায়ণী।

তু' ভাই এক কলিয়ারীতে কাজ করে। কিন্তু ভাইএ ভাইএ দেখা হয় না। কার্তিক থাকে একজারগার, গণেশ থাকে একজারগার। দাদার পাছে অসম্মান হয় ভাই গণেশ তার পরিচয় পূর্ণস্তু দিতে চায় না।

নারায়ণী একদিন বললে, বাবা, আজ আমি দেখলাম জেঠাইমাকে।

গণেশ বললে, ডাকোনি তো জেঠাইমা বলে' ?

—না বাবা ডাকিনি, শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম।

গণেশ বললে, ডেকো না কোনদিন।

—কেন বাবা, ডাকলে কি হয় ? আমাদের তো আপন জেঠাইমা !

গণেশ বললে, তা হোক। ওরা বড়লোক, আমরা গরীব। আমাদের ঘরে ঘরে থাকাই ভালো।

নারায়ণীও কিছু ভাবি ইচ্ছে, ওদের বাড়ি যাবার। প্রতিবেশী মেয়েরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে তখন তার ভাবি লজ্জা হয়। কেউ কেউ আবার বিশ্বাসই করতে চায় না। বলে, গাঁ-সম্পর্কে কেউ হবে হয়তো।

নারায়ণী বলে, না ভাই, আমার বাবার সহোদর ভাই। আপন বাবা।

—যেৎ, তুই জানিস না তাহলে !

নারায়ণী বগড়া-ঝাঁটি করবার মেয়ে নয়। চুপ করে থাকে।

● হুই ভাই

শৈলজানক হুখোপাধ্যায়

সেদিন এক ভানুকওলা এসেছিল খেলা দেখাবার জন্তে।

পরশা দিবে খেলা দেখবার সামর্থ্য এ-পাড়ার কারও নেই। কাজেই পাড়ার ছেলেমেয়েগুলো ছুটেছিল ভানুকের পিছু পিছু। ম্যানেজার ক্যাসিনারের বাংলোর কাছ পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। নারায়ণীও ছিল ছেলেমেয়েদের সেই দলের ভেতর।

জ্যেষ্ঠামশাইএর বাংলোর হুহুখে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়েছিল। কি হুম্মর বাড়িখানা! তাকিয়ে তাকিয়ে বের্ব ছল সে। হঠাৎ তার নজরে পড়লো—উঠানের একপাশে আল দিয়ে ঘেঁষা এটা জায়গায় কতকগুলো মুরগী রয়েছে। একজন মুসলমান বাবুটি এসে একটা মুরগী ধরে নিয়ে গেল।

এইটে কিছ ভাল লাগলো না নারায়ণীর।—এরা মুরগী খায় কথাটা সে শুনেছিল, আজ নিজের চোখে দেখলে। মাকে বলতে হবে গিয়ে।

এখন সময় সাহেবী পোশাক পরা জ্যেষ্ঠামশাই বেরিয়ে এলো বাংলা থেকে। তারই পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল। তার দিকে একবার কিয়েও তাকালে না।

ভানুকওলা তখন চলে গেছে অনেক দূরে। তার হাতের টুমটুমি বাজনার আওয়াজ কানে আসছে।

গীতা তাদের পাশের বাড়ির ঘরে। নারায়ণীর কাছে এসে বললে, এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছিল? আর।

নারায়ণী বললে, তাবছি জ্যেষ্ঠাইয়ার সঙ্গে দেখা করে' যা'ব কিনা!

গীতা বললে, খুব হয়েছে, আর দেখা করতে হয় না! তোর জ্যেষ্ঠামশাই তো পেরিয়ে গেল তোর পাশ দিয়ে। একটা কথাও তো বললে না!

নারায়ণী বললে, আমাকে দেখতেই পায়নি।

বলতে গিয়ে তার গলাটা কেমন বেন বন্ধ হয়ে এলো। চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগলো।

সেদিন সে তার মাকে গিয়ে বললে, যা তুমি বকবে না বল।

—কেন রে, বকবো কেন?

নারায়ণী বললে, জ্যেষ্ঠামশাই আজ আমার পাশ দিয়ে পেরিয়ে গেল, তবু একটা কথাও বললে না। গীতার কাছে আমার এত লজ্জা করছিল!

যা বললে, কি করবি মা, অদৃষ্ট!

নারায়ণী বললে, ঘরো, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে আমি যদি একদিন যাই, গিয়ে বল জ্যেষ্ঠামশাইকে—আমাদের বড় কষ্ট জ্যেষ্ঠামশাই, বাবার মাইনেটা বাড়িয়ে দাও। জ্যেষ্ঠামশাই তো ইচ্ছে করলেই পারে!

● দুই ভাই

শৈলজানক্য সুখোপাধ্যায়

মা বললে, না। তোমার বাবা বকবে।

নারায়ণী বললে, বাবে, তোমার একখানি কাপড় নেই, আমার না হয় এই কাপড়টা সেলাই করে' করে' চলছে, বাবার আঁমাটা সাবান দিয়ে জোরে আছাড় দিতে ভয় করে। বাবার মাইনে না বাড়লে কি করে কি হবে মা ?

মা বললে, ভগবান মালিক। সব ঠিক হয়ে যাবে মা, ভাবিসনি।

নারায়ণী বললে, ভোমার শুধু ওই ভগবান আর ভগবান! ভগবান কিছু করবে না তুমি দেখে নিও !

নারায়ণীর কথাই ঠিক হলো শেষ পর্যন্ত। ভগবান কিছুই করলে না।

কলিয়ারীতে হুগা পে-মেন্ট। শনিবার মাইনে পাবার দিন। কাউটারের এপাশে বসে পে-স্টার্ক। নাম ধরে ধরে ডাকে। কাউটারে টিপ লহি দিয়ে টাকা নিয়ে যায় সকলে।

কিছুদিন ধরে কাউটারে খুব গোলমাল চলছে। একে তো মাইনে নেবার দিন। হিসেবের কড়ি, গোলমাল একটু এমনিতেই হয়। তার ওপর কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে অন-বশ-বারো কাবলীওলা হস্ত বড় বড় লাঠি হাতে নিয়ে শনিবার দিন রীতিমত গোলমাল শুরু করেছে। আগে তারা কাউটার পর্যন্ত আসতো না। যা করতো দূরে দূরেই করতো। এখন তারা বলছে তাদের বহু টাকা মারা যেতে বসেছে। মাইনে নিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সবাই পালিয়ে যাচ্ছে। টাকা কিছুতেই দিচ্ছে না।

লোকজন বলছে আর পারছি না। আসল যা নিয়েছি সুদ দিয়েছি তার ডবল। আর দিতে পারবো না।

কাবলীওলারা বলছে, দিতে হবে।

উত্তর পক্ষে এমনি হুঁচক কথা হতে হতে সেদিন একটা বিদ্রী ব্যাপার হয়ে গেল।

এক কাবলীওলা দিলে একজন লোকের ওপর হাত চালিয়ে !

বেচারি নিরীহ বাবলী। হুগের জোর আছে, কিন্তু গারের জোর নেই। মার খেয়ে সে কাঁথতে লাগলো।

কাবলীওলাকে বেশী কিছু বলবারও উপায় নেই। সবাই কিছু-না-কিছু ধারে।

একজন কেবল বললে, তুমি ওকে ধারলে কেন ?

কাবলীওলা বললে, অসুখ ধারবো।

ধরজন কাবলীওলা একসঙ্গে হৈ হৈ করে উঠলো। তাদের নিজের ভাবার কি যে বলতে লাগলো হুগা পেল না।

● কই কই

শৈলজীবনক হুগোপাখ্যার

মাইনে দেওয়া তখনও শেষ হয়নি। ওদিক থেকে ডাক হলো—দামু কামার।
দামু কাউন্টারে গেল টাকা নিতে। সাত টাকা পাঁচ আনা। ভাউচারে টিপ সার্ভ দিয়ে টাকা
নিয়ে চলে যাচ্ছিল। একজন কাবলীওলা এগিয়ে এসে বললে, রুপিয়া দেও।
দামু বললে, এ-হুগায় দিতে পারবো না
সংগেব, আসছে-হুগায় দেবো।

সংগেব হাতথানা তার চেপে ধরে'
তার কবে' তুলে নিলে ছটো টাকা!

—ত্যাখো ভাই ত্যাখো,—জুলুম ত্যাখো!
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে সবাই, কিন্তু
কেউ কিছু বলতে পারলে না। তাদেরও পালা
আসছে। ভয়ত-বা তাদেরও হাত থেকে এমনি
করে' কেড়ে নেবে।

মাইনে নিতে আসছিল গণেশ। বাপার
দেখে থমকে দাঁড়ালে।

দামু ছুটে এলো গণেশের কাছে।
গাতের মুঠো খুলে দেখালে পাঁচ টাকা পাঁচ
আনা। বললে, হাত মুচড়ে ছটো টাকা কেড়ে
নিলে। বলছি আসছে হুগায় দেবো, তা
বাটা ছোটলোক গুনলে না কিছুতেই। বলছি
বোকা কাপড় একদম ছিঁড় গিয়া—

কাবলীওলা ছুটে এসে দামুর ঘাড়ের
ওপর এমন এক ধাক্কা বসিয়ে দিলে যে, দামু
উলটে পড়ে গেল।—গালি দেতা হামকো?

গণেশ সহ করতে পারলে না।
কাবলীওলা দামুকে ঠিক যেমন করে' মারলে, সেও ঠিক তেমনি করে' কাবলীওলার গালের
ওপর বাঁ করে' একটা বুবি দিলে চালিয়ে! কাবলীওলার মাথাটি ঘুরে গেল।

অন্য কাবলীওলারা ছুটে এলো। এরাও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে।
বুব খানিকটা হট্টসোল, মারামারি চললো কিছুক্ষণ ধরে'। কলিয়ারীর অত্যন্ত লোকজন



একজন কাবলীওলা এগিয়ে এসে বললে, রুপিয়া দেও

এসে থামিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। পে-রার্ক পুলিশে থবর দিতে বাচ্ছিল। কড় ক্যালিয়ার কাতিকবাবু এসে দাঁড়ালেন। বারণ করলেন পুলিশে থবর দিতে।

হাশামা থামলে দেখা গেল, একজন কাবলীওলা থানিকটা অখম হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে। বাকি ন'জন পালিয়েছে। গণেশের গায়ের জামাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। রক্তের একটা ক্ষীণ ধারা চুলের ভেতর থেকে নেমে গালের ওপর গড়িয়ে আসছে। হাতের একটা জারিগা থানিকটা ছড়ে গেছে।

হাত দিয়ে মুখটা মুছতে গিয়ে গণেশ দেখলে রক্ত। হেঁড়া জামাটা আরও ভাল করে' ছিঁড়ে তাই দিয়ে হাতের আর মুখের রক্ত মুছে, সে গিয়ে দাঁড়ালো। কাউন্টারের কাছে। কিছুই যেন হয়নি এমনি ভাবে বললে, আমার টাকাটা দিন মানিকবাবু।

মানিকবাবু তার ভাউচারটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে, লহি কর, পনেরো টাকা।

লহি করে পনেরোটি টাকা হাতে নিয়ে মুখ তুলে তাকাতাই দেখে মানিকবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছে কাতিক—তার দাশ।

গণেশ চোখটা নামিয়ে নিলে, কাতিকও কিছু বললে না।

অবাব মিলে গেল তার পরের দিন।

গণেশ রোজ যেমন যার সেদিনও তেমনি কাজে গিয়েছিল। খাদ-মোহনার একটা টুলের ওপর বসেছিল টাইমকিপার। ডুলি থেকে বেরিয়ে গণেশ তার টিকিটটা নিতে গেল হাত বাড়িয়ে। টাইমকিপার বললে, দাঁড়াও।

গণেশ দাঁড়িয়েই ছিল, লোকজন চলে যেতেই টাইমকিপার বললে, তুমি একবার দেখা করগে বড়বাবুর সঙ্গে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেন?

—আনি না ভাই। আমার ওপর এই হকুম।

কাকা ডুলি উঠছিল ওপরে। গণেশ গিয়ে দাঁড়ালো টালোয়ানের কাছে। টালোয়ান মাস্ক-গুটার বসি মারলে। ওপর থেকে বসির অবাব এলো। গণেশকে নিয়ে 'লিকটু কেড' ওপরে উঠে গেল।

আপিসে গিয়ে গণেশ শুনেলে তার চাকরি নেই। কাল নাকি সে এক কাবলীওলার সঙ্গে মারামারি করেছে, সেই অপরাধে তার চাকরি থতম্।

গণেশ বেন বোবা হয়ে গেল। মুখ দিয়ে তার কোনও কথা বেরলো না। হাত দু'টি আঁড় করে' কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশ্যে বেন একটি প্রণাম করে' বেরিয়ে বাচ্ছিল আপিস থেকে।

● দুই ভাই

দেয়দেয়ানন্দ মুখোপাধ্যায়

বড়বাবু ডাকলেন, গণেশ !

গণেশ ফিরে দাঁড়াতেই বড়বাবু একটুকরো কাগজে কি যেন লিখে তার হাতে দিয়ে বললেন, এইটে নিয়ে যাও খাজাখী বাবুর কাছে। কোম্পানি তোমাকে তিরিশটে টাকা দিয়েছে।

হাত বাড়িয়ে কাগজটি নিলে গণেশ। বললে, কোম্পানির অয় হোক !

আপিস থেকে গণেশ বেরুলো তিরিশটি টাকা হাতে নিয়ে। কোথায় যাবে সে ?

ভাবলে একবার যাবে নাকি তার দাদার কাছে ?

না গিয়ে করবেই-বা কি ?

কাল পেরেছে পনেরো টাকা, আজ তিরিশ টাকা। দেনা মিটিয়ে দিন-সাতক চলে যাবে কোনোরকমে, কিন্তু তার পর ? এখানে আর কাজ করে' খেতে হবে না তাকে—ত' সে বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছে।

মাথা ঝুঁজবার আরগা একটা ছিল তাদের। এখনি থেকে ক্রোশ-পাঁচছয় দুয়ে তাদের পৈতৃক বাসস্থান হরিরামপুরে। কিন্তু সে কি আর এখনও আছে ? মাটির একখানা বাড়ি ইটের গাটির দিয়ে ঘেরা, আর সামান্য কিছু ধানের জমি। কলকাতায় বিয়ে করে' স্বস্তরের পরসার লেখাপড়া শিখে দাখা তার একটা মানুষের মতন মানুষ হয়ে গেল, গ্রামের বাড়িতে স্ত্রী তার থাকতেই চাইলে না। দাদার টানে টানে সেও চলে এলো গ্রাম ছেড়ে। সহোদর ভাই—বাবেই-বা কোথায় ?

এক কলিয়ারীতে চাকরি—একই সঙ্গে ছিল চ'লেন।

কাতিকের বাংলোর পেছন দিকে বাবুচি-পানসামার ঘরের পাশে একটা ঘর নিয়ে গণেশও ছিল বেশ মনের আনন্দের, কিন্তু তার বোদি সেটা পছন্দ করলে না। বললে, তোমার আলাদা থাকাই ভাল ঠাকুরপো। এরকম ভাবে থাকলে আমাদের মান-সম্মান কিছু থাকে না।

গণেশ বুঝলে সেকথা।

নারায়ণী তখন নিতান্ত ছোট। ঘর-সংসারের জিনিসপত্র যতসামান্য। সেইদিনই সে তার দাদার সংশ্লষ পরিত্যাগ করে' গিয়ে উঠেছিল কুলি লাইনে।

সে আজ অনেকদিনের কথা।



সাতাটা দিন সে এখিক ওখিক ঘুরে বেড়ালো। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে গা ঢেকে গিয়ে দাঁড়ালো কার্তিক-সাহেবের বাংলোর। সাহেব তখন সবেমাত্র কলিয়ারী থেকে ফিরেছে।

● হুই ভাই

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

দেয় দেউল

গণেশকে দেখেই মেম-সাহেব চীৎকার করে' উঠলো : কি জন্তে এসেছ তুমি ?
ভয় কাকে বলে গণেশ জানে না। কাউকে ভয়-ভয় করবার ছেলেই সে নয়। বললে, দাদার
পক্ষে খেপা করতে এসেছি।



কি দেখেই মেম-সাহেব চীৎকার
করে' উঠলো : কি জন্তে
এসেছ তুমি ?

—কেন, কি দরকার ?

গণেশ বললে, কি দরকার তা তো তুমি জানো
বোদি।

মেম-সাহেব বললে, তোমার চাকরি গেছে
তাই তোমার দাদাকে বিরক্ত করতে এসেছ—
এই তো ?

গণেশ বললে, দাদা বিরক্ত হবে না বোদি,
তুমি দাদাকে একবার ডেকে দাও।

মেম-সাহেব রেগে উঠলো। বললে, এইমাত্র
সে এলো আপিস থেকে। ডাকবার সময়টি
বেশ !

এই বলে' মেম-সাহেব ভেতরে চলে গেল।

গণেশ ভাবলে দাদাকে ডেকে সে দেখে
না, তাই সে নিজেই একবার চীৎকার করে'
ডাকলে—দাদা !

কাঁতিক বোধকরি বাথ-রুমের ভেতর থেকে
সাড়া দিলে।—কি বলছিল ?

গণেশ বললে, বিনাদোবেই চাকরিটা তো
দিলে খেয়ে ! এখন কি করি বল দেখি !

মেম-সাহেব বেরিয়ে এলো : তুমি কি করবে না করবে তাও বলে দিতে হবে ? কান্না
নও, বোঁড়া নও,—

কথাটা তার শেষ হলো না। কাঁতিক বললে, অস্ত্র কোনও কলিরারীতে একটা কাছ-টাছ ঝাঞ্জে বা।

গণেশ বললে, নাঃ, চাকরি আর করবো না।

দাদা চুপ করে' রইলো। বোদিবি কথা বললে। ভেতর থেকে বলে উঠলো ; হ্যাঁ সেই
ভালো। ভগুনি করোগে বাও।

● হুই ভাই

শৈলজানন্দ সুবোধাচার্য

দেব দেউল

৩৭১

গণেশ জবাব দিলে না কপাটায়। শুধু বললে, দাদা, আমি হরিরামপুরে চললাম। সেই-
খানেই থাকিগে যাই।

দাদা বললে, তাই যা।

বলেই হঠাৎ কি যেন তার মনে হলো, তাড়াতাড়ি কলঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললে, বাচ্ছিস্
তো গ্রামে, বাড়িখানা আস্ত যদি থাকে এখনও তো মাথা স্তম্ভবার ঠাই না হয় হবে, কিন্তু খাবি কি ?

গণেশের কাছ থেকে কোনও জবাব না পেয়ে কাতিক ডাকলে, গণেশ !

কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

যেম-নাহেব দুখ বাড়িয়ে দেখলে, কেউ নেই। বললে, কাকে ডাকছো ? সে চলে গেছে।

কাতিক বললে, মরুকগে যাক্ !

বলেই সে তার টেবিলে গিয়ে বসলো। বললে, দাও এক পেয়লা চা দাও।



গণেশ হরিরামপুরে গিয়ে দেখলে তাদের বাড়ির আর কোনও 'পদার্থ' নেই। চালের
খড় একরকম নেই বললেই হয়। খিড়কির দোরের কপাট ছটো করা যেন ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে।

স্ত্রী আর কতাকে নিয়ে সেই বাড়িতে গিয়েই উঠলো গণেশ। পাড়াপড়ণীর কাছে চেয়েচিন্তে
খড় এনে ঘরছাদন করলে। এতদিনের অব্যবহারে ভুতুড়ে বাড়ির মত যে-বাড়ি খাঁ খাঁ করতো,
দিন-তাই পরেই দেখা গেল তার চারদিক বন্ধবন্ধ তক্ততক্ত করছে।

বাড়িটা না হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হলো, কিন্তু উপার্জনের কিছু ব্যবস্থা না হলে তো
আর চলে না !

গণেশ বললে, চাব করবো।

গণেশের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে, তোমার জমি কোথায় ?

গণেশ তার বাড়ির সামনের জমিটা দেখিয়ে দিয়ে বললে, আমি জানি এই জমিটা আবাদের।

তারপর প্রতিবেশী সাধারণ মোড়লের বাড়ি গিয়ে গণেশ বললে, তোমার নামলটি
একবার বেবে ?

—কেন বেবো না ?

গণেশ বললে, বলবও দিতে হবে, নামলও দিতে হবে।

সাধারণ বললে, নিয়ে যাও।

● চই তাই

বৈলম্বানন্দ সুখোপাধ্যায়

ঝিস্‌ ঝিস্‌ করে' বৃষ্টি পড়ছে। মাঠে মাঠে নাঞ্চল দিচ্ছে সবাই। সাধারণের নাঞ্চল গক নিয়ে গণেশ নিজেই নামলো তার মাঠের ওপর।

বারা দেখলে, সবাই অবাক হয়ে গেল। নারায়ণ ভট্টাচার্য যাচ্ছিল স্নান করতে। গণেশ নিজের হাতে নাঞ্চল দিচ্ছে বেথে থমকে থামলো। বললে, এ তুমি কি করছো গণেশ? ব্রাহ্মণের ছেলে—নিজের হাতে নাঞ্চল দিচ্ছ?

গণেশ বললে, হ্যাঁ দাশা, দিচ্ছি।

ভট্টাচার্য বললে, জাতিজন্ম সব খোরালো যে!

গণেশ বললে, কি করবো ভট্টাচার্য, এ-ছাড়া আমার আর কোনও উপায় নেই।

ভট্টাচার্য বললে, কিন্তু তোমার এ অপরাধ কেউ ক্ষমা করবে না গণেশ, সমাজে তুমি পতিত হয়ে পাকবে।

কথাটার অব্যব দিলে না গণেশ। আপন মনে কাজ করতে লাগলো।

ভট্টাচার্যের হলো বিপদ। স্নান করতে যাওয়া তার আর হয়ে উঠলো না। এত বড় একটা দৃষ্টিনা ঘটছে চোখের স্তম্ভে, লংবাট। ঘরে ঘরে প্রচার না করে' সে স্নানই-বা করে' কেমন করে'?

বেশতে বেশতে কথাটা রাই হয়ে গেল সারা গ্রামের মধ্যে। ছেলেবুড়ো ছুটে এলো মজা দেখবার অন্তে। গণেশের বাড়ির গুরুপে যেন বেলা বলে গেল।

ব্রাহ্মণেরা নিবেদন করলে গণেশকে। বললে, এ-কাজ তুমি কোরো না গণেশ। তোমার মেরে বড় হয়েছে, তার বিয়ে দিতে হবে, গ্রামের ব্রাহ্মণ-সমাজে বাস করতে হবে।

গণেশের সেই এক কথা!—আমার আর কোনও উপায় ছিল না দাশা।

নাঞ্চল দেওয়া তখনও তার শেষ হয়নি, এমন সময় এলো অমিয়ারের এক হিন্দুস্থানী দরোয়ান। গণেশকে বললে, ওঠো।

—কেন ভাই? তুমি আমার কে?

দরোয়ান বললে, অমিয়ারের তালব। কাছারিতে তোমার ডাক পড়েছে।

গণেশ বললে, কাজটা হয়ে থাক, তারপর বাব।

দরোয়ান কিন্তু ওনলে না সে কথা। বেশ জোরে জোরে কথা বলতে লাগলো।

গণেশ হাতজোড় করে' অতুন্ন করলে প্রথমে। বললে, পরের হাল-গরু চেয়ে এনেছি ভাই, কাজটা শেষ হোক, তারপর বাব বলছি এখন, নিশ্চয়ই বাব।

দরোয়ান বললে, না, এতুনি যেতে হবে।

৩৭২ ভাই

শৈলজানক সুখোপাধ্যায়

গণেশ বললে, কাজ ছেড়ে যেতে আমি পারবো না।

দরোরান বললে, তোমার বাপ পারবে।

এ আবার কিরকম কথা?

গণেশ বুক টান করে' লোজা হয়ে ফিরে দাঁড়ালো।—কি বললে?

দরোরান বললে, আমি জোর করে' তুলে দেবো তোমাকে।

—কেন?

—এ আমি তোমার নয়।

—আমার নয়?

—না। ব্যক্তি খাজনার দায়ে নিলাম হয়ে গেছে অনেকদিন আগে।

গণেশ বললে, সে নিশ্চয় আমি করে' নেবো জমিদারবাবুর সঙ্গে।

দরোরান এবার আর কোনও কথা না বলে এগিয়ে গেল গণেশের কাছে। তার একখানা হাত টেনে ধরে' বললে, এসো বলছি!

ঝট্কা মেয়ে হাতটা ছাড়িয়ে নিলে গণেশ। টাল সামলাতে না পেরে লোকটা মাটিতে পড়ে গেল। এ অপমান দরোরানের সঙ্গ হলো না। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে গণেশের গালে সে সজোরে এক চড় মেয়ে বসলো।

এবার গণেশ যা করলে তা দেখবার মত।

হাল-গরু ছেড়ে দিয়ে গণেশ ঝাঁপিয়ে পড়লো দরোরানের ওপর। দরোরান চেঁচা করলে উঠে দাঁড়ায়, কিন্তু পারলে না। গণেশ তার বৃকের ওপর চেপে ঝাঁপপে ছ'টি বুঁধ চালিয়ে দিলে লোকটির মুখে।

হিন্দুস্থানী দরোরান চীৎকার করে' উঠলো : আয়ে বাপু!

লোকটার কশ বেতের রক্ত গড়িয়ে এলো। তাই না দেখে গণেশ তার হাতটা তুলেও হাতটা নামিয়ে নিলে। উঠে দাঁড়ালো তাকে ছেড়ে দিয়ে।

দরোরান একটি কথাও বললে না। হাত দিয়ে রক্ত মুছতে মুছতে ছুটে পালিয়ে গেল সেখান থেকে।

গরুটো চূপ করে' দাঁড়িয়েছিল। কিছুই বেন হয়নি এমনি তাবে গণেশ আবার তাঁয়ের কাছে গিয়ে নাকলের বোটা ধরলে।

ক্ষেতে নাঙ্গল চালানো অত সহজ নয়। শরীরে শক্তি থাকলেই হয় না, অভ্যাস থাকা চাই। গণেশ ধীরে-ধীরে কাজ করছিল। কাজ তখনও তার শেষ হয়নি।

মজা দেখবার জন্য গ্রামের অনেক লোক এসে জড়ো হয়েছে।

অমিদারের দরোয়ানকে মেরেছে গণেশ। খবর পাবামাত্র অমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ যেন দপ্ করে' জলে উঠলেন। মনে হলো মারটা যেন তাঁকেই মারা হয়েছে। এই গ্রামের ভেতর কার এত বড় স্পর্ধা যে তাঁর দরোয়ানের গায়ে হাত দেয়? সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হয়ে গেল— ধরে নিয়ে এসো তাকে। এমন আসতে না চায় বেঁধে নিয়ে এসো!

লাঠি হাতে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটলো পাঁচজন লাঠিয়াল গণেশকে ধরে আনতে। গণেশের হাতে মার খেয়ে ঘে-লোকটা পালিয়ে গিয়েছিল বুথে একটা গামছা জড়িয়ে সে-ই এলো লকলের আগে। গণেশের ঘুঁষি খেয়ে তার মুখটা তখন ফুলে গেছে। মোটা নাকটা সে ঢাকা দিতে পারেনি।

গ্রামের কতকগুলো ছেলে তাদের আগে আগে এলো হৈ হৈ করে' ছুটতে ছুটতে। এশেই বললে, গণেশদা পালাও। তোমাকে মারতে আসছে।

ওদিকে তখন গণেশের ঘেয়ে নারায়ণী এসে দাঁড়িয়েছে। সেও বললে, বাবা! মা তোমাকে ডাকছে। বাড়িতে এসো।

গণেশ কিন্তু কারও কথা শুনলে না। রাধারমণ মোড়লকে দেখতে পেয়ে বললে, তোমার বলদ আর নাঙ্গল তুমি নিয়ে যাও মোড়ল। এরা আমাকে চাষ করতে ধেবে না।

বলতে বলতে লাঠিয়ালদের সঙ্গে নিয়ে, হুথফোলা দরোয়ান এসে দাঁড়ালো মাঠের কিনারে। আঙুল বাড়িয়ে গণেশকে দেখিয়ে দিয়ে বললে, ধারো ব্যাটাকে!

তার দীর্ঘঘ বেধে ছেলেগুলো হো হো করে' হেসে উঠলো। তারা ভেবেছিল গণেশের সঙ্গে আবার হয়ত তাদের মারামারি হবে। এই লোকটা আবার হয়ত মার খাবে গণেশের হাতে। মজা মজা হবে না। কিন্তু গণেশ নিজেই সব মজা দিলে মাটি করে'। সংখ্যার তারা পাঁচজন, আর এখিকে গণেশ এক। হয়ত-বা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না ভেবে গণেশ তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, চল আমি বাড়ি কাছারিতে।

এই বলে তাদের আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে সে নিজেই এগিয়ে চললো অমিদারের বাড়ির দিকে।

● দুই তাই

বৈলজ্ঞানিক সুখোপাখ্যার

দেব দেউল

৩৭৫

গ্রামের ছেলেরা তাদের পিছু পিছু এসেছিল রাজেন্দ্রনারায়ণের বাড়ি পর্যন্ত। ভেবেছিল ২৩টা দেখেই বাবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু মজা দেখা তাদের হলো না। গণেশ যেই ঢুকেছে বাড়িতে, সদর দরজাটা দিলে তারা বন্ধ করে।

প্রায় আধঘণ্টা পরে জমিদারের ঠাকুরবাড়ির ফটক থেকে বেরলো গণেশ। সবাই কত বিক্ষত, মংগার চুলের ভেতর থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে আসছে, ভাল করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছে না।

গ্রামের লোক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলে।
‘জিজ্ঞাসা করবার সাহস কারও হলো না’।

গণেশ তার বাড়িতে ফিরে এলো। বাবাকে দেখে নারায়ণী কঁদে উঠলো। গণেশের স্ত্রী এবং লক্ষীর বেদীর কাছে আঁচড় পেয়ে পড়লো।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করলে, এমন করে তোমাকে কে মারলে বাবা ?

গণেশ বললে, জমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণ।

—পারলে তোমাকে মারতে ?

গণেশ একটু হাসলে। বললে, পারতো না। তবে ওরা ছিল পাঁচ চ’জন, আমি এক। সবাই মিলে ধরাদরি করে আমাকে বাঁধলে ঠাকুরবাড়ির থামে, তারপর জমিদারবাবু নিজে মারলে পারের চটি জুতো দিয়ে।

গণেশের স্ত্রী বললে, চল আমরা এখান থেকে চলে যাই।

গণেশ বললে, না, আরও কয়েকটা দিন বেধি।

—কি বেধবে ? চাব করবে ?

গণেশ বললে, না। চাব আর করবো না। আমি আমাদের নেই। বাড়িটা ব্রহ্মোত্তর, তাই তুমি ওইটুকুই আছে।

—এখানে করলাকুঠি নেই, কল-কারখানাও নেই, বাজ কোণার করবে ?



বাবাকে দেখে নারায়ণী কঁদে উঠলো।

● ওই তাই

শৈলজানন্দ সুখোপাধ্যায়

গণেশ বললে, 'যেখি চেষ্টা করে'। কোথাও যদি কিছু না পাই, আমাদের ময়নাবুনি রেল স্টেশনে কুলির কাজ করবো।

—কুলির কাজ করবে ?

গণেশ বললে, লেখাপড়া শিখিনি, কে আমাকে ভাল কাজ দেবে ?

স্বী তার চুপ করে' রইলো।

গণেশ বললে, তোমার লজ্জা করছে ? আমার কিন্তু কোনও কাজ করতে লজ্জা করে না।

এই বলে সে সত্যিই বেরিয়ে পড়লো বাড়ি থেকে।

ময়নাবুনি স্টেশনে গিয়ে শুনলে কুলির কাজ করতে হলো লাইসেন্স দরকার। 'কেমন করে' লাইসেন্স করতে হয় জানবার জন্তে গণেশ যাচ্ছিল স্টেশন-মাস্টারের কাছে। এমন সময় স্টেশনের বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল।

সবাই ছুটছে সেইদিকে।

গণেশ ছুটলো।

গিয়ে দেখে, রাস্তার ধারে প্রকাণ্ড একটা অশ্বখগাছের নীচে সর্ব্বাঙ্গে ছাই মেখে এক সাধু বসে আছেন, আর সেই সাধুর কাছে দাঁড়িয়ে আছে একটা মন্ত বড় উট। এই উটে চড়েই তিনি নাকি সারা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ওদিক থেকে আসছিল একটা প্রাইভেট বোড়ার গাড়ি। কালো রঙের বোড়াটা তার চোখের সামনে উট দেখে আচমকা এমন ভাবে লাফিয়েছে যে কোচম্যান টাল সামলাতে না পেরে উলটে পড়ে গেছে রাস্তায়। পড়ে গিয়ে কোমরে তার এত ঝোর লেগেছে যে সে আর উঠে দাঁড়াতে পারছে না। এদিকে বোড়াটা তখন গাড়িটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে নামিয়েছে রাস্তার ধারে। কাত হয়ে গিয়ে গাড়ির সামনের একটা চাকা গিয়ে লেগেছে একটা গাছের গায়ে। বোড়াটা তখনও লাফাচ্ছে আর চোঁচাচ্ছে।

গাড়ির ভেতরে বসে আছেন এক শ্রৌত ভদ্রলোক, তাঁর স্ত্রী আর ছ'টি ছেলে। তাঁদের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। গাড়ি থেকে তাঁরা নামতেও পারছেন না, অথচ নিশ্চিন্তে বসে থাকবারও উপায় নেই। উট দেখে বোড়াটা ক্ষেপে গেছে। কোচম্যান পড়ে গেছে নীচে। এখন এই আলুগা বোড়া গাড়িটাকে কোথায় কোন্ খানের ভেতর উল্টে ফেলে বেবে তার কোনও স্থিরতা নেই। গাছের গুঁড়িতে চাকাটা লেগে গেছে তাই রক্ষা। নইলে এরূপ কি দৃষ্টিনা যে ঘটতো কে জানে।

প্রায় শ'খানেক লোক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে। একটা লোকও এগিয়ে যাচ্ছে না।

● দুই ভাই

শৈলজ্ঞানন্দ বুখোপাধ্যায়

নির্বিকার সন্ন্যাসী বলে আছেন চূপ করে'। ততোধিক নির্বিকার তাঁর উটটি গলা বাড়িয়ে নিশ্চিন্তমনে কি বেন চিবিরে চলেছে।

ভিড় ঠেলে গণেশ গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলে, যে-কোনও মুহূর্তে গাড়ির চাকাটা গাছ থেকে ছেড়ে আসতে পারে। ভগবান রক্ষা করেছে—গাড়ির চাকা গাছে আটকে গেছে।

গাড়ির ভেতর যিনি বসে আছেন তাঁর অবস্থা ঠিক পাগলের মত। না পারছেন গাড়ি থেকে নামতে, না পারছেন বসে থাকতে। ছেলে ছোটো তাদের মাকে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করছে, আর 'নিত্যন্ত অসহায় ভদ্রমহিলার চুচোখ দিয়ে দর দর করে' জল গড়াচ্ছে। কখনও তিনি ভগবানকে ডাকছেন, কখনও-বা সমবেত জনতার দিকে হাত বাড়িয়ে বলছেন, এগিয়ে এসো বাবা, বাচাও আমাদের। তোমরা বা চাও তাই দেখো।

'কিছু দিতে হবে না মা।' বলে' ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো গণেশ।

গাড়ির কাছে গিয়ে প্রথমেই সে টেনে ছেলে-ছোটিকে গাড়ি থেকে বের করে' নিলে। তারপর হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোককে বললে, আহ্নান আপনি ধরুন আমাকে।

অতিকষ্টে আড়কোলা করে' তাঁকেও বের করলে। সবার শেষে গিন্নীমাকে।

গিন্নীমা রাস্তার নেবেই ছেলেছোটিকে নিয়ে নিরাপদ আয়গার যেতে যেতে দ্বারীকে তিরস্কার করতে লাগলেন, কতদিন থেকে বলছি যেটির কেনো যেটির কেনো, তা না সেই মাদ্রাসার আমলের বোড়ার গাড়ি! বলে কিনা—বাবেকি চাল! বলে কিনা—আমাদের বনেরই বংশ!

মামুষগুলোকে বাচিয়ে গণেশ এবার বোড়ার দিকে এগিয়ে গেল। গাড়িটা চালকা হয়ে যেতেই বোড়াটা বেই লাফিয়েছে, গাড়ির চাকাটা বেরিয়ে এলো গাছের গুড়ি থেকে।

বোড়াটা এগিয়ে বাচ্ছিল গাড়িটাকে টেনে নিয়ে।



গণেশ সবার শেষে গিন্নীমাকে গাড়ি থেকে নামালো।

গণেশ চট্ট করে' ঘোড়ার মুখের লাগামটা চেপে ধরলে। প্রাণপণে চেপে ধরেও কিছু বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না গণেশ। অতঃপর একটা ঘোড়াকে জল করা বড় সহজ কথা নয়। ঘোড়াটা যদি কোনোরকমে একবার রাস্তার ধারে চলে যায়, আর একটা পা যদি হড়ক ফাটতে কোনোরকমে তাহ'লেই সর্বনাশ। রাস্তার ধারেই প্রকাণ্ড একটা খাদ। সেই খাদে গিয়ে পড়লে ঘোড়াটাও মরবে, গাড়িটাও ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

গণেশ চেষ্টা করছে ঘোড়াটার মুখটাকে কোনোরকমে ফিরিয়ে দিতে, আর ঘোড়াটা চেষ্টা করছে রাস্তার ধারে চলে যেতে।

গণেশের শরীরের সব রক্ত যেন তার মুখে এসে জমেছে, শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। শক্তি-পরীক্ষা চলছে ঘোড়ার আর মাথায়।

লোকগুলো মজা দেখছে। দুই কয়েকটা ছেলে টিটকিরি মারছে, একটা লোক হাততালি দিচ্ছে, বলছে, বাটা! এইবার মরবে।

সামনে এতগুলো লোক দেখেই ঘোড়াটা এদিকে আসতে চাইছে না। গণেশ বললে, আপনারা সরে দাঁড়ান।

কিন্তু কে কার কথা শোনে!

—তাহ'লে আর আমার দোষ দেবেন না। বলেই সে প্রাণপণে ঘোড়ার মুখটাকে দিলে সেই অবাধ্য লোকগুলোর দিকে ফিরিয়ে।

ঘোড়া ছুটলো সেইদিকেই। মরি বাঁচি করে' লোকগুলো যে যেদিকে পারলে ছুটে চলে গেল। যে-লোকটা হাততালি দিচ্ছিল, দুই পাড়িয়ে গণেশকে সে গালাগালি দিতে লাগলো।

রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালো ঘোড়াটা।

মালিক দুই পাড়িয়ে তখন চীৎকার করে' বলছেন, ছেড়ে বাও তুমি। ছেড়ে বাও ঘোড়াটাকে। বাকগে আমার গাড়ি ঘোড়া। তুমি পালিয়ে এসো।

কোচম্যান তখন বীরে-বীরে উঠে পাড়িয়েছে। ঝুড়িয়ে ঝুড়িয়ে সে গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। কোচম্যানকে দেখেই কিন্ত ঘোড়াটা শান্ত হয়ে গেল।

গণেশ তখনও পাড়িয়েছিল লাগাম ধরে।

কোচম্যান বললে, লাগাম ছেড়ে বাও তাই, ও আর কিছু করবে না।

বলেই সে হাতছাড়া বাড়িয়ে একটা পা তুলে কোচম্যানের উঁতে গেল, কিন্ত পারলে না। গণেশকে বললে, আধাকে ধরে ধরে কোনোরকমে তুলে দিতে পারো তাই?

● ছই তাই

দৈলকানন্দ সুখোপাধ্যায়

দেব দেউল

৩৭৯

গণেশ তাকে তুলে দিলে তার জায়গায়। ওপরে উঠে গিয়ে সে লাগাম ধরতেই শক্তিশিষ্ট ঘোড়াটি আবার ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

গাড়ি নিয়ে মনিষের কাছে গিয়ে কোচম্যান বললে, উঠুন। উট দেখে কান্দেবটা পুণ বেকায়দার পড়ে গিয়েছিল হজুর, ওর কোনও দোষ নেই। উট ও জীবনে কখনও দেখেনি।

মনিষ বললেন, আবার চড়বো এই গাড়িতে? এখনও আমার বুকটা যে টিপ্ টিপ্ করছে।

গিন্নী বললেন, চড়। ছেলেহুটো তো হাঁটতে পারবে না।

গাড়ির দোরটা খুলে দিলেন বাবু নিজের হাতে। ছেলেরা চড়লো, গিন্নী চড়লেন, কিন্তু গাড়ির পাদানিতে পা দিয়েই বাবু থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, ছি ছি, আমরা কিবকম নিমকহামাম দেখেছ? বে-লোকটি আমাদের বাঁচালে তার কথা ভুলেই যাচ্ছি।

এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, গণেশ তখন পায়ে টেটে টেটে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সেইখান থেকেই ডাকলেন তিনি, বলি ও মশাই, শুনছেন?

গণেশ ফিরে তাকালে। বাবু হাতের ইশারায় ডাকলেন তাকে।

গণেশ কাছে আসতেই বাবু বললেন, কোথায় যাবে ভাই তুমি? কোথায় বাড়ি তোমার?

গণেশ বললে, বাড়ি হরিরামপুর। এমনি বেরিয়েছিলাম বাড়ি থেকে। যাচ্ছিলাম একবার শক্তিপুরের দিকে।

বাবু বললেন, ভালই হলো। এসো তুমি আমাদের গাড়িতে! আমরাও শক্তিপুরে যাব।

গণেশ বসতে যাচ্ছিল কোচম্যানের পাশে। বাবু কিছুতেই তাকে সেখানে বসতে দিলেন না। বললেন, তা হয় না। তুমি আমাদের জীবনরক্ষা করেছ। তুমি ভেতরে এসো।

এই বলে কস্তা-গিন্নী একটা ছেলেকে তাঁদের নিজের কাছে টেনে নিলেন।

গণেশ বললে, ও কি করছেন? আমার জন্তে আপনারা কষ্ট করবেন না। আমি একজনকে কোলে নিয়ে বসছি।

কোলে নিয়ে বসবার ধরকার হলো না। নিতান্ত ভোট ছেলে। একটি বছর দশকের, আর একটি পাঁচ বছরের। তিনজনকেই ধরে গেল পাশাপাশি।

গাড়ি ছাড়তেই বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শক্তিপুরে কার বাড়ি যাবে তুমি?

গণেশ বললে, চাটুজ্যোবাবুদের বাড়ি।

গিন্নী কি বেন বলতে যাচ্ছিলেন। কস্তা তাঁকে পাখিরে দিরে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ চাটুজ্যো?

গণেশ বললে, নামটা ঠিক জানি না আমি।

● চই তাই

শৈলজানক্য হুণোপাধ্যায়

যুক্তি একটু হাসলেন কতাবাহু। তারপর সে লম্বকে আর কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না। তবে অতখানি পথ—চূপ করেও তো থাকা যায় না! গাছপালা, চাষ-আবাদ এইরকম সব নানারকমের অবাস্তব কথা বলে শেষে তিনি আনালেন যে তাঁর এক শালা আছে, গড়গড়ি স্টেশনের কাছে তার বাড়ি। এককালে বড়লোক ছিল, আজকাল অবশ্য গরীব হয়ে গেছে। সেই তারই কাছে তিনি বাজিলেন সপরিবারে। বোড়াটা বিগড়ে গেল বলে যাওয়া হলো না।

শক্তিপুর একটা মস্তবড় গ্রাম। গণেশ কিন্তু কখনও সে গ্রামে আসেনি। ময়নাবুনি স্টেশনে কাজ যখন সে পেলো না, তখন হঠাৎ তার মনে হয়েছিল শক্তিপুরের বাবুদের কথা। বাবুরা বড়লোক। তাই ভেবেছিল একটা চাকরি-বাকরি যদি পায় সেখানে তো বড় ভাল হয়।

বোড়ার গাড়িটা শক্তিপুর গ্রামের ভেতর ঢুকে প্রকাণ্ড একটা বাড়ির সূত্রে গিয়ে দাঁড়ালো। বাড়িটা রাজবাড়ির মত। বাবু বললেন, এইটেই শক্তিপুরের বাবুদের বাড়ি।

গণেশ বললে, তাহ'লে এইখানেই আমাকে নামিয়ে দিন।

গাড়িটা ফটক পেরিয়ে গাড়িবারান্দার নীচে গিয়ে দাঁড়ালো। গাড়ির ধোর খুলে কতাবাহু-গরী ছ'জনেই নামলেন, ছেলেরাও নামলো। গণেশ একটু অবাক হয়ে গেল ব্যাপারটা দেখে। বললে, আপনারা নামলেন কেন?

বাবু বললেন, আমরাও এই বাড়িতেই বাব।

গণেশ এবার আর থাকতে পারলে না। বললে, তাহ'লে আপনি আমার একটু উপকার করুন।

এই বলে সেইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই গণেশ তার নিজের অবস্থার কথাটা তাঁকে জানিয়ে হাতজোড় করে' অহুরোধ করলে, বাবুকে আমি চিনি না জানি না, শুধু নাম শুনে এসেছি এখানে। আপনি যদি বাবুকে বলে আমার একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে' দিতে পারেন তো খুব ভাল হয়। আমি লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানি না কিন্তু।

বাবু বললেন, এসো ভূমি আমার সঙ্গে।

এই বলে তিনি তাকে বাইরের ঘরে বসিয়ে রেখে সবাই মিলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন।

খানিক পরেই একজন চাকর এলো একখালা মিষ্টি নিয়ে। খালাটা তার হাতের কাছে নামিয়ে দিবে বললে, খান।

● দুই তাই

শৈলজানক বুখোপাধ্যায়

গণেশ আর কি করবে, বাধ্য হয়ে খেতে হলো। খেতে খেতে তার ক্রমাগত মনে হতে লাগলো তার স্ত্রী কন্ডার কথা।

খানিক পরে সেই বাবুটিই নেমে এলেন দোতলা থেকে।

—তোমার নাম কি ভাই?

—আমার নাম গণেশচন্দ্র সুখোপাধ্যায়।

বাবু বললেন একটা চেরায়ে। বললেন, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

গণেশ বললে, আমি, আমার স্ত্রী আর আমার একটা মেয়ে।

বাবু বললেন, এতক্ষণ তোমাকে বলিনি, ভেবেছিলাম বলব না। কিন্তু আর না বলে পারছি না। শক্তিপুরের বাবুদের বাড়িতে তুমি এসেছিলে একটা কাজের সন্ধানে। আমিই সেই শক্তিপুরের বাবু। আমার নাম দক্ষিণা চাটুজো।

গণেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে' সসম্মানে চাটুজোমশাইএর পায়ে হাত দিয়ে একটি প্রণাম করলে। বললে, আজ আমার পরম সৌভাগ্য, আপনার সঙ্গে পরিচয় হলো।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তার চেয়েও বড় কথা, তুমি আজ আমাদের বিপদে ঝাঁপিয়ে না পড়লে কেউ আমরা বাঁচতাম না!

—না না, ও কি কথা বলছেন? গণেশ বললে, চোখের সামনে কারও বিপদ দেখলে আমি চূপ করে' থাকতে পারি না। ওটা আমার স্বভাব।

—এই তো মানুষের স্বভাব। আমরা তো জানোয়ার নই। মানুষের আর জানোয়ারে এইখানেই তফাত।

গণেশ বললে, আপনি ভাল মানুষ তাই একথা বলছেন। কিন্তু আপনি জানেন না আমার এই স্বভাবের জন্মেই আজ আমার এই দুর্দশা।

দক্ষিণাবাবু বললেন, হোক দুর্দশা। এ স্বভাব তুমি ছেড়ো না।

গণেশ বললে, আমি লেখাপড়া বিধিনি, সুখ-সুখ-মাহুস, আপনারা বলছেন বা বলেন তাই বিশ্বাস করি।

দক্ষিণাবাবু বললেন, শোনো, তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই, তোমাকে নিতে হবে। তোমার ঋণ পরিশোধ করবার নয়, তবু বতটুকু পারি আমার করা উচিত।

গণেশ চূপ করে' গুনতে লাগলো।

দক্ষিণাবাবু বললেন, তোমাদের গ্রামে আমার বিধে দশেক ভাল জমি আছে। সেই

● চুই তাই

শৈলজানক্য সুখোপাধ্যায়

জমিটুকু আমি তোমাকে দান করতে চাই। এইট পেলো তোমাদের তিনজনের সারাবছরের খাওয়ার কথা অন্তত ভাবতে হবে না।

জমি সন্ধকে গণেশের একটি আতঙ্ক আছে। আবার সেই জমি? একবার ভাবলে, এ-দান তার প্রত্যাখ্যান করা ভাল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারলে না। বললে, আপনার অমুগ্রহ।

দক্ষিণাবাহু তাঁর ম্যানেজারকে ডেকে বলে দিলেন। বললেন, কালই এই জমিটা তুমি গণেশের নামে দানপত্র রেজিস্ট্রি করে' দলিলটি হরিরামপুরে গিয়ে ওকে দিয়ে আসবে। জমির চৌহদ্দি, কার কাছে জমিটা আছে—এ সব কথা একটি কাগজে লিখে তুমি আজ ওর হাতে দিয়ে দাও।

এই বলে দক্ষিণাবাহু গণেশের হাতে একশ' টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, এইটি আমার স্ত্রী তোমাকে দিয়েছে। তুমি নাও।

একশ' টাকার নোট আর দশ বিঘে জমির চৌহদ্দির কাগজটি নিয়ে গণেশ তার বাড়ি ফিরে এলেই ডাকলে নারায়ণীকে আর তার মাকে।

নারায়ণীর মার হাতে কাগজ ছুটি দিয়ে বললে, এই নাও, দশ বিঘে জমি আর এই একশটি টাকা। এইটি রোজগার করে' নিয়ে এলাম।

নারায়ণীর মা বললে, রোজগার করে' নিয়ে এলাম বোলা না। বল আমার মা দিলেন। মাহুয়ের হাত দিয়ে তিনিই পাঠিয়ে দেন।

এই বলে গণেশের স্ত্রী কাগজ ছুটি নিয়ে গিয়ে তার লক্ষ্মীর বেন্দীর ওপর রাখলে। তারপর গলার কাপড়ের আঁচলটা ফেরত দিয়ে ঘুরিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলে। অনেকক্ষণ পরে মাথা বখন তুললে, দেখা গেল, ছ'চোখ বেয়ে তার জল গড়াচ্ছে।

সবই হলো। ছ'দিন পরে শক্তিপুর থেকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ম্যানেজার নিজে এসে দানপত্র দলিলের একটি কপি দিয়ে বলে গেলেন, দানপত্র রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। মাসখানেক পরে দলিলটা পেলোই আমি দিয়ে বাব। জমির চাবের ব্যবস্থাও করে' দিয়ে গেলেন তিনি।

কিন্তু জমির উৎপন্ন ফসল পেতে তখনও ছ'মাস বেরি। এই ছ'টা মাস গণেশকে কষ্ট করে' কাটাতে হবে।

একশ' টাকার বে-কদিন চলে চলুক বলে গণেশ শেখিন আবার বেরুজিল গ্রাম থেকে, জমিটার বাড়ির একজন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ দেখা। লোকটা বললে, এসো তুমি আমার সঙ্গে। বাবু তোমাকে ডাকছেন।

● দুই তাই

শৈলজানক্য সুখোপাধ্যায়

গণেশ যেতেই রাধেন্দ্রনারায়ণ বললেন, 'কি রে শয়তান, তুই বুঝি এখানে এলি আমার সঙ্গে শয়তানি করতে ?

গণেশ যেন আকাশ থেকে পড়লো।

—আপনার সঙ্গে শয়তানি কি করলাম ?

—করলি না ? রাধেন্দ্রনারায়ণ বললেন, জমিটা তোর চাউড়া হয়ে গেল বলে' বুজে বুজে গেলি আমার পরম শত্রু—শক্তিপুরের ওই বাটা। দক্ষিণে চাটুজোর কাছে। সেখানে পেরে বাটার ওই দশ বিঘে জমি লিখিয়ে নিয়ে এলি ?

গণেশ বললে, আমি লিখিয়ে নিয়ে আসিনি আপন বিদ্যাস করুন, উনি আমাকে দিয়েছেন।

—হ্যাঁ দিয়েছেন ! কি দেনওলা লোক ! দেবার আর লোক পেলে না, তাই তাকে দিতে গেল ? আমি কিছু বুঝি না—না ?

গণেশ বললে, কি আর বলব বলুন ! আমার আর কিছু বলবার নেই।

—বলবি আবার কি ? বলবার তোর আছে কি ? শোন ! কত টাকার কিনেছিল ?

—আমি কিনিনি। কেনবার টাকা আমার কোণার ?

—আবার মিছে কথা ? জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেবো। মনে নেই সেই মার ? এরই মধ্যে ভুলে গেলি ?

গণেশের এবার রাগ চড়ে গেল। বললে, আজ্ঞে না, ভুলিনি। চিরকাল মনে থাকবে।

রাধেন্দ্রনারায়ণ বললেন, তাহ'লে এক কাজ কর। শ' চই টাকা দিচ্ছি, ও জমিটা তুই আমাকে লিখে দে।

গণেশ বললে, আজ্ঞে না, তা আমি পারব না।

—তা পারবি কেন ? ভাল করে বলছি বে ! যা বেরো, দূর হ' আমার স্তম্ভ থেকে। দিতে হয় কিনা দেখাচ্ছি পরে।

রাধেন্দ্রনারায়ণ একরকম জোর করেই তাকে ঠেলে বের করে' দিলেন ঘর থেকে।

রাধেন্দ্রনারায়ণের কথাই ঠিক আছে। যা বলেন তা' না করে' ছাড়েন না।

গণেশ কি কষ্টে বে ছ'টা বাস পার করলে তা একমাত্র জানলেন তার অন্তর্গামী। কাষোড়া কলিরারিতে একজন ঠিকাদারের কাছে একটা কাজ পেয়েছিল। বাসখানেক পরেই সে কাজটা

গেল। আবার ছুটলো আর-এক আরগার। দশ দিন কাজ করে তো বসে থাকতে হয় পনেরো দিন। এমন করে' কাটিয়ে দিলে কয়েকটা মাস।

দক্ষিণাবাহুর দেওয়া দশ বিঘে জমিতে ধান হয়েছে চমৎকার। এত ধান গ্রামের কোনও জমিতে হয়নি। গ্রামের সব চেয়ে সেরা জমি।

মাঠের পাকা ধানে তখনও কেউ হাত দেয়নি, এমন দিনে রমণ মোড়ল কাঁদতে কাঁদতে এসে পথর দিলে, সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু, দশ বিঘে জমির ধান একটি নেই। সব কেটে নিয়ে চলে গেছে।

সে কি? গণেশ ছুটলো। গ্রাম থেকে দূরে নদীর ধারে বেশ নির্জন আরগার একবনে দশ বিঘে জমি। গিয়ে দেখে সত্যিই তাই। মাঠে একটি ধান নেই।

গণেশের বুকে বাকি রইলো না—কে এ কাজ করেছে। রমণ মোড়ল বললে, পুলিশ-খানার থবরটা দিয়ে আসি বাবু।

গণেশ বললে, না। এর কোনও প্রতিকার করতে পারবে না কেউ। না পারবে পুলিশ, না পারবে আমরা! প্রতিকার যিনি করতে পারবেন তাকে জানিয়ে দে। ভগবানকে বল!

গণেশ সোজা চলে গেল শক্তিপুর।

দক্ষিণা চাটুজোকে গিয়ে বললে, জমিতে আমাকে আপনি বুথাট দিলেন। জমির সমস্ত ধান কেটে নিয়েছেন আমাদের জমিধার রাজেনবাবু।

দক্ষিণাবাহু কিছুক্ষণ চুপ করে' বসে রইলেন। বললেন, জমিটা তোমাকে দেওয়াই আমার অজ্ঞার হয়েছিল। ওই জমির ওপর রাজেন্দ্রনারায়ণের লোভ অনেকদিনের। ভেবেছিলাম তুমি গ্রামের মানুষ তার ওপর তোমার শরীরে শক্তি আছে, তোমাকে কিছু বলবে না।

গণেশ বললে, আমাকে দুশ' টাকা দিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন জমিটা আমাকে কুই বিক্রি করে' দে।

হাসলেন দক্ষিণা চাটুজো। বললেন, মানুষের লোভ যখন প্রচণ্ড হয়, মানুষ তখন অন্ধ হয়ে যায়।

এই বলে তিনি গণেশকে বললেন, তুমি এক কাজ কর গণেশ, তোমার স্ত্রী আর কত্তাকে এইখানে নিয়ে এসো। আমি তোমাদের ছোট একখানা বাড়ি দিচ্ছি, সেইখানে এসে থাকো। তোমরা তিনটি তো গ্রাণী, তোমাকে পঞ্চাশ বাট টাকার চাকরি একটা আমি অনায়াসে দিতে পারবো।

দেয় পর্বত ডাই হলো। দক্ষিণাবাহু তাঁর পাড়ি পাঠিয়ে দিলেন হরিরামপুরে। সেই পাড়িতে চড়ে গণেশ শক্তিপুরে চলে এসো।

● দুই ডাই

বৈষ্ণবানন্দ বুঝোপাধ্যায়

দেয় দেউল

৩৮৫

দক্ষিণাবাহু বাড়ি থেকে একটু দূরে হাটতলার পাশে কর্মচারীদের অল্প ছোট ছোট কয়েকখানা বাড়ি ছিল, তারই একটা খালি করিয়ে রেখেছিলেন দক্ষিণাবাহু। সেই বাড়িতেই এসে উঠলো তারা তিনজনে।

কয়েকদিন আগে দক্ষিণাবাহুর শালা হীরালালবাহু তার স্ত্রীপুত্র নিয়ে এসেছেন। শ্রীপুরে কয়েকদিন থাকবার ইচ্ছে।

হীরালালবাহু এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ। দিবারাত্রি শুপু ছেলের গল্প। একটিমাত্র ছেলে—মানিক, বি-এ পাশ করেছে। ইচ্ছে ছিল বিলেত পাঠিয়ে তাকে ব্যারিস্টার করে আনিবেন। কিন্তু তার মা কিছুতেই ছেলেকে বিলেত যেতে দেবেন না। 'তাদের বাড়ির কাছে গড়গড় রেল-স্টেশনে মন্ত বড় বাজার। মানিক সেই বাজারে এক মাদোয়ারীর গদিতে একটা চাকরি নিয়েছে। ইংরেজীতে তাদের চিঠিপত্র লিখে দেয়, আরও কি-সব করে। মাসে 'তারা গুশ' টাকা' মাইনে দেয়। ছেলের মা তাইতেই খুশী। বলে, একটিমাত্র ছেলে, চোপের সামনে থাকবে। এই যপেই।

সেদিন সকালে বাইরের ঘরে বসে বসে দুই শালা-ভগ্নীপতি গল্প করছিলেন। দক্ষিণাবাহু বললেন, ছেলেকে বিলেত পাঠাবো বিলেত পাঠাবো বলছো, যেখানকার পরচ আনো? অত টাকা কোথায় পাবে? নিজের অত অত টাকা দিয়েছ তো শেষ করে'।

হীরালাল বললেন, টাকা তুমি বেবে।

দক্ষিণাবাহু বললেন, না, আমি অনেক টাকা দিয়েছি তোমাকে। আর বেবো না।

হীরালাল বললেন, বেবে না তো বেবে না! আর দিতেও হবে না। মানিকের মা ওকে বিলেত যেতে দেবে না। আবার কাল থেকে কি বলছে আনো?

—কি বলছে?

—বলছে, রাতে উনি এক স্বপ্ন দেখেছেন। ঠাকুর নাকি একটি কুটুন্টে সুন্দর মেয়েকে সঙ্গে করে এনে গুঁর হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন এই নে তোর বোঁ নে।

দক্ষিণাবাহু তো 'হো করে' হেসে উঠলেন। বললেন, তার মানেই এতবার গুঁর মনে সাধ ভেগেছে ছেলের বিয়ে দেবার।

হীরালালবাহু বললেন, ওরে বাবা! সেসব কথা বলবার উপায় নেই। কই তুমি একবার বোলো দেখি সে, মনের ইচ্ছাই তোমার স্বপ্নে ঠাকুর করে দেখা দিয়েছেন—তেড়ে মারতে আসবে। ঠাকুর ঠাকুর করেই গেলেন!

● দুই তাই

শৈলজানক্য সুখোপাধ্যায়

ঠিক এমনই সময় ঝোড়ার গাড়িটা ফিরে এলো। গাড়ি থেকে নামলো একা গণেশ। পানি হাত দিয়ে প্রণাম করলে চমকনকেই। বললে, আমরা এলাম।

দক্ষিণাবাবু বললেন, একবারে ওইখানে গিয়েই উঠলে? প্রথমে এখানে আসতে বলেছিল? যে! আমার বাড়িতে চ'দিন থেকে তারপর যেতে ওখানে।

গণেশ বললে, ঘর-সংসার আগে গুছিয়ে নিক, তারপর আসবে। আপনার বাড়িতে তো রইলাম।

দক্ষিণাবাবু বললেন, সংসার গুছোবার কিছু নেই। তোমরা আসবার আগে আমার দ'আর ছীরালালের স্ত্রী জ'জনে গিয়ে সব গুছিয়ে দিয়ে এসেছে।

—সে তো দেখেই এলাম। উনোনে করলা পর্যন্ত দেওয়া রয়েছে। ভাঁড়ারে জিনিসপত্র সাজানো, ঝিট, আনাড়, শিলনোড়া—কিছুটি বাকি নেই। গণেশ বললে, ও-সবের জন্তে তো ভাবনা নেই, আমার স্বার ভাবনা শুধু লক্ষ্মীর আটন কোণায় বসাবে। ভাঁড়ার ঘরের একটা দিক পরিষ্কার করে' দিয়ে তবে আসছি।

ছীরালাবাবু বললেন, ঘেরেঘেরে এ একটা রোগ। উনপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে এও একটা বায়ু।

দক্ষিণাবাবু গিন্নী নিজেই গিয়েছিলেন তাঁর ভাষকে সঙ্গে নিয়ে গণেশের সংসার দেখতে থেরে ঘেরে গিয়েছিলেন পানের বাটা হাতে নিয়ে, ফিরে এলেন সন্ধ্যায়।

ফিরে এসেই ছীরালাবাবুর স্ত্রী ডেকে পাঠালেন ছীরালাবাবুকে। তারপর চুপি চুপি অনেকক্ষণ ধরে কি সব তাঁদের কথাবার্তা হলো। প্রথমে ছীরালাবাবুও অবশ্য কথা বলছিলেন চাপা গলায়, কিন্তু শেষের দিকে তাঁর গলা যেন ধাপে ধাপে উঠতে লাগলো। মনে হলো যেন তিনি রেগে গেছেন।

বাইরে যখন বেরিয়ে এলেন, সুখখানা দেখে মনে হলো যেন সত্যিই তিনি রাগ করেছেন।

দক্ষিণাবাবু সঙ্গে তাঁর দেখা হতেই সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। ছীরালাবাবু বললেন, তোমার এখানে না এলেই যেন ভাল হতো।

—কেন, কি হয়েছে?

—হয়েছে আমার মাথা আর হুতু! সেই যে বললাম উনি স্বপ্ন দেখেছেন—ঠাকুর গুঁকে একটা রাতা টুকটুকে বোঁ দিয়ে গেছেন, তোমার ওই গণেশের ঘেরোটায় সঙ্গে নাকি গুঁর স্বপ্নে-বেধা ঘেরোটায় হবহ মিল!

দক্ষিণাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, গণেশের ঘেরে কি দেখতে ভাল?

● হুই ভাই

শৈলজানক সুখোপাধ্যায়

দেব দেউল

১৮৭

—আমি কি বেখেছি নাকি চাই! তুমিও যেখানে আমিও সেইখানে।
দক্ষিণাবাবু বললেন, তাহ'লে জাখো মেয়েটাকে। পছন্দ যদি হয় তো দাও লাগিয়ে
—ছি ছি 'ছি, তুমি কি করে' বলছো একথা? আমার ওই 'ব-এ' পাস রাক্ষসের মত
ভেলেব বিয়ে দেবো। তোমার ওই লোকটার মেয়ের সঙ্গে?
দক্ষিণাবাবু বললেন, দেখ কি? তুমি তো মেয়ের বিয়ে দিচ্ছ না, দিচ্ছ ভেলের।
—নাও। তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলা চলে না।
এই বলে গেমে গেলেন হীরালালবাবু।

কিন্তু হীরালালবাবু থামলে কি হবে, তাঁর গৃহিণী থামলেন না।
নারায়ণীকে প্রায়ই আনতে লাগলেন এ-বাড়িতে এবং বাড়ি গিয়ে যাওয়া কুড়িও বাকলেন।
এ-রকম ঘটনা মাসখের জীবনে খুব কমই ঘটে। সেট দুখ, সেট চোখ, সেট চেহারা—৬৭৬
সেই স্বপ্নে দেখা মেয়েটি! ঠাকুর যেন নারায়ণীকেই তাঁর হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। এ তাঁর
স্বপ্নের আদেশ।

হীরালালবাবু বললেন, না না এ তোমার ঠাকুরের আদেশ নয়, তোমার মনের ভুল।
এ অপবাদ অসহ্য।
হীরালালবাবুর স্বী বিনোদিনী তখন প্রতিজ্ঞা করে' বসলেন, ভেলের বিয়ে না দিয়ে তিনি
কিন্তুপুর থেকে নড়বেন না।

হীরালালবাবু তার মানতে বাধ্য হলেন।
চমৎকার মেয়ে নারায়ণী। যেমন মিষ্টি চেহারা, তেমনি মিষ্টি তার স্বভাব।
শেষ পর্যন্ত হীরালালবাবু রাজী হলেন।
রাজী হলেন এক শর্তে—নারায়ণীকে নিয়ে যাবেন ভেলের বেঁ। করে' কিন্তু এট যাওয়াই তার
শেষ যাওয়া। বাপ-মার কাছে আর পাঠাবেন না।

গণেশের স্ত্রী তার লম্বার বেলী হুয়েবে আছাড় খেয়ে পড়ে কীভাবে লাগলো—এ 'কি করলি
মা? তার ওই একটিনার নয়নের মণি নারায়ণী! তাকে কি মার কোল থেকে কেটে ছিঁড়ে চিরজন্মের
মত নিয়ে না গেলে তুই শাস্তি পাইলি না?

গণেশ হাতজোড় করে' দাঁড়ালো গিয়ে দক্ষিণাবাবুর কাছে।—আপনার অজ্ঞেই আমার এই
সৌভাগ্য। কিন্তু মেয়েটাকে জীবনে আর কখনও দেখতে পাব না?

চোখ দুটো তার জলে ভরে এলো।

● ওই তাই

শৈলজানক্য সুখোপাখ্যায়

দক্ষিণাবাহু বললেন, খুব যখন দেখতে ইচ্ছে করবে তুমি নিজের গিয়ে দেখে আসবে মেয়েকে
—আমি নাহয় গেলাম! গণেশ বললে, নারায়ণীর মার পক্ষে যাওয়া তো সম্ভব হবে না!

দক্ষিণাবাহুর স্ত্রী এর মীমাংসা করে' দিলেন। বললেন, মানিক মাঝে মাঝে নারায়ণীকে
সঙ্গে নিয়ে আমার বাড়ি আসবে, তাহ'লেই হবে।

হীরাজীবাবু বিপদে পড়ে গেলেন। এবার আর না বলতে পারলেন না। বললেন, একদিনেব
বেশী পাকবে না কিন্তু।

দক্ষিণাবাহু বললেন, তাই হবে। এখন বিয়েটা হয়ে যাক। তুমি কি নেবে তাই বল হীরাজীব
হীরাজীবাবু দুকণ্ঠে পারেননি কথাটা। জিজ্ঞাসা করলেন, তার মানে?

—মানে—আমাকেই সব দিতে হবে। কারণ যে তোমার বেড়াই হবে তার যে কিছু নেই
বোধহয় তুমি জানো সেকথা।

ভাল একটি দিন দেখে বিয়ে হয়ে গেল নারায়ণীর।

দক্ষিণাবাহু সোনার গহনায় মুড়ে দিলেন নারায়ণীকে। হীরাজীবাবুর কোন ফোড়ই রাখলেন না।

—শেষে যে বলবে কিছু না নিয়েই গণেশকে তুমি কতাদায় থেকে উদ্ধার করেছ সেকথা
বলবার সুযোগ তোমাকে আমি দেবো না।

ছেলে বো নিয়ে তারা চলে গেল।

গণেশের বাড়ি একেবারে কীকা।

নারায়ণীর মা বললো পুজো নিয়ে আর গণেশ ভ্রমণ হয়ে উঠলো দক্ষিণাবাহুর কাছ নিয়ে।

কিছুদিন পরে গণেশ একদিন দক্ষিণাবাহুকে বললে, আমাদের এখানে থাকা বোধহয় উচিত
হচ্ছে না। আমরা কি হরিরামপুরে ফিরে যাব?

দক্ষিণাবাহু বললেন, তোমার ঘেরে আমাই কিন্তু আসবে আমার বাড়ি, হরিরামপুরে যাবে
না—সেকথা ভুলে যেরে না।

কাজেই গণেশের আর হরিরামপুরে যাওয়া হলো না।

যে-নারায়ণী ছিল তার সব সময়ের সঙ্গিনী, সেই নারায়ণীকে একটবার দেখবার জন্য মারের
মন অভ্যস্ত ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

একটি বছর পার হতে চললো, নারায়ণীর চিঠি আসে মাঝে মাঝে কিন্তু এখানে আসার
কথা কিছুই সে লেখে না।

● হুই তাই

শৈলজানক্য সুখোপাধ্যায়

নারায়ণীর মা তার স্বামীকে লিঙ্গাসা করে। এবার একটবার আসবার কথা লিখবো নারায়ণীকে ?

—না, লিখো না। গণেশ বলে, বেরাই শুনলে রাগ করবে।

শেষে কিছুতেই আর মানা মানে না মায়ের মন। আশ্বিন মাস। হাতে পুষো। নারায়ণীর মা চিঠিতে লিখলে, পুষোর ক'টা দিন যদি আসতে পারিস মা, তো বড় ভাল হয়।

লিখে কেটে ফেললে। আবার লিখলে।

লিখে চিঠিখানি ডাকে দিয়ে কাঁদতে বসলো।

নারায়ণীর কাছ থেকে জবাব এলো। নারায়ণী লিখেছে, পুষোর সময় এঁরা কিছুতেই আমাকে পাঠাতে চাচ্ছেন না মা, তুমি কিছু মনে কোরো না। তোমাকে একটবার দেখবার জন্যে আমারও মন বড় ছটফট করছে। যাই হোক, অনেক কষ্টে আমি আমার শাতড়ীর মত করেছি। তিনি বলেছেন, বিজয়ার পরের দিন আমি গিয়ে তোমাকে প্রণাম করে' আসব।

—ওগো শুনচো ?

গণেশ লবে তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, নারায়ণীর মা ছুটে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানি দিয়ে বললে, পড়ে ডাখো, নারায়ণী কি লিখেছে।

—কি লিখেছে ?

নারায়ণীর মা আর জবাব দিতে পারলে না। আনন্দে তার চোখে তখন জল এসে গেছে, মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না।

পুষোর বস্তু।

সারা গ্রাম আনন্দ কলরবে সুখরিত হয়ে উঠেছে। আনন্দ নেই শুধু নারায়ণীর মায় মনে। গণেশ গেছে পুষোর পুষ্পাঞ্জলি আনতে। নারায়ণীর মা লক্ষীর বেশীর সুখুখে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল নারায়ণীর কথা। ভাবতে ভাবতে বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ তার কানে এলো পরিচিত কণ্ঠস্বর : মা!

কিন্তু ঘুম তখনও বোধকরি তার ভাঙেনি। মনে হলো সুখি বস্তু বেথছে।

গায়ে হাত পড়তেই চোখ চেয়ে তাকাল। তাকিয়েই দেখে, নারায়ণী তার সুপের কাছে বসে পড়ে বলছে, মা গো, তাকিয়ে ডাখো আমি এসেছি।

মা তার ধড়মড় করে উঠে বসলো। নারায়ণী তখন তার কোলের উপর শুয়ে পড়েছে।

—সুখখানি কতদিন দেখিনি বল দেখি ? সুখে গারে হাত মুলিয়ে আদর করে' মা বললে, তবে যে লিখলি একাধার দিন আসবি ?

● দুই ভাই

শৈলজানন্দ সুখোপাধ্যায়

—না মা আমি থাকতে পারলাম না। আগেই চলে এলাম ঝগড়া করে’।

—ঝগড়া করে’ এলি কি রে? আমাই কোথায়? ও-বাড়িতে?

—না। আমি একাই চলে এসেছি রাগ করে’।

—সে কি সন্দেহে কণা! কিছু হবে না তো?

মা দেন ভয়ে কাঁপতে লাগলো।



মা পো, তাকিয়ে ডাখো আমি এসেছি। [পৃষ্ঠা ৩৮৯]

নারায়ণী ছেদ ধরে বললো, তুমি খাও তবে খাব। ওই মাসে একটু চুখক দিয়ে দাও। আমার অন্তে আর তোমাকে উপোস করতে হবে না। এই তো আমি এসেছি।

—আমায় সেই নারায়ণী!—মা তাকে আবার করে’ অড়িয়ে ধরলে।—তাই কি হয় রে পাগলী, তোমার বাবা আহুক।

—কই, কোথায় তুমি? গণেশ এলো বোম্বাইয়।

● চই ভাই

পৈলজানিক সুখোপাখ্যার

খিল্ খিল্ করে’ হেসে উঠলো নারায়ণী :
না না কিছু হবে না। তুমি ভেবো না তো!
নাও ওঠো। সকাল থেকে উপোস করে’
আছি, কিছু খাওনি, মুখখানা শুকিয়ে গেছে।
আমি তোমাকে সরবত করে’ দিই, তুমি
খাও।

মা উঠে দাঁড়ালো : তোমার মুখখানি
দেখে আমি সব ভুলে গেছি। তোকেই
বরং একমাস সরবত করে’ দিই। আমি
পরে খাব। তোমার বাবা গেছে পুজোর মূল
আনতে। আহুক।

নারায়ণী বললে, আজ উপোস কেন
করেছ মা? উপোস তো করে অষ্টমীর
দিনে। তোমার সবই বাড়াবাড়ি।

চিনির সরবত তৈরি করে’ লেবু দিয়ে
ঘর করে’ মাসটি মা তার মুখের কাছে তুলে
ধরলে, নে’ খা। বললে, উপোস তোমার অন্তেই
করেছি মা। তোমার মম্বলের অন্তে।

—ওই তো বাবা এসেছে! বাবা! আমি এসেছি।

গণেশ ঘরে ঢুকলো।—নারায়ণী! তবে যে লিখেছিলেন পুজোর পর আসবি?

নারায়ণী বললে, মা যে কাঁদছিল বাবা। আমি বুঝতে পারছিলাম যে!

পুজোর পুষ্প দিয়ে জল খেলে নারায়ণীর মা। নারায়ণী তখনও পর্গস্ত সরবস্তের রাস্তা হাতে নিয়ে বসেছিল। বললে, দাও এবার একটু চুমুক দিয়ে দাও।

পাগলী মেরে! ঘরের আঁকার রাখতে হলো মাকে।

নারায়ণী বললে, বাবা, তুমি যেন কাউকে বোলো না আমি এসেছি।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেন রে?

নারায়ণীর মা তাকে চুপি চুপি বললে, মেয়ে তোমার রাগ করে' ঝগড়া করে' একাই চলে এসেছে। শুনে তো আমি ভয়ে কাঠ!

নারায়ণী বললে, মা ভাবি ভীতু। যেদিন নিতে আসবে সেইদিনই চলে যাব। তাই লেট হবে।

আলো ঝলমল রূপ নিয়ে নারায়ণী ঘরে বেড়াতে লাগলো মায়ের পিছু-পিছু।

ঘরের কাজকর্ম মাকে কিছুই করতে দেবে না।

মা বলে, ছ'দিনের জন্তে এসেছিস মা, হাত-পা ছাড়িয়ে একটু বোস। তা না পেটে পেটে মরছিস দিনরাত।

নারায়ণী হাসে আর বলে, তুমি জ্বাখো না মা আমি কেমন কাজ করতে শিখেছি। শাকুড়ী আমার ওপর ভারি খুলী।

—শাকুড়ীই তো জোর করে' বিয়ে দিয়েছে মা, তা নইলে কি তোমার বাবার শাখি ছিল ওট বাড়িতে তোমার বিয়ে দেবার!

এখনি করে' মারে-মেরেতে কত কথা! কত হাসি, কত চুপের কাহিনী!

বঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী—চারটি দিন কৌনদিক দিয়ে যে পার হয়ে গেল কে জানে! বীর্ষ বিরহের পর মা যেন তার নারায়ণীকে নতুন করে' পেয়েছে মনে হতে লাগলো।

মেয়ে তার সুখী হয়েছে এইতেই মায়ের আনন্দ যেন আর থরে না!

কিন্তু দশমীর দিন দুপুরে পাওয়া-দাওয়ার পর বগুরবাড়ি থেকে নারায়ণীর পালকি এসে হাজির!

নারায়ণীর মা বললে, ও মা, সেরি? আজ যে বিজয়া দশমী! আজ কি যেতে আছে বাড়ি থেকে?

নারায়ণী বললে, তা বোক মা, তুমি আপত্তি কোরো না, আমি যাই। নইলে আবার,— বুঝতেই তো পারছে!—

—তাও সত্যি। কিন্তু হ্যাঁ মা, বেরানঠাকরুন জেনে শুনে আজ পাল্‌কিটা পাঠালে কি বলে?

—সে তোমরা চুটে বেরানে বুঝে নিও মা, আমাকে যেতেই হবে।

মাকে প্রণাম করলে নারায়ণী। বাবাকে প্রণাম করলে।

মা কাঁদছিল। নারায়ণী আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছে দিয়ে বললে, কৈদো না মা।

এই জ্ঞানো, আমি কাঁদছি না। এবার থেকে তুমি যখনই আমাকে দেখতে চাইবে আমি চলে আসবো।

এই বলে চট্‌ করে' নারায়ণী গিয়ে পাল্‌কিতে উঠলো।

জাহাজ চলে গেল মায়ের মন—বিজয়া দশমীর দিন মেয়ে চলে গেল বাড়ি থেকে, মনটা কেমন যেন ভারি হয়ে উঠলো। আবার গিয়ে তার লক্ষ্মীর আটনের কাছে হাতজোড় করে' বসলো। জ'চোখ বেয়ে দর দর করে' জল গড়িয়ে এলো।

কিন্তু এত জ'খের মাঝেও সারা মন তার ভরে রইলো। বিগত চারটি দিনের নিবিড়তম সাহচর্যের আনন্দময় স্মৃতিতে।

কিন্তু কে জানতো যে এমন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটে যাবে একাদশীর দিন সকালে।

দশমীর রাত্রে টেলিগ্রাম পেয়ে একাদশীর দিন ভোরে দক্ষিণাবাঘু গাড়ি পাঠিয়েছিলেন ময়নাবুনি স্টেশনে।

সেই গাড়ি এসে ঠাঁড়ালো গণেশের বাড়ির দরজায়।

গাড়ি থেকে নামলো মেয়ে আর জামাই। নারায়ণী আর মানিক।

নারায়ণীকে দেখেই গণেশ বলতে বাজিল—আবার কিরে এলি? কিন্তু নারায়ণীর মা কথাটা তাকে বলতে দিলে না। গণেশের হাতে একটা চাপ দিয়ে বললে, চুপ!

নারায়ণী ছুটে এসে মাকে প্রণাম করলে, বাবাকে প্রণাম করলে। বললে, জ্ঞানো মা, একাদশীর দিন আসবো লিখেছিলাম, ঠিক এসেছি।

গাড়ির মাথার ওপর ছিল চামড়ার একটা হুটকেস। মানিক কোচম্যানকে বললে, ওটা ও-বাড়িতে নিয়ে যাও।

এই বলে গাড়িটা ফিরিয়ে দিয়ে বাড়িতে এসে ঢুকলো। যত্নরক প্রণাম করলে, শাওড়ীকে প্রণাম করলে। বললে, নারায়ণী পিসিমার বাড়িতে যেতে চাইলে না, বললে, মাকে বাবাকে আগে প্রণাম করবো। তাই গাড়িটা প্রথমে এখানেই নিয়ে এলাম।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মা বাবা ভাল আছেন?

● দুই ভাই

বৈজ্ঞানিক সুখোপাখ্যায়

মানিক বললে, ই্যা। নারায়ণী থাক এইখানে। আমি আসছি ও-বাড়ি থেকে।

মানিক চলে গেল।

নারায়ণীকে নিয়ে তার মা তখন ঘরে গিয়ে ঢুকেছে। হু'হাত দিয়ে তার খুখখানি তুলে ঘরে একদৃষ্টে সেইদিকে তাকিয়ে আছে। চ'চোখ অলে ভরে এসেছে। খুখ দিয়ে একটি কথাও বলতে পারছে না। সমস্ত শরীর শুণু বারবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে।

নারায়ণী বললে, তুমি অমন করছো কেন মা? কথা বলছো না, কাঁপছো থর থর করে—

মা অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করলে। চোখের জল বুছে বললে, না কিছু না। আর।
বোস। কতদিন পরে দেখলাম তোকে—

আসল কথাটা গোপন করে' গেল নারায়ণীর মা। স্বামীকেও বারণ করে' দিলে কাউকে বলতে। যে-কথা কাউকে বলবার নয়, কাউকে বুঝাবার নয়, সে কথা মনের মধ্যে গাথা হয়ে রইলো এই চুই স্বামী-স্ত্রীর।

একাদশীর দিন এলো, দ্বাদশীর দিন থেকে ত্রয়োদশীর দিন চলে গেল নারায়ণী। মানিক নিয়ে গেল। প্রথমতঃ তাব চাকরির ছুটি নেই, দ্বিতীয়তঃ বাবার হুকুম নেই।

বাবার সময় নারায়ণী খুব খানিকটা কাঁদলে। কিন্তু তার মায় কান্না তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তার নারায়ণী তো আঁচল দিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে গেছে, তুমি কেঁদো না মা। যখনই তুমি আমাকে খুঁজবে তখনই আসবো। তবে আর কান্না কেন?

হরিরামপুর থেকে একদিন একটা লোক এলো। গণেশকে বললে, অমিদারবাবু আপনাকে ডেকেছেন। আপনি চলুন।

আবার সেই হরিরামপুরের অমিদার রাজেন্দ্রনারায়ণের ডাক! যেতে ইচ্ছেও করে না, ভরসাও হয় না, তবু গণেশ গেল।

এবার কিন্তু লক্ষ্য করলে এক বিশিষ্ট ব্যাপার। কাছারিবাড়িতে না বসিয়ে গণেশকে নিয়ে বাওয়া হলো ঠাকুরবাড়িতে। মার্বেল পাথর দিয়ে বাধানো ঠাকুরবাড়ির দালানে আসন বিছিয়ে গণেশকে বসিয়ে দেওয়া হলো।

কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল রূপোর থালায় নানারকমের খাবার নিয়ে এসে দাঁড়ালো অবগুষ্ঠনবতী এক মহিলা। পেছনে বাণী এনেছে রূপোর মাসে জল।

গণেশ অবাক হয়ে গেল। এই ঠাকুরবাড়ির ওই বাঘে বেঁধে তাকে একদিন কুতো মারা

● চুই ভাই

শৈলজানকী সুশোপাখ্যার

হরেছিল। আজ সেইখানে বসিয়েই তাকে সমাদর করা হচ্ছে। এও কি সেই বিচিত্ররূপিণী মা নারায়ণীর খেলা? কণাটা ভাবতেই তার সারা অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। আজকাল কি যে হয়েছে তার, যে-চোখে জল সহজে আসতো না—সেই চোখ যেন জলে ভরেই থাকে। কঙ্কারূপিণী নারায়ণীকে মনে পড়ে যায়। কারও ওপর কোনও রাগ বা বিদ্বেষের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও খুঁজে পায় না। ক্ষমামূলক একটি অপরূপ অশ্রুভূতি যেন সমস্ত অশ্রু-করণকে অভিভূত করে' রাখে।

অবগুণ্ঠনবতী মহিলা তাঁর মাথার কাপড় একটুখানি তুলে দিয়ে বললেন, আমাকে তুমি চিনবে না বাবা, আমি এ-বাড়ির গৃহিণী। আমার স্বামী তোমার ওপর অনেক অবিচার করেছেন। শুধু তোমার ওপর নয়, অনেকের ওপর করেছেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

গণেশ বললে, কেন মা?

—মা বলে যখন ডাকলে বাবা, তখন তোমাকে বলি শোনো। আমার থাকবার মধ্যে আছে মা'র একটি মেয়ে। একটি ছেলে ছিল, মরে গেছে। মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলাম গত বৎসর। এই বছর পুজোর আগে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে। বিধবা হয়ে ফিরে এসেছে আমার সেই একমাত্র মেয়ে।

এই বলে তিনি তাঁর দাসীকে হুকুম করলেন, মালতীকে ডেকে দে। এসে প্রণাম করুক।

দাসী চলে যাবার পর জমিদার গৃহিণী আবার বললেন, কি পাণে যে কি হয় বাবা কিছু বলা যায় না। এই যে মন্দির দেখছো, আমার স্বামীর এই দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। করেছিলেন দেবতার ওপর ভক্তির ভঞ্জন, অপহরণ-করা কিছু সম্পত্তি দেবোত্তর করবার জন্তে। আমি নিজে একদিন স্বপ্ন দেখলাম, এই মন্দিরের দেবতা আমাকে বলছেন, তোর স্বামীর পাণে তোর সং-কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। এখনও সময় আছে। এখনও তার প্রায়শ্চিত্ত কর। কণাটা হেসেই উড়িয়ে দিলেন আমার স্বামী। বললেন, স্বপ্ন কিছুই নয়, ও তোমার মনের কল্পনা। তার পরেই আরম্ভ হলো আমাদের সর্বনাশ। আমার মেয়ে বিধবা হয়ে ফিরে এলো। আমার স্বামী নিকি থেকে পড়ে খোঁড়া হয়ে পড়ে রইলেন। এখনও তিনি শয্যাশায়ী।

এমন সময় তাঁর সন্তবিধবা কন্ডা মালতী এসে দাঁড়ালো তার কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলে গণেশকে। নিরাতরণ্য ও ভ্রমসনা স্তম্ভরী বুঝতী।

জমিদার গৃহিণী বললেন, তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই বাবা, তোমাকে নিতে হবে। তোমার বাড়িটি আমি ভাল করে' তৈরি করে' দেবো আর পঁচিশ বিঘে জমি দান করবো। তুমি কিছুতেই না বলতে পাবে না। এই আমার অনুরোধ।

● হুই তাই

শৈলজানক্য বুঝোপাখ্যায়

দেয় দেউল

৩৯৫

দান গ্রহণ করবার ইচ্ছা গণেশের ছিল না, তবু এই জন্মহিলার সনিবন্ধ অগ্ররোধ সে প্রত্যাখ্যান করতে পারলে না। সম্মতি দিতে হলো।

হরিরামপুরে এলোই যখন, গণেশ ভাবলে, নিজের বাড়িটা একবার দেখে যাট। 'দে' দেখে, সেখানেও এক বিচিত্র ব্যাপার। বাড়িতে লোকজন বাস করছে বলে মনে হলো।

উঠান পেরিয়ে রান্নাঘরের কাছে গিয়ে দেখলে, একটি মেয়ে বসে বসে রান্না করছে। আর দু'টি ছোট ছোট ছেলে এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে।

মেয়েটিকে প্রথমে সে চিনতেই পারেনি। মুখ তুলে যখন কথা বললে তখন অবাধ হঠকে গেল। দেখলে তার সেই মেম-সাহেব বৌদিদি। কাকিতকের স্ত্রী। সে যে এতরকম দীনদারদ বেশে এখানে বসে রান্না করবে তা সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি।

বৌদিদি তার বেশি কথা বললে না। বললে, খাখো ঠাকুরপো, নিজের পৈতৃক বাড়িঘরদোর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। আমরা তাই এইখানে এলাম বাস করতে। আমাদের অর্ধেক ভাগ তো আছে।

গণেশ জিজ্ঞাসা করলে, দাদা কোথায়?

বৌদিদি বললে, দাদা তোমার আসেনি।

বড় ছেলেটা এতক্ষণ ঠার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাদের কথাবার্তা শুনছিল। প্রথমদে পরে সে কথা বললে। বললে, মা ভাবি মিছে কথা বলে।

মা তাকে চীৎকার করে' ধমক দিয়ে থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না থামাতে। ছেলেটা গণেশের কাছে এসে বললে, বাবার যে পাঁচ বছর জেল হয়েছে, আসবে কেমন করে! বাবা কলিয়ারী টাকা চুরি করেছিল।

গণেশ পাথরের মত শক্ত হয়ে সেইখানে দাঁড়িয়ে রইলো।

ন কালত প্রায়ঃ কন্দির ধোয়াঃ কুরুসত্তম।

ন মধ্যমঃ ক'তঃ কালঃ সর্বঃ কালঃ প্রকথতি।

অম্বাতারভ - দ্যুতরাষ্ট্রের প্রতি বিহ্বল



মনি ও মুক্তা

পুত্রপোকে অধীর মহারাজ দূতরাষ্ট্রকে বিদ্রব বলছেন, যে কুরুশ্রেষ্ঠ, কাল কাউকে ভালবাসে না, কাউকে ভুগা করে না। কোন ঘটনাতোটে কাল মধ্যস্থ থাকে না, সে দলদলে সমানভাবেই আকর্ষণ করে।



পূজোর হিড়িক যে শেষ পদন্ত এমন হিড় হিড়িক হয়ে পড়বে তা কে জানত ! বাড়ির ফেরারী গুন করে ফের বাড়িতে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যাওয়াতে নকুড় মামার সঙ্গে আমার ঘে জন্মের মত আড়ি হয়ে যাবে তাইকি আমি ভাবতে পেরেছিলুম !

জুলু আর আমি সেবার সন্ধ্যা থেকেই প্রতিমাভাসান দেখতে লেগেছিলুম। আহা, দুর্গাপূজোর কদিন কী ফুটিতেই না গেল ! সারা কলকাতা প্রতিমা দেখে দেখে আর প্রসাদ চেখে চেখে তারপর অবশেষে, বিজয়ার দিন, শ্যামবাজার থেকে শুরু করে প্রতিমার শোভাযাত্রা দেখতে দেখতে, গোটা কলকাতা সারা করে কেঁপে উঠল। এসে থতম্ করা গেল। রাত তখন সাড়ে এগারোটো।

জুলু বললে, 'বিজয়া তো বৈশ হোলো, এবার বিজয়োৎসবে লাগা যাক্ !'

'এই—এত রাত্তিরে ?' আমি বললাম, 'মাসীপিসীদের কেউ কি এখনো জেগে বসে আছে নাকি আমাদের জেগে ? আমাদের মিষ্টিমুখ করাতে ?'

মা দুর্গার দয়ায় মাসী পিসী মামী কাকীর আমাদের অভাব নেই, আর মা লক্ষ্মীর রূপায় কেউ তাঁরা রূপগ নন। সকলেই খেয়ে ফতুর, আর খাওয়াতে পাগল, কিন্তু এত রাত্তিরে গিয়ে দরজার কড়া নেড়ে তাঁদের ঘুম ভাঙলে রূপাণ যদি হাতের কাছে তাঁরা নাও পান, হাতা খুন্সি যা পাবেন, তাই নিয়ে তাড়া করবেন নির্বাত।

'তাহলে, কাল সেই ভোরে উঠেই প্রণাম করতে বেরুনো যাবে, কি বলো শিখামদা ?' জুলু শুধায়।

‘না, কালকে নয়। কাল সকালে তো নয়ই। অত সকালে গেলে শুধু জিলিপি খাইয়েই ছেড়ে দেবে। কিংবা মতিচূর খেয়ে ফিরতে হবে। ভরপেট সন্দেশ খেয়ে চুর হয়ে ফেরা যাবে না। অত সকালে তখন কি আর ভাল খাবার মেলে রে? আমি বলি কি, কলকাতার মাসীপিসীদের এখন আক্রমণ করে কাজ নেই। এ’কদিন কলকাতায় সন্দেশের দর হবে বেজায়। দশ টাকা সেরের তো কম না। সে সন্দেশ কেউ কাউকে প্রাণ ধরে খাওয়াতেও পারবে না—প্রাণ ভরে খেতেও পাবো না। তার চেয়ে আমি বলি কি—’

আমার ‘প্লানটা শুনে জুলু তো লাফিয়ে ওঠে—‘তুমি বলছে! আগে চুঁচড়ো, শ্রীরামপুর, বনভগলি, বাঁশবেড়ের মাসীপিসীদের সেরে সুরে আসা যাক? মশাগ্রাম, কমাগ্রাম সব ধরসাবার পর—’

‘তারপরে কলকাতায় এসে এদেরকে ঘায়েল করা যাবে। সেই কি ভালো না? তদ্দিনে দেখবে কলকাতার সন্দেশ আবার চার টাকায় নেমে গেছে—সঙ্গে সঙ্গে খাবার সাথে খাওয়াবারও চাড় দেখা দেবে। এখন এ’কদিনে দেশ পাড়াগাঁই ভাল, সেখানকার মেঠাইনগুর দাম তো আর বাড়ি না! খাচ্ছে কে?’

‘জানো ঠিক?’

‘আর যদি একটু বাড়িই তাতে কি? মা বস্তীর দয়ায় কলকাতায় আমাদের সাতাত্তর জন কাজিনের সঙ্গে ভাগ করে মারামারি করে তো পেতে হবে না? নফসলে সে ঝামেলা নেই। কেই বা যাচ্ছে সেই অজ পাড়াগাঁয় নিদ্রি খাবার জুড়ে য়েলে চেপে বাড়ি বয়ে প্রণাম করতে? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতাত্তর জনের একজনও নয়। আমরা দু’জনই যা যাবো—ফলে সবার পাতনা আনুহাই পাবো, বুকেচিস্ তো? আর, আমরা গেলে, দেখিস্ হুই, তারা যেন হাতে চাঁদ পাবে।’

‘দু’জনে মিলে একটা চাঁদ? তাহলে কিন্তু এক একজনের ভাগ্যে অর্ধচন্দ্রই জোটে দাদা!’

‘অর্ধচন্দ্র নয়রে, চন্দ্রপুলি। ইয়া খালার মতন গোল, এমনি পুরু পুরু একেকখানা। আর খেতে! আহা, তার বর্ণনা কী দেব রে ভাই, জ্বিভে পড়লেই টের পাবি। তারু মানার বাড়ির চন্দ্রপুলি স্কীরের চাঁচ—আহা, তার কি তারু রে দাদা!’

‘তারু মানার বাড়িই সব আগে যাওয়া যাক তাহলে।’ জুলুর তাড়ী দেখা যায়, ‘সেখান থেকেই আমাদের প্রণামের পালা শুরু করা যাক—কি বলো?’

‘তারু মামা? না না, তারুর থেকে নয়, শুরু করতে হবে নকুড় মানার বাড়ি থেকে। সবার আগে চ পানাগড়—নকুড় মানার আস্তানায়।’

‘পানাগড়ের কী মিষ্টি বিখ্যাত? মিহিদানা, না, ছানাবড়া? নাকি ছানার গজা?’ জুলু গজ গজ করে।

‘গজা নয়রে পাঁঠা!’

‘কী বললে?’ জুলু কৌসু করে উঠলো—‘পাঁঠা বললে আমায়?’

‘পাঁঠারে পাঁঠা! রাগছিস কেন, তোকে পাঁঠা বলিনি। চার পেয়ে পাঁঠার কথা বলছি। আমাদের দেখলেই নকুড় মামা একটা খাসি কেটে ফেলবে দেখিস। আর, নকুড় মামীর মাংস যদি একবার খাস এ জীবনে—’

‘তাই বলো।’ জুলু বলে।—‘খাবই তো!’

‘তারপর সেখান থেকে, বর্ধমান হয়ে নানুমাসীদের প্রণাম ঠুকে সেখানকার

সীতাভোগ মিহিদানা মেরে, চু চড়ো ছগলী শ্রীরামপুর সেরে— জয়নগর মজিলপুর সমস্ত বিজয় করে—মফস্বলের সব মাসী-পিসীদের মজিয়ে—’

—‘আরে এ কে রে!’

মজার কথার মাঝখানে এক হেঁচট খেতে হয়। দেশপ্রিয় পার্কের ধার ঘেঁষে আমরা যাচ্ছিলুম। এক ধারের গোটা একটা বেঞ্চি জুড়ে লম্বা হয়ে সটান—আমাদের নকুড় মামা!

‘নকুড় মামা এখানে!’

সবিস্ময়ে আমি বলি: ‘আর আমরা এদিকে যাচ্ছি নকুড় মামার বাড়ি বিজয়া করতে!’

‘এটা কি রকম হোলো?’ মুখ ভার করে বাড়ি নাড়লো জুলু: ‘এ তো মোটেই ভালো হোলো না।’

‘ভালো তো নয়ই।’ সায় দি আমি: ‘বরং এক কামেলা হোলো। এখন নকুড় মামাকে ঘুম থেকে তুলে বাড়ি নিয়ে যেতে হয়।’

‘আমাদের বাড়ি? তাহলেই হয়েছে। কোথায় আমরা নকুড়মামার বাড়িতে



বেঞ্চি জুড়ে লম্বা হয়ে সটান—

আমাদের নকুড় মামা!

বিজয়া করবো, না, নকুড় মামাই উলটে আমাদের ধরে বিজয়া করে দিক। আমাদের বাড়ি গিয়ে আমাদেরই বাড়ি ভেঙে সন্দেশ মারতে থাক।' বলে জুলু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : 'দশটাকা সেরের দামী সন্দেশ।'

'আরে আমাদের বাড়ি কি! সেই নকুড় মামার পানাগড়ে—তার নিজের বাড়িতেই ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।' আমি বাতলাই : 'মনে হচ্ছে নকুড় নামা প্রতিমা ভাসান দেশতে কলকাতায় এসেছিল। তারপর আমাদের মতন সারাদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পার্কের বেঞ্চে একটু জিরোতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

কিন্তু তুলতে গিয়ে দেখা গেল নকুড় মামা সহজে উঠবার পাত্র নন। যতই তাকে তুলতে যাই ততই যেন তাঁর নাকের ডাক বাড়ে। কিন্তু তাই বলে তো আর নকুড় মামাকে পার্কের একটা বেঞ্চে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। অতঃ, ভাগনের সেটা কর্তব্য নয়। আর, নকুড় মামাকে এখানে ফেলে রেখে তাঁর বাসিখানায় হানা দেবার কোনো মানে হয় না।

'নকুড় মামাই বারোটা বাজালো দেখছি।' হাতঘড়িতে চোখ রেখে বলি : 'বারোটা বাজতে আর বেশি দেরী নেই। হাওড়ার শেষ গাড়ি ছাড়ে রাত সাড়ে বারোটায়...সেটা ধরতে পারলে ভোরের মুখে পানাগড়ে পৌঁছুতে পারি। দাঁড়া একটা কাজ করা যাক। নকুড় মামাকে তুলে একটা ট্যাকসিতে করে নিয়ে যাই'—

'নকুড় মামা সহজে উঠবে না! ট্যাকসি হলেও নয়। মনে হচ্ছে এই বিজয়ার দিনে, নকুড় মামা আজ একটু ইয়ে—কি বলে গিয়ে সিদ্ধি টেনেছে'—জুলু নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করে।

'তাহলে নকুড় মামাকেও টেনে তুলতে হবে। সিদ্ধির মতই টেনে। ট্যাকসি-ওয়ালার সাহায্য ছাড়া কি তা আমরা পারবো?' আমার স্তচিস্থিত অভিমতঃ 'ততে পারে আমি ভীম আর তুই অজুন, দু'জনে মিলে কুরুক্ষেত্র করতে পারি, কিন্তু নকুড়ের ক্ষেত্রে আমরা কিছুই নই।'

ট্যাকসিওয়ালার, জুলু আর আমি—তিনজনে মিলে ধরাধরি করে কোনোরকমে তো মামাকে ট্যাকসিতে তুললাম! তারপর হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে সেই ঘুমন্ত মানুষের বোকা ট্যাকসি থেকে নামিয়ে কুলীদের ঘাড়ে চাপিয়ে—ঠেলাঠেলি করে টেনে তোলা হলো। ট্যাকসির ভাড়া চোকাতে আর রেলের ভাড়া গুনতেই আমার আর জুলুর পকেটে যা ছিল, তা ফাঁক হয়ে গেল বেবাক। যাকগে, পানাগড়ে গেলে

আর টাকার ভাবনা নেই। মামা-বাবীর কাছ থেকেই মিলবে। ফেরা যাবে সেই টাকায়।

গাড়ি ছেড়ে দিল। মামা তখনো বের্শ—ঘুমে কি সিদ্ধিতে কে জানে! ঘুবুই তো আমিও, থাকে বলে, বেষড়ক ঘুম! এমন ঘুম যে ভূমিকম্পও আমাকে জাগাতে পারে না। চৌকির থেকে ফেলে দিলেও ঘুমের থেকে ঠেলে তুলতে পারে না, কিন্তু সত্যি বলতে, নকুড় মামার মত নিদ্রা—সিদ্ধি বেয়েই কি না কে জানে—



এমনতরো নিদ্রা-সিদ্ধি আমিও লাভ করিনি! মামার ঘুমের বহর আর বাহার দেশে আমার হিসো হতে লাগল।

সারাপথ মামার কোন উচ্চবাচ্য নেই। গাড়ির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সনানে নাক ডাকিয়ে চলেছেন। একবার খালি ওতোরপাড়া পেরিয়ে গা কাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছিলেন—

‘বাঁধকে, বাঁধকে!’ বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন একবার।

‘এ বাঁধবার গাড়ি নয় মামা!’—জবাব দিয়েছিল জুলু। ‘কলকাতার বাস নয় তোমার।’

‘অতিশয় অবাধ্য গাড়ি।’ বলে-ছিলাম আমি।

তারপর মামা আর দ্বিতীয় কথাটি না বলে ফের ঘুমের কোলে চলে পড়েছেন। শ্রীরামপুর পেরিয়ে আবার

‘বাঁধকে, বাঁধকে!’ বলে মামা চেঁচিয়ে উঠলেন একবার।

তার একটু উচ্চবাচ্য শোনা গেল—‘এই! রোক্কে—রোক্কে!’ বলে তিনি রুখে উঠলেন হঠাৎ!—‘কোথায় এলাম আমরা? হাজরা না হারিসন রোড?’

‘হিরামপুর।’ বললে জুলু—‘পেরিয়ে এসেছি।’

‘হিরামপুর। হিঃ!’ বললেন মামা—‘হিরামপুর এলাম শেষটায়!—ছি-ছি! ঘো ঘো ঘোউৎ!’

শেষের কথাগুলো মামা নাকের মারফত জানানলেন।

- বিজয়ার পর বিবিজর
শিবরাম চক্রবর্তী



তারপর ?

তারপর পানাগড়ের এক কাক-ডাকা ভোরে নাক-ডাকা মামাকে নিয়ে সাইকেল রিক্সায় চাপলাম আমরা। জুলু ধরলো মামার একধার, আর আমি আরেকধার, দু'জন পার্শ্বরক্ষীকে দু'ধারে নিয়ে ঘুমন্ত মামা ঢুলুঢুলু হয়ে রিক্সায় উঠলেন সমানে নাক ডাকিয়ে। মামাকে কোলে কোরে বসলাম আমরা।

কিছু দূর গিয়ে জুলু উসখুস করতে লাগলো, বললো, 'বড্ড লাগছে যে।'

'লাগছে ? কোথায় লাগছে আবার ? রিক্সার পেরেকে ?'

'না, মামার। না না, জামায় নয়—মামায়।' বলে জুলু যা বিশদ করল তার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, মামারা সাধারণতঃ ভাগনেদের চেয়ে বেশী ভারী হয়ে থাকে। তাছাড়া ভাগনের কোলে কোনো মামার বসবার কথা নয়; সেখানে তারা শোভা পায় না, যদি বসতেই হয় তো ভাগনেই বরং মামার কোলে—

এই বলে সেই চলন্ত রিক্সায়, কি কোশলে কে জানে, নকুড় মামাকে কোল থেকে ধসিয়ে সে নিজেই মা মা র (এ বং ষা নি ক টা আমারও) কো লে জ মিয়ে বসলো।

নকুড় মামা আপত্তি করলেন—'এঃ এ কী হচ্ছে!

ধামাও। গাড়ি ধামাও! চেন টানো! চেন টেনে গাড়ি ধামাও! করছ কি!'

'কিছু করছিনে। শুধু তোমার কোলে একটু বসেছি।' বলল জুলু।



'কিরে চলো...কিরে চলো আপন ঘরে!' [পৃষ্ঠা ৪০২]

কিন্তু কোলে চাপ পড়তেই ঘুম তাঁর চলকে গেছিল। তিনি হৈ চৈ করে উঠলেন—‘চেন টানো! চেন টানো!’

‘চেন-ফেন কিচ্ছু যে নেই এখানে!’ আমি বললাম—‘টানবো কি?’

‘সিকি টানো!’ বললো জুলু। একটু চাপা গলাতেই।

কিন্তু নামা সেকথা শুনলেন না। আশ ঘুমের ঘোরে তেমনি চোখ বুজে চোঁচাতে লাগলেন।

‘সেই গানটা গাইবো দাদা?’ জিজ্ঞেস করল জুলু—‘মামা যদি তাতে একটু ঠাণ্ডা হয়?’ বলে আমার শুকুমের অপেক্ষা না রেখেই সে শুরু করল—‘ফিরে চলো—ফিরে চলো আপন ঘরে!’

নির্জন পথ জুলুর কালোয়াতিতে মাত হয়ে গেল। এখানে ওখানে দু’ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে সেই গানের তালে যোগ দিতে চাইলো বুঝি। একটা গাখা কোথেকে তার স্তরলহরী তুললো সেই কোরাসে! আমি শিউরে উঠলাম।

মামা কিন্তু তেমনি কাত আমার ঘাড়ে।

আর জুলু তেমনি অকাতর তার গানে—‘আকাশে পাখি কহিছে গাহি, মরণ নাহি মরণ নাহি—’

‘ধাম’ বলে মামা একটা ঝামটা দিয়ে উঠলেন। চোখ বুজেই এক ঝাবড়া বসালেন জুলুকে। জুলুর গানটা জমে উঠতে-না-উঠতেই থেমে গেল আচমকা।

‘মামার কিন্তু এটা ভারী জুলুম দাদা!’ জুলু বললো।

‘পাখি বলেছে মরণ নাহি—মরণ নাহি বলেনি তো? তাই তোকে মার খেতে হোলো, বুকেচিস?’ বলে আমি সাবুনা দিই। ‘যাক! মামার মার! গায়ে লাগে না, মনে রাখতে নেই। মামার বাড়ি গিয়ে মামীর রান্না খাসির কালিয়া কেমন মারবি সেই কথাটা ভাব একবার।’

অবশেষে আমরা মামার বাড়ির দোরগোড়ায় এসে ঝাঁড়ালাম—‘বাড়ির মধ্যে চলো মামা!’ সাখলাম আমরা।

‘বাড়ির মধ্যে। কার বাড়ি?’ চোখ না ধুলেই তিনি জানতে চাইলেন।

‘তোমার নিজের বাড়ি, নকুড় মামা!’ বলতে হোলো আমরা।

‘পানাগড়ের বাড়ি তোমার?’ জুলু আরো প্রাঞ্জল করে—‘তোমার আপন পৈতৃক বাড়ি—’

এবার নকুড় মামার চোখ বিস্ফারিত হয়—‘পানাগড়ের আমার বাড়ি—তার মানে?’

‘তার মানে—তোমার বাপের বাড়ি, আমাদের মাতুলালয়।’ জুলু কি করে মানে করতে হয় ভালোই জানে।

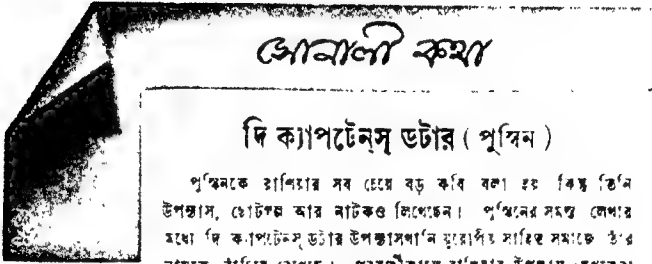
‘তার মানে—তোরা আমাকে এই এখানে টেনে এনেছিস?’ মামা রাগে যেন ফেটে পড়লেন—‘এই করেছিস তোরা!’ বলে ক্রোধে ক্ষোভে তিনি চোখ গুলে বার বার চারখার দেখলেন, দেখে উথলে উঠলেন তৎক্ষণাৎ।

‘কেন কি হয়েছে তাতে?’ ক্ষুব্ধকণ্ঠে আমি বললাম।

‘কী হয়েছে! আমার বৌ ছেলে সব পড়ে রইলো সেখানে’—নাচতে লাগলেন নকুড় মামা—‘পুঞ্জোর ছুটিতে আজ সকালেই আমরা সবাই বেড়াতে গেছি কলকাতায়। আমার বৌ ছেলে সব পড়ে রইলো সেই হোটেলে! আর তোরা কিনা—’

—‘তোরা কিনা—তোরা কিনা’—রাগে মামার আর রা বেরয় না।

নাচতে থাকেন নকুড় মামা।



দি ক্যাপটেন্স ডটার (পুস্তিন)

পুস্তিনকে রাশিয়ার সব চেয়ে বড় কবি বলা হয় কিন্তু তিনি উপজাতি, ছোটগর আর নাটকও লিখেছেন। পুস্তিনের সমস্ত লেখার মধ্যে দি ক্যাপটেন্স ডটার উপজাতিসংগঠন যুরোপীয় সাহিত্য সমাজে তাঁর নামকে বাঁচিয়ে রেখেছে। পরবর্তীকালে রাশিয়ার উপজাতি লেখকেরা পুস্তিনের ভেতর দিয়ে রাশিয়ার সাহিত্যিক মূল্যের কথাই প্রচার করেন। দি ক্যাপটেন্স ডটার হলো এই জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক উপজাতিসংগঠন পুস্তিনের। এই উপজাতিসংগঠনের ভেতর রোমানের একটা আদর্শ আছে কিন্তু এর প্রধান পুরুষ হলো অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন রুস বিদ্রোহী, পুগাচেভ। পুগাচেভকে দুর্ভাগ্য ভাগ্যবান সর্গীর হিসাবে জারের লোকেরা বানা রকমের অপব্যবহার করেন। আবার একদল সামাজিক ঠীকে জারতন্ত্রের এখন উদ্বেগবোধগো বিদ্রোহী-রূপে এঁকেছেন। পুস্তিন সেই যুগের লিখ-পড় খোঁটে এই উপজাতিসংগঠন পুগাচেভের বিদ্রোহে রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়েছেন। দুর্ভাগ্য কস্যাকদের মধ্যেও পুগাচেভের দুঃসাহসিকতা বিদ্রোহ তুলে ধরেছে। একদল দুঃস্থ কস্যাকদের নিয়ে পুগাচেভ নিজেকে রুস-সিঁহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন এবং জারের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ চাতিয়ে বড় দুর্গ দখল করেন। কিন্তু অবশেষে তাঁর বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়।



রূপ কথা নয়

—বিমলচন্দ্র ঘোষ

কত কোজাগরী রাত কেটে গেছে দীন দুঃখীর ঘরে
লক্ষ্মী আসেনি কুটিল পেচক ডেকে গেছে কুরবরে ।
ক্ষিধের জ্বালায় ময়ূর নাচেনি, কোকিল হয়েছে বোবা,
পাপিয়া নীরব, জ্বলে পুড়ে গেছে শ্যাম বনানীর শোভা ।

ঘরে ফেরে ডুখা ক্লান্ত কিশোর কবি,
কোজাগরী টাঁদ জাগাতে পারেনি মনে তার কোনো ছবি ।

শূন্য ভাঁড়ার, ঘরে হাহাকার, ঘুমায় রুগ্ন মাতা !
সঁাতসঁাতে মেঝে তোশক জোটেনি, ছিন্ন মাদুর পাতা,
কচি ভাই বোন স্মৃতিবারণ করেছে পাতা খেয়ে
তাও একবেলা ! অক্ষু গড়ায় ঘুমন্ত চোখ বেয়ে ।

রাত্রি নিরুন্ম ঢোখে নেই ঘুম কবি আজ উদাসীন
 ছুখিলী মায়ের কিশোর পুত্র অকালে পিতৃহীন।
 পিতার চিতায় উদ্ভাভিলাষ আশানে গিয়েছে পুড়ে
 তরুণ-মনের স্বপ্ন-পাখিরা দিগন্তে গেছে উড়ে।
 যত সাধ যত আহ্বাদ আজ দারিদ্র্যে অবনত
 ভাই বোন আর মায়ের হুংখ নিয়েছে ভিক্ষারত।

সারাদিন ঘুরে বিশাল শহরে জোটেনিকো কানাকড়ি
 টিক্ টিক্ টিক্ বেজে গেছে শুধু কালের সাক্ষী ঘড়ি;
 কবিতা লেখার স্বপ্নে যে তার মন ছিল মায়াময়
 আজো সে মনের মরেনি বাসনা, আজো মন হুর্জয়।
 কে জানে আবার কতদিন পরে আসিবে সুদিন তার?
 হুংখজয়ের গরিমায় কবে সুখী হবে সংসার?
 ভাঙা কুঁড়ে-ঘরে মন হহ করে ঘুম যদি ভেঙে যায়—
 রুগ্ন মায়ের ওষুধ পথ্য কোথা থেকে পাবে হয়।

নিরন্ন কবি ভাবে বসে মনে মনে—
 কোজাগরী রাতে কোথা মা লক্ষ্মী? পেঁচা ডাকে দূর বনে।

ঘর থেকে কবি রুহ্ননিশাসে চলে আসে ধীরে ধীরে
 শঙ্খশুভ্র পূর্ণিমা রাতে নির্জন নদীতীরে।
 রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর রূপালী আকাশে টান
 দেখেও দেখে না কিশোর মনের কী করুণ অবসাদ।

দেব দেউল

সমুখেই তার বিলাসী রাজার অট্টালিকার কোলে
পুষ্পকানন, নদীতরঙ্গ চঞ্চল ছায়া দোলে।

শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাটের
নির্জনতায় এসে
বিষণ্ন কবি বসে থাকে একা
জীর্ণ মলিন বেশে;
ভুলে যায় ব্যথা হুঃখ অভাব
দারিদ্র্য অপমান
ক্ষণকাল যেন জ্যোৎস্না-সায়রে
করে সে মুক্তিমান!

সোনালী স্মৃতির তরঙ্গ ওঠে
কবি-কিশোরের মনে
অমৃতপিয়াসী উচ্চাশা জাগে
নিভূতে সঙ্গোপনে।
কত যে প্রশ্ন, কত জিজ্ঞাসা,
তোলপাড় করে মন
কল্পলোকের বীণা-ঝংকারে
শোনে সে অনুরণন!

সোনার পথে স্বরের ভ্রমর গুঞ্জন গান করে
সুরভি-মন্দির স্বপ্ন-মুকুল ফুটে ওঠে থরে থরে।
দূর আকাশের টাঁদে ঝলমলে সূর্যের মরীচিকা,
লতাপল্লবে বনজ্যোৎস্নার কাঁপে রক্তিম শিখা।



নিখর রাতের সীমান্তে নীল নীলিমার ছায়াপথ
নদীতটে ঐ কে এসে নামলো, কার পুষ্পক রথ ?
রথ নয় রাঙা কৃষ্ণচূড়ার পাপড়ি চৈতী-ঝড়ে,
এলোমেলো দিকব্রান্ত মনের দিগন্তে ব্যারে পড়ে।
তবু এ রাতের সংসার রূপকথার রাজ্য নয়,
রাজকুমারী ও রাজকুমারের স্নেহের স্বপ্নময়।

বিলাসী রাজার প্রাসাদের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে ভাবে,
সোনার কাঠি ও রূপার কাঠি কি ওরাই কেবল পাবে ?
রূপকুমারীরা ওদেরি কণ্ঠে পরাবে বিজয়মালা ?
ঋটিকের সাতমহলা প্রাসাদে মাণিক্য-দীপ জ্বালা !
ওরাই কেবল ডিঙুবে পাহাড় সমুদ্র নদী বন ?
কবির শোনাবে ওদেরি কাব্যকাহিনীর গুজন ?
ইতিহাস শুধু শেখাবে ওদেরি দিশিজয়ের কথা—
জন্ম-মৃত্যু-দর্প-দণ্ড-হিংসা-বর্বরতা ?
হায় মা লক্ষ্মী, ওরা তো ঘুমায় কোজাগরী জ্যোৎস্নাতে,
ঐশ্বর্যের ঝাঁপি কেন তবে ওদেরি কলুষ হাতে ?
স্বপ্নবিভোর কিশোর কবির মন—
ছল ছল করে ব্যথার অশ্রু-কুয়াশায় হ'নয়ন।

‘চোর !’ ‘চোর !’ বলে হঠাৎ কে যেন শুরু জ্যোৎস্না রাতে
অদূরে টাঁটায়, কিশোর তাকায় বিভল দৃষ্টিপাতে !

দেয় দেউল

গুপ্তিত হয়ে শোনে কলরব স্বপ্ন দেখেছে রাজা,
 চোর এসে সিঁদ কেটেছে প্রাসাদে। 'ধরে আনো! দাও সাজা!'
 স্বপ্নবিলাসী রাজার প্রাসাদে দীপমালা জ্বলে ওঠে,
 'চোর!' 'চোর!' বলে রক্ষীর দল হাতিয়ার নিয়ে ছোটে।



স্বপ্নের চোর? সে কেমন চোর? দারুণ কোতূহল
 কিশোর কবির মনে জাগে, শোনে চারিদিকে কোলাহল।
 রাজঘাটে একা কিশোরকে দেখে রক্ষীরা ছুটে আসে
 চোর ভেবে তাকে লাঞ্ছনা করে ভাগ্যের পরিহাসে!
 কেউ ঘাড় ধরে, কেউ ধরে হাত, কেউ এসে টানে কান,
 নিরীহ গরীব বেচারাকে করে অকথ্য অপমান।
 কোনো প্রতিবাদ শোনেনাকো দেয় নিদারুণ পদাঘাত
 নিরন্ন ক্ষীণ কণ্ঠের কেউ শোনে না আত্ননাদ!
 ধরে নিয়ে আসে রাজার সমীপে স্বপ্নালু চোখে রাজা
 বলেন, "বেটাকে কারাগারে দাও! সিঁদেল চোরের সাজা
 এক শো চাবুক! পাঁচটি বছর ঘোরাক তেলের ঘানি।"
 রাজস্বপ্নের মাহাত্ম্য দেখে হেসে কুটি কুটি রানী!!

কিশোরকে বেঁধে নিয়ে যায় কারাগারে
 কোজাগরী টাঁদ মূর্ছিত হয়ে
 লুটায় নদীর ধারে।
 নিরীহ বালক বিনাদোষে পায় সাজা
 স্বপ্ন সত্য হোক বা না-হোক,
 ন্যায়-বিচারক রাজা।*

সবুদ্র থেকে হুঁষা
ম'মা বেশ িটেউয়ের
মাথায় ঢলতে ঢলতে
হাসতে হাসতে উঠে
থাকেন কিম্ব পাহাড়
পার হতে লাফ দিতে
হয় হুঁষা মামাকে।

এ তো পাহাড়
তু পাহাড় নয়,
পাহাড়ের স ব্রা ট
চিমালয়। পাহাড়-



হীরাবুনি

—জুজুমার দে সরকার

পর্বতের শ্রেণী ডিঙিয়ে, বরফান পাহাড়ের চোখ সোনালী কপোলী রঙে রঙে ম'মিয়ে দিয়ে মন্ত
লাফ মেয়ে হুঁষা মামা আকাশে ওঠে। পাহাড়ের কোলে কোলে, রোদ মেখে, খোলা আকাশের
কমঝুমে বর্ষার জলে গড়ে উঠেছে বন। কত গাছ, কত গুল্ম, কত লতা। ফার গাছের
বন, পিরামিডের মত সবু হতে হতে উঁড়টুকু তুলে দিয়েছে আকাশে। দেওদারের দল ধাপে
ধাপে সোজা লম্বা আর একটু বাড়িয়ে দিয়েছে গলা। রডোডেন্ড্রনের কোপ মাঝে মাঝে।

বনে ফুল ফোটে। সে কি ফুল! কোথাও বেন সারা বনে রঙের দাবানল। আবার
কোথাও বন সাধারণ সাধারণ শুভ্র শুভ্র।

সুনীল স্বচ্ছ আকাশে, এধিকের পাহাড়ে বজ্র পুপিবার গুপ্ত দিয়ে উড়ে যায় যাবাবর
হাঁসের দল। নাথুল! গিরিসংকটের মাথায় পাহাড়ী বুনো গাধা কিয়াঃ এর দল একবার সৈনিক
চেয়ে দেখে বৈকি। তাকলা মাকান উপত্যকায় মেহনতী যাবাবর মাঠঘেরাও একবার আকাশ দিগন্তের
পানে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। অদৃশ্য ইয়েতিরাও কি চেয়ে দেখে না?

একটা ভীমভাবানী পাহাড়ের কোলের বনে বুনো বাঘাম গাছের নীচে, গর্ত গুঁড়ে লতা-
শুভ্র চাপা দিয়ে হীরাবুনি আর তার বোকা বোয়েরা বাসা বেঁধেছিল। হীরাবুনিরা একটা ছোট্ট বন-
মোরগের দল। এই বনমোরগেরা অনেকক্ষণ টানা না চললেও গানিকটা উড়তে পারে।
বনমোরগদের বৌগুলোর বেশ গোলগাল, পেটমোটা, মেটে মেটে, বোকা বোকা চেতারা কিম্ব
হীরাবুনির বেলা ভগবান বেন বেশ রয়ে রয়ে, রঙ মিলিয়ে মিশিয়ে ছবি এঁকে, এক কুঁয়ে তাতে
প্রাণ তরে দিয়েছিলেন। মাথায় তার রক্তপলাশের কাঁচা রঙ মাথা উজ্জীর মতো। ঝাঁক ঝুটি,
মাথার থেকে গলা অবধি কচি পাতার নরম সবুজ, তারপর গলার কাছে পড়ন্ত-স্বর্ণরঙের একটা।

লাল বেড়। বৃক্কের কাছটা শিউলি ফুলের কমলা রঙ আর সারা দেহ পত্রযোচী বনের হাঙ্ক থেকে গাঢ় সবুজ হতে হতে করাপাতার হলদে পাণ্ডটে হয়ে কালোর একটা তুলির টানে গিয়ে মিশেছে। মোটামুটি, ফুলন্ত বনে গাছের পাতার চেউয়ের ভেতর এক হয়ে মিশে যাওয়ার অন্তে এই নানা রঙই হীরাকুনির আশ্বর্যকার অঙ্গ।

গত দিনটা এই ছোট্ট বনমোরগের দলটার ওপর দিয়ে একটা প্রচণ্ড বিপর্যয় চলে গেছে। শত্রুর তো তাদের অভাব নেই! পাহাড়ী বনবেরাল, স্বর্ণ ঈগল, ভাম শেয়াল, আরও কত কে। বুনা ছাগল ধরতে না পেয়ে হিমালয়ী চিতাবাঘগুলোরও সময়ে সময়ে বনমোরগদের দেখে ভিড়টা লকলকিয়ে ওঠে। বাঘের পেছু নেওয়া কেউয়ের তো কথাই নেই।

এই গতকাল পর্যন্ত হীরাকুনির দলে, সে ছাড়া তার আরও পাঁচটা নাচস-মুচস পেট-মোটা বোকা বো নেচে নেচে ঠুকরে পোকা শিকার করেছে, বুনা শত্রুও খেয়েছে তারা। শত্রু না থাকলে, উঁয়োটো গুবরেমা ডেঁয়ে পিপড়েরা, রঙ-কলসান প্রজাপতিরা, বহুধরপী ফড়িঙেরা আসবে কেন বল? অবশ্য মানুষের গড়া শত্রু? আঃ সে শুনলেই বনমোরগদের ভিত্তে জল আসে। ভুট্টার ধান, ধানের কড়াই, গমের শীষ? আগ! বোলো না বোলো না!

খেতে বসলে, ল্যাঙ্কের ডগা, মাথার টিকি এমন কি সারা দেহ অর্থাৎ নিজেকেই সামলান শক্ত। বিশেষতঃ ভুঁড়িয়ার খাওয়া-পাওয়া লোকদের। আর হীরাকুনির বোকা বো পাঁচটা তো ছিল ভুঁড়িয়ার খাওয়া-পাওয়ার পাওয়া। কাজেই একটা নিল ছালে। একটা লগো গেল স্বর্ণ ঈগলের খাবার চড়ে। আর চুটো গেল পাতালে, রাতের আধারে, নীলকান্ত চোখ-জলা বনবেরালের মুখে করে।

সেই রাতের আধারে বাগাম গাছটার মাথায় এসেছিল উজ্জুক বাগড়শেয়ালেরা। তাদের কাছে শুনল হীরাকুনি—এবারে মানুষদেরও আপেল গাছে কি ফলন! তেমনি কমলালেবু। যেন উজ্জুকদের অন্তেই মানুষেরা ফলিয়েছে ফল।

হীরাকুনি ভাবল—আরে ছোঃ! আপেল আর কমলালেবু। কেউ খায় নাকি?

উজ্জুক শেয়ালদের স্থখ সব্বেও চুঃখুর দেখ ছিল না, মানুষগুলো কিনা আপেল কমলালেবু পেরারা আমলকী হরতুকী আতা না বসিয়ে বৈশীষ ভাগ করেছে ভুট্টা ধান আর গম?

আরে ছোঃ! বোকা! বোকা! বোকা! সব তো খাবে পোকা! উজ্জুক ছুঁয়েও বেখবে না ওসব।

হীরাকুনি বলে উঠেছিল চটেমটে—চালাক! চালাক! চালাক! আঃ, মানুষেরা কি চালাক! বনমোরগদের অন্তে তারা কী না বানায়! হ্যাঁ একটু একটু ভুল করে বটে। আপেলটা, কমলালেবুটা না করে শুধু তার বিচিটুকু করলেই তো পারতো!

● হীরাকুনি

জুজুমার দে সরকার

উজ্জ্বল আর বনমোরগদের ভেতর একটা প্রকাণ্ড গেরুয়া আর লালঝাড়ার লড়াই লেগে যেতে পারতো যদি উজ্জ্বল বনমোরগদের খাস ইংরেজী ভাষা বুঝতে পারত আর বনমোরগেরা উজ্জ্বলের খাটি জলমেশানো হিন্দী ভাষা বুঝতে পারতো।

কাজেই মনে মনে মনের কথা বলে নিয়ে চুপ করে যাওয়ার থেকে ভাল আর 'কি? কি? কি? কি?' গরবগুলো তো কানে আসে আর জমা থাকে মনে মনে।

* * *

ভোরের হাবিয়ার সাতটা; ছটা পাহাড়ের রূপালী মাথায় লেগেছে কি না লেগেছে, ঘাসের ডগা থেকে শিশিরের নোলক কবুড়ে কি না কবুড়ে, হীরাকুনির নীলমণি বোকা বোটা গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে স্বর্ণ-বন্দনার আনন্দ ডাক ডেকে উঠল।

হীরাকুনিও উঠে প্রথমে ডানাটা কাপটে আড়ামোড় নেড়ে মিল, তারপর গল' ডেড়ে তাব বোকা বোটার সঙ্গে স্বর্ণ-বন্দনার গল' মিলিয়ে দিল।

—নমস্কার, নমস্কার সৃষ্টিাকুর! আজকের দিন তুমি ভুল ফলে, পাহাড়ে, গাছে পাতায় আলো দিও। যেন অনেক অনেক পোকা জন্মায় আর বনমোরগেরা খেয়ে পড়ে।

হঠাৎ হীরাকুনির কানে এল যেন বাতাসে প্রায় নিশেদ একটা চড়ক'র শব্দ। কৈ বাতাস তো ওঠেনি। বোকা বোটা তার তখন মহা আনন্দে একটা পোকা চুকরে দরছে। হীরাকুনি চেঁচিয়ে উঠল—মিশে যা! মিশে যা!

এই বেচারী বনমোরগদের আয়ুবকার একটা অল্প হোল গাছপালি, পাতা লতা, মাটি বালির সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া।

এই তো গতদিন হীরাকুনির চার-চারটে বোকা বেঁ মারা পড়েছে বোকা'মি করে। হীরাকুনি বিপদে প্রথম আভাসেই তাদের সাবধান করে দিয়েছিল, কিন্তু সেই যে কপায় বলে না—বোকারা এগিয়ে যায় সেই পথে যেখানে ঘরোয়ার পেরাধাও যেতে ভয় পায়।

হীরাকুনির এই বোকা বোটা কিন্তু আর সে ভুল করল না। একেবারে বালি পাথরে মেশানো মাটির সঙ্গে গায়ের রঙ মিশিয়ে দিল সে। আর হীরাকুনি? সে তো বহরুপী। কোপে-কাড়ে গাচের পাতায় লতাগুয়ে নিজে'কে নিশেদে মিশিয়ে যেবার রঙ ভগবান তাকে দিয়েছিলেন।

একটা স্বর্ণ ঈগল হেঁ মেরেছিল কিন্তু তাকে ভুল হয়ে গেল। কোপায় গেল বনমোরগ ছটো? হস্ করে বেরিয়ে গেল ঈগলটা। রাগে তার গা ককরক করছে। এখন খায় কি বাচ্চা-কাচ্চা?

● হীরাকুনি

শুকুমার দে সরকার

হীরাকুনি ঝোপের ভেতর গা-তাকা অবস্থায়ই জিগেস করল—বাবি নাকি? মানুষদের গায়ে?
বেথানে আছে অনেক ধানের শীষ, আর ভুট্টার দানা?

—আমি শ্রাল নেই? বোকা বোটা জিগেস করল।

—দূর! শ্রালে কি ধান খায়?

—তবে কি শ্রালে শুধু বনমোরগই খায় নাকি?

হীরাকুনি হঠাৎ চাপা গলায় বলল—উড়ে চলে আর আমার সঙ্গে। চট করে।

গতদিনের অভিজ্ঞতায় বোকা বোটা বুঝেছিল হীরাকুনির কথা মেনে চলাই ভাল। মুহূর্তের মধ্যে হীরাকুনি আর তার বোকা বোটা উড়ে এসে একটা গাছের ডালে পাতার মধ্যে গা মিশিয়ে দিল।

একটা শেরাল বেশ তাকে তাকে বোকা বোটাকে ধরবার তাগিদে ছিল। শিকার ফসকে যাওয়ার শেরালটা এমন খুশি করে চলে গেল যেন এদিকে সে নিছক তপস্যা করতে এসেছিল।

হীরাকুনি শুধু আকাশে খুশি ভুলে একবার ডেকে উঠেছিল—হরো! চরো!

কিন্তু তার ডাক জমে গেল। আকাশে খুশি ভুলতেই আড়চোখে তার নখরে পড়েছিল ওপরের ডালে শুড়ি মেরে একটা বনবেরাল।

একবার ডেকে উঠে বোকা বোটাকে সাবধান করে দেবার সময়টুকুও পেল না হীরাকুনি। এই লিনক্স (lynx) জাতের পাছাড়া বনবেরালগুলো খুব ভাল পাহাচে চড়তে পারে। আর মাটিতে তো তাদের বিদ্রোহগতি। পা'গুলো তাদের পেশীময় লম্বা লম্বা। সাধারণ বেরালের থেকে এরা আকারেও একটু বড়। চোখ কপালে টানা টানা একটু বাকালো। আর মাথার ওপরের পাশ দিয়ে কালো প্যাড দেওয়া ছোট ছোট ছোটো কান যেন ছোট ছোটো শিঙ। গায়ে ধোঁয়াটে রঙের মিহি শাখা লোম। দেখতেও যেমন স্বভাবের তেমনি হিংস্র, ঠিক যেন শয়তানের বাচ্চ।

হীরাকুনি আর মুহূর্ত দেবী না করে খাঁপিয়ে পড়ল নীচে। বনবেরালটাও তাকে লক্ষ করে মেরেছে লাক। বোকা বোটা তাই বেঁচে গেল।

এদিকে হীরাকুনি মাটিতে নেমেই মারল ছুট। কিন্তু হ'পায়ের ছুট আর চারপায়ের তীরের মত গতির তফাত আছে বৈকি। কিন্তু হীরাকুনির উদ্দেশ্য ছিল বনবেরালটাকে টেনে নিয়ে ক্রমাগত দ্রুত করে দেওয়া।

কীস্ কীস্ করে হেসে উঠল বনবেরালটা তার পেছনে। শিকার যেন তার হুঁচোর ভেতর। শিকারী জানোয়ারেরা শিকারের ঝড়ে লাকিরে পড়বার আগে একচোট গর্জন-হাসি হেসে শিকারকে ডর পাইয়ে দেয়। কিন্তু ঠিক বনবেরালটার হুঁচোর ভেতর থেকে উড়ে গেল হীরাকুনি সামনের গাছটার একটা ডালে। চূপ করে বসে বস নিতে লাগল সে।

● হীরাকুনি

অকুসার বে সরকার

এই বনবেরালটা ছাড়বার পাত্র নয়। ঘোড়ের গতি একটুও না থামিয়ে ত্বরত্ব করে গাড়ে চড়তে লাগল সে। হীরাকুনি নিথর। আর বনবেরালটা যখন ক্ষিপ্ৰপায়ে ডালের পর ডাল পার হয়ে প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে আবার ঝুপ করে নীচে নেমে এল হীরাকুনি।

এখানে মনে হতে পারে যে হীরাকুনি একেবারে উড়ে পালিয়ে গেল না কেন? পালাবারই তো চেষ্টা করছিল হীরাকুনি। একবার মাটিতে একবার গাছের ডালে। এই বনমোরগদের যেন ভগবান অনেকক্ষণ একটানা ওড়ার ক্ষমতা। দেননি, আর বনবেরালদের দিয়েছেন শিকার ধরার জেদ। কোনও প্রাণী পালায় সোজা বা বাঁকা বা এঁকে বেকে ছুটে আবার কোন প্রাণী পালায় ওপর নীচু ছুটে।

হীরাকুনিকে ওপর নীচু ছুট ধরতে হয়েছিল। এমনি করেই চলতে লাগল তাড়া আর তাড়া খাওয়া। হীরাকুনি একবার নীচে নেমে আসে আবার উড়ে গিয়ে একটা ডালে বসে। বনবেরালটাও নাছোড়বান্দা। হীরাকুনিও ভাবছে কতক্ষণে শরতান বনবেরালটা হাঁকিয়ে গিয়ে হাল ছেড়ে বেবে আর বনবেরালটা ভাবছে বাড়াধন আর কতক্ষণ পারবে।

হীরাকুনির ডানা ভারী হয়ে এসেছে। তাইতো শরতান বেরালটা তো তাকেই কাবু করে আনিছে। একটা বৃদ্ধি এল তার মাথার। সেবার সে উড়ে গিয়ে একেবারে গাছের বগডালে বসল যেখানের ডাল বনবেরালটার ভার সহিতে পারবে না। কিন্তু শরতান বেরালটাও বৃদ্ধিতে কম যায় না। সেও যতদূর উঠতে পারে উঠে এসে বেশ হাত পা টান করে হীরাকুনির দিকে চোখ রেখে গাছের ডালে বসে রইল। দেখা যাক কে কতক্ষণ না খেয়ে থাকতে পারে!



ত্বরত্ব করে গাড়ে চড়তে লাগল বনবেরালটা।

৩ হীরাকুনি

শুকুমার যে শরকার

কথায় আছে পাখির আহার। পাখিদের অনবরত পেয়ে বেতে হয়, না হলে শরীরের গরম বজায় থাকে না। বনবেরালদের এমন কি একদিন উপোস দিলেও কিছু আসে যায় না। কাজেই হীরাকুনির মতলব খাটল না। সেও জানতো শয়তান বনবেরালটা ওখানে বসেই থাকবে। তার মুখের খাবার সামনেই যদিও নাগালের বাইরে। কিন্তু হীরাকুনির নিজের তো বেশীকণ না পেয়ে থাকা চলবে না।

হঠাৎ চম্ করে নীচে নেমে এল হীরাকুনি। আর সঙ্গে সঙ্গে বিড়াতের মত ডালের পর ডাল লাফাতে লাফাতে নেমে এল বনবেরাল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্যাস্ ক্যাস্ হাসি। কেমন আত্মদন ফাঁকি দেবে ?

হীরাকুনি এবারে বনবেরালের তাড়ায় মাটিতে ছুটে নিল থানিকটা, ঝুপ্ ঝুপ্ করে উড়ে আবার মাটিতেই পড়ল আর ক্যা ক্যা করে ডাকতে লাগল। ভীষণ ভয় পেয়েছে যেন। বনবেরালটা খুণীয় উত্তেজনা আর রাগতে পারছে না! হঠাৎ আবার হস করে উড়ে গিয়ে হীরাকুনি এবারে গাভের একটা নীচু ডালে বসল।

আা পালাবে? বনবেরাল মুহূর্তে লাফিয়ে গাছে উঠতে লাগল। হীরাকুনি নড়ে না, যেন আর সে উড়তে পারছে না। প্রায় যখন ধর ধর হীরাকুনি উড়ে ঠিক তার ওপরের ডালটায় বসল। বনবেরালটা মহা উত্তেজিত। প্রায় তো ধরেই ফেলেছে। আর তেমন উড়তেও পারছে না।

রসোগোলা পাখিটা! আর প্রতিবারই প্রায় খাবার মধ্যে থেকে হীরাকুনি ঠিক ওপরের ডালটায় গিয়ে বসে। বনবেরালটা উত্তেজনার জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। ক্রমশঃ উঁচু আরও উঁচু। নীচের মোটা ডাল থেকে একটু সরু ডাল। আক্স একটু সরু, আরও, আরও। একদম সরু ডাল—আকাশ ছোঁয়া যায় যেন। বনবেরালটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

হঠাৎ মট্ মট্ করে বনবেরালটার পায়ের নীচের শেষ ডালটা ভেঙে গেল। আর পড়তে লাগল বনবেরালটা। একটা সরু ডাল আঙুল দিয়ে তাকে মারল এক খোঁচা। আর একটা একটু মোটা ডাল তাকে সজোরে মারল এক চাবুক। যতই নীচে পড়তে লাগল গতি বাড়তে লাগল তার আর ক্রমশঃ পেটমোটা ডালগুলো জোরে আরও জোরে ঠকাঠক তার হাথা চুঁকে মিতে লাগল। এমন কি শেষে মাটিও তার সারা দেহ ছুঁড়ে দিল এক বিরালী সিকা ওজনের খাবড়া। সেই মাটিতেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুিয়ে পড়ল বনবেরাল।

● হীরাকুনি

সুস্থবার দে সরকার

গাছের মগডালে বসে পৃথিবীটা কত ছোট। হীরাকুনি সেখান থেকে ডেকে উঠল—
—হুয়ো! হুয়ো! সেই তার বিষয় ডাক।

তারপর—ওমা বোকা বো? হীরাকুনি গলা ছেঁড়ে ডাক দিল বোকা বোটারকে। কিন্তু কোথায় বোকা বো? না হলে আব বোকা কেন?

ওই দূরে ধোঁরাকাঁপা নীল আকাশ ছাড়িয়ে রূপোলী ববদান পাতাড়ের নীচে, কত নীচে—
সাপ-চিকচিকে বরফগলা বরনা জড়ান সবুজ, সবুজ কালচে উপত্যকায় মাদুদের গা নী? যেখানে আছে আপেল কমলার বিচি, ভুটার দানা আর দান যবেব নোহানে শিশি, পোকা, কত পোকা! আহা নাড়সমুচস ট্যাশাটোপা বোকা বোটা পোকা খেতে কি ভাজই বাসতে! হাকগো পেটের খিদে চনচনিয়ে উঠেছে।

হীরাকুনি নেমে এল, আর ক্রান্ত পাখায় উড়ে, কখনও ছুটে, মাদুদের গায়ে সবুজ গালচে পাতা উপত্যকার দিকে নামতে লাগল।

সত্যঃ বদ। ধর্মঃ চর। স্বাধারমাঃ প্রমদঃ। সত্যঃ
প্রমদিত্বাম্। মাতৃদেবো ভব। পিতৃদেবো ভব। আচার্য-
দেবো ভব।

তৈত্তিরীয়েপনিষৎ

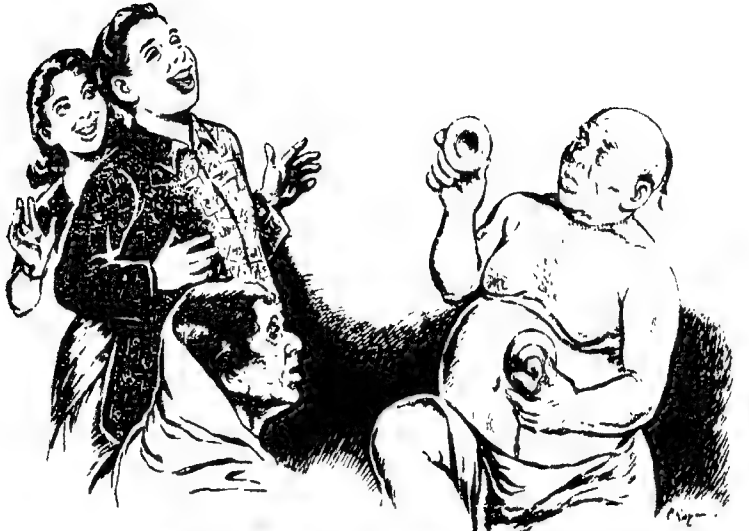
মণি ও মুক্তা



অশ্বারন শেখ করার পর ছাত্র যখন গুরু
আশ্রম থেকে সংসারে ফিরে যেতেন, তখন গুরু
আশীর্বাদ করতেন,—

সত্য কথা বলবে, ধর্ম আচরণ করবে।
অশ্বারনে যেন কোন ফ্রটি না ঘটে। সত্য অশ্ব-
সরণে যেন কোন ফ্রটি না ঘটে। মাতাকে দেবতার
মতন জানবে। পিতাকে দেবতার মতন জানবে।
আচার্যকে দেবতার মতন জানবে।





যুগের চাকা

—ঐশ্বরীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

“শান্তিপুর ডুবু-ডুবু ন’দে ভেসে যায়,
তোরা আয় রে ছুটে আয়—”

রাত্তা থেকে গানের আওয়াজ আসতেই হুজাতা ডানহাতের তর্জনী উঁচিয়ে বললে—“ঐ বে, এসেছে!”

“কে এসেছে?”—অবাক হয়ে জানতে চাইল অজিত। সে সবে আজ ভোরেই কলকাতা থেকে বাড়ি পৌঁছেছে; এখানকার কোন-কিছুই তার জানবার কথা নয়।

ঠাকুমা ততক্ষণে সদর খুলে দিয়েছেন—“এস গো বাবাজী এস, একটু নাম শুনিয়ে যাও।”

নাম ? কার নাম ? হরিনাম নাকি ? এখনো এই সব জিনিস এ-বাড়িতে চলছে নাকি ? বাবা একটা জেলার হাকিম, দাদা মার্কিন মুলুকে পাড়ি দিয়েছে অ্যাটম বোমার গবেষণার জগে, তবু দেশের বাড়িতে বসে ঠাকুমা এখনো খোশমেজাজে হরিনামের মালা ঘুরিয়ে সংসারে থেকে মুক্তির পথটা খুলে রেখেছেন !—কলকাতায় বসে কারো মুখে একথা শুনলে অজিত তাকে মুখের উপর বলে দিত যে—সে মিথ্যুক।

খন খন্ ক’রে নীচের রোয়াকে গল্পনি বেজে উঠেছে তখন। জানালা দিয়ে সেইদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে সজ্জাতা যখন দাদার পানে ফিরে চাইল, তখন তার ভুরু কঁচকে উঠেছে। সেই সঙ্গে বুঝি একটা চাপা স্বর ফুটি ফুটি করছে—“দেখে যাও, কী সুখে এখানে আমি আছি—” সজ্জাতার কথার সুরে যেন সীতার বনবাসের ব্যথা আর অভিমান বোল-আনা ফুটে উঠল।

কথাটা এই, ঠাকুমা একা থাকতে পারেন না বলে নাতনীদেবর এক একজনকে পালা ক’রে এসে তার কাছে থাকতে হয়—এই অজ্ঞ-পাড়ারগা বোম্ভিমপুরের বাড়িতে। বছরে একবারের বেশী কাউকে আসতে হয় না, থাকতেও হয় না মাসখানেকের বেশী। কারণ, শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে ঠাকুমার ছয়টি ছেলে, আর মেয়ের সংখ্যা তাদের কারও তিন, কারও চার। অবশ্য নেহাত বাচ্চাগুলো আসে না, আট-দশ-বারো-চোদ্দ বছরের নাতনীগুলোকে নিয়েই টানাটানি পড়ে।

এ নিয়ে অশান্তি কম ঘটে না। বোমার মেয়েদের পাঠান বটে, কিন্তু খুশী হয়ে পাঠান না। তাদের পক্ষ নিয়ে ছেলেরা অনেকবারই ওকালতি করেছেন বুড়ীর দরবারে “তুমি কেন আর ঐ পড়ো বাড়ি আগলে রয়েছ মা ? কলকাতায় এসে থাক, না হয়—কাশী বাস কর। কিংবা প্রয়াগে থেকে নিত্য ত্রিবেণী দেখ। এক এক জায়গায় তোমার এক এক ছেলের বাড়ি। যেখানে খুশী থাক, তিন বেলা গঙ্গাচ্চান কর, মন্দিরে পুজো দাও, বামুনদের কাঁচা-পাকা ফলার খাওয়াও। ঐ ভাঙা বাড়িতে তোমাকে কবে সাপে ছুঁলে মারবে—এই ভয়ে রাত্তিরে আমাদের ঘুম নেই মা !”

ছেলেদের কথা বুড়ী একেবারেই কানে তোলেন না। আর নাতনীদেবর কাউকে-না-কাউকে কাছে রাখবার যে ধমুকভাঙা পণ তিনি করেছেন—তাও একদিনের তরে ছাড়েন না। তাঁকে রাগাবার সাহস কারো নেই। না ছেলেদের, না বউদের। মাতৃভক্তি, শাস্ত্রীভক্তি তো আছেই ; তা-ছাড়াও খুব জোরাল কারণ একটা আছে, যেটা শয়নে স্বপনে এক মিনিটের জগুও কারও ভুলবার জো নেই। ব্যাঙ্কে সারদেবী দেবীর নামে

● বুকের চাক।

ঐনুল্লাহ বন্দোপাধ্যায়

পুরো একটি লক্ষ টাকা জমা রেখে গিয়েছেন তার স্বামী। উনি গার উপর চটে যাবেন, তাঁর ভাগ্যে জুটবে না ঐ লক্ষ টাকার বখরা। টাকাকড়ির বাপায়ে বুড়ী বেজায় শক্ত, তাঁর নিজের ভাইপো হ'ল উকিল, তাকে দিয়ে তিনি বছর-বছর নতুন-নতুন উইল করান। এ-কথাটা কি জানি কেমন ক'রে প্রকাশ হয়ে পড়ে ছয় ছেলেরই কাছে।

সারদেবীর নাতনীরা তাই পালা ক'রে বোস্টমপুরে বাধ্য হয়েই আসে বছরে অন্ততঃ একটিবার; ঠাকুয়ার পুজোর ফুল তোলে, আলপনা দিতে শেষে, আর “ভাল লাগে না, ভাল লাগে না” বলতে বলতেও হাঁড়ি-হাঁড়ি আচার কাস্তান্নি কাবার করে। এ বয়সেও বুড়ী নিজের হাতে নানান রকমের আচার তৈরি করেন, আর খুব শুদ্ধাচারে সেগুলি মাটির হাঁড়িতে ভরে রেখে তৃপ্তি পান।

আট থেকে চোদ্দ বছরের ভিতর সারদেবীর যে-নাতনীরা পড়ে, তাদের সংখ্যা ডজনোর উপর। তাই সৃজাতাকে বাদ দিলেও মাসে একজন ক'রে বডিগার্ড তিনি অনায়াসেই পেতে পারেন। তারই সন্মোগ নিয়ে কঁা-একটা ফিকির ক'রে সৃজাতা গেল বছরটা ঠাকুমাকে ফাঁকিও দিয়েছিল। সেটা কিন্তু ভোলেননি ঠাকুমা। এবার যখন কলকাতা থেকে নাতনী আনাবার পালা এল, তখন তিনি সৃজাতার কোন কাঁড়নিকেই আর আমল দিলেন না। ছেলের কাছে কড়া ভকুম পাঠিয়ে দিলেন—“সৃজাতাকেই আমার চাই, চুলের ক'টি ধরে তাকে পাঠিয়ে দাও।” এ-কথার উপর আর কথা কইতে সাহস করল না কেউ। না কেবল মেয়েকে ভরসা দিলেন—“যা না একবারটি। একটা মাস তো মোটে! আমি না হয় তাঁর মেজদাকে মাসের মাঝামাঝি একবার পাঠিয়ে দেব, তাকে শহরের শবরাখবর শুনিয়ে আসবার জগা।”

সেই থেকে সৃজাতা বোস্টমপুরে আছে, মেটে হাঁড়িতে জিয়েনো সিঙ্গি নাছের মত।

অজিত এই আজ সকালেই এসেছে—সঙ্গে একগাল সিনেমা পত্রিকা, আর একপাল ছেলেমেয়ের বনভোজনের একটা ফটো। নতুন ছবির সমালোচনা প'ড়ে যে-পরিমাণে আনন্দ পাচ্ছিল সৃজাতা, ঠিক সেই পরিমাণে তার হচ্ছিল দুঃখ—বন্ধু আর বান্ধবীদের সৃজাতাহীন গ্রুপ-ফটো দেখে। ভাবছিল—ঐ পারুল শিপ্রা দেবানীষ অভিনয়ীদের আক্কেলের কথা! বোটনিকেল গার্ডেন কি রাতারাতি গঙ্গার জলে ডুবে যাচ্ছিল? আর দুটো হপ্তা পরে বনভোজনটা করলে হ'ত না? এ শুধু সৃজাতাকে দেখানো যে তার জগ্গে ওদের কিছু যায়-আসে না। আচ্ছা—! দেখে নেবে সৃজাতা। কলকাঠি নাড়তে সেও কিছু কম ব্যয় না।

● যুগের ঢাকা

শ্রীযদিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

অজিত এসেছে। কেক-সন্দেশের বদলে মোহনভোগ দিয়েই কোনমতে চা-পর্ব সমাধা করছে—এমন সময় রাত্তায় শোনা গেল গান, আর স্তম্ভাভা তুর্জনী উঁচিয়ে বলে উঠল—“এস, এসে দেখে যাও দাদা, কী সুখেই আমি এখানে আছি।”



নীচের রোয়াক সাদা ধবধব করছে, যেন শ্বেতপাখর দিয়ে আগাগোড়া মুড়ে-দেওয়া। সেই রোয়াকে পা ঝুলিয়ে বসেছেন গোলোকবাসী বাবাজী, আর তাঁর থেকে অনেকটা দূরে সিঁড়ির উপর চেপে বসে ঠাকুমা শুনছেন তাঁর গান—“তোরা কে কে যাবি আয়! ওরে বাছ তুলে নাচে গোরা, আয় রে ছুটে আয়রে তোরা; কীর্তনেতে প্রেমের বান, ন’দে ভেসে যায়!”

বাবাজী বুড়ো, গলা তাঁর ভাঙা; কিন্তু সেই ভাঙা গলায় এমন এক প্রাণচালা আবেগ যে পাষণ্ড গলে যায় তাঁর কীর্তন শুনে। কামানো মুখখানা এই সন্তর-পঁচাত্তর বছর বয়সেও পাকা আমের মত টসটস করছে। আর দু’টি পুরস্কৃত গাল বেয়ে অঝোরঝোরে করে পড়ছে চোখের জলের দু’টি পবিত্র ধারা। গান গাইতে গেলেই বাবাজী কঁাদতে থাকেন। আর এমন লোকও গাঁয়ে কম আছে, বাবাজীর গান শুনেও যে চোখের জল না ফেলে স্থির থাকতে পারে।

ঠাকুমা তো পারেনই না। সিঁড়িতে বসে বসে ক্রমাগত চোখের জলে ভাসছেন তিনি, আর মাঝে মাঝে আকুল হয়ে ডেকে উঠছেন—‘গৌর! গৌর!’

“দেখে যাও দাদা, কী সুখেই আমি এখানে আছি!”

অজিত আর স্তম্ভাভা এসে কখন যে তাঁর পিছনে ঝাঁড়িয়েছে, তিনি তা খেয়াল করেননি। হঠাৎই এক সময় খেয়াল হ’ল সেটা, যখন হাঃ হাঃ হোঃ হোঃ ক’রে

সতেরো-আঠারো বছরের নাতিটি তাঁর, বাবাজীর গানের মাঝখানেই অটুটহাসি হেসে উঠল।

নীল আকাশ থেকে হঠাৎ সেই মুহূর্তে যদি বাজ পড়ত ঠাকুরার সামনে, তিনি এমন থ'ম্মে যেতেন না। কথা বলা দূরে থাকুক, অনেকক্ষণ যেন তিনি বুঝতেই পারলেন না যে ব্যাপারখানা কী ঘটেছে।

গোলোকবাসী বাবাজীও কম অবাক হননি। কিন্তু আগে তিনিই সামলে উঠলেন। স্বপ্ননি ঝোলায় পুরে নিজের চোখমুখ থেকে জলের খারা মুছে ফেললেন নামাবলী দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে সারদেবীরকে বললেন—“এরা বৃষ্টি তোমার নাতি-নাতিনী মা? তুমি মনে কষ্ট পেয়ো না; জগাই মাখাই সব দুগেই আছে। আমি এখন যাই, আর একবার স্নান না করলে মনটা শুচি হবে না।”

ঠাকুরা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—“সিঁথেটা—”

“আজ আর নয় মা!”—মাথা নেড়ে বাবাজী বললেন—“আজ আমার উপোস! ঠাকুরকে আগে প্রসন্ন করি, তবে তো তাঁর ভোগ!”

বাবাজী বেরিয়ে গেলেন, ঠাকুরাও উঠে দাঁড়ালেন। নাতি-নাতিনীর দাঁড়িয়ে আছে পিছনেই, কিন্তু তাদের দিকে ফিরেও চাইলেন না সারদেবী। পৃথিবীতে অজিত নামে একটা ছেলে আর স্বজাতা নামে একটা মেয়ে যে জলজ্যান্ত বেঁচে আছে তাঁর হাতের নাগালের ভিতরেই, একথাটা যেন জানাই নেই তাঁর। তিনি সোজা সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলেন, দেতলার বারান্দায় একবারটি তাক দেখা গেল এক পলকের মত, তারপর একটা দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ হ'ল—বাস্! আর কোথাও টুঁ শব্দটি নেই।

“ঠাকুরঘরে ঢুকলেন”—চুপি চুপি বলল স্বজাতা।

থারে কাছে জনপ্রাণী নেই, তবু এমন চুপি চুপি কথা কিসের জগা? স্বজাতার মুখ দিয়ে জোর-জোর কথা বেরুতেই যেন চাইছে না আর। তার যেন ভয় করছে। স্বর আসবার আগে যেমন শীত করে মালেরিয়া-রুগীর, তেমনি-থারা শীত করছে যেন স্বজাতার। তার যেন মনে হচ্ছে—নিজের ঘরে ঢুকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই হ'ত ভাল।

আর অজিত? খুব একটা বাহাদুরির কাজ করা গিয়েছে বলে সেও মনে করতে পারছে না যেন। নিজের মনকে শক্ত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে বেচারী। এ সব ভগ্নামি ক্যাকামি পুতুলপুজো ছুঁচোর কেশনের গোড়ায় কালাপাহাড়ী আঘাত হানাই দরকার, এই কথাই সে বার বার বলতে চাইছে নিজেকে। কিন্তু কোন কথার পিছনেই জোর নেই যেন। নড়বড়ে বাঁশের খুঁটির মত তার যুক্তিস্তলো যেন কেবলই

এপাশে-ওপাশে কাত হয়ে পড়ছে, মনটাকে চাড়া দিয়ে কোনমতেই আর ঝাড়া করতে পারছে না।

নিজের দুর্বলতায় নিজেই সে ক্ষেপে উঠল হঠাৎ। একটা বি-এ ক্লাসের ছাত্র সে, কান্ট হেগেল মার্ক্স প'ড়ে প'ড়ে দুনিয়ার আদি-অন্ত নবদর্পণে এনে ফেলেছে এই আঠারো বছর বয়সে। তার কি সাজে একটা ভীমরতি-ধরা বুড়ীর ভয়ে এমন মুষড়ে পড়া? না, না, না! ঠিক কাজই করেছে সে! যুগের ঢাকা এগিয়ে চলেছে। বুড়ীর চোখরাঙানির ভয়ে পাঁচশো বছর আগেকার কেতনের উঠোনে আর আটকে থাকবে না সে-ঢাকা। বাবাজীদের সঙ্গে নিয়ে ঠাকুমা-রা বনবাস করুন না এইবার। রায়বাড়ির ছয়-ছয়টা ডাকসাইটে পুরুষ—অজিতের বাবা কাকা জেঠা-রা—মাঁরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ-বা ব্যারিস্টার, কেউ-বা আবার আই-সি-এস হাকিম—তারা কেউ গোলোকবাসী বাবাজীর কেতন শুনে গলে যেতে রাজী নন। তাতে যদি রেগেমেগে ঠাকুমা তাঁর লাগ টাকা বঙ্গোপসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দেন, তাতেও না।

রাগের মাথায় অজিত ভাবতে লাগল—রায়বাড়ির ইচ্ছত বজায় রাখবার ভার আজ হঠাৎই ভগবান তার এই বাক-শাশ-করা মাথায় একান্তভাবে চাপিয়ে দিয়েছেন : বাবা-কাকা-জেঠাদের প্রতিনিধি হয়ে তাকেই আজ এ-বাড়ি থেকে বিদায় করতে হবে সেই পাঁচশো বছর আগেকার খোলাটে আবহাওয়া।

জোরে জোরে দুই চারবার হাত-পা ছুঁড়ল অজিত। জোরে জোরে নিশ্বাস নিল দুই চারবার। তারপর সজাতার কাঁধে একটা ঝাকুনি দিয়ে বলে উঠল—“চল ঠাকুমার কাছে!”

“গিয়ে?”—ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল সজাতা।

“গিয়ে বলব—বেছে নাও ঠাকুমা! একদিকে নাতি-নাতনী, আর একদিকে গোলোকবাসী! একদিকে তোমার ছেলেদের স্বপ্নস্ববিধে, আর একদিকে তোমার বাবাজীর সিধে! কোনটা বেছে নেবে, নাও! দুই নৌকোয় পা দিও না। তুমি দিতে চাইলেও আমরা তা দিতে দেব না।”

সজাতার ভয় তবু যায় না। সে বলে—“ঠাকুমা গোঁয়ার আছেন। তাকে রাগিয়ে দিলে ভারি গোলমাল হবে। বাবা রেগে যাবেন হয়ত আমাদের উপর। জানো তো সেই লাগ টাকার কথা? ওটা যাতে হাতছাড়া না হয়, বাবা-মা সেদিকে হুঁশিয়ার!”

একটু দমে গেল অজিত। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। খোলাখুলি বিদ্রোহটা এখন থাকুক তাহলে! কলকাতায় চলে গিয়ে এখানকার কীর্জন-ফীর্জনের ব্যাপার বাবাকে খুলে বলা যাবে। তিনি তো আজ দশ বছর দেশে আসেন না, ঠাকুমার

● যুগের ঢাকা

শ্রীমদিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকালকার কাণ্ডকারখানা তাঁর জানা থাকার কথা নয়। সব খুলে বলে তাঁকে পক্ষো জিজ্ঞাসা করা হবে—বোম্বেমপুরে পাঠিয়ে দিয়ে স্বজাতাকে তিনি কি বোম্বেমি করেই তুলতে চান ?

ঠাকুমা ঠাকুরঘরেই প'ড়ে আছেন সারা সকাল, সারা দুপুর। চোখের জল তাঁর মানা মানে না। অবিরল ধারায় গড়িয়েই চলেছে। বড় আঘাত লেগেছে আজ মনে। তাঁরই বংশধর তাঁরই ভিটেয় দাঁড়িয়ে ঠাকুরের অপমান করছে। মহাপ্রভুর নামকীর্তনে করেছে উপহাস। অকল্যাণের ভয়ে শিউরে উঠেছে তাঁর অন্তর। ছেলেদের মতিগতি ভাল নয়, তা তিনি জানেন। তাঁরা ধর্ম মানে না, ঠাকুরদেবতার উপর ভক্তি নেই তাঁদের, সায়েবিয়ানা তাদের হাড়ে মাসে জড়িয়ে গিয়েছে, এসবও বোঝেন তিনি। তাই নিজের দিক থেকে ষোলো-আনা নিষ্ঠাকে তিনি আঠারো-আনা পদন্ত চড়িয়ে দিয়েছেন। দিবারান্ত্রি ঠাকুরকে ডেকেছেন—“প্রভু, আমার যুগ চেয়ে আমার ছেলেগুলোকে তুমি দয়া কর। ক্ষমা কর ওদের অনাচার। রায়বংশ যদি পাপের আগুনে জ্বলে পুড়েই যায়, তোমার দয়াল নামের মহিমা তবে রইল কোথায় ?”

মনে মনে এতদিন একটা দুরাশা ছিল যে তাঁর কাকুতি হয়ত ঠাকুরের ক্ষোথকে থামিয়ে রাখতে পারবে। আজ হঠাৎ রুঢ় আঘাতে সে-আশা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। পাষণ্ড নাস্তিটা দানবের মত হেসে উঠল নামকীর্তনের সময়। অপমান হ'ল গোলোকবাসী বাবাজীর, অপমান হ'ল মহাপ্রভুর, অপমান হ'ল ভগবানের। এ-অপরাধ কখনো ক্ষমার যোগ্য নয়। বিচারের ভার যদি ভগবান নিজের হাতে না রেখে সারদেবতার উপরেই ছেড়ে দেন, তিনি নিজেই বলতে বাধ্য হবেন—এ-পাপে রায়বংশের ধ্বংস হওয়াই উচিত। নাঃ,—আর বৃদ্ধি থাকে না কিছু! এতদিন বুক দিয়ে তিনি যা আগলে রেখেছিলেন, তাঁরই বোকামিতে তা নষ্ট হয়ে গেল। বোকামি নয় ? কিসের জ্ঞান তিনি এই সব নাস্তি-নাস্তনীরকে ডেকে ডেকে আনেন এই পুণ্যের ঘরে ? ওরা আধারের জীব, ওদের কেন তিনি ঢুকতে দেন এই আলোকের দেশে ?

সারা দুপুর কেটে গেল চোখের জলে, অন্তশোচনায়। বেলা আড়াই পহরে তাঁর দরজায় পড়ল মৃদু টোকা। সারদেবতারী জবাব দিলেন না। বাধুনি ক্ষীরি বামনী তাঁকে ডাকছে। তাঁর খাবার বেলা কখন পেরিয়ে গেছে, ব্যস্ত হয়ে উঠেছে বেচারী ক্ষীরি। মাইনে নিয়ে কাজ করে, তা সত্যি। তবু বুড়ীর উপর একটু দরদ আছে তাঁর। ডেকে ডেকে ষাওয়ান, অনুবেবিস্থে গা-হাত-পা টেপে। বেলা গড়িয়ে গেল দেখে সে সাহস ক'রে উপরে উঠে এল ; দরজায় টোকা দিয়ে তাঁকে ডাকল—“মা উঠন।”

সারদেবতারী ওঠেন না। রায়বংশের সর্বনাশ হবে, এ তিনি পক্ষো বুঝতে

পেরেছেন। ছেলে-বোঁ-নাতি-নাতনী ছলে পুড়ে থাক্ হয়ে যাবে দেবতার দোষে, এতে আর কোন সন্দেহ নেই তাঁর। কিসের লোভে তবে তিনি আর এ-জীবন রাখবেন? ওরা মরবার আগে নিজে মরতে চান সারদেখরী। তিনি ওঠেন না, জবাবও দেন না।

সুজাতা শুনল ব্যাপারটা। আগেই সে ভয় পেয়েছিল, এবার একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ল। দাদাটা তো গোল বাধিয়ে দিয়ে বেনালুম সরে পড়ল কলকাতায়। প'ড়ে রইল সুজাতা, সব বাকি সামলাবার জগা। কিন্তু এ-বাকি তো সামলাবার মত বাকি নয়! কী করতে পারে সে? সাধারণ অবস্থাতেই ঠাকুমার কাছে গিয়ে কথা কইতে তার কেমন ভয়-ভয় লাগে। বেজায় রাশভারী লোক কিনা! এখন তো রেগে কাঁই হয়ে আছেন তিনি! সুজাতাকে দেখলে হয়ত চিবিয়েই খেয়ে ফেলবেন। কী তা হলে করে সে? চোদ্দ বছর মাত্র তার বয়স; তবু এটা সে জানে যে বাড়ির কেউ রাগ ক'রে না-খেয়ে থাকে যখন, বাড়ির অগ্নি লোকদের তখন কর্তব্য দাঁড়ায়—তাকে খোশামোদ ক'রে শাওয়ানো। জানে বটে সুজাতা, কিন্তু জানা এক কথা আর সে-অমুসারে কাজ করা আর এক কথা। মন স্থির করতেই দিনটা কেটে গেল সুজাতার। ওদিকে ঠাকুমা দোর খুললেন না। না খেয়ে সারা দিন সারা রাত্তির প'ড়ে রইলেন গৃহদেবতার পায়ের তলায়।

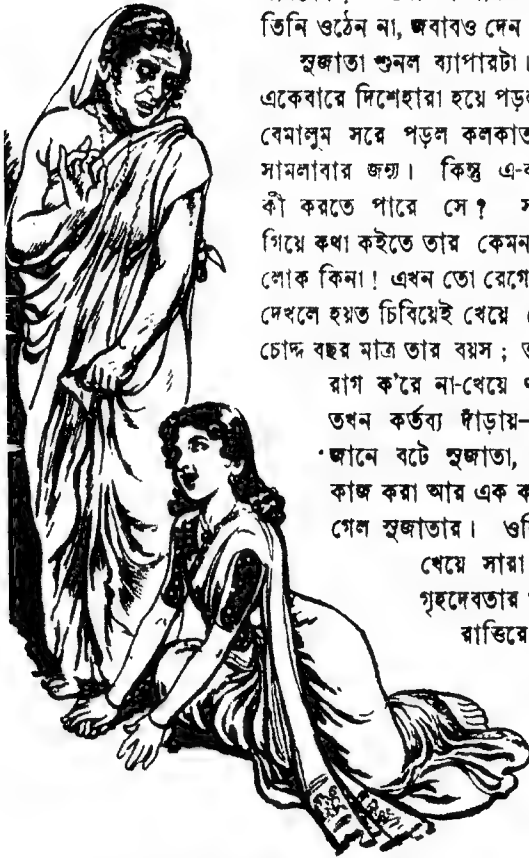
রাত্তিরে লুচিগুলো যেন গলা দিয়ে নামতে চায় না সুজাতার। বুড়ী ঠাকুমা সারা দিন না খেয়ে শুকিয়ে রইল? ছিঃ ছিঃ—বড় অম্ভায় হয়ে গেল। মেজদা-টা যেন কী! একেবারে বেহায়া, বেপরোয়া, বেয়াকেল! অমন মিলিটারি হাসি না হাসলেই কি চলছিল না, কীর্তনের মাঝখানে?

“তুমি আমাদের মাক করো ঠাকুমা!” [পৃষ্ঠা ৪২

কই, সুজাতা তো এ-বাড়িতে এসে অবধি রোজ ঐ গান শুনছে, বিরক্তও হয়েছে রোজই! কিন্তু লোক দেখিয়ে হাসতে তো সে যায়নি! কোথায় কী-

● বুকের ঢাকা

ঐশ্বর্য্যাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়







রকমভাবে চলতে হয়, তা স্বজ্ঞাতা যতটুকু জানে—তার চেয়ে চার-বছরের বড় মেজনা কি জানে না!

রাস্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে যেন কেবল ঠাকুমাকেই স্বপ্ন দেখতে থাকল। ঠাকুমা ঠিক সেইভাবে কঁদে চলেছেন, যেভাবে কঁদছিলেন সকালবেলা বাবাজীর গান শুনে। অকোরে দু'চোখ দিয়ে ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, তার আর বিরাম নেই। স্বজ্ঞাতা ঘুমের ঘোরে ভেবে পায় না—এখনও তিনি কাদেন কেন। সে-কীর্তন তো আর কেউ গাইছে না এখন! তবে এখন কিসের জগা এ-কামা?

ঘুম যখন ভাঙল স্বজ্ঞাতার, মনটা তার ধারাপ। অবাক হয়ে সে দেখল—বালিশটা তার ভিজে গিয়েছে। স্বপ্নে ঠাকুমাকে কঁদতে দেখে নিজের সে কঁদেছে সারা রাত। অবাক কাণ্ড! তবে কি স্বজ্ঞাতা ঐ বুড়ীটাকে ভালবাসে নাকি? কই, স্বজ্ঞাতা তো তা টের পায়নি! এমন কথা সে ভাবতেই পারেনি যে তার মত আধুনিকা ইংরেজী-পড়ুয়া শতরে মেয়ের পক্ষে এমন একটা তিনকৈলে জবড়জগা পাড়ার্গেয়ে পেত্নীকে এক তিলও ভালবাসা সম্ভব! তবে, এটা হ'ল কী? বালিশ তার ভিজে কেন?

ভোরবেলা উঠে ঘর খুলতেই সারদেবীর সঙ্গে তার চোষোচোষি হয়ে গেল। মুখ হাত ধোবার জগা একবারটি ঠাকুরঘরের বাইরে তিনি এসেছিলেন। এইবার আবার খরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে যাবেন, এমন সময়—

স্বজ্ঞাতা দেখল ঠাকুমার ফর্সা মুখখানা একদম কালো হয়ে গিয়েছে এক রাস্তিরে। ভাসা-ভাসা চোখের কোলে গাঢ় ক'রে কালি লেপে দিয়েছে কে-যেন। চোখের চাউনিতে কেমন-যেন একটা উদাস ভাব!

স্বজ্ঞাতার কী হ'ল, কে জানে! সে দড়াম্ ক'রে আছাড় বেয়ে পড়ল ঠাকুমার পায়ের কাছে—ককিয়ে উঠে বলল—“তুমি আমাদের মাক কর ঠাকুমা! আমার মুখ চেয়ে মাক কর। আমি আর কখনো তোমার অবাধ্য হব না, দেখে নিও তুমি।”

ঠাকুমা তাকে কী বলতেন, তা কেউ জানে না। কিন্তু কোন কথা তিনি বলতে পারলেন না। তিনি অবাক ভাবটা কাটিয়ে ওঠার আগেই সিঁড়ির মাথা থেকে শোনা গেল একটা মিষ্টি হাসি।

আজকের হাসিটা গোলোকবাসী বাবাজীর। কীরি তাঁকে ডেকে এনেছে—সারদেবীকে সাস্তুনা দেবার জগা।

হাসি থামলে বাবাজী বললেন—“অবাধ্য না হয়ে তো তুমি পারবে না দিদিমণি!

যুগের হাওয়া তোমায় টানছে যে! কাল আমি জগাই-মাধাই বলেছিলাম তোমাদের। সারা দিন ভেবে ভেবে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। জগাই-মাধাই তোমরা নও, তোমরা শুধু একটু নতুন রকম। পুরোনোদের মত হতে তুমি পারবে না, পারা উচিতও নয়। যে যুগের যা। রামের হাতে ধনুকবাণ, শ্যামের হাতে বাঁশ। তোমার ঠাকুরার জন্মে জপের মালা, তোমার জন্মে কলেজের কেতাব। যে যুগের যা। আমাদের দিন ফুরিয়েছে; তল্লি কাঁধে নিয়ে আমাদের এখন সরে পড়াই দরকার।”

সুজাতাকে সেইদিনই ফিরতে হ'ল কলকাতায়। কয়েকদিন পরে সুজাতার বাবা-কাকা-জেরারা এক একটা চিঠি পেলেন। লেখক হচ্ছেন সারদেশ্বরীর উকিল ভাইপো। একই রকম চিঠি সকলের কাছে। সারদেশ্বরী তাঁর লক্ষ টাকা সমান বখরা ক'রে দিয়েছেন তাঁর ছয় ছেলেকে। তিনি খানকতক গয়না মাত্র সম্বল ক'রে চলে গিয়েছেন বৃন্দাবনে। ঐ গয়না বেচে সেখানে একটু ছোট্ট মন্দির গড়া হবে। তাতে থাকবেন রায়বংশের গৃহদেবতা, সারদেশ্বরী আর গোলোকবাসী বাবাজী।

শ্রোতৃ শ্রোতৃ বহুসংখ্যক

সম্প্রদায় বিবিন্ধক ধর্মঃ।

জ্যোতিষী বীণাভিঃপ্রসঙ্গো বৃন্দাবনে

প্রোচো মনো যোগক্ষেমাদ্ বৃন্দাবনে

কঠোপনিষৎ

মণি ও মুক্তা



প্রত্যেক হৃদয়ের কাছে গুটি জিনিস আছে, একটি হলো প্রেম, আর একটি হলো প্রেরণ। যিনি প্রকৃত জানী তিনি প্রেরকে বরণ করেন, আর যারা অস্বপ্নি তারা অ'পাত হৃদের জন্মে প্রেরকেই বরণ করে।



— কটিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

রায় বারুদের ছিল কালু বলে বেহারা
মিশ্ কালো রঙ তার মোটা সোটা চেহারা ।
দাঁত তার সাদা বটে, ঘোর কালো মুখটা
দেখলেই ভয়ে যেন কঁপে ওঠে বুকটা ।
হয় দোয়াতের কালি, নয় আলকাতরা
মেখে বৃষি বসে আছে কালুরাম সাঁতরা ।

রায় বারুদের মাম্মা যেন পাকা আতাটি
চুল সব পেকে গেছে ধপধপে মাথাটি ।
কলপ রয়েছে তাঁর টেবিলের শিশিতে,
মাথাতে মাখেন রোজ সযতনে নিশিতে ।
সাদা চুল কালো হয়, দেখে কালু চুপটি
ভাবে—ওকলপ খেলে বাড়ে যদি রূপটি ।

একদিন মাম্মাবাবু গিয়েছেন বাহিরে—
কালুরাম দেখে তবে চারিদিকে চাহি রে ।
ঘরে এসে কলপের শিশি নিয়ে হাতে সে
ঢেক ঢেক কলপটি খেয়ে ফেলে রাতে সে ।
তার পর অদ্ভুত বল্ব কি ভাই আর—
ঝকঝকে রঙ হল কালো কালু সাঁতারার ।



আঁধারে ফুটল আলো

—ঐশ্বরীপ্রসাদ রাহা

কাঁটাবন ভেঙে খাল বিল পেরিয়ে তিনদিনের পথের মাথার অবশেষে এই বড়রাস্তা।
আগ ইটতে পারে না কালোমানিক। শালকাঠের হুগুরের মত তার যে একজোড়া পা, তাও
ফুলে গোঁব হয়েছে। কত জায়গা দিয়ে রক্ত করে করে শেষকালে যে পায়েতেই শুকিয়ে
হুলোকাবার তলার চাপা প'ড়ে গিয়েছে, লেখাজোখাই নেই তার। লোহার ভীমের মত পুরুষ
থেকে থেকে থামোকাই থর থর ক'রে কঁপে উঠছে—আর সে পারে না, সোজা হয়ে দাঁড়াতেই
পারে না।

চওড়া রাস্তা, উঁচুনীচু, খাল খন্দকে ভরা। গরুর গাড়ি চলে চলে এর এই দশা। গাড়ির
লিক্‌বাঁচিরে কালোমানিক শুয়ে পড়ল একটা গাছের ছায়ায়। একটু জিরোতে না পেলে আর

জান বাচে না তার। জ্বিনোনো দরকার আর লোকালয়ে পৌঁছোনোও দরকার। তিন দিন খাওয়া হয়নি কিছু, যা হোক কিছু পেটে দিতেই হবে। হোক ভাত, হোক চিড়ে মুড়ি, হোক না-হর কলাগুলো ফল পাখালি। যে-রাত্তায় সে ছুটে এসেছে এই তিন দিন ধরে, তাতে মাহুঘের মুখও তার চোখে পড়েনি, খাওয়ার জ্বিনিসের পাতাও তার কোথাও মেলেনি। রাফসের মত মানুষ যে মানিক সর্দার, সেও তাই না-থেরে না-থেরে মড়ার সামিল হয়ে পড়েছে। পাড়াতে গেলে দুঁকড়ে, চোখ চাইতে গেলে চোখে দেখেছে সর্ষেফুল।

চোখ বুজে বুজে সে-রাত্তিরের কাণ্ডগুলোকে সে যেন আবার চোখের উপরই ঘটতে দেখছে। হারে-রে-রে ক'রে পোনেরোটা ডাকাত নিয়ে সে লাক্ষিয়ে পড়ল বৃদ্ধ সাউয়ের তেমহলা বাড়িতে। কাকপক্ষীর জানবার কথা ছিল না, কিন্তু কুজ বাটা পুলিশ আনিরে রেখেছে। এর মানেটা তা হলে কী? দলের কেউ বেইমানি করেছে নিশ্চয়! কে সেটা? তাকে একদিন ধরবেই কালোমানিক! নিজের হাতে তার চোখ দুটো যদি প্যাট্ প্যাট্ ক'রে সে গেলে না বের, তবে কালোমানিকের নামই যেন সবাই ফিরিয়ে রাখে।

কালোমানিকেরাও লাক্ষিয়ে পড়ল বাড়ির উপর, পুলিশেরাও লাক্ষিয়ে পড়ল কালোমানিকের উপর। হাতাহাতি লড়াই, মুখোমুখি বন্দুকবাজি। লালপাগড়ি-সম্মত একটা লেপাইয়ের মাথা দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল কালোমানিকের রামলারের এক কোপে। মড়াচুড়ো-পর্য্য দারোগা লাহেব বারান্দার থামের আড়াল থেকে বন্দুক তাক্ করছিল। শুন্দরবনের বাঘের মতই একটি লাফে কালোমানিক গিয়ে পড়ল তার উপরে। বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে দারোগারই কপালে ঠেকিয়ে করল ফায়ার,—মুতুটা গুড়িয়ে খেঁতলে ছরকুটে পড়ল, কাকের-মুখ থেকে পড়ে যাওয়া পাররার ডিমের মত। তারপর কালোমানিক পালাল। দলের বৈদ্য ডাগেরই চোটে হাতকড়া পড়েছে দেখে ছাব থেকে সে নেমে পড়ল জলের পাইপ বেয়ে। তারপর বাগান পেরিয়ে চবা-মাঠ, চবা-মাঠ পেরিয়ে কাঁটা-ঝোপের জঙ্গল, জঙ্গল পেরিয়ে চিত্তিরের দহ—চলা-পথের এক পা এখায়-ওখায় হলে বে-দহের কাদায় হাতী পর্যন্ত বেমানুম তলিয়ে যাবে—

—কাঁচোর-কাঁচ!—গাড়ি আসছে একটা।

চৈচিরে কঁদে উঠল কালোমানিক, “বাবা গো! আমার একটু তুলে নাও! অরে চোপ চাইতে পারছিনে।”

গাড়োয়ান ইন্টিননে যাকে। কালোমানিক যদি সেন্থিকে যেতে চায়, গাড়িতে তাকে তুলে নিতে আপত্তি নেই গাড়োয়ানের। আহা! পপ-চলুতি লোক বিপদের সময় এ ওকে দেখবে বই কি! আহা! অর হয়েছ বেচারীর। আহা! গাড়িতে এস! এস গাড়িতে!

● ঝাঁপারে ফুটল আলো
জ্বিনীজ্বিনী রাহা

“একটু ধরে তোল দালা!”

ধরে তুলবার অজ্ঞ গাড়ি থেকে নেমে এল গাড়োয়ান, কিন্তু কাছে এসেই সে আঁতকে উঠল। এ কী চেহারা! কালো মুখকো এই গাট্টা জোয়ান, গায়ে মাথার শুকনো রক্তের দাগ—এ কি কখনো ভাল মানুষ হতে পারে?

এক পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে গাড়োয়ান চোখা নজরে তাকাল কালোমানিকের দিকে। কালোমানিকও তাকিয়ে আছে ঝাঁকড়া ভুরুর তলায় কুতকুতে লাল চোখের মিটিমিটি চোর-চাউনি দিয়ে। গাড়োয়ানকে থমকে যেতে দেখেই সে তড়াক্ ক’রে উঠে পড়ল—যেমন ক’রে উঠে পড়ে কাল-কেউটের ফণা। কোথার গেল তার দেহের থরথরানি, কোথায় গেল তার মুকের ধড়ফড়ানি! চড়াত ক’রে মাথায় খুন চেপে বসল তার। বদমাইশ গাড়োয়ান! তুমি ভয় পাচ্ছ? কালোমানিককে পথে ফেলে রেখে পালিয়ে যাবার মতলব করছ? গায়ে গিয়ে পাঁচজনাকে বলতে চাইছ যে একটা ডাকাত আধমরা হয়ে বড়শাওয়া প’ড়ে আছে?—তা হলে আর রফে আছে মানিক সর্দারের? পাঁচজনার মুখ থেকে কথাটা উঠবে পুলিশের কানে, আর থানার থানায় লাড়া প’ড়ে যাবে—পলাতক মানিক সর্দার এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করছে, পাকড়ো তাকে, পাকড়ো!

তড়াক্ ক’রে লাফিয়ে উঠেই বাঘের মত গাড়োয়ানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কালোমানিক। মিনিট পাঁচেক ধস্তাধস্তি! তারপরই লাশটাকে কোপের ভিতর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে গাড়িতে চড়ে বসল, আগের মতই হেলে জলে চলল গাড়ি ইন্সটিনের দিকে।

গামছায় বাঁধা চিঁড়ে-খুঁড়ি রয়েছে গাড়িতে, বসে বসে চিবুতে লাগল কালোমানিক। তিন দিন পরে এই তার প্রথম খাওয়া। শুকনো চিঁড়ে গলার বেধে যায়, রাস্তার ধারে একটা ডোবা দেখে সেখানেই নেমে পড়ল সে। চিঁড়েও ভিজিয়ে নিল, গলাও ভিজিয়ে নিল। জলটা নোংরা, কিন্তু তা বলে আর উপায় কী! কলেরায় যদি মরতে হয়, হোক না। কীসিতে মরার চাইতে সেটা খাওয়া কিসে?

ক্যাচোর-ক্যাচ, ক্যাচোর-ক্যাচ—গরুর গাড়ি চলতেই থাকে। মাঝে মাঝে বেথা হয় মানুষের লাখে। কেউ পায়ের হেঁটে চলেছে, কেউ গাড়িতে চড়ে। তারা আলাপ করতে চায় কালোমানিকের সঙ্গে। তারা চায়, কিন্তু কালোমানিক চায় না। কথা কইতে গেলে ধরা পড়ে যাবে যে সে এম্বিক্কার লোক নয়। ধরা সে পড়তে চায় না। তাই কালোমানিক শুয়ে পড়ল গাড়ির উপরে। গাড়ির গরুর চেনা পণ, নিজের মনেই ঠিক পথে চলে। কালোমানিক ঘুমের ভান করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল একশয়।

● আধারে কুটল আলো

ত্রিহুখান্নাথ রাহা

ঘুমটা হঠাৎই ভেঙে গেল। গাড়ি আর চলেছে না।

চমকে মাথা তুলতেই কানে এল একটা কড়া চকুম। “মাথা তুলেছিস্ কি গুলি করব। চুপ্ ক’রে শুয়ে থাক, যেমন আছিস্!”

চুপ ক’রেই শুয়ে রইল কালোমানিক। শুয়ে শুয়েই দেখতে পেল, গাড়ির সামনে গাড়ির এক পুলিশ। দারোগা-টারোগাই হবে, কারণ মাথায় তার পাগড়ি নয়, টুপি। মাথায় টুপি আর হাতে রিভলভার। রিভলভার অন্তরটাকে চেনে কালোমানিক।

মাটিতে একটা সাইকেল কাত হয়ে প’ড়ে আছে। ঐতেই দারোগাটা এসেছে বটে। গাড়োয়ানের লাশটা দেখতে পেয়েছে বোধ হয় রাস্তায়। না-দেখবেই বা কেন? দিনের বেলা, এতক্ষণ নিশ্চয় শকুনের মেলা বসে গেছে সেখানে—জানাছানি হয়ে গেছে খুনের বাপারটা। দারোগা হস্ত অস্ত্র কাজে কোণাও যাচ্ছিল; খুনের গল পেরে সন্কেত ক’রে এই দিকেই চলে এসেছে সাইকেল নিয়ে। এঃ হে হে! কী বোকামিই করেছে কালোমানিক। এদিকে গাড়ির উপর ঘুমিয়ে পড়ে কখনো! না ঘুমোলে পুলিশটাকে দূর থেকেই তো সে দেখতে পেত! রাস্তার চ’ত্রে পাক্ষেত, লুকিয়ে লুকিয়ে সে যে কখন ওর নাগালের বাইরে চলে যেতে পারত!

“খবদার! নড়লেই গুলি করব!”—আবার গর্জে উঠল দারোগা—“তার গাড়োয়ানকে খুন ক’রে তারই গাড়িতে চড়ে ইন্টিশানে চলেছ? বাহবা! লখ বাবা তোমার!”

দারোগা তব্বি করছে, আর এদিক ওদিক চাইছে। কানদিকে একটা লোকও সে দেখতে পায় না, রাস্তা একেবারে খালি। একা একা এই যমদূতের গায়ে তাত দিতে সাহস হয় না তার। তাত-পা ভেঙে দিতে পারা যায় গুলি ক’রে। কিন্তু তারপর ব’দ প্রমাণ হয়ে পড়ে যে লোকটা খুনে বা ঘাতুক মোটেই নয়, সত্যি সত্যিই গাড়োয়ান—তাহলে? উলটে যে দারোগাকে নিয়েই টানাটানি শুরু হবে তখন!

দারোগা এদিক ওদিক চাইছে—মানিক চাইছে শুধুই দারোগার পানে। একটা স্তযোগ কি আসবে না? ভোড়া মোষ বনচড়ীর কাছে মানিত ক’রে ফেলল কালোমানিক। একটা-কিছু ঘটুক, যাতে দারোগা এক পলকের অন্তর পিছন পানে ফিরে তাকানো বাধ্য হয়।

‘হ্যাঁজো!—বনচড়ীর বাহাজরি আছে বইকি! হঠাৎ কী ত’ল বাহাজরি, কিছুতেই বেচারা আর নিজেই সামলাতে পারল না, গোটা রাস্তাটা কাঁপিয়ে দিয়ে ভীষণ শব্দে সে ঠেঙে উঠল। রিভলভার-ধরা হাতটা তার কঁপে গেল। আর সেই মুহূর্তে তার বাড়ির উপর লাফিয়ে পড়ল কালোমানিক। লোকটা কি শুয়ে শুয়েই লাফ দিল নাকি?—দারোগার তো অন্ততঃ তাই মনে হয়েছিল।

● আখারে কুটল আলো
ঐশ্বর্যব্রনাথ রায়

গলা টিপে ধারোগাকে শেষ ক'রে দিতে মিনিট ছইয়ের বেশী লাগল না কালোমানিকের। তারপর রক্তভর্যার হুক লাশটাকে গাড়ির উপর তুলিয়ে দিয়ে কাছের গরুটার লেজ মলতে মলতে জিভে-তালুতে শব্দ ক'রে উঠল—“চক্-চক্-চক্”—কাঁচোর-কাঁচ আওয়াজ তুলে আবার গাড়ি চলতে লাগল ইন্টিশানের দিকে।



কালোমানিক এইবার মাঠে নামল। পাটক্কেতের ভিতর দিয়ে ছুটে চলল প্রাণপণে। জল কাঁদা সাপ! মাঠের পর বিল, বিলের পর নদী। সারাদিন অপথে-বিপথে ঘুরে সন্ধ্যাবেলা নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কালোমানিক ভাবল—“এবারকার মত বেঁচে গিয়েছি বোধ হয়।”

হুপুর রাতে এক ফালি চাঁদ উঠল আকাশে। নদীর জল চিকমিকিয়ে হাসতে লাগল—যুঝি কালোমানিকেরই হৃদয়। বেধে। রাগ হয়ে গেল নদীটার উপরে। জোরে জোরে কালোমানিক ছ'চারবার পা ছুড়ল জলের উপরে। নদীকে লাথি মেরে মেরে রাগটা প'ড়ে এল যখন, তখন কূলে উঠে জিরোতে লাগল একটু।

চাঁদের আলোতেই চোখে পড়ে একটা সরু পারে-চলা পথ নদী

ধারোগার উপর লাফিয়ে পড়ল কালোমানিক। [পৃষ্ঠা ৪৩১

থেকে উঠে নলখাগড়ার বন চিরে উপর পানে চলে গিয়েছে। লোকালয় ওষিক পানেই হবে হয়ত। মাহুদই কালোমানিকের ছদ্মনাম। ওরা কালোমানিককে বেধলেই ধরতে আসে; আর ধরতে এলে উলটে নিজেরাই মারা পড়ে। বাধে-মাহুদে যে সম্প্রদায়, ঠিক তেমনি আর কি!

মাহুদই ছদ্মনাম। পারলে কালোমানিক ওদের এড়িয়েই চলে। কিন্তু এখন তো তা পারবার

● আখারে ফুটল আলো
শ্রীহরীনাথ রাহা



দেব দেউল

৪৩৩

জো নেই! কিছু না খেলে তো জীবন বাঁচে না। আজ চার দিন গেল। সেই সকালবেলায় ঠ'খুঁঠো চিঁড়ে-মুড়ি আর করেক আঁজলা পচা গল! আর-কিছু পোড়া পেটে বারনি আজ চার দিনের ভিতর। কিছু খেতেই হবে! আর খেতে যদি হয় তাহলে ঐ মাস্তবের গোরটো যেতে হবে! চুরি ক'রে হোক, গারের জোরে কেড়ে নিরেই হোক, কিছু খাবার তাকে পেতেই হবে এই র'হুটুগর ভিতর। তারপর, খাবার টাঁকে থাকলে সে জন্মলেও সুখে থাকবে। পুলিশের বাবার সাঁচি 'ক' তাকে ধরে?

চিরদিন আটঘাট বেধেই কাজ করে কালোমানিক। নদী চেড়ে যাওয়ার আগে সে ভাল ক'রে নেয়ে ধুরে পরিষ্কার হয়ে নিল। গারের ধুলোকাদা শুকনো রক্ত লব ঘষে ঘষে তুলে ফেলল অনেকক্ষণ ধরে। কাপড়খানা কেচে নিংড়ে, আবার সেই ভিজ়ে কাপড়ই প'রে ফেলল বাড়্যানি চ'ঙ। মাথার চুলে আঙুল দিয়েই কেটে ফেলল লম্বা টেড়ি।

এইবার বনচণ্ডীর কাছে আর একবার মানিত। জোড়: মোঘের কড়ার তো আগে থেকেই ধোয়া রয়েছে, এবারে মানিত করতে হলো মজ্জ্ব। মা-বনচণ্ডী তাকে খেতে দিক আজ রাত্তিরে, দেশের বত ডাকাত চ্যাঙাড়েকে নেক্স্তর ক'রে স্তরোরের মাংস দিরে খিচুড়ি খাওয়াবে কালোমানিক। বনচণ্ডীর খান হ'ল ডাকাতের বনে। ভোজটা হবে সেইখানেই।

কিন্তু, মাস্তব ত' এদিকে বাস করে বলে মনে হয় না মোটেই! নলখাগড়ার বনটা পেরিয়ে উঁচু ডাঙা। তাল নারকোল খেজুর আর লম্বা ঘাসে ভরা বন একটা মাঠ। মাঠের ওপারে কী আছে, চাঁদের মিটমিটে আলোতে তা ঠাहर হয় না।

অনেকক্ষণ সেই মাঠের ভিতর খামোকাই চকোর দিতে থাকল লোকটা। অবশেষে হতাশ হয়ে আবার নদীর দিকেই ফিরে বাবে ভাবছে, এমন সময় চোখে পড়ল একখানা তালপাতার কুঁড়ে। তাল-খেজুরের গাছের এমন ভিড় সেখানটার যে পুখ কাছে গিয়ে না পড়লে সে কুঁড়ে কারও নজরে আসবার কথা নয়। গাছের গায়ে গাছ, শুঁড়িতে শুঁড়িতে ঠেকাঠেকি, তারই ভিতর দিয়ে ভিড়ি মেরে মেরে গিয়ে অবশেষে কালোমানিক পৌছোলো সেই কুঁড়ের দরজায়।

প্রথমে উঁকিঝুঁকি, তারপর নীচুগলার ডাকাডাকি। ভিতরে আঁধার, মাস্তবের কোন সাদা পাওয়া যায় না সেখানে। কী করা যেতে পারে,—বেশ কিছুক্ষণ সেই কুঁড়ের সামনে ঠাড়িয়ে ঠাড়িয়ে ভাবতেই থাকল কালোমানিক। চলে বাবে? কোথায় বাবে? বাওয়ার আরগা কোথায় আছে? তার চেয়ে ভোর হোক। এই কুঁড়ের ভিতর কী আছে দেখা যাক। স্তব্ধে মনে হলো হু'একটা বিনও তো থাকা যেতে পারে এখানে! 'স্বাধিবে' বলতে অব্যক্তি বুঝতে হবে

● আঁধারে হুটল আলো
শ্রীস্বপ্ননাথ রাহা

খাতের স্তুবিধে। এমনটা হওয়া তো অসম্ভব নয় যে এ-কুঁড়ের আশেপাশে নারকোল গাছে ডাব, তালগাছে তালপান্স আর খেজুরগাছে খেজুরস অটেল পাওয়া যাবে! তা যদি হয় আর লোকজনের আশ্বাসনি বহি তেমন না থাকে, কিছুদিন বেশ আরামেই কাটবে কালোমানিকের।

কুঁড়ে থেকে বেশকিছুটা দূরে গিয়ে গাছের গুঁড়ি-দিয়ে-ঘেরা একটা জায়গায় শুয়ে পড়ল কালোমানিক। ঘুমের ভিতর শত্রুর হাতে পড়তে সে আর রাজী নয়, যেমনটা পড়েছিল গল্পের গাড়িতে। সেবারে বনচণ্ডী খুব ঠাচিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু যে-বোকা ঠেকেও না শেখে তার উপরে কোন দেবতারই দরা বেশীদিন থাকে না।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল কালোমানিকের, বেলা তখন অনেকটা। লম্বা লম্বা অশ্রুন্তি গাছ চারদিকে। তাদের তলায় এখনো যথেষ্ট ছায়া বটে, কিন্তু যেখানে গাছ নেই সেখানে খড়্‌খড়-গুলো রোদ্দুরে জলছে সেনার পাতের মত।

উঠে ঠাড়িয়ে চারদিক একবার তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কালোমানিক। মাঝে মাঝে খড়্‌খড়-ই, আর তাদের ঘিরে গাছের পর গাছের শ্রেণী। যতদূর নজর চলে, তাল নারকোল খেজুরেরা মাথা উঁচু ক'রে আকাশের ভাসন্ত মেঘের আড়ালে কী-বেন-কী পরম নিধির সন্ধানে ব্যস্ত হয়ে আছে। হ-হ-হ-হ ক'রে বাতাস বইছে এলোমেলো, তালপাতার উঠছে খরখর শব্দ, খড়্‌গুলো মাথা লুটিয়ে কোন দেবতার পায়ে প্রণাম জানাচ্ছে তা তারাই জানে।

কী জানি কেন—পাখও দল্লটার মনও হ-হ ক'রে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্ত। বুঝি তার মনে হ'ল—পৃথিবীতে একা যদি কেউ থাকে তবে সে হ'ল কালোমানিক। সমাজের ধারে-কিনারে কোথাও তার ছায়াটি দেখতে পেলেই ছেলে-বুড়ো মেয়ে-পুরুষ একসাথে ভয় পেয়ে চৈত্রে উঠবে—“ঐ যে, ঐ সেই খুনে বাতুক!” হজ্ঞে হয়ে পুলিশ ছুটবে তার পিছনে, প্রাণ নিয়ে তাকে ছুটে পালাতে হবে খালে বিলে জলার জললে। এভাবে প্রাণ কতদিন বাঁচবে? বাঁচিয়েই বা লাভ কি? তার চেয়ে—

না, না,—এসব ভাবনাচিন্তাকে মনে ঠাই দিতে নেই। ওরা মানুষকে অমানুষ ক'রে ফেলে, সাহসী পুরুষকে ক'রে দেয় ভীতু। গা ঝাড়া দিয়ে কালোমানিক ঢুকে পড়ল তালপাতার কুঁড়ের ভিতর।

ঢুকই সে আঁতকে উঠল। গায়ের লোম ঝাড়া হয়ে উঠল তার; চোখ দুটো ঠিকরে বেরুবার মত হ'ল কোটর থেকে। একটা মড়া মাটিতে প'ড়ে আছে লম্বা হয়ে।

মড়াটার মুখে মাছি বসছে, পিপড়ে ঢুকছে। দুই একদিন আগেই মরেছে হয়ত, মুখটা ফুলো-ফুলো মনে হয়। ভাগ্যিস কাল রাতে আধারে কালোমানিক ঘরের ভিতরে ঢোকেনি! তাহলে

- আধারে কুঁটল আলো
শ্রীহরীমুখা রাহা

এই মড়ার উপরে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে হয়ত তার মত অসমসামান্য ভয়ে চৌচর্যে উঠত। বেশ কিছুক্ষণ বাধে একটু ধাতস্ত হয়ে কালোমানিক মড়াটার দিকে ভাল করে তাকাল, মনে হ'ল এ-লোকটা সাধুসন্নিসা ধরনের লোকই ছিল বোধ হয়। লম্বা দাড়ি ঠিক কালোমানিকেরই মত। পরনে গেরুয়া কাপড়, দড়ির উপর ঝুলছে একটা গেরুয়া রং-এর আলখাল্লা। আর লম্বা এক ফালি কাপড় রয়েছে সেই আলখাল্লারই পাশে, তারও রং গেরুয়া। অত লম্বা অথচ অত সরু কাপড়টা পাগড়ি বাধা ছাড়া অত্ কান্ কাছে লাগতে পারে, বুঝতেই পারল না কালোমানিক।

• • •

আধ ঘণ্টা বাধে আর মড়াটাকে দেখা গেল না হুঁড়ের ভিতরে। কালোমানিক তাকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছে।

তারপর ৭ তারপর সেই তেপান্তর মাঠে শুরু হ'ল কালোমানিকের নতুন জীবন। খাওয়া-দাওয়ার চিন্তা নেই, হাঁড়িতে চাল রেখে গিয়েছেন মৃত সাহুজী! মেটে হাঁড়ি মেটে কড়া মেটে বাসন, আশুন আলবার শুকনো কাঠ এমন কি দেশলাইটি পর্যন্ত শুছিয়ে রেখে গিয়েছেন চালের বাথারিতে। মনে মনে সাহুজীর স্বর্গ কামনা করতে করতে পাঁচ দিন পরে আজ ছুঁটি ভাত রান্না করে খেল কালোমানিক।

দিন যায়, বেধা হয় না একটাও বাহুরের সাপে। খার, আর বুঝার, আর আনমনে তাল খেজুরের বনে ঘুরে বেড়ায় কালোমানিক। অতীতের কথা কমাচিং মনে পড়ে। ঐ যে চত বাতাস বইছে খড়বনের উপর দিয়ে, ঐ বাতাসই যেন পুনরাবতম রাহাআনির শতক নুতি উড়িয়ে



একটা মড়া মাটিতে পড়ে আছে লম্বা হার। [পৃষ্ঠা ৪০৪]

● আখ্যারে হুটল আলো:
প্রীত্বীজনাথ রাহা ৫

নিরে গিয়েছে কালোমানিকের অন্তর থেকে। খড়খড় মড়মড় শব্দ উঠছে তালগাছের মাথার মাথার, কী যেন ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ছে চারপাশে। কী সে? কালোমানিকের অজান্তে তার অতীত জীবনটাই ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে—তারই বৃষ্টি ঐ আওয়ার!।

অতীতের কথা মনে আগে না, ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে চায় না সে। কিসের জ্ঞান ভাববে? বহু—বহুদিন বাঘে আঁজ সে নির্ভাবনার দিন কাটাচ্ছে। মানুষ তার হৃদয়, সে-মানুষ তার ধারে কাছে কোথাও নেই, সে ভয় করবে কাকে?

তবে একটা ছোট ভাবনা—চাল ফুরিয়েছে। খাবার ভাবনা আছে বটে। ঐ ভাবনায় পাগল হয়ে একসময় সে মানুষ খুনও করেছে। আজ ও-চিন্তা তাকে পাগল করা দূরে থাকুক, ব্যাফুল পর্যন্ত করতে পারছে না। একটু সে ভাবছে তা ঠিক। ভাবছে, কাল সকালে নারকোল গাছে চড়তে হবে, ডাণ্ড পাড়তে হবে কিছু। ডাণ্ড খেয়ে ঢের ঢের দিন বাঁচতে পারে মানুষ। অমন জিনিস আর হয় না। ভাঙলেই জ'খানা রুটি, এক গেলাস জল। আর কি চাই? ভগবান তার জ্ঞান গাছে গাছে অমরন্ত খাবার যুগিয়ে রেখেছেন। চিন্তা কী?

হঠাৎই চমকে উঠল কালোমানিক। কার কথা সে ভাবছে? ভগবান? সে আবার কে? স্বপ্নের মত মনে হয়—যখন সে এতটুকু ছোট ছিল, মায়ের আঁচল ধরে সে গায়ের মন্দিরে মন্দিরে পুজো দেখতে যেত। শিব কালী নারায়ণ—স্বপ্ননোর গন্ধ শাখের শব্দ, পুরুতটাকুরের মুখের মস্তুর! ইঁা, তখন মায়ের বুখে সে স্তন্য বটে—ভগবান ঐখানেই আছেন। তারপর, দীর্ঘ—দীর্ঘ দিন, বহু বহু বৎসর; বনচণ্ডী ছাড়া আর কোনও দেবতার সঙ্গে সে সম্পর্ক রাখেনি। আর বনচণ্ডীকে মোষ-পাঠা মতই সে মানত করুক, কোনদিন একথা সে ভাবেনি যে ছেলেবেলায় মায়ের বুখে যার কথা শোনা যেত সেই ভগবানের সঙ্গে বনচণ্ডীর কোন সম্পর্ক আছে।

ভগবান? ভগবান খাবার যুগিয়ে রেখেছেন? এঃ হে হে, এতকাল কালোমানিক তাহলে এ কী ভূতের ব্যাগার খেটে বেড়াল? এই খাওয়ার জন্মই চুরি, এই খাওয়ার জন্মই ডাকাতি, এই খাওয়ার জন্মই এ-বাঁধত করেক ডজন মানুষকে সে খুন করেছে। কী বোকামি! ছি ছি ছি—নিজের উপর ঘেরা এসে দায় এ বোকামির কথা ভাবতে গেলে!

সকালে উঠে ভাল খেজুর নারকোলের বনে ঘুরছে কালোমানিক। কোন্ গাছটার সহজে ওঠা যাবে, অগচ্ উঠলেই নারকোল পেড়ে আনা যাবে পাঁচ লাভ বিনের মত,—এগাছ ওগাছ দেখে খেবে তাই ঠাণ্ডাবার চোটা করছে, এমন সময় একটা হৈ-হট্টগোল! অনেক লোক যেন কথা কইছে। নদীর ধিক থেকে অনেক লোক যেন এগিয়ে আসছে এতকি পান্নেই।

কালোমানিক লুকিয়ে পড়ল। যে-অতীতকে সে ভুলতে বসেছিল, সেই অতীতই বৃষ্টি হাত

বাড়িয়েছে তাকে ধরে নিয়ে ফাঁসিতে লটকে দেবার জন্ত। পুলিশ যদি হয় এরা তাহলে কালোমানিককে আবার পালাতেই হবে।

কিন্তু নাঃ, পুলিশ তো নয়!

কোমরে খাটো কাপড়, গায়ে আমার বালাই নেই! কালো-কালো কৃষ্ণ, হাতে কাস্তে পিঠে বোঁচকা। গোটা একটা দল—জন কুড়ি-পঁচিশের কম নয়। কারা এরা?

“বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!” বলে তারা ডাকতে লাগল পাথর ঝুঁড়ের পাশে দাঁড়িয়ে। তারা যে কালোমানিককে ধরতে আসেনি এটা বুঝতে এক মিনিটও সময় লাগে না। এরা নিশ্চয় সেই সাধুকে খুঁজছে, যাকে ঝুঁড়ের ভিতর মরা অবস্থার দেখতে পেয়েছিল কালোমানিক।

দলের ভিতর একজন বলে উঠল—“বাবাঠাকুর তপস্বী করছেন, কেউ হস্তা করবি না তোরা। যে যা ভুক্তি এনেছিল—দোরগোড়ার নামিয়ে রেখে যে যার কাজে যা। দলে যারা নতুন আছিল তাদের আবার বলে রাখছি—ঠাকুরের কাছে কেউ আসবি না। আমরা অন্তঃত, চিরদিন তাঁর থেকে দূরে দূরেই থাকি, দূর থেকেই গড় করি। দূর থেকেই হাত তুলে তিনে আশীর্বাদ করেন, তাতেই আমাদের ভাল হয়। দোরগোড়ার গড় ক’রে যে যার কাজ শুরু কর। খড়উড় কেটে ঘরে ফিরতে হবে দিন লাতেকের ভেতর।”

চিপু চিপু ক’রে দোরগোড়ার গড় ক’রে লোকগুলো কেউ ঢাল, কেউ ডাল, কেউ আনাঙ্ক-পাতি, কেউ-বা এক ভাল গুড় নামিয়ে রাখল বাবাঠাকুরের জন্ত। তারপর দল বেঁধে গিয়ে পড়ল খড়ের ভূঁইয়ে। খড় কাটবার সময় এটা। ওরা খড় কেটে নৌকো বোঝাই ক’রে নিয়ে যাবে।

ওদিকে বিশখানা কাস্তে ঘন্ ঘন্ শব্দে খড় কেটে নামাচ্ছে, এদিকে বাবাঠাকুর গাচের আড়ালে আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে কোনমতে এসে ঘরে ঢুকল। ওরা দূরে দূরে থাকে, দূর থেকেই গড় করে? কালোমানিক যদি দূর থেকে হাত তুলে আশীর্বাদ করে, তাহলেই ওরা পূর্ণ হবে? এ তো মন্দ নয়! কালোমানিক তো সাধুবার গেকরা কাপড়ই পরে একরকম দিন। আজ থেকে আলখান্ধাটা পরে আর পাগড়িটা মাথায় চড়িয়ে রাখবে সে। দূর থেকে দেখে ওরা ভাববে—তারেই সেই মারুণী বাবাঠাকুর যুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন। হাত তুলে আশীর্বাদ করা? অত-অত খাবার জিনিস ব্যাড়া দিয়েছে, তাদের আশীর্বাদ করা কালোমানিকের মত পাখাণের পক্ষেও শক্ত নয়।

দিন যায়। রোজই দূর থেকে গড় করে কৃষাণেরা। রোজই হাত তুলে আশীর্বাদ জানায় কালোমানিক। তাতেই তাদের ভক্তি উথলে ওঠে। কালোমানিক যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সে সবে আসার পরেই সেখানকার দুলা খাবলা খাবলা তুলে নিয়ে তারা গারে যাবে। কেউ বা সে-গুলো

● অঁথারে ফুল আলো
প্রিয়খাননাথ রাখ

কাপড়ের খুঁটেও বেধে নের বাড়ির লোকদের জন্ত। বলাবলি করে—ও-ধুলোর অনেক গুণ। কঠিন কঠিন ব্যারাম সেরে যায় বাবাঠাকুরের পায়ের ধূলা পেলে। তা নইলে কি আর তারা অত ভক্তি করে বাবাকে ?

দিন সাতেক পরে ওদের কাজ শেষ হয়ে গেল। খড় উঠে গেল নৌকায়। তখন



তালপাতা কেটে বাবাঠাকুরের কুঁড়ে মেরামত করতে লেগে গেল তারা। পাতার চালা, খড়ের মটকা। পাতা দিয়ে বেড়া দেওয়া চারদিকে। বছর বছরই এইভাবে তারা মেরামত ক'রে দিয়ে যায়। বছর দশেক ধরে দিচ্ছে। বাবাঠাকুর ঐ বছর দশেক আগেই প্রথম আসেন এই তালবনে বাস করতে। সাধ্বাৎ দেবতা! তা নইলে এই ভূয়ুগির মাঠ—হুই দিনের পথে কোথাও জন-মনিয়ি নেই, এখানে মানুষ থাকতে পারে ?

সবাই মিলে ঘর মেরামত করছে, কালোমানিক ধ্যানস্থ হয়ে আছে তালগাছের গোড়ায়। ওদের সমুখে ওকে ধ্যানস্থ হয়েই থাকতে হয়। ধ্যানের ভান ক'রে চোখ বুজে ! সাত-পাঁচ

পুলিসের দারোগা এসে প্রণাম করলো কালোমানিককে। [পৃষ্ঠা ৪৩৯

অনেক-কিছু ভাবে। এক এক সময় এও ভাবে যে সত্যিকার একটা সাধুই যদি সে হোত, ব্যাপারটা হোত কত আনন্দের। এখন এটা যা ঘটছে তাতে আনন্দ নেই, আছে মাত্র একটু নির্ভাবনার সোরাণ্ডি। খাবার চিন্তা নেই পুলিসের ভয় নেই—এইটুকু মাত্র সোরাণ্ডি। কিন্তু তার সঙ্গে ? সেই সোরাণ্ডির সঙ্গে মিশে রয়েছে অনেকখানি লজ্জা, অনেকখানি ধিকার ! ছিঃ ছিঃ

- কীধারে ফুটল আলো
- শ্রীমদ্বীন্দ্রনাথ রায়

—এসে কী করছে? এত বড় পাখিষ্ট হয়েও সাবু সেজে বসে লোকের ভক্তি কুড়ানোর কী অধিকার আছে তার? মানুষ খুন করার চাইতেও এতে স্থিতি বেশী পাপ!

চোখ বুজে বসে এইরকমই কী-একটা ভাবছিল কালোমানিক, চম্পা একটা চিৎকার—
“বাবাঠাকুর! বাবাঠাকুর!” চট করে চোখ মেলে কালোমানিক দেখল—নফর কুখান নদীর দিক থেকে দৌড়ে আসছে, তার পিছনে—কী সবনাশ! পুলিশ!

নেকা খড় বোকাই হয়ে নদীতে ভাসছে তারই পাঠারার ছিল নফর। যেমন কালো, তেমনি জোয়ান, তেমনি কালো দাড়ি। কালোমানিক অনেক সময় ভেবে দেখেছে—তার নিজের সঙ্গে নফরার অনেকখানি চোচাবার মিল আছে। দোট নফর ছুটে আসছে পুলিশের হাড়া খেয়ে। উপায় থাকলে কালোমানিকও উঠে ছুটে পালানো। কিন্তু তা আর এখন সম্ভব নয়। যে তক্তা কুখানদের সম্মুখে ছুটে পালানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। এক ঘেন ওকে জোর করে বলিয়ে রেখে দিল তাগতলাতেই।

আজ আর দু'ব দু'ব থাক' নয়, নফর ছুটে এসে পা জড়িয়ে ধরল তার—“বাচাও দেবতা! তুমি জানো আমি খুন করিনি।”

পুলিসের দারোগা এসে প্রণাম করল কালোমানিককে। “আপনি মাথাভাঙ্গার মাঠের বাবাঠাকুর, আপনার কথা আমরা শুনেছি। মহাপুরুষ আপনি। এলোকটাকে আমরা ধরে নিয়ে বাব, আপনি অনুমতি করুন। আপনি একে জানেন না, জানবার কথা নয় আপনার। এর নাম মানিক সর্দার ওরফে কালোমানিক। কুজ সাউয়েব বাড়িতে ডাকাতি করতে গিয়ে চট্টো খুন করে নিজহাতে। তারপরে তিন দিনের রাগা পেরিয়ে এসে খুন করে একটা গাড়োয়ানকে, আর আমাদেরই এক দারোগা হরিনাথবাবুকে। এখন কুখানদলে মিলে ও এই মাঠে এসে পড় কাটছে শুনে আমরা ধরতে এসেছি ওকে। ও এতবড় মহাপাণী যে পঞ্চাশবার কীসি হলোও বোঁগা দণ্ড হয় না।”

একা নফর নয়, পঁচিশটা কুখান তখন কালোমানিকের পায়ে লুটোচ্ছে—“বাচাও বাবা-ঠাকুর, বাচাও! তুমি তে জানো নফরা ডাকাত নয়! তুমি দেবতা, তুমি তে সব জানো!”

কালোমানিক উঠে দাঁড়াল। একটু হাসল ওদের পানে চেয়ে,—“ট্যা বাবারা আমি সব জানি। নফরা ডাকাত নয়, ওর কোন ভর নেই! দারোগাবাবু, আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। ও লোকটা সত্যিই কুখান, ডাকাত নয়। আসল ডাকাত হ'ল এই!”

নিজের বুকে হাত রেখে কালোমানিক দীরে দীরে বলল—“আসল ডাকাত, মানিক সর্দার ওরফে কালোমানিক—এই আমি—পঞ্চাশবার কীসি হলোও সত্যিই বাব বোঁগা দণ্ড হয় না।”



স্বাস্থ্যের ফোয়ারা

—ঐক্যগোষ্ঠীর বক্তব্যোপাধ্যায়

ধোঁয়া! কী গাঢ় সে ধোঁয়া! ধোঁয়ার কুণ্ডলী!—
ধোঁয়ার কুণ্ডলী-জড়ানো একটা বাজপাখি যেন উষ্কার
মত বেগে নীচে নেমে আসছে।

সেদিন সে ছবি যারা দেখেছিল, আজও তারা তা ভুলতে পারেনি। মনে
হলে ভয়ে ও আতঙ্কে আজও তারা শিউরে ওঠে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এমন দৃশ্য অবশ্যি একেবারেই নতুন নয়। আকাশের পটে
এমনিধারা বিমান-ধ্বংসের ছবি যখন-তখন ফুটে উঠতো, আর যুদ্ধের ভয়াবহতা সকলকে
স্মরণ করিয়ে দিতো। এমন ঘটনা তখন প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত
হয়েছিল।

তবু শত শত ধ্বংসদৃশ্যের মধ্যে ২৩শে জুন তারিখের সেই দৃশ্য আজও যেন
সকলের মনের পাতায় অক্ষয় ভাবে আঁকা রয়েছে!

এর একমাত্র কারণ—পাইলট বব হ্যারিস্ নিজে।

পাইলট বব হ্যারিস্ ছিল সেদিনের সেই হতভাগ্য বিমানের চালক। মাত্র দশ
মিনিট পূর্বে সে একটা স্টেশন থেকে রওয়ানা হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাকে
ভাড়া করে আসে শত্রুপক্ষের দু'টি বোমারু-বিমান।

পাইলট হ্যারিস্ খুব কৃত্তী বৈমানিক। কিন্তু দু' দু'টি মারাত্মক শত্রুর আক্রমণ
থেকে সে তার বিমানখানিকে সেদিন বাঁচাতে পারলো না। শত্রুর প্রচণ্ড আক্রমণ—
গোলার আঘাত—কিছুক্ষণ সে এড়িয়ে গেল বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক জ্বলন্ত
গোলা এসে পড়লো বিমানের সম্মুখ দিকে।

প্রচণ্ড শব্দে এক ভয়ংকর বিস্ফোরণ! সঙ্গে সঙ্গে ধূ ধূ করে কেঁপে উঠলো
প্রকাণ্ড বিমানখানি। আর—তার পরেই এক তুফান অগ্নিকাণ্ড!

হ্যারিস্ চেষ্টা করে তখনো—কোন রকমে যদি বিমানখানি বাঁচান যায়! কিন্তু
তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। আহত পাখির মত ভীরবেগে নেমে আসতে লাগলো
বব হ্যারিসের বিশালকায় বিমান।

হারিসের নাকে-মুখে তখন ধোঁয়া ঢুকতে শুরু করেছে—আগুনের উত্থাপ তাকে তখন বলসে দিতে চায়!

বব্ হারিস্ শুধু বৈমানিকই নয়, একজন পালোয়ানও বটে। তার শক্তি, সাহস ও ধৈর্য সামরিক বিভাগের অনেকের কাছেই উন্নত। কিন্তু সেও আজ যেন হতভম্ব হয়ে গেল! এমন বিপদে মাথা ঠিক রাখা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠলো।

হতাশার কোলে সে প্রায় এলিয়ে পড়ছিল। কিন্তু পরক্ষণেই কে তার অন্তরে তাকে তীব্র কশাঘাত করে বললে, কি আশ্চর্য! তুমি না একজন মহাবীর? তুমি না পালোয়ান?—

হারিস্ আর দেহী করলো না এক মুহূর্ত। চোখের পদকে সে তার পারাশুট খুলে, তাই নিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়লো।

বিমান তার বাঁচেনি বটে, কিন্তু সে বেঁচে গেল সে যখন। বৃষ্টি জননী বসুন্ধরার স্নেহময় আকবণেই সে রক্ষা পেয়ে গেল।

জননী বসুন্ধরা,—মাটি-মা।—

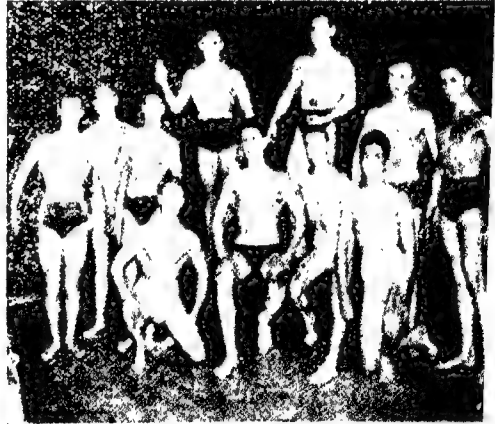
সুদূর অতীতে মাটি-মায়ের ছিল তরুণ বয়স। সেই তরুণ বয়সেই মাটি-মায়ের ছিল এক বিশিষ্ট রূপ। তার দেহ ছিল কোমল, অন্তরে ছিল সরসতা!

বুঝি আঙুলের মূহু টিপুনিও সেদিন তার অন্তর-বাহিরে দাগ রেখে যেতো! তরুণ বয়সের পৃথিবী সেদিন ছিল এত কোমল ও কমনীয়!

কিন্তু তারি সন্তান, মানুষগুলি,—তারা তো মায়ের মত হলো না! বব্ হারিস্ তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মায়ের কোমলতা আঁকড়ে ধরে তারা দেহ-মনে নিজেদের এলিয়ে দিতে চাইলো না! তারা হয়ে উঠলো বিপরীত।

তরুণ মানুষ আজ হিমালয়ের কাঠিন্য নিয়ে মাথা উচু করে উঠে ঝাঁড়াতে চায়! এক নতুন পৃথিবী গড়বে বলে তারা যেন অংহকারে ফেটে পড়তে চাইছে!



দেহ শক্তির, আর অন্তর বরনটন অনন্ত উদার! [পৃষ্ঠা ৪৪১]

● বাহ্যের কোয়ারা

শ্রী:বিশেষজ্ঞ বন্যোপাধ্যায়

তাই দিকে দিকে আজ শুধু তরুণের জয়ডঙ্কা, তরুণের মিলন-তীর্থ! তাদের একমাত্র উচ্চাকাঙ্ক্ষা—তারা দেহে গড়বে আলস-এণ্ড্‌জ্-হিমালয়, কিন্তু তারা অন্তরে ছড়িয়ে দেবে শরতের নীলাকাশ, অথবা লুটিয়ে বিলিয়ে দেবে সীমাহীন প্রশান্ত মহাসাগর!

মোট কথা,—দেহ স্ফুটন, আর অন্তর বন্ধনহীন অনন্ত উদার! এই তাদের আকাঙ্ক্ষা! এই তাদের উচ্চাশা!

তরুণ স্ফাণ্ডে একদিন এমনি মানস নিয়ে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন! জীবন-সাধনা তিনি শুধু শক্তিশালতের জন্মই নিয়োজিত করেছিলেন।

সাধনা তার ব্যর্থ হয়নি—পাথর গুঁড়িয়ে তিনি তাঁর সারা দেহ দিয়ে লোহ-কাঠিমা উপভোগ করেছিলেন!

বৃষ্টি স্বর্গের দেবতাও সেদিন তাঁকে ঈর্ষা করেছিল—বিস্ময়ে চোখের পলক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল!

শক্তি-সাধক স্ফাণ্ডে সেদিন যথার্থই বুঝেছিলেন, জননীর দেহ-মন কখনো সন্তানের অমুকরণীয় হতে পারে না। তরুণ বয়সে জননী যে মূর্ত কোমলতা নিয়ে সন্তানের স্তন্থে ঝাঁড়াবে, এতো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তান তার তেমনিধারা হলে চলবে কেন?

স্ফাণ্ডে তাই দেহ-মনে অপরূপ শক্তিশর হয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন,—পৃথিবী আজও তাঁকে ভুলতে পারেনি!

কিন্তু তাই বলে কেউ যদি মনে করেন যে, অতীতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় মহামন্ন, তাহলে খুবই ভুল ধারণা করা হবে। কারণ মল্লবীর স্ফাণ্ডের শত গৌরবের মধ্যেও কেমন করে এক বিন্দু কলঙ্ক-কালিমা পড়ে গিয়েছিল!



হার্কেউলিস্ ম্যাক্ক্যান্

স্ফাণ্ডের মত শক্তিশালী ব্যক্তিও একদিন এক শক্তি-পরীক্ষায় পরাজিত হয়েছিলেন!—

সে হলো ১৮৯০ সালে। হল্‌বর্নের ‘রয়েল মিউজিক হলে’ আজও তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। স্ফাণ্ডকে সেদিন যিনি হারিয়েছিলেন, তাঁর নাম হার্কিউলিস্ ম্যাক্ক্যান্ (Hercules Mc Cann)।

কিন্তু আশ্চর্য! সেদিনের সেই বিজয়ী মল্ল ম্যাক্ক্যান্—আজ তিনি কোথায়? পরাজিত স্ফাণ্ডের ভুলনায় বিজয়ী ম্যাক্ক্যান্ যে বিশ্বস্তির মহাসমুদ্রে তলিয়ে যাবার জন্ম অপেক্ষা করছেন!

তাহলে কিসের দৌলতে স্ত্রীপুত্র এই মহা সৌভাগ্য ?
বিজয়ী মাক্কান যে শক্তিচর্চা করেছিলেন, তিনি নিজেকেই ছিলেন তার উদ্দেশ্য। তিনি শুধু নিজেকেই গড়ে-পিটে শক্ত-সমর্থ করে তুলেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীপুত্রের অনুশীলন ছিল অতরূপ।

শক্তি-সাধনায় তিনি তাঁর দেহ-মনে বজ-কাঠি এনেছিলেন। কিন্তু শুধু নিজের জগুই নয়, অসংখ্য তরুণের কাছে তিনি তাঁর নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন, দিয়ে গেছেন এক নতুন পথের ইঙ্গিত।

স্ত্রীপুত্র আজও তাই অমর হয়ে আছেন। আর মাক্কান—তিনি যে কোথায় তিনিয়ে যাবার পথে যাত্রা করেছেন কে জানে ?—

কৃতী শক্তি-সাধক বারা, পৃথিবী তাদের কোনদিনই ভুলতে পারেনি। বরং শক্তিকে কেন্দ্র করে আরো কত কিছু পৌরাণিক চরিত্র আনাদের চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে !

তাই স্ত্রীমসন ও হার্কিউলিস আজও আনাদের কাছে শক্তির মূর্ত প্রতীক।—

কিন্তু শক্তি-সাধক বারা, আদর্শের সংঘাত তাঁদের মধ্যে চিরদিনই রয়ে গেছে। এত বড় দুর্দশ শক্তিশালী স্ত্রীমসন, কিন্তু তার সে শক্তি কোন পৌরুষের কাছে নিয়োজিত হলো না; আর তার ফলে শুরু হলো তার শক্তির হ্রাস।

কিন্তু বীর হার্কিউলিস বৃষি অগ্নি ধাতুর ভৈরী। তবে ভাগ্য তার বিরূপ। তাই পুনঃ পুনঃ তাকে টেনে নিয়ে গেছে বিপদের মুখে। কিন্তু তার অতুলন পৌরুষ তাকে সকল সংগ্রামে জয়যুক্ত করেছিল। তাই দিকে দিকে আজ অনুভূত হয়েছে শক্তি-সাধনার প্রয়োজন।



দুগ্ধ পানভারে
হেঁটে চলে যান
রে জিহিনেজ
[পৃষ্ঠা ৪৪৪

● বাস্তবের কোথার

শ্রী:বাগেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেব দেউল

পাশ্চাত্য জগতে তরুণের দল তাই আজ আর শুধু ভাস-পাশা ইত্যাদি কুড়ুমি খেলায় সময় কাটায় না। তারা আজ সংঘ-তৈরির কাজে উঠে পড়ে লেগেছে।

এদেশ যখন সিনেমা-হিলোলে নৃত্যের ছন্দে ভেসে চলে, ওদেশ তখন স্বাস্থ্যচর্চায় মনোনিবেশ করে। নিজেদের দেহে আলস্ পর্বতমালার উঁচু-নীচু তরঙ্গের সৃষ্টি করে যায়।



ওদেশের রে জিমিনেজ্ (Ray Jiminez) যখন তাঁর দৃশ্য পদভারে জননী বসুন্ধরার কোলের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যান, তখন মদমত্ত সিংহও বুঝি লজ্জায় নতশির হয়ে থাকে!

এক বিখ্যাত সাহিত্যিক ঘোষণা করেছিলেন, অন্ধকারেরও রূপ আছে। অন্ধকারের রূপ দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কোন কিছুর সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে তেমনি অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োজন।

অন্ধকারের রূপ আছে; কিন্তু উঁচু-নীচু এবড়ো-খেবড়ো জিনিসের কি তেমনি রূপ থাকতে পারে না। সন্দেহ যদি কারো থাকে তাহলে সে একবারটি তরুণ ব্যায়ামবীর ফ্রাঙ্ক ভাস্কেজের (Frank Vasquez) দেহের দিকে তাকাও দেখি।

তরুণ ব্যায়ামবীর ফ্রাঙ্ক ভাস্কেজ

স্বাস্থ্যের পেশী-তরঙ্গ তাঁর সর্বদেহে!
স্বর্গের শ্রমমা তাঁর দেহ-মনে লীলায়িত!

কিন্তু একদিনে কি শক্তি-সাধনা সার্থক হতে পারে? না, তা কখনো সম্ভব নয়। সে জন্ম প্রয়োজন মাসের পর মাস কঠোর সাধনা।

সরু লিক্লিকে কিশোর, রাসেল্ গ্রে (Russel Gray) ব্যায়াম আরম্ভ করার পূর্বে পৃথিবীর এক আবর্জনার মতই ছিল। কিন্তু মাত্র কয়েক মাস ব্যায়াম করার

● বাহ্যের কোঠার

প্রিয়োপদেশে বন্যোপাখ্যার



ব্যায়ামের পূর্বে—রাসেল গ্রে

স্বামি ত্রিয়ারলী ও বব্‌ হারিস্‌ দু'জনাই বলেছেন, শুধু ব্যায়াম করলেই স্বাস্থ্য ও শক্তিশালিত করা সম্ভব নয়। বিখ্যাত চিকিৎসক ডাক্তার হোয়াইটহেডও (Dr. Whitehead) তেমনি কথাই বলেছেন।

ডাঃ হোয়াইটহেড্‌ বলেন, ব্যায়ামচর্চার সঙ্গে আমাদের একটি দেহবস্তুর দিকে সতর্ক দৃষ্টি থাকে প্রয়োজন। সে যন্ত্রটি হচ্ছে—লিভার (Liver) বা যকৃত।

আমাদের দেহবস্তুর যে কয়েকটি কোষ আছে লিভার তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কোষ। দেহের দূষিত রক্ত বিশুদ্ধ করাই লিভারের কাজ। সে কাজ যদি বীতিমত সম্পন্ন না হয়, তাহলে নানা রকম ব্যায়াম হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

পরেই তার যে চেহারা হয়েছে দেখা গেল, স্বাস্থ্যের স্রবণা তায় তখনই বিকশিত হয়ে উঠেছে।

স্বামি ত্রিয়ারলী বাহান্তর বছরের বৃদ্ধ। তিনিও যখন অনেক কিছু ব্যায়ামে ভোগার পর চিকিৎসকের পরামর্শে স্বাস্থ্যচর্চা শুরু করে দেন, তখন সকলে তা এক বিস্ময় বলেই মনে করেছিল। কিন্তু কিছু কাল স্বাস্থ্যচর্চার পর তারও দেহ-মনে যখন স্বাস্থ্যের জলুস ফুটে উঠলো, তখন হলো আর-এক মহা-বিস্ময়!



ব্যায়ামের তিন বছর পরে—রাসেল গ্রে

● বাহ্যের কোয়ারা

প্রিয়োগেশক্রে বসোপাধ্যায়

দেব দেউল

লিভার তার কাজ করে যায় বলেই আমাদের তেল-ঘি-চর্বি সহজে হজম হয়ে যায়। আমাদের রক্তের মধ্যে একরকম চিনি মেশানো আছে। লিভার সেই চিনির অংশকে 'গ্লাইকোজেন' নামক একটি সার-পদার্থে পরিণত করে। আর এ জিনিসটাই আমাদের খুবই আবশ্যক। আমাদের যা কিছু উৎসাহ ও শক্তি, গ্লাইকোজেনকে তার উৎস বলা যায়।

লিভারের কাজ সঠিকভাবে সম্পন্ন না হলে আমাদের ভুক্তব্রব্য পরিপাক হয় না, কোষ্ঠকাঠিন্য এসে যায়। বুক-খড়ফড়ানি, কামলা বা ছাঁবা রোগ ও রক্তচাপ লিভারের অক্ষমতার জন্মই এসে যায়। কাজেই লিভারকে একেবারেই তুচ্ছ করা সংগত নয়।

লিভারকে কর্মক্ষম ও সতেজ রাখতে হলে কতকগুলি খাওয়া একেবারেই বর্জন করা উচিত। তৈলাক্ত বা বেশী চর্বি-মেশানো খাবার, ভাজা জিনিস, কোকো, চকোলেট ইত্যাদি স্পর্শ করাও অগ্য।



লিভারের পক্ষে ভালো হচ্ছে নানারকম ফল, তাজা শাক-সবজি ও দুধের সঙ্গে মিশিয়ে ফল বা সবজির রস। প্রতিবার আহারের পূর্বে এক চামচ (টেবিল-চামচ) নেবুর রস খাওয়া খুবই ভালো। লিভার যাদের বড় হয়ে গেছে, এই-ভাবে নিয়মিত নেবুর রস

বাহ্যস্তর বছরের বৃদ্ধ স্থান ত্রিয়ারলী [পৃষ্ঠা ৪৪৫

পান করলে তাদের সেই ব্যাধিগ্রস্ত বড় লিভারও ছোট হয়ে আসে। নেবুর রস একটুখানি সৈঁকে নিয়ে মুন মিশিয়ে খেলে দুর্বল রূপিণী শীঘ্রই সবল হয়।

লিভার যাদের সতেজ ও কর্মক্ষম থাকে, অসাধারণ কাজের চাপেও তারা মূড়ো পড়েনা। তাদের কর্মশক্তি হয় অদম্য ও অক্ষুরন্ত।

অমন বিপদে পড়েও পাইলট বব্ হারিস্ যে তার কর্তব্য ভুলে যায়নি, তখনো যে তার মাথা গুলিয়ে যায়নি তার একমাত্র কারণ,—তার বলিষ্ঠ লিভার।

বব্ হারিস্ একথা নিজের মুখে বলেছে।

● বাহ্যর কোরা

প্রিয়গোপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সর্বাস্থে অসংখ্য ক্ষত-চিহ্ন নিয়ে বব্ হারিস্ আজও পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করছে।

ভয়ে বা আতঙ্কে সে তার বিপজ্জনক কাজ ছেড়ে দেয়নি, আজও সে সামরিক বিভাগের এক বিখ্যাত পাইলট।

পেন্সন সে নিতে পারতো অনেক আগেই। কিন্তু তা সে নিলে না। আজও এখানে-সেখানে নানা যুদ্ধের নানা রঙ্গমঞ্চে সে তার সুবিশাল বিমান-খানি নিয়ে ছোট্ট ছুটি করে।

শত্রুর গোলা-গুলি বা আগুনে-বোমাকে আজও সে ভয় করে না।

আজও সে যখন তার বিমানের ওপর সদর্পে বসে থাকে, তখন স্বর্গের দেবতা স্বয়ং ইন্দ্রও বুঝি তার পাশ কাটিয়ে যেতে চান!

মনে হয় একখানি স্বাস্থ্যের ফোয়ারা যেন তার উপযুক্ত বাহনের ওপর সদর্পে বসে রয়েছে!



আজও হারিস্ বিমানের ওপর সদর্পে বসে থাকে।



রায়ডাক্‌ বায়েন্‌ডাক্‌

— শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অজুন সেনকে তোমরা নিশ্চয়ই চেন না? কী করেই বা চিনবে? আমার সঙ্গে সে কখনো কখনো শিকারে গিয়েছে বটে, কিন্তু একটি দিনও বন্দুক ধরেনি। তবে মাঝে মাঝে তার দু'চারটে উপদেশ এমন 'লাগসই' হত যে আমরাই অবাক হবার পালা। তবু কেন যে সে কারো কাছে ধরা দিতে চাইতো না, তার রহস্যটা এখনো খুঁজে পাইনি।

পাক্সা ছ' ফুট লম্বা দোহারা গড়ন, ঘন-কৃষ্ণিত কেশে ব্যাক-ব্রাশ—খাকী পোশাকে তার জাঁদরেল চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। লম্বা নাক, বড় বড় চোখ দু'টিতে অস্বাভাবিক নীপ্তি। চিবুকের ভাঁজে এমন একটা চাবুকের মত রেখা, দেখলেই মনে হয়, তার সব কিছুতেই 'ডোর্ট কেয়ার' ভাব। চাপা ঠোঁটের আড়ালে এমন একটা চাপা হাসি লুকিয়ে থাকতো, যার অর্থ, প্রয়োজন হলে সে যেন সব কিছুই একটিমাত্র মুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারে। যুদ্ধেরত কিনা—আবিসিনিয়ার যুদ্ধে সে নাকি নাম করেছিল। তবে সৌভাগ্যের কথা, তার মিলিটারি মেজাজের পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

সহজে কথা বলতে সে নারাজ—কিন্তু একদিন কবি-বন্ধু অবনীকান্তের খোঁচায় মনের কোন্ এক সূক্ষ্ম তারে বা পড়তেই অর্জুন সেন একটার পর একটা তার শিকার অভিজ্ঞতা বলতে থাকে। তার দ্বিতীয় গল্পটাই আজ তোমরা শোনো।

সেদিন বর্ষার সন্ধ্যা। প্রথম কিস্তি চা দিতে চাকরটা এত দেরি করে কেন, খোঁজ নিতে বাইরে এসেই দেখি বন্ধু অর্জুন সেন জলে ভিজতে ভিজতে সিঁড়ি দিয়ে ষটমুট ক'রে উঠে আসছে। দু'হাত তুলে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলি, আরে এসো ভাই সবাসাচী, এসো। এমন দিনে যে তোমাকে কাছে পাব তা ভাবতেও পারিনি। এসো, বর্ষায় আসর জমিয়ে বসা থাক্।

কবি-বন্ধু অবনী কল্লনায় যেমন সিদ্ধহস্ত, ষাণ্ড-পরিকল্পনাতেও তার জুড়ি নেই। তিনি তখনি কাব্য-প্রতিভার একটি ঘিয়ে-ভাজা নমুনা ছুঁড়ে দিলেন—

এমন বন ঘোর বরিষায়—

এমন দিনে তোরে বলা যায়—

পরান চা-চা ক'রে 'সমার' বরষরে

বসে যে আছি তারি ভরসায়।

—অতএব বেয়ারা ডাকো—অন্দরে ধবর পাঠাও—আমুযন্ত্রিক মালগুলো না আসা পর্যন্ত স্থিরো ভব—তারপর চায়ের পেয়লায় চুমুক দিয়ে শ্রীল শ্রীযুক্ত অর্জুন সেনের সিনা-ফুলিয়ে-গল্প-বলার শ্রোতে ভেসে যাও—কী বল হে ?

অবনীর উচ্চ্বাসে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না—কিন্তু অর্জুনের মুখের ভাবটা হঠাৎ ধমধমে হয়ে উঠতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম—তাকে ধামিয়ে দেওয়া দরকার। বলা যায় না, মিলিটারি মেজাজ কখন বিগড়ে ওঠে। 'কবির্য নিরতুল'—এ পাঠশালার ছাত্র সে তো নয়। তাই অবনীকে চোখ টিপে বলি—হয়েছে, হয়েছে, তোমার কবিত্ব এখন মূলত্ববী থাক্—চা কচুরির ফরমাশ আগেই দিয়ে রেখেছি। আজ নাকি মাছের কচুরি হবে—তাই কিফিৎ বিলম্ব আছে। অতএব আমি প্রস্তাব করি, ততক্ষণ অর্জুন তার গল্প আরম্ভ করে দিক।

সেদিনকার মজলিসে পোস্টমাস্টার মশাই উপস্থিত ছিলেন। একটা জরুরী কাজ নিয়ে তিনি এসেছিলেন, বৃষ্টি এসে পড়ায় তাঁর যাওয়া হয়নি। তিনিও এক কোণে একটি চেয়ারে চুপ করে বসেছিলেন। আহা বেচারী! কতই না ষাটতে হয়—কত দূরদূরান্তের স্রব-দুঃখ হাসি-কান্নার ধবর ঘরে ঘরে পৌছে দেওয়ার মালিক তিনি। তারপর কলমপেশা তো আছেই—তাই সন্ধ্যা লাগতেই তিনি

চলতে শুরু করেন। হঠাৎ তিনিও যেন সজাগ হয়ে উঠলেন—সেই ভাল, গল্পটাই আরম্ভ হোক।

একটা ফ্রন্টস্ট্রী করে অজু'ন একবার সেদিকে চাইলে। আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম—কিছু মনে করার নেই—ইনি ক্লান্ত জীব—নেহাত গোবেচার। তবে যখন বাথ শিকারের গল্প শুনতে এঁর উদগ্র বাসনা, চালিয়ে যাওনা কেন?

অজু'ন সেন আর কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করেই বললে, আজকের কাহিনীটা তেমন বড় নয়—তবে বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে কিছু কম যায় না।

অবনী বললে, সেই ভাল, কারণ একটু পরেই তো চা-টা সব আসছে—সেটাও তো আরামসে গিলতে হবে!

অজু'ন বলে যায়—অনেক দিনের কথা বলছি। আমার যুদ্ধে যাওয়ার আগের ঘটনা।

সেবার কোশী নদীর উজ্জান ধরে তরাই অঞ্চলে আমাদের তাঁবু পড়েছে। সামনে ভয়াবহ অরণ্যপথ। একদিন একাই জঙ্গলে ঢুকে পথ হারিয়েছি। সন্ধ্যা আগতপ্রায়—আকাশেও পুঞ্জীভূত মেঘ। চিন্তায় ও পরিশ্রমে সমস্ত শরীর বেয়ে ঘাম ঝরে পড়ছে। হঠাৎ দেখি এক গাছতলায় একটি বৃদ্ধ গালে হাত দিয়ে বসে আছে। আমাদের দেখেই হাতছানি দিয়ে ডাকলে, আর কী বললে, জানো?

—বুঝেছি সাহেব, তুমি পথ হারিয়েছো। আমার সঙ্গে এসো—তোমার আস্তানায় পৌঁছে দি। কাঠ কাটতে এসেছিলাম—হাঁপটা বেড়েছে কি না, তাই আজ আর কিছুই হোল না।

তাঁবুতে পৌঁছে তাকে কিছু বকশিশ দিতেই সে হাতজোড় করে আপত্তি জানায়—আপনাকে পথ দেখিয়েছি, পয়সা নেব কেন?

বৃদ্ধের কথায় মুগ্ধ হলাম। কিছুতেই কোনো মতেই তাকে কিছু নেওয়াতে পারিনি। সেদিনের সেই কথা আজও আমার মনে দাগ কেটে বসে আছে।

পোস্টমাস্টার মশাই হঠাৎ গলা বাড়িয়ে বলে উঠলেন—এর মধ্যে বাঘের গল্প কৈ?

অজু'ন সেন বাধা পেয়ে চট করে বলে ওঠে—ওঃ, তোমরা বুকি ভূমিকা বাদ দিয়েই শুনতে চাও? তাহলে থাক এধানকার কথা। এবার সোজা বাঘের দেশেই যাওয়া থাক। শোনো—

কলকাতা থেকে আমরা জনাচারেক বন্ধু একদিন দার্জিলিং মেলে চেপে বসলাম। উদ্দেশ্য শিকার—কিন্তু দার্জিলিংয়ে নয়—ডুমার্সের এক চা-বাগানে আমার

● রাহডাকে বাঘের ডাক

ঐদীপেন্দ্রনাথ রায়

এক বন্ধুর নিমন্ত্রণে আমরা চলেছি। ড্রাসের যেমন খ্যাতি, তেমনি অখ্যাতি। খ্যাতির কারণ, সেদিকে শিকার নাকি প্রচুর। আর অখ্যাতিটা পুই মারাত্মক, কারণ একবার যদি ম্যালেরিয়া প্রচুর দম্বা হয়, তাহলেই কালাজর, তার ওপরেও ব্র্যাক-ওয়াটার ফিভারের কথা আর বলে কাজ নেই।

কবি অবনীকান্তের প্রশস্তি-বচন—যা বলেছ, ভাই,
ম্যালেরিয়া, ম্যালেরিয়া, দূর দূর কাঁপে হিয়া,
ধনে প্রাণে মারা যায়, হায় হায়, হায় রে।

অর্জুন সেনের রৌষকষায়িত দৃষ্টি। হাত তুলেই ধমক দিয়ে বলে—বাগড়া দিও না—শুনে যাও। পার্বতীপুরে গাড়ি বদল করে সেই লালমণিরহাট, আগার গাড়ি বদলে ছোট লাইনে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনওরকমে নির্দিষ্ট স্টেশনে পৌঁছুতেই দেখি বন্ধুবর তার চা-বাগানের গাড়িটি নিয়ে সশরীরে হাজির। আদর-আপায়ন কোনও কিছুই ক্রটি নেই। প্রথমতঃ বিশ্রাম, ৩ রপর জলযোগান্তে কিছুটা এদিক-ওদিক ঘুরে ফিরে দেখে নেওয়া গেল।

শিকারের জায়গা একটা বেছে নেওয়া দরকার। বন্ধু বললেন, সে জগ্জে চিন্তা নেই—এখান থেকে মাইল বারো দূরে একটা পাড়াগাঁয়ে বাগেব পুইই অত্যাচার। অবশ্য বাগ ঘুরে ফিরে আমাদের এদিকেও রূপা করে দর্শন দিয়ে যান, কিন্তু বড় বেশী হামলা করেন না, এই যা রক্ষে!

—সে কি হে? এখানেও বাগ আছে নাকি? তবে আর দূরে গিয়ে কী লাভ?

একটি সহায় উত্তর পেলাম—যা বলেছ ভাই! তবে কি জানো? কবে কোন দিন ব্যাঘ্র মহারাজের রূপা হবে, তিনি পাহাড় থেকে নেমে এদিকে শুভাগমন করবেন তার তো কিছুই ঠিক নেই—কাজেই ঠিক অকুন্তলে যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। তবে জঙ্গলে যাওয়ার পথে ভালুকের দেখাও মিলবে—বুনো শুর্যেরও আছে—বিস্তর হরিণও দেখতে পাবে, যদি চাও তো এস্তার পিছুতে পারো।

শুনে পুলকিত হলাম। আর কথা কি? আমরা পরের দিন সকালেই রওনা হয়ে পড়ি। বলাই বাহুল্য, সঙ্গে কয়েকটা টিফিন কেঁরয়ারে প্রচুর খাবার, পানীয় জল, বন্দুক, টোটা ইত্যাদি সরঞ্জামের কোনই ক্রটি নেই। আর সঙ্গে ছিল বন্ধুবরের অফিসের গাট্রাগোটা দারোয়ান খড়গ সিং—জাতে নেপালী। তারও শিকারীর বেশ—কথায় বেশ চটপটে—সব কাজেই চৌকশ।

বেলা আটটা নাগাদ আমরা সেই গ্রামে এসে পৌঁছুতেই কয়েকজন গ্রামবাসী

● রায়চাঁকে বাগের ডাক
শ্রীদেবপ্রনারায়ণ রায়

আমাদের মোটরকে ঘিরে ঝাঁড়ালো। তাদের মধ্যে একজন মাঝবয়সী লোকের হাতে একটা টান্সি, কোমরে ভোজালি দেখে তাকেই ডেকে নিলাম। ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে তাকে জিজ্ঞেস করি—বাঘ কোথাও মারি করেছে কিনা।

উত্তরে সে বললে—বাঘ গরুটার কোমর থেকে খানিকটা মাংস খেয়ে উধাও হয়েছে।

বুঝলাম এটা বাঘের কীর্তি নয়—নিশ্চয়ই বাঘিনী। কারণ বাঘ হলে সে গরুটার মাথার দিকে কিংবা ষাড়ে আক্রমণ করতো।



...জানতে পারা গেল বাঘটা উধাও হয়েছে।

গ্রামের কথাটা সংক্ষেপেই বলে রাখি। পাহাড়ী গ্রাম, ছোট ছোট কুঁড়ে-ঘরের বসতি সব। কেবল দূরে মিশনারী-দের একটি গির্জা দেখা যায়—কাঠের তৈরী। আর একটু পশ্চিমেই গ্রামের একটি বিশিষ্ট মোড়লের বাড়ি। যেমন তেমন লোক নয়—হয়তো হাজার বিঘে জমির মালিক—চাষ বাস করা, বাজনাপত্র আদায় ইত্যাদি কাজে সে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে থাকে। ভাবে ভঙ্গীতে চেহারায় বেশ বোকা যায়, সে কারও পরোয়া করে না। ধানের মরাই কয়েকটা তার বাড়িতে। হাঁস মুরগী, গোটাকয়েক ভেড়া ছাগল, কয়েক জোড়া বলদ, একপাল পাহাড়ী গরু, দু-দুটো গাধা, একটা খচ্চর—এই সব নিয়ে বিরাট তার সংসার। একপাশে আছে পিলখানা—গোটা আঠেক হাতী পায়ে শিকল বেঁধে মোটা মোটা শালকাঠের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা। প্রত্যেকের সামনেই রাশীকৃত

পুণ্ডীগাছ (কলাগাছের মত একজাতীয় সরু সরু গাছ—হাতীর শাখ)। একটা ছোট বাচ্চা হাতীও দেখলাম। ঘন মেঘের মত তার গায়ের রং—ছোট্ট শূঁড় দুলিয়ে সে যখন কান দুটো নাড়তে লাগলো—মনে হ'ল, কিছুক্ষণ ঝাঁড়িয়ে ভাই দেখি।

- রাহডাকে বাঘের ডাক
প্রবীরেন্দ্রনাথ রায়

কিন্তু সে সময় কৈ? মোড়লের সঙ্গে কথা বলে গোটা দুই হাতী চেয়ে নিতে হবে—তা ছাড়া আরও অনেক কিছু সাহায্যই সে করতে পারে।

খড়গ সিংকে পাঠিয়ে খবর দেওয়া হ'ল। কিছুক্ষণ পরেই মোড়লের আঙ্গানো আমরা তার কাছে হাজির হলাম। চেয়ার টেবিলের বাংলাই নেই। কাঠের খুঁটির ওপর কাঠের তক্তা বিছিয়ে অনেকটা বেঞ্চের মত করা আছে। তারই ওপর বসা গেল।

আমাদের উদ্দেশ্য বলতেই মোড়লও উৎসাহী হয়ে তৎক্ষণাৎ আমাদের দু'দুটো হাতী দেবার কথা তার মাতৃত-প্রধানকে বলে দিল এবং নিজেও সে একটা পৃথক হাতীতে আমাদের সঙ্গে যাবে, এই সংকল্প ঘোষণা করলে।

আমরা যদিও সকালের ষাওয়াটা বেশ ভালভাবেই সেরে এসেছিলাম, কিন্তু মোড়লের নিমন্ত্রণকে এড়ানো গেল না। তবে উপকরণে আড়ম্বর ছিল না,—চিড়ে, কাঁচা দৈ, গুড় আর সঙ্গে গুটিকয়েক পাকা কলা।

আতিথ্যার্থে বাধা দেওয়া চলে না; কাজেই দই, চিড়ে, কলা আর গুড় দিয়ে অপূর্ব এক মণ্ড তৈরি করে অতিকষ্টে গলাধঃকরণ করা গেল। মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছিল—এই বুঝি বসি হয়ে যায় আর কি! অভ্যেস নেই তো! কিন্তু চা-বাগানবাসী আমার সেই বন্ধুটি খুব তৃপ্তির সঙ্গে সেই কাঁচা ফলায়ের উৎসবে মেতে গেল।

অতঃপর যাত্রাপর্ব। একটি হাতীর উপরে আমার সেই বন্ধুবর, আমি আর খড়গ সিং—আর একটা হাতীতে আমার সহগামী বন্ধু শুবীর, অনন্ত আর অতুল, পেছনে তৃতীয় হাতীর ওপরে গাঁয়ের মোড়ল, তারও পেছনে জন বিশেক লোক, হাতে চাপ্পি, বর্শা, লাঠি ইত্যাদি।

পাহাড়ী নদী রায়ডাক—কোন অজানার ডাকে ছুটে চলেছে, কে জানে!

অবনীকান্ত ঠোটে একটি আড়ুল চাপা দিয়েই বসে ছিল, সে তড়াঙ্ক করে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠেই আর এক নম্বর ভাবপ্রবণতা জাহির করে বসল—আহা, কী সুন্দর! যেন সে উদ্ভ্রান্ত হয়ে কোন নাম-না-জানার সন্ধানে, পর্বতে বনে বনান্তে ছুটে চলেছে!

অহেতুক বাধা পড়ায়, অজ্ঞান সেন এক বটকায় তাকে বসিয়ে দিয়েই আমার বলতে থাকে—নদীর জল গভীর নয়, কিন্তু তার স্রোতে বুঝি সব কিছুই ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বুনা মোষগুলো যখন নদী পার হয়, তখন তাদেরও খুব সন্তুর্পণে এক একটা করে পা তুলে কেলতে হয়—একটু অসাবধান হলেই স্রোতে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। হাতীর পিঠেই আমরা নদীর ধারে এসে থমকে ঝাঁড়ালাম। এখন কোন

দিকে যাওয়া যাবে? এমন সময় সেই মোড়ল তার দলবল সঙ্গে সেখানে এসে আমাদের সেই নদীর ধার দিয়ে বরাবর পূর্ব দিকে যাওয়ার নির্দেশ দিলে। প্রায় মাইলটাক সেই উঁচু নীচু জমির ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পর সামনে একটা ধানের ক্ষেত পাওয়া গেল। সেটাকে ডাইনে রেখে আরও কিছুটা যেতেই কয়েকটা ঝোপ, তার ওপারেই কয়েকটা বস্তি। মোড়ল বললে—বাঘটা সেখানেই মারি করেছে। প্রায়ই কৃষকদের গরু ছাগল ধরে নিয়ে যায়। কয়েকদিন আগেও একটা লোক বাঘের হাতে খায়েল হয়েছে।

আমরা খুব সন্তুর্ণণে পথ এগিয়ে চলি। মোড়লের হাতীটা একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে যেতেই, কেমন যেন গুড় গুড় করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের হাতীদুটোও ধমকে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে যারা, তারা সবাই মিলে এমন একটা হৈ চৈ শুরু করে দিলে যে মনে হ'ল, সত্যি বৃষ্টি বাঘ বেরিয়েছে।

কিন্তু, কোথায় বাঘ?

সামনে তাকিয়ে দেখি, গ্রামখানা ছাড়িয়েই তরাই অঞ্চলের ঘন অরণ্য আরম্ভ হয়েছে। বিরাট বিরাট শালগাছ মাথা উঁচু করে যেন আকাশ ছুঁতে চায়। নীচে জঙ্গল, তার মধ্যে নানারকম ফান' জাতীয় গাছ। জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। যারা জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে যায় তারা, আর বন-বিভাগের কর্মচারীরা সকলেই ঐ হাঁটাপথেই জঙ্গলে প্রবেশ করে। শোনা গেল, ওর মধ্যেই নাকি বাঘের আড্ডা। কিন্তু বিনা অনুমতিতে ওখানে যাওয়া যাবে না।

আপাততঃ যে বাঘটা গ্রামে অত্যাচার শুরু করেছে এবং আশপাশেই হয়তো কোথাও আছে তারই খোঁজ করা যাক। গ্রামবাসীদের দু'চারজনকে জিজ্ঞেস করতে তারা সবাই একবাক্যে জানালে—বাঘটা আর কোথাও যায়নি, নিশ্চয়ই ঝোপে-ঝাড়ে কোথাও লুকিয়ে আছে।

একটা জঙ্গলের খানিকটা বাঁশের বন। সরু তলতা বাঁশের ঝোপ—কঞ্চিগুলো এপাশে ওপাশে ছড়িয়ে যেন মাটিকে ছুঁয়ে প্রণাম করতে চায়। তার পাশেই একটা বেতের জঙ্গল। বাঘ যদি বেতবনে ঢুকে থাকে, তা হলেই তো মুশকিল! নাঃ, তা বোধ হয় নয়। তাদেরও তো স্ত্রিবিধা-অস্ত্রবিধা আছে! এইরকম অনেক কিছু জল্পনা-কল্পনাই করে চলি।

বাঘটা যেখানে মারি করেছে, তার পাশ দিয়েই ছোট্ট একটি কয়না তরতর করে বয়ে এসে রায়ডাক নদীতে পড়েছে। আমরা আশেপাশেই খোঁজাখুঁজি করি, বাঘ হয়তো কোথাও লুকিয়ে আছে—সন্ধ্যা হলেই আবার সে আহার-পর্বে যোগদান করবে।

● রায়ডাকে বাঘের ডাক

ঐশীয়েন্দ্রনারায়ণ রায়

এদিকে বেলাও প্রায় গড়িয়ে এসেছে—সূর্যদেব পাটে বসবেন এইবার। এর মধ্যেই যদি কিছু করা সম্ভব না হয়, তবে সমূহ বিপদ। মরিয়া হয়ে মোড়ল তখন তুকুম দিলে—জঙ্গলগুলো ‘বিট’ করা হোক।

তৎক্ষণাৎ তুকুম তামিল। জঙ্গল বিট শুরু হতেই আমার হাতীটা হঠাৎ শুঁড় উঁচু করেই বিকট একটা আওয়াজ তুললে—সঙ্গে সঙ্গেই অগাধ হাতীগুলোও তার সঙ্গে যোগ দেয়। বন্দুক হাতে নিয়ে আমি তৈরী হয়েই রইলাম। খড়গ সিং তার টান্দিটা বাগিয়ে বসে রইল। কি জানি যদি বাঘটা লাফিয়ে হাতীর ওপর আক্রমণ চালায়, তবে সেও টান্দির সম্ভাবহার করতে একটুকুও দেরি করবে না।

টিক সামনেই, বোধ হয় বিশ গজও হবে না, জঙ্গলের ফাঁকে হঠাৎ একটা বাঘের মূণ্ড জেগে উঠেই ডুবে গেল—তার ওপর একটা আক্রমণ আসন্ন বলেই বুঝি সে আত্মগোপন করতে চায়।

কিন্তু তা’ তো নয়! বাঘটা যেন সোজা বেরিয়েই ছুটে চলে, যেন ঐ বরনাটা পার হয়ে, আমাদের কলা দেখিয়ে ঐ অরণ্যে ঢুকে পড়বে। মুহূর্তের মধ্যে আমি যেন নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। বাঘ বরনাটা লাফিয়ে পার হওয়ার চেষ্টা করতেই আমার রাইফেলও গর্জন করে উঠল।

গুলিটা লাগলো বাঘের কোমরে—একটা বিরাট গর্জনে রায়ডাকের বনভূমি কেঁপে উঠল। বাঘটা ঘুরে দাঁড়িয়েই হাতীকে লক্ষ্য করে বিদ্রোহের মত ছুটে আসে—প্রকাশ ঠাঁ—মুখের ভেতর সাঙ্গা দাঁতগুলো নিকমিক



দ্বিতীয় গুলিটা বাঘটার মূণ্ডগল্লর ভেদ করে চলে গেল। [পৃষ্ঠা ৪৫৬

● রায়ডাকে বাঘের ডাক
শ্রীবীরেন্দ্রনাথ রায়

দেব দেউল

করে উঠল—“হয় তুমি মর, নয় আমি মরি,” এমনি একটা বেপরোয়া ভঙ্গী তার।

আর মুহূর্তকাল বিলম্ব নয়। আমার দ্বিতীয় গুলিটা তার মুখগহ্বর ভেদ করে বেরিয়ে গেল। হতভাগ্য জানোয়ারের অমিত বিক্রম তখন ধুলোয় গড়াগড়ি।

পরীক্ষা করে দেখলাম আমার অনুমানই ঠিক—বাঘ নয়, একটা বেশ বড় রকমের কৈদো বাঘিনী!

গল্প শেষ করে অর্জুন একটা মোটা বার্শা চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে অবনীকে বললে—কৈ হে কবিবর, তোমার কচুরি আর চা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। ওগুলো তো অনেকক্ষণই টেবিলে তোমার রসনার অপেক্ষায় আছে।

চমকে উঠলাম।

সত্যিই তো—চা-টা যে একেবারেই ঠাণ্ডা—!

—ওরে কে আছিস, শীগ্গির গরম গরম আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

কবিবরের ভাবে ঢল ঢল চোখে তখনও বাঘের ছবি—সেটা সেরে যেতেই সে চিৎকার করে উঠল—আরে, দেখেছো মজাটা—পোর্স্টমাস্টার মশাই দিবা গরম গরম চা কচুরি ধেয়েই কখন সরে পড়েছেন!

অর্জুন সেনের টিপ্পনী—মাস্টার লোক কিনা তাই সর্ববিষয়েই মাস্টার।

“হির হক! ঘরে বাহ না হও বাতুল,
করে করে পায় লোক ভবদিক্ত কুল।
সকট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইরা
বখাবোয়া বিবর তুল্ল অবাসক্ত হইরা।”

শ্রীচৈতন্যদেব

মণি ও মূক্তা

বিরাট অমিরার উত্তরামিকারী রত্ননাথ বখন
মৌষনে লংসারের লব কাজ ছেড়ে দিয়ে বৈরাগ্য
নিভে যান, তখন চৈতন্যদেব তাঁকে এই উপদেশ
দিয়েছিলেন।





অপকল্প কথা

—চক্ষিগারজম মিত্র মজুমদার

—তুমি কি পার ?

—সাঁতার কাটতে ।

সত্যি, মাছের সঙ্গে সাঁতার কেটে কেউ-ই পারলে না । শব্দ শামুকের দল তো অবাক হয়েই রইল মাছদের সাঁতারের দৌড় দেখে ।

সমুদ্র হাসলো ।

থুবই থুশী হয়ে ।

—সাঁতারের অমন অদ্ভুত গুণপনা তো দেখালে, কিন্তু তোমরা কি হাঁটতে পার ? মাছেরা হাঁ করতে গিয়ে বন্ধ করলে, মুখ বুজে সরে এলো ।

কুমীরের দলেরা বললে, তা পারিনে ? সাঁতারে প্রায় হেরে যাই বটে, কিন্তু হাঁটতে ? জল আর মাটি সবই বেড়িয়ে এলেম ।

সমুদ্র, মাটি হাসল দুজনেই থুশীতে ।

—তোমাদের সুধাতি না করে পারিনে । তা, উড়তে পার কি ?—ঈতগুলি তারা এঁটে বন্ধ করতে বাবে, হঠাৎ পিছন থেকে একজন উঁচু হয়ে বললে,—আমার খুঁড়ত ভাইয়েরা তাও পারে ।

—পারে !

বাহুড়ের মত পাখা নেড়ে তাদের খুঁড়ত ভাইয়েরা এসে তাদের ঈত আর লেজ স্কন্ধ ওড়বার কসরত দেখিয়ে দিলে ।

আকাশ হা ! হা ! করে হেসে উঠল থুশীতে ।

হাসির সে হাওন্নাতে গাছের পাতা নেচে উঠলো সমুদ্রের কিনারা-পাহাড়ের চূড়োয়, যেখানে যেখানমে তার কাহাকাহি ।

বনে বনে নাচল ফুলের পাঁপড়িরা ।

—নাচ দেখে খুশী হলেন।

—বেশ তো। তাহলে তোমরা কি গান গাবে ?

পাতার ভিতর থেকে পাখিরা ঠোট বের' করে বলে—না।—বলেই গান জুড়ে দিল।
নিজদের গানের সুরে তাদের রঙে শিউরোলো পাখা, শেষে তাদের উধাও
উড়িয়ে নিয়ে চলল।

বন, পাহাড়, দ্বীপ, দেশ, মহাদেশ, মেঘের ম্লুক—সুরে ভরে গেল।

তবু গান শেষ হয় না !

কথা বলবে কে ?

পাখিরা হেসে বললে—গান গাইতেই পারি, কথা তো আমরা জানি নে !

বাতাস ধমকে ছিল।

গাছের ডালের পাশ থেকে উঁকি মেরে বানরেরা নেমে এসে বললে—কিচি
মিচি খিচি !

বলেই তারা চুপ করে গেল ; মাটিতে পড়া ফল, ফলের আঁটি তারা কামড়াতে লাগল।

পাখিরেরা, শুকনো পাতারা, সবুজ ঘাসেরা হেসে বললে,—ভাই, তোরা সাহস
করে মুখ তবু খুলতে যাচ্ছিলি যা হোক !

ধরা পড়ে, লজ্জায় চোখ মিটিমিটি করে বানরেরা কেউ গাছে উঠে ফল খেতে
লাগল, কেউ পালাল পাহাড়ে।

হাওয়ার সৌ সৌ ঢেউয়ের গর্জন, মেঘের আওয়াজ, জানোয়ারদের শোরগোল,
পাখির সুর, কিস্তি কথা কোথায় ?

পাহাড়ে কোন গুহায় প্রথম জন্মাল মানুষ।

জন্মেই সে বললে

—“মা”

জলে, স্থলে, আকাশে, পৃথিবীতে যেন অনন্ত মধু ঢেলে দিলে !

সেইরূপ অপরূপ ‘মা’ কথা।

হাজার হাজার বছর চলেছে, গহ্বর ছেড়ে বনে, বন ছেড়ে কুঁড়েয়, কুঁড়ে ছেড়ে
অট্টালিকায় মানুষ এসেছে।

যুগ যুগ যাচ্ছে চলে।

মানুষ যে কত দেশে কত ভাষায় কথা বললে, কত কথা শেখালে, কথার আদরে
পশুদের বশ করলে, কত ভাষায় লিখলে কত সহস্র বই, তবু আজো পৃথিবীর যেখানে
যে মানুষ জন্মাল, জন্মেই সবখানে মানুষ সেই অনুপম প্রথম কথাই বলেছে—‘মা’।

পৃথিবীর সবখানের সব মানুষ কি ভাইবোন ?

মদনার কথা শুনে রায়-
বাহাদুরের কালো মুখ আরো
কালো হয়ে উঠল। শাট করবার
সময় ইঞ্জিনের ধোঁয়া যেমন তক্তক্
ক'রে বেরোয়, তিক সেই রকম
বেকতে লাগল তাঁর মুখের ধোঁয়া।
গড়গড়ার নল ছিল হাতে, সেটাকে
মুঠি ক'রে ধরলেন, যেন তাই
দিয়েই মদনার মুখে এক ঘা বসিয়ে
দেওয়ার মতলব।

ঘা-গুতো দিলেন না বাটে,
কিন্তু চিবিয়ে চিবিয়ে কথা যা
শোনাতে শুরু করলেন, তার জালা
চাবুকের জালায় চাইতে কম নয়।
“একেই বলে ঘোর কলি। বধা
নেমেছে কি না নেমেছে, কেঁদে
এসে পড়লি, ঘরে থাবার নেই
বলে। হাজার টাকা তোলা ছিল
হারু সিকদারকে দেব বলে, তাই
থেকে একশো টাকা বার ক'রে

তোকে দিলাম। সিকদারের পো চালানী ব্যবসা কেঁদেছে, তিন বছর খাটাবে আমার টাকা, সুদের
মার নেই কানা কড়ি। দেখ্ ভেবে, সেই সোনারচাঁদ খাতকের মুখ থেকে আমি একশো টাকা কেড়ে
নিয়ে এলাম—তোর ছাইমুখো গুটিকে খাইয়ে বাঁচাবার জন্য। আর এখন? তুই ব্যাটা অস্বাভাবিক
না-পড়তেই নাচতে নাচতে এসে হাজির, ‘টাকাটা হিসেব ক’রে নিন কত্তা!’—একে বধি
ঘোর কলিই না বলব, কাকে আর বলব শুনি?”

অপরাধটা যে তিক কোন্‌খানে হয়েছে, বুঝতে না পেয়ে কাল্ কাল্ ক'রে রায়বাহাদুরের
পানে তাকিয়ে রইল মদন। কথা ছিল—এক বছরের ভিতরে টাকা শোধ করবে। সেইগানে
সে ছয় মাসও পেরুতে যেতনি। আশা ছিল—চটপট টাকা কেয়ত পেয়ে কত্তা খুঁই হয়ে



—হুমার তপতারা

দেব দেউল

তু' এক টাকা স্নদ হয়ত মাক ক'রেই দেবেন। কিন্তু এ ঘেন উলটো-বুঝলি রামের মত শোনাচ্ছে!

মদনাকে নিশ্চুপ বেগে আবার ভক্ ভক্ ক'রে থানিক দৌয়া ছাড়লেন রায়বাহাদুর। তারপর হাঁক দিলেন মেঝে। ছেলে কেঁটোর নাম ক'রে। পাশের ঘরেই হিসাবের খাতার পাতা ওলটাইছিল



ভক্ ভক্ ক'রে থানিক
দৌয়া ছাড়লেন
রায়বাহাদুর

কেটো, দেনদার টাকা শুধতে এলেই গোমস্তার হাত থেকে খাতা টেনে নিয়ে সে স্নদ কবতে বসে। এসব ব্যাপারে তার খুব উৎসাহ। বাপের পাওনা আঠারো-আনা আদায় ক'রে দেবার পর সে খাতককে আড়ালে টেনে নিয়ে যায়, আর হাসি-হাসি মুখে তার কানে কানে বলে—“দেখলি তো কী-রকম সুবিধে ক'রে দিলাম তোরা? দে—আমার একটা টাকা দে। আবার তো আসছে বছর আসবি!”

মনে মনে এই বেহায়াটার উপরে যতই চটুক, বেশীর ভাগ খাতকই একটা ক'রে টাকা ওকে দিয়ে যায়। সত্যিই তো! আসছে বছর আবার এখানেই হাত পাততে হবে তো! কেটোবাবুকে চটিয়ে দিলে সে-সময় বহুত বাগড়া পড়তে পারে। রায়বাহাদুরের পাঁচটা ছেলের

মধ্যে এইটেই মুখু। চাকরিচাকরি করে না, সেরেস্তা বেঁটে এমনি করেই ছ'পরগা কামার। রায়বাহাদুর বোধেন লব; কিন্তু মুখু বলেই বোধ হয় ওর উপরে বাপের দয়া বেশী। বুঝেও কোন কথা বলেন না।

মদনা আসতেই খাতা খুলে বসেছিল কেটো, এখন বাপের হাঁক শুনে খাতা হাতে করেই এসে দাঁড়াল তাঁর সামনে।

● লাখা

কুমারী তপতীমানী

“কত সুখ?” জানতে চাইলেন রায়বাহাদুর।

“শতকরা আড়াই টাকা মাসে।”—জবাব দিল কেটো।

“আড়াই টাকা?”—কাতরে উঠল মদনা। “না, না, ওটা ছ’টাকা হবে, যেজোবাবু! ওটা ছ’টাকা হবে।”

“ছ’টাকা হবে? কেন হবে, শুনি?”—গর্জে উঠলেন রায়বাহাদুর।

মদনা ভয় পেয়েও মরিয়ার মত জবাব দিল—“যেজোবাবুই আমার আড়ালে বলেছিলেন—ওটা ছ’টাকা হবে। বলেছিলেন—দলিলে যত-ইচ্ছে লেখা থাকুক, আদারের সময় এ-বাড়িতে ছ’টাকার বেশী কোন খাতককে দিতে হয় না।”

রায়বাহাদুর হাত চাপা দিয়ে মুখের হাসি ঢাকলেন, তারপরই গড়গড়ান নল ফেলে দিয়ে চোট ফটফট করতে করতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন—তার তেল মাখবার সময় হয়ে গিয়েছে। কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কেটো হিসেব করতে বসল—মাসে আড়াই টাকা হলে বছরে হ’ল গিয়ে—ছ’ টাকা করেই আগে হিসেব করা যাক—বারো মাসে বছর তো?—বারো ছ’গুণে হ’ল গিয়ে ছাব্বিশ—”

কেটো দেখে নি মদনার পিছনে বসে ছিল কালোকালো একটি নয় দশ বছরের ভেলে। সে এতক্ষণ একটি কথাও কয়নি। কিন্তু কেটোর মুখে বারো ছ’গুণে ছাব্বিশ শুনে, এবং বাবা তার কোন প্রতিবাদ করছেন না দেখে, সে আর চুপ ক’রে থাকতে পারল না। মুচগলার বলে উঠল—“ছাব্বিশ নয়, চব্বিশ। ও বাবা, তুমি গুনছ না? বাবু যে ভুল হিসেব করছেন! বারো ছ’গুণে ছাব্বিশ নয়, চব্বিশ!”

ছাব্বিশ-চব্বিশের হিসেব আদবে কানেই ঢোকেনি মদনার। কি ক’রে ঢুকবে? সে ভাবছিল অল্প কথা। এক বছরের সুখ যেজোবাবু হিসেব করে কেন? আবার থেকে অগ্রাণ—ছয় মাস মোটে। তাও আবার, নিয়ম যদি মানতে হয়, আবারের সুখ নিলে অগ্রাণের নেওড়া চলে না, অগ্রাণ নিতে হ’লে ওদিকে আবারটা বাব দিতে হবে। কাজেই, তার বেনা হ’লে পাঁচ মাসের সুখ। ছ’টাকা হিসেবে দশ টাকা। আসল একশো, আর সুখ দশ—সব মিলিয়ে একশো দশ টাকা সে এনেছে। অথচ যেজোবাবু বে-রকম হিসেব করছে—

সে-কথা সে বলেই ফেলল। “বারো মাসের হিসেব কেন করছ যেজোবাবু? কচি ছেলের কথা শুনে রাগ কোরো না। কিন্তু চব্বিশই বা কিসের, ছাব্বিশই বা কিসের? সুখ তো আমি দেব মোটে পাঁচ মাসের।”

মোটা খাতাখানা জুন্ ক’রে বন্ধ ক’রে ফেলল কেটো। টেচিরে বলে উঠল—“পাঁচ মাসের?

● মাঝ

কুমারী তপসীরানী

যা, তা হলে আদালতে গিয়ে জমা দিগে যা! বাহবা রে আদার! এখন তুমি পাঁচ মাসের সুদ দিয়ে দেনাটি শোধ ক'রে গেলে। তারপর ঐ টাকাটা নিয়ে আমরা করব কী? এখন তো চাষীর ঘরে ঘরে গোলা ভর্তি; কেউ কি এখন ধারকর্জ নিতে আসবে? টাকা যে লিন্দকে পচবে আমাদের! লগুনি করার সময় হ'ল বর্ষা। যে ধার করবে, তাকে এক বর্ষা থেকে আর এক বর্ষা পর্যন্ত সুদ দিতেই হবে।”

মদনার মনে হ'ল—তার মাথায় এক বা ডাঙা বসিয়ে দিয়েছে মেজোবাবু। ধারকর্জ এর আগে তাকে কখনো করতে হয়নি, অবস্থা তার মোটামুটি ভালই। গেল-বছর আকালের দরুন ও-বিঘের হাতেখড়ি হয়েছে তার।

কেটোর কথা শুনে জ্ঞানগম্যি যেন লোপ পেয়ে গেল বেচারার, কথা বেরোর না মূখ দিয়ে, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে কেবল তাকিয়েই রইল কেটোর পানে।

কেটো? তুখোড় ছেলে! খাতকদের দশ দশা দেখে দেখে সে পাকা খেলোয়াড় ব'নে গিয়েছে। এবারে একটু নয়ম হয়ে বলল—“সব টাকা আনিস্নি বুঝি? তাতে আর হয়েছে কি? যা এনেছিল, জমা দিয়ে যা! বাকী তো থাকবে সামান্যই! বারো ছ'গুণে ছাব্বিশ, আর বারো আশে ছয়—একুনে হ'ল গিয়ে চৌত্রিশ টাকা। তা তুই এনেছিল বুঝি বারো, না দশ? দিয়ে যা একশো দশ টাকাই দিয়ে যা, খাতার টুকে রাখব আমি। চ' হ', এ হ'ল রায়বাহাদুরের গদি, এখানে এক পরগার তঞ্চক হবার জো নেই!”

মদনা আর হালে পানি পায় না। নয় বছরের ছেলেটার পানেই সে ফিরে তাকাল অসহায়ভাবে। ভাবটা এই—“তুই কি বলিস্ নখিল্লর?” নখিল্লরের যা বলবার তা সে বলতই, বাপ ফিরে না তাকালেও। ছোট বড় সব ব্যাপারে নিঃস্ব মতামত জোরগলায় জাহির করা এই বয়সেই তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

নখিল্লর বা বলল, তা রায়বাহাদুর সুনলে জুতো মারবার হুকুম দিতেন তজ্জুনি। কেটো তা শুনে ঝাঁক হাসি হাসল, এবং গট্‌গট্‌ ক'রে উপরে উঠে গেল, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে।

অর্থাৎ নখিল্লর বলেছে—টাকা জমা রাখা না-রাখার কথা এখন নয়। তারা গিয়ে রসিক মোক্তারকে ডেকে আনবে, সে হয় নখিল্লরের দূরসম্পর্কের বোনাই। টাকা যদি দিতে হয়, দেওয়া হবে রসিকের সামনে।

এতবড় আশ্বর্ষ্য কথা কেটো তো কখনো শোনেই নি, রায়বাহাদুরও না। তাঁর এই পঞ্চম বছর বয়সের ভিতরে ছায়ায় রকম মানুষ নিয়ে কারবার করেছেন তিনি। তাঁর আর তাঁর খাতকের

● লাক্ষা

কুমারী তপতীরানী

ভিতরে ভূতীয় লোক ঢোকাবার প্রস্তাব করতে পারে, এমন বৈরাগ্য কটিকে এতদূর তিনি চোপে রাখেননি। কেটোর কাছে সব কথা শুনে তিনি চক্ৰম্ব দিলেন—“টাকা ডেড়ো না। থাকে শুলী ডেকে দায়ক, যে রকম শুলী লিখিয়ে নিক। একশো দশটা টাকা অবলোয়ার ডেড়ো দেবার জিনিস নয়। টাকা নিয়ে নাও, তারপর একে দেখে নিচ্ছি আমি—”

তাই-ই হ'ল! চেলের যুক্তি অপ্রমাণী আধাঘণ্টার ভিতরই রসিক মোস্তারকে নিয়ে এল মদন, আর পাঁচ মাসের স্তন দিয়েই বেড়াই পেয়ে গেল। একশো দশ টাকা স্তনে আসলে মদন, আর কেটোর নিজের এক টাকা—বাস্! রসিকই টাকা শুনে দিল, রসিকের হাতেই দ'লল ফেরত ইল কেটো।

মদন পিঠি চাপড়ে দিল চেলের। রসিককে বলল—“জানো আমাই, এতটুকু চেলের কী দি! তোমার ডেকে আনবার কথা ঐ বলেছিল। আর তুমি এসেছিলে বলেই এত সজো উল কামেলা। আমি তো বিশেষতারা হয়ে পড়েছিলাম বাবা!”

একটা বছর গেল। রাহবাহার ভোলেননি যে মদনকে টিট করতে হবে। তাঁর এতকালের জোরতী বাবসার বারোটা বেজে যাবে—এ তিনি সইবেন না।

কেপাও কিছু নেই, একদিন নীলামের চোল বেজে উঠল মদনার বাড়িতে। গায়ের লোক চুটে গেল কাজকর্ম ফেলে। কী হ'ল? ব্যাপার কী?

কেটো ছিল আদালতের পেয়াদার সঙ্গে। গোফে তা দিয়ে বলল—“সোজা আদালত 'ব' বেরায় না, কী করি বল? টাকা তো আদায় করতেই হবে!”

“টাকা? কিসের টাকা?”—চৈচিয়ে উঠল মদন।

কেটো বলল—“তমস্রক লিখে ও-বছর আদালতালে একশো টাকা ধার করনি?”

“করেছি তো হয়েছে কী!”—রেগে উঠল মদন—“সে-টাকা স্তনে আসলে শোণ ক'রে যিনি? একশো দশ টাকা! আর তোমার পান খাবার এক টাকা! দিইনি তা?”

গায়ের লোক অবাক হয়ে গুনচে। মদনকে তারা জানে একান্ত নিরীহ লোক বলে। ঠাকুরদেবতার উপর ওর অটুট ভক্তি, বাহুনের পাদোদক ধার এই ক'লির সঞ্চেতেও। সে যে একটা আজগুবি মিথ্যা কথা বলবে এত দোকের সামনে দাঁড়িয়ে, এ কারো যেন বিশ্বাসই চতে চায় না।

মদনার কথার উত্তর যোগানোই আছে কেটোর বুধে। “টাকা স্তনে আসলে শোণ ক'রে তিরেছিল? মরে বাই আর কি!”—জনতার দিকে কিয়ে সে টিটকারি দিয়ে বলল—“হ্যাগো

● দাখা

কুমারী গুণতীরানী

দেব দেউল

ভালমাহুঘের ছেলেরা, টাকাপরসার লেনদেন তোমরাও ক'রে থাক, বলি—একটা দেনা শোধ ক'রে দিলে শুদ্ধি তার দলিলখানা তোমরা ফেরত নিয়ে থাক কিনা?”

“তা আবার নিই না?”—একসাথে বলে উঠল বিশ জন লোক।

“নিশ্চয়ই নাও।”—জোর দিয়ে দ্বিগুণে কথা বলতে লাগল কেটো। “নিশ্চয়ই তা নিতে হয়। মদনাও যদি টাকা দিয়ে থাকে, সেও অবশি তার দলিল ফেরত নিয়েছে।”

“নিরেছিই তো!”—সায় দিল মদনা।

“বেশ, দেখাও সে দলিল!”—হুঁমু করল কেটো—“এই সব ভালমাহুঘের ছেলেকে দেখাও সে দলিল!”

দলিল?—মদনা মাথা চুলকোতে লাগল। দলিলখানা কোথায়!—বাজে? সে ছুটল ঘরের ভিতর। বাহ্য খুলে উলটে পালটে খুঁজতে লাগল। না, নেই তো!

জনতার ভিতর কেউ-একজন বলে উঠল—“শোধ-করা দলিল কি আর কেউ যত্ন ক'রে তুলে রাখে? ছিঁড়ে ফেলে দেয় তখুনি!”

কেটো অবাক দিল—“কই, তোমাদের মদন হালদার তো তা বলছে না! সে তো খুঁজতে গেল ঘরের ভিতর।”

“পেলাম না তো! ওটা কি তবে রসিকের হাতেই রয়ে গিয়েছিল?”—ফিরে এসে কেটোকেই জিজ্ঞাসা করল মদনা।

কেউ কেউ হেসে উঠল, কেউ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল মদনার দিকে। লোকটা কি পাগল? না—এক মিথ্যে ঢাকবার জন্ত নরির হায়ে আর এক মিথ্যে চাপাচ্ছে তার উপর?

ওদিকে কেটো যেন আকাশ থেকে পড়ল—“রসিক? রসিক আবার কে? রসিকের হাতে দলিল রয়ে গেল, এ কথায় মানে কী?”

“রসিক গো! রসিক মোস্তার!”—কামার মত শোনাল মদনার কথা। “আমার দূর-সম্পর্কের ভাগ্নী আনাই—তাকে নিয়েই তো টাকা মেটাতে গেলাম। সেই তোমরা পাঁচ মাসের জারগায় পুরো এক বছরের সুদ চাইলে কিনা—তাইতে নখিকরের পরামর্শে মত রসিক মোস্তারকে ডেকে নিয়ে এলাম আমি—”

আর বেশি করতে রাজী নয় আদালতের পেরাদ। সে চোল পিটিয়ে, বাঁশ পুঁতে, লুটিশ এঁটে দেশদুর্গ লোককে আনিয় দিল যে—মদন হালদারের অধি-আয়গা সব একশো টাকার দেনার ঈর্জ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছে মাসখানেক আগে। নীলাম কিনেছেন স্বয়ং রাব্বাহাছর।

আজ

মারী তপসীরানী

